নারায়ণ
সান্যাল
উলের কাঁটা
সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা
নারায়ণ সান্যাল
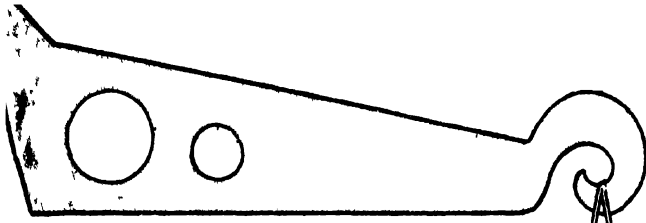
কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

দ্বিতীয় খণ্ড

1. মুশকিল আসান ঃ—XVIII.
2. বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ঃ—XII.
3. বল্মীক ঃ—XII.
4. গ্রাম্যবাস্তু ঃ—II.
5. পরিকল্পিত পরিবার ঃ—II.
6. বাস্তুবিজ্ঞান ঃ—X.
7. ব্রাত্য ঃ—XVI.
8. দশেমিলি ঃ—II. Decimal system
9. মনামী ঃ—XVII.
10. অরণ্যদণ্ডক ঃ—XII.
11. দণ্ডকশবরী ঃ—VI, XI, XVI, XVII.
12. HANDBOOK ON ESTIMATING—X.
13. অলকনন্দা ঃ—XVII.
14. মহাকালের মন্দির ঃ—XIII.
15. নীলিমায় নীল ঃ—XVI.
16 .থের মহাপ্রস্থান ঃ—VI.
17. সত্যকাম ঃ—XVI.
18. অন্তর্লীনা ঃ—VII.
19. অজন্তা অপরূপা ঃ—V.
20. তাজের স্বপ্ন ঃ—VIII.
21. নাগচম্পা ঃ—XVII.
22. নেতাজী রহস্য সন্ধানে ঃ—XI.
23. "আমি নেতাজীকে দেখেছি" ঃ—XIV.
24. পাষণ্ড-পণ্ডিত ঃ—XVI.
25. কালোকালো ঃ—I & III.
26. শার্লক হেবো ঃ—I, IX.
27. জাপান থেকে ফিরে ঃ—VI, XI.
28. আবার যদি ইচ্ছা কর ঃ—V, & XVI.
29. কারুতীর্থ কলিঙ্গ ঃ—V, XI.
30. গজমুক্তা ঃ—III, XVI, XVII
31. "আমি রাসবিহারীকে দেখেছি" ঃ—XIV, XI.
32. বিশ্বাসঘাতক ঃ—IV, X, XVI, XVII.

33. হে হংসবলাকা ঃ—IV, X, XVI
34. সোনার কাঁটা ঃ—IX.
35. মাছের কাঁটা ঃ—IX.
36. অশ্লীলতার দায়ে ঃ—XVI.
37. লালত্রিকোণ ঃ—XVI.
38. আজি হতে শতবর্ষ পরে ঃ—IV, XI, X.
39. অবাক পৃথিবী ঃ—IV.
40. নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ঃ—V.
41. পঞ্চাশোর্ধ্বে ঃ—VII.
42. পথের কাঁটা ঃ—IX.
43. চীন-ভারত লঙ-মার্চ ঃ—XI.
44. হংসেশ্বরী ঃ—XIII.
45. প্যারাবোলা স্যার ঃ—XVI.
46. ঘড়ির কাঁটা ঃ—IX.
47. কুলের কাঁটা ঃ—IX.
48. আনন্দস্বরূপিণী ঃ—XIV.
49. লিওবার্গ ঃ—XIV.
50. তিমি-তিমিঙ্গিল ঃ—III, IV.
51. কিশোর অমনিবাস ঃ—I, XIX.
52. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন ঃ—V, XI.
53. গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা ঃ—X.
54. গ্রামের বাড়ি ঃ—X.
55. অ রিগামি ঃ—I, X.
56. লা-জবাব দেহ্‌লী অপরূপা আগ্রা ঃ—V, XI.
57. না-মানুষের পাঁচালী ঃ—I, III.
58. সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম ঃ—XV, XI.
59. সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় ঃ—XV, XI
60. রাস্কেল ঃ—I, III.
61. IMMORTAL AJANTA—V, XI.
62. EROTICA IN INDIAN TEMPLES—V, X
63. রোদ্যাঁ ঃ—V, XIV
64. ষাট-একষট্টি ঃ—VII, VI.
65. মিলনান্তক ঃ XVI, XVII.
66. নাকউঁচু ঃ—I, III.
67. ডিজনেল্যাণ্ড ঃ—I, V, VI
68. উলের কাঁটা ঃ—IX.
69. লাডলিবেগম ঃ—XIV.
70. পূরবৈঁয়া ঃ—XVI.
71. প্রবঞ্চক ঃ—V, XVI.
72. অ-আ-ক-খুনের কাঁটা ঃ—IX.
73. পয়োমুখম্‌ —VI, XI.
74. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'—প্রথম খণ্ড ঃ
"ANIMAL 'ENCYCLOPAEDIA',
Vol. I—Invertebrates—III, XI
75. অচ্ছেদ্যবন্ধন ঃ—XVI.
76. না-মানুষের কাহিনী ঃ—I, III, XIX.
77. সাবমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা ঃ—IX.
78. ছয়তানের ছাওয়াল ঃ—XVI.
79. হাতি আর হাতি ঃ—I, III.
80. ছোঁবল
81. আবার সে এসেছে ফিরিযা
82. রূপমঞ্জরী
83. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'—দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মাছ—পাখি
ANIMAL 'ENCYCLOPAEDIA' Vol II.
Vertebrates, [Fish to Bird]— III, XI.
84. কাঁটায়-কাঁটায়—প্রথম খণ্ড ঃ
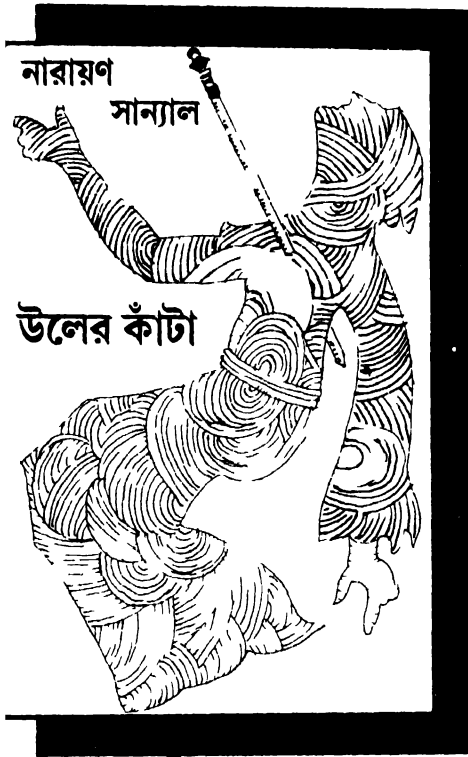
“কৃপা কব সুনিযে অব হামাবা হাওযাই জাহাজ ”

বাকিটা শুনবাব প্রযোজন হল না। কৌশিক স্ত্রীকে বললে, মাজাব পেটিটা বেঁধে নাও। আমবা শ্রীনগবে পৌছে গেছি। এখনই ল্যান্ড কববে।

সৃজাতা জানলা দিযে তুষাবমৌলী পাহাডেব দিকে তাকিযে ছিল। ওব কথায কোমবেব বেল্টটা কষতে কষতে বললে, শেষ পর্যন্ত কী সাব্যস্ত হল? হোটেল না হাউসবোট?

কৌশিক ততক্ষণে নিজেব বেল্টটা বেঁধে ফেলেছে। জবাবে বললে, দুটোব একটাও নয। গাধাবোট।

—গাধাবোট? তাব মানে?

—কর্তায ইচ্ছায কর্ম। বড-কর্তা কী বায দেন দেখ।

সৃজাতা আডচোখে সামনেব-সীটে-বসা ব্যাবিস্টাব সাহেবকে এক নজব দেখে নেয। ঘুমাচ্ছেন কি না বোঝাব উপায নেই। কোলেব উপব বিছানো আছে একখণ্ড দৈনিক পত্রিকা। চোখ দুটি বোঁজা। বাঁ-হাতে ধবা আছে চশমাটা।

কৌশিক সামনেব দিকে একটু ঝুঁকে পডে বললে, ঘুমোচ্ছেন নাকি বাসু মামু? প্লেন শ্রীনগবে ল্যান্ড কবছে কিন্তু।

বাসু-সাহেব নডেচডে বসলেন। বলেন, না জেগেই আছি। থিংক কবছিলাম।

বানী দেবী বসেছেন ওঁব পাশেব সীটে। ‘আইল’-এব দিকে। একটু ধমকেব সুবে বলেন, সাবাটা পথই তো তুমি কাগজ পডলে আব ‘থিংক’ কবলে। তাহলে জানলাব ধাবে বসা কেন বাপু?

—আযাম সবি। তা বললেই পাবতে। জানলাব ধাবেব সীটটা তোমাকেই ছেডে দিতাম।

—কিন্তু কী এত ভাবছ তখন থেকে?

অমায়িক হাসলেন বাসু-সাহেব। বলেন, তুমি শুনলে রাগ করবে রানু। আমি ভূস্বর্গে এসেও ধান ভানছি।

—ধান ভানছ? মানে?

—কালপেবল হোমিসাইড' না 'ডেলিবারেট মার্ডার'?

খবরের কাগজটা বাড়িয়ে ধরেন উনি। রানী দেবী হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। সে যাই হোক কাগজটা দেখবার সময় হল না। ইতিমধ্যে আকাশযান ভূমিস্পর্শ করেছে।

এয়ার হস্টেসকে বলাই ছিল। ওরা অপেক্ষা করলেন। শেষ যাত্রীটি নেমে যাবার পর এয়ার হস্টেস এসে জানালো, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসু-সাহেব আর কৌশিক ধরাধরি করে রানী দেবীকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনলেন। ততক্ষণে হুইল চেয়ারটা সিঁড়ির নিচে লাগানো হয়েছে। রানী দেবীকে তাতে বসিয়ে ওরা চারজনে টারমিনাল বিল্ডিং-এর দিকে চলতে থাকেন। কৌশিক বলে, মামু, আপনি লাগেজগুলো সংগ্রহ করুন। আমি ততক্ষণে বরং খোঁজ নিয়ে দেখি কোথায় থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

রানী বলেন, এখানে কী খোঁজ নেবে? তুমি বরং একটা ট্যাক্সি ধর। চল সবাই মিলে টুরিস্ট রিসেপশান সেন্টারে যাই আমি আর সুজাতা সেখানে মালপত্র পাহারা দেব। আর তোমরা দুজনে হোটেল কিম্বা হাউসবোট ঠিক করে আসবে।

সুজাতা আসছিল পিছন পিছন। বলে, হোটেল নয়, রানুমামী। হাউসবোট। মামু কী বলেন? শ্রীনগরে এসেও হোটেল?

বাসু-সাহেব বলেন, আমার মতামত যদি জানতে চাও সুজাতা, তাহলে আমি বলব হাউসবোটও নয় হোটেলও নয়, এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সো-জা চলে যাব কোনও নির্জন জায়গায়। যাকে বলে, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড

—পহলগাঁও কিম্বা গুলমার্গ?—কৌশিক তার ভূগোলের জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

বাসু মাথা নাড়েন. উঁহু। ওসব জায়গাতেও ট্যুরিস্টদের গাদাগাদি। আমি চাইছিলাম—নিতান্ত নির্জন একটা পরিবেশ। পাইন-বার্চ-ওকের মাঝখানে, কাছেই নদী, সলিটারী লগ-কেবিন বলতে যা বোঝায়। যেমন ধর, 'ট্রাউট-প্যারাডাইস'।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'ট্রাউট প্যারাডাইস'! সেটা আবার কোথায়? নামও তো শুনিনি কখনও।

—কাল রাত পর্যন্ত নামটা আমিও জানতাম না। আজ সকালে জেনেছি। 'ট্রাউট-প্যারাডাইস' হচ্ছে লীডার নদীর ধারে একটা গ্রাম বিট্যুইন অচ্ছাবল অ্যান্ড কোকরনাগ। সেখানে ছোট ছোট লগ-কেবিন ভাড়া পাওয়া যায়। ফার্নিশড কেবিন। ইলেকট্রিসিটি আছে, টেলিফোন আছে। 'অ্যাংলার'রা এই সিজনে সেখানে যায় ট্রাউট মাছ ধরতে। গ্র্যান্ড আইডিয়া, 'মাছ মারব খাব ভাত'! ব্যস!

—কিন্তু এত সব তথ্য কোথায় সংগ্রহ করলেন রাতারাতি?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। ইতিমধ্যে ওঁরা পায়ে পায়ে টার্মিনাল বিল্ডিংস-এ এসে পৌঁচেছেন মালপত্র এখনও প্লেনের গর্ভ থেকে খালাস হয়ে আসেনি। যাত্রীরা 'বেল্ট-কেরিয়ার' ঘিরে একসার জিরাফে পরিণত। কৌশিক হঠাৎ বললে, এ কী! আপনার নাম অ্যানাউন্স করছে না?

তিনজনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। না, ভুল শোনেনি কৌশিক। লাউড-স্পিকারে ঘোষিত হচ্ছে, ইংরাজীতে অ্যাটেনশান প্লিজ! মিস্টার পি. কে বাসু বার-অ্যাট-ল। আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি যেখানেই থাকুন ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স কাউন্টারে চলে আসুন। সেখানে মিস্টার এস. পি. খান্না আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। থ্যাঙ্ক!

কৌশিক একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, এস. পি. খান্না? চেনেন?

বাসু বলছেন, চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে নামটা জানি। আর লং-লেগ বাউন্ডারীতে লোকটা কেন দাঁড়িয়ে আছে তা-ও আন্দাজ করতে পারছি...

—লং-বাউন্ডারী মানে?

—বানু একটা ওভাব বাউন্ডাবী হাঁকড়েছে—পূজোর ছুটিতে আমাব গোয়েন্দাগিরি বন্ধ। আব ঐ বাইশ বছরের ছোকরা বাউন্ডারী ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে কপাৎ কবে লুফে নেবে বলে।

কৌশিক না বুঝলেও রানু দেবী ধবতাইটা ঠিকই ধবেছেন। বলেন, তার মানে তোমার ক্লায়েন্ট? তাই এক কথাতেই শ্রীনগরে আসতে রাজী হয়ে গেলে। নয়?

বাসু পাইপ ধরাবার উপক্রম করছিলেন। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলেন, বিশ্বাস কব বানু, এই পাইপ ছুঁয়ে বলছি—লোকটা আমার ক্লায়েন্ট নয়। তাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, কথাবার্তাও হয়নি কখনও। বস্তুত কাল রাত পর্যন্ত তার নামই জানতাম না।

রানু দেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, মায়েব কাছে মাসিব গপ্পো! তোমাকে চিনতে বাকি আছে নাকি আমাব? যাকে দেখনি, যার সঙ্গে জীবনে কথা বলনি, যাব নামটা পর্যন্ত জানো না, তাব বয়স 'বাইশ' তুমি কেমন করে জানলে?

—পিওর ডিডাকশান! বুঝিয়ে বললে সহজেই বুঝবে! তবে একটু অপেক্ষা কব। লোকটাকে বিদায় করে আসি। ভয় নেই রানু, কথা যখন দিয়েছি তখন এ ছুটির মধ্যে ওসব ঝামেলায় নিজেকে জডাব না।

অন্যমনস্কের মতো পাউচ থেকে টোব্যাকো নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বাসু-সাহেব ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স-এর কাউন্টাবের দিকে এগিযে এলেন।

দূর থেকেই নজর হল কাউন্টার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক। বয়স সম্বন্ধে বাসু-সাহেব যা আন্দাজ কবেছিলেন, দেখা গেল তা নির্ভুল। বছর বাইশ-তেইশ বলেই মনে হয়। থ্রি-পিস্ ডার্ক-গ্রে স্যুট। গলায় একটা কালো টাই। মাঝারি গড়ন, স্বাস্থ্যবান। গোঁফ-দাড়ি কামানো। বাঁ-হাতের অনামিকায় ওটা বোধ হয় পোখরাজ নয়, হীরে। নিখুঁত সাজ-পোশাক সত্ত্বেও সে কেমন যেন নিষ্প্রভ। একটা আন্তর-বিষণ্ণতা যেন ঢেকে রেখেছে তাব আপাত চাকচিক্য।

বাসু-সাহেব আর একটু অগ্রসর হতেই ছেলেটি এগিয়ে আসে। ডান হাতখানা বাড়িযে দিয়ে সপ্রতিভ ভাবে বলে, মিস্টাব পি. কে. বাসু?

বাসু ওর করগ্রহণ করে বলেন, ইয়েস, মিস্টার খান্না। বাট হাউ অন আর্থ কুড য়ু নো দ্যাট আযাম কামিং বাই দিস্ ফ্লাইট?

ছেলেটি ইংরেজীতে বললে, একটা অত্যন্ত জরুরী প্রযোজনে কাল বাত্রে ক'লকাতায় আপনার চেম্বারে ট্রাঙ্ক-কল করেছিলাম। সেই সূত্রেই জেনেছি, আপনি এই ফ্লাইটে দিল্লি থেকে আসছেন। এয়ারপোর্টে আপনাকে ধরতে না পারলে খুব মুশ্কিল হত। কারণ যিনি টেলিফোন ধরেছিলেন তিনি বলতে পারলেন না—আপনি এখানে কোথায উঠছেন। তা আগে বরং সেই কথাটাই জেনে নিই। কোথায় উঠছেন আপনারা? হোটেলে না হাউসবোটে?

বাসু-সাহেবের জবাব দিতে একটু দেরি হল। পাইপটা ধবিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে আর কি। তারপর বললেন, আপনি আমাকে মাপ্ করবেন মিস্টার খান্না! আমি এখানে সপরিবারে বেড়াতে এসেছি। আপনার কেসটা আমি নিতে পারছি না।

খান্না ম্লান হাসল। বল্‌ল, চাক্ষুষ আপনাকে কখনও না দেখলেও আপনার অনেক কীর্তি-কাহিনী আমার জানা। সুতরাং আমি অবাক হইনি। আপনি ঠিকই ধবেছেন। একটা জটিল কেস্-এ আপনার সাহায্যপ্রার্থী হতে চাই বলেই আমি ট্রাঙ্ক-কলে আপনাকে ধরতে চেয়েছিলাম। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেসটা কী জাতের শোনার পর আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, ওটাও আপনার ভুল ধারণা। কেসটা আমার অজানা নয়। 'ট্রাউট-প্যারাডাইস'-এর রহস্য তো?

এবার বিস্মিত হবার পালা ও-পক্ষের। বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্নটি এতক্ষণে সে এ-কোর্টে ফিরিয়ে দিল: হাউ অন আর্থ কুড য়ু নো দ্যাট, স্যার?

—খুব সহজে। আজ সকালের 'কাশ্মীর টাইম্‌স্'-এ আপনার পিতৃদেবের হত্যার খবরটা ছাপা

হযেছে। আপনার নামটাও কাগজে আছে। প্লেনে সেই বিবরণটা পড়তে পড়তে এসেছি। ইয়েস, আই অ্যাডমিট—ইটস্ অ্যান ইন্টারেস্টিং—এক্সীডিংলি ইন্টারেস্টিং কেস! কিন্তু—আমাকে মাপ করতে হবে, এই মুহূর্তে আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত নই।

খান্না সবিনয়ে বললে, স্যার, কাগজে যেটুকু বার হযেছে তাতেই যদি আপনাব মনে হয়ে থাকে কেসটা অত্যন্ত আকর্ষণীয়,তাহলে আমি সুনিশ্চিত যে, কেসটা আপনাকে নিতে হবে। কারণ দু-দুটি অবিশ্বাস্য বকমেব 'ক্লু'-ব সন্ধান আমি রাখি, যা কাগজে ছাপা হয়নি। সে দুটি শোনার পর...অল রাইট, স্যাব। ওসব কথা পবে হবে। আপাতত বলুন, কোথায় উঠবেন?

বাসু বলেন, ঠিক করা নেই কিছু। হঠাৎ পূজার ছুটিতে সকলে মিলে চলে এসেছি। এবং মিসেস্ বাসুকে কথা দিযেছি—ছুটিব এই কটা দিন আমি কোনও কেস নেব না।

—আই সি! আপনাবা কজন আছেন?

—আমাকে নিযে চাবজন। কেন?

খান্না একটু ভেবে নিয়ে বললে, অলরাইট স্যার। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। দেখুন, আপনি তাতে বাজী হতে পারেন কি না।

—কী প্রস্তাব?

—আমাদের একটা হাউসবোট আছে। 'ঝিলাম কুইন'। ডিলাক্স ক্লাস। দুটো ডব্‌ল-বেড রুম, ড্রইং অ্যান্ড ডাইনিং। আপনাদেব অসুবিধা হবে না। ঠাণ্ডা-গবম জল পাবেন, অ্যাটাচড বাথ, ইলেকট্রিসিটি আছে, টেলিফোন আছে। কুক আছে, বেযাবা আছে।

—দৈনিক ভাড়া কত?

ম্লান হাসল ছেলেটি। বললে, স্যাব, ওটা আমাবা কখনও ভাড়া দিইনি। বস্তুত ওটা আমাদের বাড়ির গেস্ট রুম। আমাদেব পবিবারের বন্ধুরা এলে ওখানেই ওঠেন। আপনার সঙ্কোচ করার কিছুই নেই।

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন, তা হয়না। আমি আপনার হাউসবোটটা নিতে চাই, এবং কেসটা নেব না। এ-ক্ষেত্রে আপনি যদি ন্যায্য ভাড়া না নেন, তাহলে আমি কেমন করে রাজী হই?

এক কথায় ফয়সালা করে দিল ছেলেটা—বেশ তো, ভাড়া দেবেন। বাজার দব অনুযায়ী যা ন্যায্য ভাড়া হওযা উচিত তাই দেবেন আমাকে। আমি মাথা পেতে নিয়ে নেব।

—আপনি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না?

—বিন্দুমাত্র না। কারণ আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওব কেসটা আপনি নিতে বাধ্য হবেন...আপনি ওখানে উঠুন। গুছিয়ে নিয়ে বসুন। ঘণ্টাদুয়েক পরে আমি আসব। আমার কেসটা শোনাব—হ্যাঁ, মিসেস্ বাসুকেও। তারপব যদি কেসটা না নিতে চান, নেবেন না। ন্যায্য ভাড়া দিয়ে ছুটির শেষে কলকাতায় ফিবে যাবেন। এগ্রীড?

—এগ্রীড!

—থ্যাঙ্ক স্যাব। মালপত্র নিযে বাইরে আসুন। আমার গাড়িতে পৌছে দেব।

বাসু-সাহেব ফিবে এসে দেখলেন ইতিমধ্যে কৌশিক মালপত্র সনাক্ত করে ছাড়িয়েছে। ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল সকলে। কৌশিক বলে, তাহলে কী স্থির হল? এখান থেকে সোজা টুরিস্ট রিসেপশান সেন্টারে যাবো তো?

—না। আমি ইতিমধ্যে হাউসবোট বুক করে ফেলেছি। 'ঝিলাম কুইন'। দুটো ডবল্-বেডের রুম আছে। অসুবিধা হবে না কিছু।

কৌশিক বলে, একবার না দেখেই অ্যাডভান্স করে দিলেন? শুনেছি, এখানে দরদাম করলে ভাড়া অনেক কমে যায়।

—তা হয়তো যায়। কিন্তু এটা একটা শৌখিন হাউসবোট। ভাড়া দেওয়া হয় না। আমরা হয়তো গেস্ট হিসাবে—

রানী দেবী ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন, থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমরা বুঝেছি। হাউসবোটের মালিক ঐ মিস্টার খান্না তো?

বাসু-সাহেব হেসে ওঠেন. সবাই গোয়েন্দা হলে আমরা যাই কোথায়? একটা সুটকেস উঠিয়ে নিয়ে বললেন, চল যাওয়া যাক। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

বেরিয়ে আসতেই খান্না এগিয়ে এসে নমস্কার করল। বাসু-সাহেব তার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মালপত্র উঠিয়ে দেওয়া হল গাড়িতে। প্রকাণ্ড স্টেশান-ওয়াগন। পিছনের ডালাটা খুলে দেবার পর রানী দেবীর হুইল চেয়ারটা অনায়াসে স্থান পেল কেরিয়ারে।

হাউসবোটটা চমৎকার। অপছন্দ হবার কথা নয়। আসবাব-পত্র অবশ্য একটু সেকেলে ধরনের—মিড-ভিক্টোরিয়া যুগের। তা হ'ক. আধুনিক জীবনযাত্রার যাবতীয় উপকরণই উপস্থিত। ড্রইংরুমে প্রকাণ্ড একটা আয়না। সোফা-সেট, সেন্টার-টেবল্। তারপর ডাইনিং রুম। সেটা পার হলে একটা চওড়া গলিপথ। রানী দেবীর হুইল চেয়ারটা সে গলিপথে অনায়াসে চলবে। তার দুদিকে দুটি বেড-রুম। সংলগ্ন স্নানাগার। হাউসবোটের পিছনে বাঁধা আছে আর একটি ছোট নৌকা। সেটা রান্নাঘর ও ঠাকুর চাকরদের বাসস্থান। ঝিলাম নদী যেখানে ডাল লেক-এ গিয়ে মিশেছে প্রায় তার কাছাকাছি হাউসবোটটা নোঙর করা।

আভূমি নত হয়ে আদাব জানালো 'কেয়ার-টেকার-কাম-কুক' খোদাবক্স। ধবধবে সাদা দাড়ি। মাথায় কাজকরা সাদা গোল টুপি। পরনে একটা জোব্বা মত পোশাক। মনে হল, যেন মোঘল-পেন্টিং-এর কোন মূর‍্যাল থেকে হাউসবোটে নেমে এসেছে। ওর পিছনেই দাঁড়িয়েছিল একটি অল্পবয়সী ছোকরা—ওরই নাতি। সেও সেলাম করল আগন্তুকদের দেখে।

খান্না ওদের জিম্মাদারী বুঝিয়ে দিল কেয়ারটেকারকে। বললে, খোদাবক্স, এঁরা কলকাতা থেকে আসছেন। আমার মেহ্মান। ঠিকমত দেখভাল করবে। যেন তোমার হাউসবোটের বদনাম না হয়ে যায়'

খোদাবক্স পুনরায় মোঘলাই কায়দায় আদাব জানিয়ে বললে, বে-ফিকর রহিয়ে সাব!

তারপর একটু ইতস্তত করে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করল, কাল সব মিটতে কত রাত হল হুজুর?

—রাত প্রায় কাবার হয়ে গিয়েছিল।

খোদাবক্স পুনরায় মাথা নেড়ে সখেদে বললে, আজব এ দুনিয়া' কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল!

খান্না আর কথা না বাড়িয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি ঘণ্টাদু'য়েক পরে আবার আসব।

ফিরতে গিয়েও আবার থেমে পড়ে বলে, মিস্টার বাসু, মানসিক প্রস্তুতি আমারও এখন নেই। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। যা করার তাড়াতাড়িই তো করতে হবে?

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তা তো বটেই। কিন্তু খোদাবক্স আপনাকে কী জিজ্ঞাসা করল বলুন তো? কাল রাত্রে কোথা থেকে ফিরতে অত রাত হল আপনার?

ম্লান হাসল খান্না। অস্ফুটে বললে, শ্মশান থেকে। এমনিতেই এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছিল। পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল আর কি—

বাসু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, থাক ওসব কথা। আপনি ঘণ্টাদুয়েক পরেই আসবেন। কেসটা নিই বা না নিই, কিছু পরামর্শ আপনাকে দিতে পারব নিশ্চয়ই।

খান্না চলে যেতেই সকলে ওঁকে ঘিরে ধরে: ব্যাপারটা কী?

বাসু বললেন, তোমরা বিশ্রাম করবে না? কাহিনীটা বলতে অনেক সময় লাগবে।

সুজাতা বলল, বিশ্রাম করার আবার কী আছে? এলাম তো প্লেনে। ঢুলতে ঢুলতে। আপনি এখনই শুরু করুন। আমি বরং খোদাবক্সকে বলি চার কাপ কফি বানাতে।

বাসু বলেন, বেশ। তবে আমারটা ব্ল্যাক-কফি! ওকে বলে দিও। আর জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, হাউসবোটে খবরের কাগজ রাখা হয় কিনা? আজকের 'কাশ্মীর টাইমস্' পাওয়া যাবে?

তেরই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ সেদিনের সংবাদপত্র সহজেই সংগ্রহ করা গেল। তার প্রথম পৃষ্ঠাতে খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে—কারণ সূরযপ্রসাদ খান্নার স্বর্গগত পিতৃদেব এ শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। ওঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি বটে তবে যে লগ-কেবিনে ওঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি আলোকচিত্র আছে। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে সংবাদটা পঞ্চম পৃষ্ঠায় উপচিয়ে পড়েছে। তাছাড়া পঞ্চম পৃষ্ঠায় সূরযপ্রসাদের একটা ইন্টারভিয়ুও ছাপা হয়েছে। পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা দুঃসংবাদটা এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে একটা মানবিকতার আবেদন ফুটে উঠেছে। সংবাদের চুম্বকসার এই রকম

নিহত মহাদেও প্রসাদ খান্না এ অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'কাশ্মীর-ভ্যালী ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড অটোমোবাইলস'-এর স্বত্বাধিকারী। তিনি প্রাক্তন এম. পি.ও বটে। ইদানীং তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পর পর দুটি ইলেকশনে নির্বাচনপ্রার্থী হননি। অথচ সাধারণ লোকের ধারণা তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হলে অনায়াসেই নির্বাচিত হতে পারতেন। বস্তুত বছর দুই হল তাঁর চরিত্রে একটা বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম তিনি ইদানীং বড় একটা দেখতেন না। পুত্র সূরযপ্রসাদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সব দায়ঝক্কি তার স্কন্ধেই অর্পণ করেছিলেন! অথচ অবসর নেবার মত এমন কিছু বয়সও তাঁর হয়নি! মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছেচল্লিশ, যে বয়সে অনেকেই নতুন উদ্যমে নতুন ব্যবসায় নামে।

বছর দুই হল খেয়ালী প্রৌঢ় মানুষটি শুধু হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে যাননি, ভারতের বাইরেও নয়। শুধু মাত্র হিমালয়ের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে পরিক্রমা করেছেন। তাঁর চিঠিপত্র মাঝে মাঝে আসত—কখনও কুলু-মানালী থেকে, কখনও কেদারবদ্রীর বিভিন্ন চটি থেকে, কখনও বা সান্ডাকপু-ফালুট অঞ্চল থেকে। তিব্বত এবং নেপালের বহু অঞ্চলে তিনি এই দু'বছরে ঘুরেছেন। যখন যে অঞ্চলে যেতেন তখন সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করতেন। সাধারণ পোশাকে; যাতে কেউ না বুঝতে পারে তিনি লক্ষপতি! ওদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনতেন—ছবি আঁকতেন, ওদের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করতেন। কখনও বা নির্জন পাইন বনে বসে থাকতেন বাইনোকুলার হাতে। ছড়িয়ে দিতেন পাঁউরুটি অথবা বিস্কুটের টুকরো। দেখতেন আরণ্যক প্রাণীদের—কাঠবড়ালী, খরগোশ আর বিচিত্র পাখিদের সন্ত্রস্ত আহার-সংগ্রহের প্রচেষ্টা।

পুত্র শ্রীসূরযপ্রসাদ খান্না পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতাকে বলেছিলেন, মহাদেবের এই চারিত্রিক বিবর্তনের মূলে আছে নাকি তাঁর ছোট ভাই প্রীতমপ্রসাদ খান্না। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করেন! সন্ন্যাস নেননি—কিন্তু ভবঘুরের জীবন যাপন করে এসেছেন এতদিন। প্রীতমপ্রসাদ যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখনও ওঁদের পিতৃদেব জীবিত। তিনি তাঁর দুটি সন্তানকেই সমানভাবে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান, কিন্তু প্রীতম বন্ধনমুক্ত থাকার প্রেরণায় সব কিছু পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই লিখে দেন, সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে। প্রথম দিকে মাঝে মাঝে তিনি এঁদের সংসারে আসতেন, দু-চারদিন থেকে আবার ফিরে যেতেন তাঁর অজ্ঞাত আবাসে। হয়তো মহাদেওয়ের সংগে তাঁর একটা যোগাযোগ ছিল, পত্র বিনিময়ে, সূরয সে খবর জানত না।

সংবাদে প্রকাশ, এ বছর 'ট্রাউট-প্যারাডাইস্'-এর সিজ্‌ন শুরু হয়েছে মঙ্গলবার ছয়ই সেপ্টেম্বর। 'মৎস্য ও বন্যপ্রাণী মন্ত্রক' প্রতি বছরই ঘোষণা করেন কবে থেকে ট্রাউট মাছ ধরা যাবে। জুলাই-অগস্টে মাছেরা ডিম পাড়ে—তাই সে সময় মাছ ধরা বে-আইনি। প্রতি বছরের মত এ বছরও মহাদেওপ্রসাদ পনেরই অগস্ট থেকে একটি লগ্-কেবিন বুক করেন; যাতে সিজ্‌নের উদ্বোধন দিবস থেকেই তিনি ঐ নির্জনাবাসে থাকতে পারেন। মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে পুলিস 'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' থেকে

সিদ্ধান্তে এসেছেন, মহাদেওপ্রসাদ সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর বিকালে ঐ লগ-কেবিনে আসেন। সকাল-সকাল স্বপাক আহার সেরে শয্যাগ্রহণ করেন। পরদিন অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন যাতে সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকেই মাছ ধরা শুরু করা যায়, তাই তিনি 'অ্যালার্ম ক্লকে' সাড়ে পাঁচটায় দম দিয়ে শুয়ে পড়েন। পরদিন তিনি শয্যাত্যাগ করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রাতরাশ তৈরী করেন এবং আহার করেন। তারপর মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে নদীর ধারে চলে যান। দৈনিক যতটা মাছ ধরার অনুমতি আছে দুপুরের আগেই সেই পরিমাণ মাছ ধরে তিনি কেবিনে ফিরে আসেন। তার কিছু পরেই—ঠিক কতটা পরে সেটাও পুলিস বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারছে—আততায়ীর গুলিতে মহাদেও নিহত হন। অর্থলোভ হত্যার কারণ হতে পারে না—কারণ মহাদেও-এর মানিব্যাগে প্রায় শ-তিনেক টাকা ছিল এবং সুটকেসে ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। অনুমান করা যায়, মাত্র তিন-চার ফুট দূরত্ব থেকে আততায়ী একসঙ্গে দুটি গুলি করে—কারণ মৃতদেহে পাশাপাশি দুটি ক্ষতচিহ্ন প্রমাণ দিচ্ছে কী ভাবে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়েছিল। পিস্তলটা মৃতদেহের অদূরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে মহাদেওপ্রসাদের আদরের পাহাড়ী ময়নাটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মহাদেও যখনই যেখানে যেতেন এই পোষা ময়নাটিকে নিয়ে যেতেন।

লগ-কেবিনটা বেশ নির্জনে। যে পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথটা পাহাড়কে বেষ্টন করে চলে গেছে, তার থেকে অন্তত তিনশ' মিটার দূরে। ঐ রাস্তায় মটোর গাড়ি যেতে পারে, তবে সারাদিনে খুব বেশি গাড়িঘোড়া ও-পথে যায় না। নিকটতম লগ-কেবিনটিও এতদূরে যে পিস্তলের শব্দ সেখানে পৌঁছাবে না।

দিনের পর দিন ঐ পাকদণ্ডী পথ বেয়ে মানুষজন চলাফেরা করেছে, অন্যান্য লগ্-কেবিনের বাসিন্দাও হয় তো ঐ রুদ্ধদ্বার কামরার সামনে দিয়ে চলাফেরা করেছে। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, অর্গলবদ্ধ গৃহের ভিতর পড়ে আছে একটি মৃতদেহ।

প্রায় পাঁচদিন পরে—এতদিনে প্রায় প্রত্যেকটি কেবিনই ভর্তি হয়ে গেছে—একজনের খেয়াল হল, ঐ ঘরটা থেকে একটা পাহাড়ী ময়না ক্রমাগত কর্কশ স্বরে ডাকছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি সদর দরজায় 'নক' করলেন, দেখলেন সেটা তালাবন্ধ। ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। দরজায় গা-তালা আছে, ইয়েল-লক। দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়। ওঁর মনে হল, এই কেবিনের গৃহস্বামী হয়তো শহরে গিয়ে কোনও কারণে আটকা পড়েছেন—তাই অভুক্ত ময়নাটা অমন তারস্বরে প্রতিবাদ করছে। কৌতূহলী হয়ে উনি জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। শুধু ময়নাটিকেই নয়, তিনি ঐ কেবিনের মেঝেতে এমন কিছু দেখলেন যাতে তৎক্ষণাৎ ছুটতে ছুটতে ফিরে গেলেন পুলিসে খবরটা জানাতে।

হত্যাকারী যতই নিষ্ঠুর হ'ক তার অন্তরের একটি প্রান্তে ছিল কিছু শুভবুদ্ধি। নিজস্ব সংবাদদাতা এখানে একটু কাব্য করে লিখেছেন 'লেডি ম্যাকবেথের মত পিশাচীর অন্তরে যদি একটি কন্যা-হৃদয় লুকিয়ে থাকতে পারে, তাহলে হত্যাকারীর অন্তরেও একটি প্রাণী-দরদী থাকতে পারবে না কেন?' সে যাই হোক, দেখা গেল—যাবার আগে লোকটা ঐ ময়নার খাঁচার দরজাটা খুলে রেখে গেছে। একটি পাত্রে কিছু জল এবং যথেষ্ট পরিমাণ থিন এ্যারারুট বিস্কুট মেঝেতে ফেলে রেখে গেছে।

দীর্ঘ বিবৃতিটা পাঠ করে বাসু-সাহেব বলেন, এই সংবাদটাই প্লেনে পড়তে পড়তে এসেছি। তাই লাউড-স্পিকারে যেইমাত্র শুনলাম আমার সঙ্গে জনৈক এস. পি. খান্না দেখা করতে চান, তখনই বুঝলাম তার উদ্দেশ্যটা কী। এখন তোমরা বল, কেসটা আমি নেব, না নেব না?

তিনজনের কেউই জবাব দিচ্ছেন না দেখে বাসু-সাহেব বলেন, তাহলে আর একটু বিশ্লেষণ করে বলি—কেসটা নিলে আমি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ব—গুলমার্গ-পহেলগাঁও-উলার লেক বাদ যাবে। অবশ্য তোমরা তিনজনে ঘুরে আসতে পার।

রানী দেবী বললেন, বেশ তো, আগে শুনেই দেখ না সূরযপ্রসাদ কী বলে। সবটা শুনে তারপর আমরা রায় দেব, কী বল সুজাতা?

কৌশিক এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল। আর যেন ধৈর্য রাখতে পারল না। বলে বসল, আপনি নিঃসন্দেহ?

—সন্দেহাতীতভাবে।

—কেমন করে জানলেন?

—প্রথম কথা, মুন্না যে বোলগুলো পড়ত—'হ্যালো', 'রাম-রাম', 'আইয়ে—বৈঠিয়ে—চায়ে পিজিয়ে','সীতারাম'—তার একটাও এ ময়নাটা বলতে পারে না। পুলিসের অনুমতি নিয়ে ওটাকে আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি। এ দুদিনে সে তার অভ্যস্ত 'বোল'-এর একটাও বলতে পারেনি।

বাসু-সাহেব বলেন, পোষা জন্তু-জানোয়ার তার মালিকের অভাবটা অদ্ভুত ভাবে বুঝতে পারে। আমরা সেটা বুঝতে পারি না, কিন্তু সব রকম পোষমানা জন্তুর মধ্যেই দেখা গেছে—তার সত্যিকারের 'মাস্টার'-এর অনুপস্থিতিটা...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সুরযপ্রসাদ বলে ওঠে, পার্ডন মি ফর ইন্টারাপশান, স্যার—আমার দ্বিতীয় যুক্তিটাও শুনুন—মুন্নার ডান পায়ের মাঝের আঙুলটা অনেকদিন আগে কাটা গিয়েছিল—কেবিন থেকে যে ময়নাটাকে আমরা এনেছি তার দুটি পায়ের সব কটা আঙুলই আছে!

বাসু-সাহেবের ভ্রূকুঞ্চনটা দৃষ্টি এড়ালো না কারও। উনি বলে ওঠেন, কিন্তু কেন? হত্যাকারীই হোক বা যেই হোক, ময়নাটাকে বদলে দিয়ে যাবে কেন?

সুরযপ্রসাদ বলল, আমি স্যার এ জিনিসটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমার মনে একটা সম্ভাবনার কথা জেগেছে। হয়তো শুনতে উদ্ভট লাগবে তবু আমার যুক্তিটাও শুনুন। 'মুন্না' ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কোনও 'বোল' শিখে ফেলত। আমার মনে আছে, একবার রাস্তা দিয়ে একদল শববাহী যাচ্ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে তারা একবার মাত্র হুংকার দিয়েছিল 'রাম নাম সৎ হ্যায়'। মুন্নার খাঁচাটা ছিল বারান্দায়। একবার মাত্র শুনেই সে বলে উঠল 'রাম নাম সৎ হ্যায়'।

—তাতে কী হল?

—আমার বিশ্বাস—মৃত্যু-সময়ে বাবা হয়তো চীৎকার করে উঠেছিলেন আততায়ীর নাম ধরে। এবং হত্যাকাণ্ডের পরেই হয়তো মুন্না ঠিক একই স্বরে হত্যাকারীর নামটা বলে ওঠে। এজন্যই...

এবার বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলে ওঠেন—উঁহু। মিলছে না। সেক্ষেত্রে হত্যাকারী মুন্নাকেও শেষ করে দিয়ে যেত। ঠিক একই রকম দেখতে আর একটা ময়না যোগাড় করে ঐ ঘরে দ্বিতীয়বার পদার্পণ সে কখনই করত না।

সুরযপ্রসাদ হার স্বীকার করল। বলল, তা ঠিক।

মিনিটখানেক চোখ বুঁজে কী ভেবে নিয়ে বাসু বলেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে—ঐ পাহাড়ী ময়নাটার পথ ধরেই আসল হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দাঁড়াও, মুন্নার ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিই। তুমি নিশ্চিতভাবে জান যে, মুন্নাই ছিল ওঁর কেবিনে?

—সেটাই একমাত্র সম্ভাবনা। এ বছর অগস্ট মাসে পিতাজী অমরনাথ তীর্থে যান। সেখানে যাবার আগেই উনি চিঠি লিখে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর উনি শ্রীনগরে আসবেন। এবং ঐদিনই বিকালে ট্রাউট-প্যারাডাইসে চলে যাবেন। লিখেছিলেন, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে ওঁর কী একটা জরুরী কাজ আছে। আর ওঁর সেক্রেটারী গঙ্গারামজীকেও জানিয়েছিলেন—তিনি যেন অতি অবশ্যই পাঁচ তারিখ শ্রীনগরে থাকেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, উনি দিনতিনেক আগেই এসে উপস্থিত হন—অর্থাৎ তার আগের শুক্রবার, দোশরা সেপ্টেম্বর, সকালে। পিতাজী বাড়িতে এসেই গঙ্গারামজীকে নিয়ে ব্যাঙ্কে চলে যান। বারোটা নাগাদ দুজনেই একসঙ্গে ফিরে আসেন; এবং তারপরই একটা সুটকেস আর মুন্নাকে নিয়ে তিনি চলে যান! যাওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন, দিন দুই পহেলগাঁওয়ে থেকে মৎস্য মরশুমের আগেই পাঁচ তারিখ বিকালের মধ্যে তিনি ট্রাউট-প্যারাডাইসে চলে

যাবেন। বস্তুত অগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে একটা লগ-কেবিন ওঁব নামে বুক করা ছিল। ঠিক কোনটা আমি অবশ্য জানতাম না।

বাসু প্রশ্ন করেন, কী কারণে পাঁচ তারিখ সকালে আসবেন জানিয়েও তিনি দিনতিনেক আগে চলে এসেছিলেন আন্দাজ করতে পার?

—তা বোধ হয় পারি। অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে, তারিখটা আমাব মনে নেই, দিল্লী থেকে জগদীশ আমাকে টেলিফোন কবে জানায়, সেপ্টেম্বরের ছয় তারিখে মর্নিং ফ্লাইটে সে তার মাকে নিয়ে এখানে আসছে। আমাকে সে অনুরোধ করে, আট তাবিখ সকালেব ফ্লাইটে ওদের দুজনের জন্য দিল্লীব দুখানি টিকিট কেটে রাখতে। সম্ভবত পিতাজী তাঁর সেক্রেটারীর কাছ থেকে এ খবরটা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর প্রোগ্রামটা বদলে ফেলেন। মানে, তিনি আমার বিমাতার সম্মুখীন হতে চাইছিলেন না।

—কিন্তু মুন্না যে বদল হয়ে গেছে এ খবরটা তুমি পুলিসকে জানাওনি কেন?

সূরযপ্রসাদ একটু অশান্তভাবে মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বেশ বোঝা যায় লোকটা নিতান্ত ক্লান্ত। দেহে ও মনে। আবার সোজা হযে বসে বলল, আপনি যাই বলুন বাসু সাহেব, আমার ধারণা পুলিস এ রহস্যেব কিনারা কিছুতেই করতে পারবে না। পুলিসের কতকগুলো বাঁধাধরা ছক আছে। ঘটনা যদি সেই খাতে না চলে ওরা নিতান্ত নাচার। এজন্যই আমি আপনাকে কলকাতায ট্রাঙ্ককল করেছিলাম। আমার ধারণা, এই হত্যা রহস্যের উদ্ঘাটন আপনার মত লোকের পক্ষেই করা সম্ভব। আপনি নেবেন সে দায়িত্ব?

বাসু-সাহেব আড়চোখে উপস্থিত তিনজনেব উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিযে বলেন, ঘণ্টাখানেক সময় নিচ্ছি। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছ তো? আমি টেলিফোন করে জানাব।

রানী দেবী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, মিছিমিছি সময নষ্ট করে কী লাভ? আমবা সবাই সূরযপ্রসাদের হয়ে সুপাবিশ করছি।

বাসু আবাব একবার সকলের উপব নজবটা চালিয়ে নিয়ে বললেন, অলবাইট, আই অ্যাক্সেপ্ট।

তৎক্ষণাৎ সূরযপ্রসাদ তাব পকেট থেকে একটা বন্ধ খাম বাব করে টেবিলেব উপব রাখল, বললে, থ্যাঙ্ক স্যাব।

—ওটা কী?

—আপমার 'রিটেইনাব' এবং আমার তবফে আপনার নিয়োগপত্র, যাতে পুলিস আপনাকে সাহায্য করে।

বাসু হেসে বলেন, তুমি তো খুব সিস্টেম্যাটিক?

—তা বলতে পারেন। আচ্ছা চলি নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায়। বলে, ও! দুটো কথা বলার আছে আরও। প্রথম কথা, আমাব বিমাতা ও জগদীশ প্রসাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আপনাকে টেলিফোন কবব এবং গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার ইচ্ছা, তাঁর সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হবে তা আপনাব উপস্থিতিতে হওয়া চাই। দ্বিতীয় কথা, পহেলগাঁওয়ের ও. সি. যোগীন্দর সিংজী একটু আগে আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন—দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় পুলিস সংস্থার অর্থাৎ সি. বি. আই.-এর একজন সিনিয়ার অফিসার সরেজমিনে তদন্ত করতে আসছেন। আজ বিকালেই যোগীন্দব সিংজী তাঁকে নিয়ে লগ্-কেবিনটা দেখতে যাবেন। আপনি কি যাবেন?

বাসু বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! এর মধ্যে সি. বি. আই. ঢুকল কেমন করে?

—আগেই বলেছি, পিতাজী একজন প্রাক্তন এম. পি.। তাঁর একটা পোলিটিকাল কেরিয়ার আছে। যদিও তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তবু এটা রাজনৈতিক-কারণে হত্যা হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই—

বাসু বলেন, বুঝলাম। ওঁরা কখন যাচ্ছেন?

—যোগীন্দর তো বললেন পহেলগাঁও থেকে বেলা চারটে নাগাদ রওনা হবেন। তাহলে সাড়ে চারটে নাগাদ ঐ লগ কেবিনে পৌঁছে যাবেন।

—ঠিক আছে। তুমি বেলা একটা নাগাদ আমাকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

সূরয বলে, আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এদিকে আমার অনেক কাজ জমে গেছে। সন্ধ্যার পর জগদীশরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে জানিয়েছে। চাচাজীও যে-কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছাতে পারেন।

—চাচাজী, মানে প্রীতমপ্রসাদ? তিনি কোথায় আছেন?

—না, না। প্রীতমপ্রসাদজী কোথায় আছেন আমরা কেউ খবরই রাখি না। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখে তিনি যদি নিজে থেকে যোগাযোগ করেন তবেই হয়তো শ্রাদ্ধবাসরে তাঁকে পাব। কিন্তু তিনি বোধহয় ইদানীং খবরের কাগজও পড়েন না। 'চাচাজী' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি শ্রীগঙ্গারাম যাদবকে। তিনি আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী। পুরানো আমলের লোক, বাবারই বয়সী। তাঁকেই আমি 'চাচাজী' ডাকি। কী একটা জরুরী কাজে তিনি ঐ ছয় তারিখের মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লী গেছেন। ট্রাঙ্ক-লাইনে খবরটা তাঁকে জানিয়েছি। আশা করছি, আজই তিনি এসে পড়বেন।

—দোসরা তারিখে তোমার বাবা ব্যাঙ্কে এসে কী-জাতের ট্র্যানজ্যাকশান করেন তা জানো না? গঙ্গারাম কিছু বলতে পারেননি?

—ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে অত কথা কিছু হয়নি। তাছাড়া হঠাৎ খবরটা শুনে উনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পিতাজীর অধীনস্থ কর্মচারী হলেও তাঁর সঙ্গে ওঁর একটা হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, প্রায় বন্ধুস্থানীয়। বয়সটা সমান হওয়াতেই বোধ হয়। উনি শুধু বললেন, এখনই আমি যাচ্ছি! অ্যাভেইলেবল নেক্সট ফ্লাইটে।

—এখানকার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে তোমার বাবার এ্যাকাউন্ট আছে, ভল্টে লকারও আছে। সেখানকার ম্যানেজার কিছু বলতে পারছেন না?

—আমি খোঁজ নিইনি।

—তাহলে এখনই চল। পোলিটিক্যাল মার্ডার যদি না হয়, তাহলে দোসরা তারিখের ঐ ব্যাঙ্কের জরুরী কাজ এবং ছয়ই তাঁর জীবনাবসানের মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দশটা বেজে গেছে। চল, প্রথমেই ব্যাঙ্ক দিয়ে, শুরু করি।

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজার মিস্টার অশোক সোন্ধী তাঁর ক্লায়েন্ট সূরযপ্রসাদকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন। ওঁদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে প্রথমেই সূরযের পিতৃবিয়োগের জন্য অনুশোচনা ও সান্ত্বনা-বাক্য শোনালেন। বললেন, শহরে একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল!

সূরয তাঁর সঙ্গে ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিল এবং জানালো, তার পিতৃদেবের রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে উনি তদন্ত করছেন।

সোন্ধী সবিনয়ে জানায়, বলুন স্যার? আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে সাহায্য করব। মানে, যেটুকু আমার সাধ্য।

বাসু বললেন, মিস্টার সোন্ধী, আমি ঐ দোশরা তারিখের ট্র্যান্‌জ্যাকশানের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই। ঠিক কী ঘটেছিল, যতটা আপনার মনে আছে আনুপূর্বিক বলে যান।

—আমি খুব ডিটেলস্-এ আপনাকে বলতে পারব। কারণ সেটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। সংবাদপত্রে খবরটা পড়ে আমি সেদিনের ঘটনাটা আনুপূর্বিক মনে মনে আলোচনা করেছিলাম। শুনুন: দোশরা শুক্রবার ঠিক ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই উনি আর মিস্টার যাদব আমার ঘরে আসেন। উনি বলেন—

—জাস্ট এ মিনিট। আমি আরও ডিটেইল্-এ শুনতে চাই। তখন ওঁর পরনে কী পোশাক ছিল, হাতে কী ছিল, ওঁকে উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল কি না—

—ওঁর পরিধানে কী ছিল, আমার ঠিক মনে নেই। হাতে ছিল একটা ফোলিও ব্যাগ। না, ওঁকে প্রথমবার মোটেই উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল না—

—প্রথমবার মানে?

—আমাকে বলতে দিন, স্যার। পর পর ঘটনাগুলো বলে যাই। তারপর আপনি প্রশ্ন করবেন।

—অলরাইট!—বাসু পাইপ ধরালেন।

—ওঁরাই সেদিন আমার প্রথম ক্লায়েন্ট। সকাল দশটা পাঁচ, কি দশটা দশ হবে। ওঁরা দুজনে একসঙ্গেই এলেন। দু'একটা মামুলী সৌজন্য বিনিময়ের পরেই মিস্টার খান্না তাঁর ফোলিও-ব্যাগ খুলে এক বাণ্ডিল ফিক্সড ডিপসিট্-এর সার্টিফিকেট বার করলেন। কতগুলো তা আমার মনে নেই, কিন্তু সব কটা সার্টিফিকেট মিলিয়ে ফিক্সড-ডিপসিটের অঙ্কটা পঞ্চান্ন হাজার টাকার,সুদ বাদে। সবগুলিই ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার, কনোট সার্কাস, দিল্লী ব্রাঞ্চের। উনি সেগুলি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এগুলি আমানত হিসাবে জমা দিয়ে উনি পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ করতে চান। আমি জবাবে বললাম, যেহেতু এগুলি অন্য ব্রাঞ্চের ফিক্সড ডিপসিট তাই আমার পক্ষে সেগুলি সিকিউরিটি হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। উনি বললেন, 'কেন, এ তো আপনাদেরই ব্যাঙ্কের, এগুলি তো আমি গচ্ছিত রাখছি।' আমি জবাবে বললাম, 'স্যার, এটাই সব ব্যাঙ্কের নিয়ম। ধরুন আপনি তো দিল্লী ব্রাঞ্চে জানাতে পারেন যে, এই সার্টিফিকেটগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ইন্ডেমনিটি-বন্ড দিয়ে আপনি সেখান থেকে টাকা তুলে নিতে পারেন।' তখন উনি বললেন, 'এই সার্টিফিকেটগুলি যদি আপনি দিল্লী ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেন? তারা কনফার্ম করলে নিশ্চয়ই আপনি লোনটা দিতে পারেন?' তার জবাবে আমি বললাম, 'তাতে স্যার দিন দশ-পনের দেরি হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি মিস্টার যাদবকে এগুলি দিয়ে দিল্লী পাঠিয়ে দেন, মিস্টার যাদব তো আপনার জেনারেল পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি হোল্ডার। এগুলি জমা দিয়ে তিনি আপনার তরফে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ নিতে পারেন। দিল্লী ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চের উপর আপনার নামে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পেমেন্ট করবে, এবং আমি নগদে টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব। তাহলে আপনি তিন চার-দিনের মধ্যেই টাকাটা নগদে এখানে বসেই পেয়ে যাবেন। উনি শুনে কিছু বললেন না,মনে হল উনি তাতেই রাজি হলেন। ফিক্সড-ডিপসিট সার্টিফিকেটগুলি ওঁর ফোলিও ব্যাগে ভরে এরপর ওঁর ভল্টে গেলেন। মিস্টার যাদব এ ঘরেই বসে রইলেন। আমি আর মিস্টার খান্না আন্ডার-গ্রাউন্ড ভল্টে গেলাম। ওঁর হাতে তখনও সেই ফোলিও ব্যাগটা ছিল। আমি আমার চাবি দিয়ে ওঁর লকার খুলে দিয়ে চলে এলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে উনি ফিরে এলেন। এবং দুজনে চলে গেলেন। তখন বেলা দশটা পঁচিশ-ত্রিশ হবে।

—তারপর?

—তারপর উনি দ্বিতীয়বার আসেন, এবার একা—ঐ দিনই বেলা ঠিক দুটোর সময়। সময়টা আমার মনে আছে, কারণ ওঁকে দেখেই আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, ব্যাঙ্কের আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। এখন উনি কোনও চেক ভাঙাতে চাইলে আমি বিব্রত হয়ে পড়ব। সেবার ওঁর হাতে ছিল একটা মাঝারি-সাইজ সুটকেশ আর একটা খাঁচায় একটা ময়না। এইবার ওঁকে উদ্‌ভ্রান্ত মনে হল। এসেই বললেন, 'মিস্টার সোন্ধী, আমার লকারটা জয়েন্ট-নামে করতে চাই। আমার ছেলের সঙ্গে।' আমি বললাম, 'সেটা কিছু শক্ত নয়, মিস্টার সূরযপ্রসাদকে নিয়ে আসুন। আমার খাতায় একটা এন্ট্রি করতে হবে, তাঁর স্পেসিমেন সিগ্‌নেচারটাও লাগবে।' তাতে উনি বললেন, 'আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমি যদি একটা চিঠি দিই আপনাকে—আমার পুত্রকে জয়েন্ট হোল্ডার হিসাবে, তাহলে হয় না? ওর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট তো আছে আপনার এই ব্রাঞ্চে। সেই স্বাক্ষরই ভ্যালিড হবে। হয় না?' আমি তাঁকে বললাম, 'সাধারণ ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে আপনাকে এবং আপনার পুত্রকে আমি

ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এক্ষেত্রে আপনার চিঠি আমি সাময়িকভাবে মেনে নেব। তবে, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি একদিন মিস্টার সূরযপ্রসাদকে নিয়ে এসে ফর্মালিটিগুলি সেরে যাবেন।' উনি রাজী হলেন। সুটকেশ খুলে একটি লেটার হেড প্যাড বার করে ঐ মর্মে আমাকে একটি চিঠি লিখে দিলেন।

মিস্টার সোন্ধী সেই চিঠিখানি বার করে দেখালেন। বাসু সেটি পরীক্ষা করে ফেরত দেবার সময় বললেন, তাহলে আমার ক্লায়েন্ট এখনই ঐ ভল্টটা খুলে দেখতে পারেন?

—পারেন, যদি চাবিটা তাঁর কাছে থাকে। আছে কি?

সূরয মাথা নেড়ে জানালো, সে জানে না, চাবিটা কোথায়।

বাসু বললেন, আপনি দয়া করে দেখবেন, ওঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি কোনও বড় রকমের উইথড্রয়াল হয়েছে কিনা?

সোন্ধী তৎক্ষণাৎ লেজারটা চেয়ে পাঠালেন। দেখে বললেন, শেষ উইথড্রয়াল হয়েছে অগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে, হাজার টাকা। ঐ অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স আছে 8,735.15 টাকা।

বাসু ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সূরয ওঁকে হাউসবোটে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল। বাসু বললেন, তাহলে ঠিক দেড়টার সময় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি পহেলগাঁও যাব। আর ঐ সঙ্গে তোমার বাড়িতে যে বোবা ময়নাটা আছে সেটাকেও আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

সূরয প্রস্থান করলে বাসু-সাহেব বললেন, আমার দোষ নেই রানু, কাজটা তুমিই আমার ঘাড়ে চাপালে। সে যা হোক, তোমরা দুজনে তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আজ পহেলগাঁও অঞ্চলটা বেড়িয়ে আসবে। দেড়টার সময় গাড়ি আসবে।

রানু বললেন, দুজন মানে? বাদ যাচ্ছে কে?

—কৌশিক। তাকে শ্রীনগরেই থাকতে হবে। কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন কৌশিক, আগেই বলেছি—আমার ইন্টুইশান বলছে, ঐ পাহাড়ী ময়নাটাকে ঘিরেই রহস্য-সমাধানের মূল চাবিটা রয়েছে। যে কোন কারণেই হোক আততায়ী ময়নাটাকে বদলে দিয়েছে। সময় সে খুব বেশী পায়নি। সুতরাং হয় পহেলগাঁও অথবা শ্রীনগরের বাজার থেকে সে ঐ দ্বিতীয় ময়নাটাকে কিনেছে। তুমি ওবেলা শ্রীনগরের বাজারটাকে চষে ফেল। দেখ, এখানে অমন কোনও দোকান আছে কিনা—যারা টিয়া, ময়না, বদরিকা ইত্যাদি বেচে।

কৌশিক কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললে, ভাল কাজ দিলেন যা হোক—

—আর শোন ঐ সঙ্গে বাজারে গিয়ে খোঁজ নিও উলের দোকান কটা আছে।

—উল?

—হ্যাঁ, উল। লগ-কেবিনে যে আধবোনা সোয়েটারটা পাওয়া গেছে তার রঙ ঘটনাচক্রে যদি একটু বেপট ধরনের হয় তাহলে আমরা ঐ নমুনা দেখিয়ে খোঁজ নিতে পারব এমন উল সম্প্রতি কে কিনেছে। ঐ উলের কাঁটাটাও আমাকে খোঁচাচ্ছে।

কৌশিক বলে, কিন্তু শ্রীনগরের বাজারেই কেনা হয়েছে কেমন করে জানলেন?

—জানি না। পহেলগাঁয়েও হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু সেখানে তো আমরাই যাচ্ছি। খোঁজ নেব। তুমি শ্রীনগরটা দেখ।

—এটা রীতিমত 'ওয়াইল্ড-গুজ-চেজ্' হয়ে যাচ্ছে না বাসু মামা?

বাসু বললেন, যাচ্ছে। কোন একটা দিক থেকে শুরু তো করতে হবে। তাছাড়া যাকে আমরা খুঁজছি সে ঠিক 'ডোমেস্টিক গুজ' নয়। এটাই আমার বিশ্বাস।

দুই

পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ দিয়ে অ্যাম্বাসাডাব গাড়িটা বিসর্পিল পথে ক্রমশঃ উপরে উঠছে। পিছনেব সীটে বসেছেন বানু আব সুজাতা, ড্রাইভারেব পাশে বাসু-সাহেব। খোদাবক্স দুটি বড় টিফিন-ক্যারিযাবে বৈকালিক জলযোগ এবং বড় ফ্লাস্কে কফি দিয়েছে। কোকবনাগ থেকে আচ্চাবলেব দিকে যে পাকা রাজপথটা গিয়েছে সেই পথেই কোকরনাগ থেকে প্রায় সাত কিলোমিটাব দূবে একটা কাঁচা সড়ক। পীচ নেই বটে, তবে সব রকম গাড়িই চলে। এ পথটা ঘুবে গিয়ে মিশেছে পহেলগাঁও। ঐ পথেব ধারে 'লীডাব'নদীব কিনারে 'ট্রাউট-প্যারাডাইস'। কোকবনাগ এবং পহেলগাঁওযের মাঝামাঝি দূবত্বে। ড্রাইভাব কিলোমিটারেব হিসাব এড়িয়ে জানালো পঁচিশ মিনিট ড্রাইভিং দূরত্বে। এ-পথে দিনে একখানি বাস যায়, একখানি ফেরে। তবে ট্রাউট সিজনে— সেপ্টেম্বব-অক্টোবব মাসে বাসেব সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রাইভেট গাড়ি এবং ট্যাক্সিও।

কোকরনাগ ছাড়াবার পরেই সমস্ত লীডাব উপত্যকাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বানী দেবী বললেন, তোমাব যদি তাড়া না থাকত, তাহলে আমবা এখানে একটু বসতাম। কিন্তু তুমি তো—

কথাটা শেষ হল না। বাসু-সাহেব ড্রাইভাবকে নির্দেশ দিলেন গাড়িটা থামাতে। বানী দেবীব দিকে ফিরে বললেন, কলা বেচতে এসেছি বলে বথ দেখব না কেন? দু-দশ মিনিট দেবী হলে মহাভাবত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নাম সুজাতা!

গাড়িটা পথেব পাশে দাঁড় কবিয়ে সুজাতা আব বাসু-সাহেব নামলেন। বানী দেবীর নামার উপায় নেই। হুইল চেযাবটা আনা হযনি। উনি গাড়িব কাচটা নামিয়ে দিয়ে কলস্রোতা 'লীডার' নদীব উপলবন্ধুব নৃত্যচ্ছন্দ দুচোখ ভরে দেখতে থাকেন। বাসু-সাহেব হঠাৎ বললেন, দেখি সুজাতা বাইনোকুলাবটা দাও তো। ওই নিচে যে গাড়িটা আসছে, মনে হচ্ছে ওটা পুলিস-ভ্যান। নয়?

সুজাতা যন্ত্রটা ওঁব হাতে দেয়। দেখে নিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। যোগীন্দর সিং সেই সি. বি. আই.য়ের অফিসাবটিকে নিয়ে আসছে।

অনতিবিলম্বে বিসর্পিল পথে পাক খেতে খেতে গাড়িটা এসে উপনীত হল। ওঁদেব অতিক্রম কবে এগিয়ে গেল না কিন্তু। একটু দূরে গিয়েই থামল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনজন। পুলিসেব পোশাকে থানা-অফিসাব যোগীন্দর সিংকে চিনতে অসুবিধা হল না—আকালি শিখ তিনি— গোঁফ-দাঁড়ি-পাগড়ি-কড়ায় তিনি চিহ্নিত। অপর দুজনেই স্যুট পরেছেন। একজনকে হঠাৎ চিনতে পাবলেন বাসু-সাহেব। সতীশ বর্মন! অনেকবাব অনেক কেস-এ দুজনের মোলাকাৎ হযেছে। সতীশ হাড়ে হাড়ে চেনে বাসু-সাহেবকে।

সতীশ কবমর্দনেব জন্য হাতটাও বাড়িযে দিল না, নমস্কারও কবল না। বিস্ময় বিস্ফাবিত চক্ষে শুধু বলল, আপনি? এখানে? কী ব্যাপার?

বাসু হেসে বললেন, আশ্চর্য কাকতালীয় ঘটনা। ঠিক ঐ প্রশ্নটাই যে আমি পেশ কবতে চাই: আপনি? এখানে? কী ব্যাপার?

সতীশ বলল, আমি এখন ডেপুটেশানে সি. বি. আই.-তে আছি। একটা তদন্তেব ব্যাপাবে এসেছি। কিন্তু আপনি? ছুটিতে?

বাসু তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অপব দুজনের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার নাম পি. কে. বাসু, আপনাকে অবশ্য আমি আন্দাজে চিনতে পারছি যোগীন্দর সিংজী; কিন্তু বর্মন তৎক্ষণাৎ নিজের ত্রুটি

সংশোধন করে বলে, আয়াম সরি, আমারই ইন্ট্রোডিউস করে দেবার কথা। হ্যাঁ, উনি মিস্টার যোগীন্দর সিং, ও. সি. পহেলগাঁও; ইনি মিঃ জে. কে. শর্মা এখানকার সিভিল এস. ডি. ও.। আর ইনি মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল।

বাসু-সাহেব ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বর্মনের সঙ্গেও।

শর্মা বললেন, মিস্টার পি. কে. বাসু? ব্যারিস্টার? আপনিই কি...

বাসু-সাহেব ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, আর এ হচ্ছে সুজাতা, মিসেস সুজাতা মিত্র।

সুজাতা হাত তুলে সমবেত ভাবে সকলকে নমস্কার করল।

শর্মা তার অসমাপ্ত প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করার পূর্বেই সতীশ বর্মন পুনরায় বলে, আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব দেননি। ছুটিতে?

এবারও বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। পকেট থেকে একটি খাম বার করে তার থেকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দেন শর্মাজীর দিকে, যেন তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাব হিসাবেই।

শর্মা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, ঠিকই ধরেছি তাহলে।

—কী ওটা? দেখি দেখি—বর্মন কাগজখানা নিয়ে দেখে। বলে, সুরযপ্রসাদ আপনাকে নিয়োগ করছে?

—চিঠিটা কি তাই বলছে না?

—হুম্। কিন্তু কেন? কী চায় সে আপনার কাছে? কী বলেছে?

—চায়—দোষীর শাস্তি হ'ক। বলেছে—পুলিসের সঙ্গে যেন আমি সহযোগিতা করি।

কোথাও কিছু নেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে সতীশ বর্মন। কোন রকমে হাসির দমক সামলে বলে, বাসু-সাহেব, আপনার এই 'জোক'টা এ বছরের শ্রেষ্ঠ জোক। পি. কে. বাসু— বার-অ্যাট-ল—'দ্য প্যেরী ম্যাসন অব দ্য ঈস্ট' পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন! ভাবতেই আমার হাসি আসছে! এ যেন বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে! ওফ্।

আবার হাসির দমকে ভেঙে পড়ে বর্মন।

বাসু-সাহেব এস. ডি. ও. শর্মা সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, যেহেতু কোন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার নির্দোষ অভিযুক্তের হয়ে সওয়াল করে তাই সে আরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবে না?

বর্মন হাসি থামিয়ে বলে, মায়ের কাছে আর মাসির গপ্পো শোনাবেন না ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি আজীবন পুলিসের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন! যাননি?

বাসু বললেন, বরং উল্টোটাই। পুলিসের কাজ প্রকৃত অপরাধীকে ধরা। সে কাজে আমি আজীবন পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছি। করিনি?

—সেটাকে সহযোগিতা বলে না। আপনি শুধু আপনার 'ক্লায়েন্ট'দের নির্দোষ প্রমাণ করে গেছেন। অস্বীকার করতে পারেন?

বাসু হেসে বলেন, কী আশ্চর্য! তার জন্য কি আমি দায়ী? আপনারা যে ক্রমাগত নিরপরাধীদের ধরে ধরে এনে কাঠগড়ায় তুলেছেন!

সতীশ বর্মন জবাবে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে শর্মা বলে ওঠেন, এনাফ্ অব ইট। শুনুন আপনারা। এ নিয়ে ঝগড়া করার কোন মানে হয় না। আমি এই সাবডিভিশনের এস. ডি. ও.। কালেকটারের নির্দেশে আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করছি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে, এখানকার স্থানীয় পুলিস প্রকৃত 'এক্সপার্ট'দের সাহায্য চায়। কালেকটার-সাহেব সি. বি. আই.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন—বর্মনসাহেব স্বয়ং এসেছেন, তাতে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। দেখা যাচ্ছে—অ্যাগ্রিভড পার্টি, আই মীন, নিহত মহাদেওপ্রসাদের পুত্র ওঁকে নিয়োগ

করেছেন এ রহস্যজাল ভেদ করতে। মিস্টার পি. কে.বাসুকে যদিও আজ আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম, কিন্তু ওঁর অনেক কীর্তি-কাহিনী আমার জানা। এ-ক্ষেত্রে কালেক্টারের তরফে আমি বলব, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে চাই—তাঁর নিজস্ব কায়দায় সমাধানে পৌছাতে। আমি তো বুঝি—যদি কোন আইনজীবী নিরপরাধীকে নির্দোষ প্রমাণ করে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করেন, তবে তিনি সমাজের উপকারই করেন। মিস্টার বাসু, আপনাকে সর্বতোভাবে আমরা সাহায্য করব।

সতীশ বর্মন গুম খেয়ে গেল। তিক্ত হাসির সঙ্গে মিশিয়ে বলে,ঠিক আছে মিস্টার শর্মা। এটা আপনারই কেত্তনের আসর—আপনিই মূল-গায়েন। যদি খ্যামটার সুরে আসর জমাতে চান, সেই সুরেই কেত্তন গাইব!

শর্মার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কথাটা চাপা দিতে বাসু-সাহেব শর্মাকে বলেন, আপনার গাড়ির পিছন পিছনই আসছি আমি। আপনি কি লগ-কেবিনটা চেনেন?

জবাব দিলেন যোগীন্দর সিং। বলেন, আসুন আপনি। আমি ভাল রকমই চিনি। কাল প্রায় সারাটা দিনই ওখানে ছিলাম আমি।

বাসু প্রশ্ন করেন, মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ঘরে কি বেশি কিছু নাড়াচাড়া করা হয়েছে?

—কিছুমাত্র না। আমরা শুধু মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি, আর পিস্তলটা। না ভুল বললাম—ময়না পাখিটাকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর মাছের পলোটা। পচে দুর্গন্ধ উঠছিল তা থেকে। যাই হোক, চলুন। আলো থাকতে থাকতে সব কিছু সারতে পারলেই ভালো।

আগু-পিছু দুখানি গাড়ি রওনা দিল।

মিনিট পনেরো পাহাড়ী পথে ড্রাইভ করার পর সামনের গাড়ির ডান দিকের ব্যাক-লাইটটা রক্তাভ এক-চোখে পিটপিট করে জানান দিল এবার ডাইনে মোড় নিতে হবে। পীচের সড়ক ছেড়ে পাথর-বাঁধানো কাঁচা রাস্তায়। দু-ধারে ঘন পাইনের গাছ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বনপথের উপর ঝুঁকে পড়েছে। ফলে বনপথ পাইন ফলে আকীর্ণ। মাঝে মাঝে দু-একটা কাঠের বাড়ি। লীডার নদীকে গাড়িতে বসে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা সাইন-বোর্ড: 'ট্রাউট প্যারাডাইস'—তার তলায় ছোট হরফে কী যেন লেখা, বোধ হয় বিনা অনুমতিতে মাছ ধরা যে বে-আইনী তারই বিজ্ঞপ্তি। দ্রুতগতিতে গাড়িটা অতিক্রম করায় বিজ্ঞপ্তিটা পড়া গেল না। একটু পরেই সামনের গাড়িটা থামল। আগু-পিছু দুখানি গাড়ি পার্ক করা হল। সামনের গাড়ির আরোহীরা নামলেন। বাসু-সাহেবও।

যোগীন্দর সিং এগিয়ে এসে বললেন, বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। বেশিদূর নয়, তিন-চার শ' গজ, ঐ দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে।

রানী দেবী বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে দেখলেন। পাইনকাঠের লগ্-কেবিনটা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে গেছে। মনে হয় না ওটা মানুষের তৈরী। যেন পাইন গাছগুলোর মতই ওর শিকড় গাড়া আছে উপলবন্ধুর মাটির গভীরে। একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ।

যোগীন্দর সিং বললেন, ওঁরা বরং এখানেই অপেক্ষা করুন। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।

চারজনে পাইনফলের কার্পেট-বিছানো পথে অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পরে উপনীত হলেন লগ্-কেবিনটার দ্বারদেশে। একজন কনস্টেব্‌ল বসেছিল ঐ কুটিরের বারান্দায়। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

যোগীন্দর বললেন, সব্ ঠিক হ্যায় না বাহাদুর?

লোকটা বল্‌লে, জী সাব!—পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে দিল।

শর্মাজী বলেন, আসুন আপনারা।

সতীশ বর্মন ছিল ঠিক পিছনেই। দরজাটা আগলে বলে, দেখুন শর্মাজী, প্রয়োজনের বেশি আমরা

ঘরটার ভিতরে থাকব না। হয়তো অনেক কিছু 'ক্লু' এখনও ছড়ানো আছে ঘরটার ভিতর। আনাড়ি হাতে আপনারা সব তছনছ করে দেবেন না। সবার আগে বলুন—ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছু পাওয়া কিছু গেছে?

যোগীন্দর বলেন, হ্যাঁ অনেকগুলি। অধিকাংশই মহাদেও প্রসাদের। মৃতদেহ অপসারণের আগে অনেকগুলি ফটোও নেওয়া হয়েছে। শর্মাজী যা বললেন—অর্থাৎ মৃতদেহ, পিস্তল, ময়না ও পচা মাছ ছাড়া এ ঘর থেকে আর কিছুই অপসারিত হয়নি। যেখানে যা ছিল তাই আছে।

সতীশ বর্মন গম্ভীর হয়ে বলেন, দ্যাটস্ গুড। আমি বলি কি শর্মাজী—প্রথমে মিস্টার বাসুকে ঘরটা পরীক্ষা করতে দিন। কোন কিছু না ছুঁয়ে উনি সব কিছু দেখে নিন। আমরা এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। ওঁর দেখা হয়ে গেলে উনি চলে যাবেন। আমরা তারপর তদন্ত শুরু করব।

শর্মাজী বলেন, কেন?

—কারণ উনি যতক্ষণ উপস্থিত আছেন, আমরা ততক্ষণ তদন্ত করতে পারব না।

শর্মাজীর ভ্রূকুঞ্চন আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বলেন, তার কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি। কেন?

সতীশ বর্মনও একটু রুক্ষস্বরে বলে, সেটাই তো আমি প্রথম থেকে আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। মিস্টার বাসু হচ্ছেন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। ওঁর উদ্দেশ্য একটাই—আমরা আততায়ীকে চিহ্নিত করা মাত্র উনি তার পক্ষ অবলম্বন করবেন। উঠে পড়ে লেগে যাবেন তাকে খালাশ করাতে। আমরা তদন্ত করে যেসব সূত্র আবিষ্কার করব সেগুলি আগেভাগে জানা থাকলে উনি আদালতে ততই সুবিধা পাবেন। ক্রস-এগজামিনেশানে আমাদের সাক্ষীদের উনি নয়-ছয় করে ছাড়বেন। আপনি ওঁকে চেনেন না শর্মাজী, আমি ওঁকে হাড়ে-হাড়ে চিনি।

শর্মাজী ঘুরে দাঁড়ালেন। স্পষ্টভাবে বললেন, মিস্টার বর্মন, আমি খোলা কথার মানুষ, এবং সোজা পথে চলতে ভালবাসি। প্রথম কথা, এখানে আপনি, আমি এবং মিস্টার বাসু তিনজনেই বাহুল্য...

—বাহুল্য? মানে? রুখে ওঠে বর্মন।

—ভেবে দেখুন। এটা নিতান্তই একটা খুনের কেস। যত রহস্যজনকই হোক সেটা, একটা 'মার্ডার কেস' ছাড়া কিছু নয়। এখানে স্বাভাবিকভাবে শুধু যোগীন্দর সিংজীরই তদন্ত করার কথা। কিন্তু যেহেতু মৃত খান্নাজীর একটা রাজনৈতিক পটভূমি আছে তাই সিভিল এস. ডি. ও.-কে এখানে আসতে হয়েছে, দিল্লী থেকে আপনি এসেছেন এবং মৃত ব্যক্তির পুত্রের তরফে একজন প্রখ্যাত আইনজীবী উপস্থিত হয়েছেন। এই হত্যারহস্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনও দায়রা আদালতে নেওয়া হলেও এ নিয়ে লোকসভায় 'স্টার্ড কোশ্চেন' উঠতে পারে। আমি চাই না, সেখানে মিস্টার বাসু এ-কথা বলবার সুযোগ পান যে, অথরিটি ওঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেনি। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি বললেন যে, আমরা যাকে অভিযুক্ত করব উনি ক্রস-এগজামিনেশনে প্রমাণ করবেন সে নিরপরাধী। এই বিষয়ে আমার একটিই বক্তব্য—আপনি এক্সপার্ট, আপনি দয়া করে এমন লোককেই অভিযুক্ত করুন যে-লোকটা সত্যিকারের অপরাধী।

সতীশ বর্মনের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

বাসু তৎক্ষণাৎ বললেন, মেঝেতে ঐ যে চকের দাগ দেওয়া আছে এটাই বোধ হয় মৃতদেহের অবস্থানসূচক?

যোগীন্দর সিং বলে, জী হাঁ। মৃতদেহ অপসারণের আগে আমি মুর্দার আউটলাইনটা চক দিয়ে দাগিয়ে ছিলাম। আপনাদের সুবিধা হবে বলে আমি এই বাড়ির একটা নক্সাও তৈরি করেছি—চার-পাঁচ কপি অ্যামোনিয়া প্রিন্টও নিয়ে এসেছি। তাতে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি লিখে বুঝিয়ে দিয়েছি হত্যামুহূর্তে কোন জিনিসটা কোথায় ছিল।
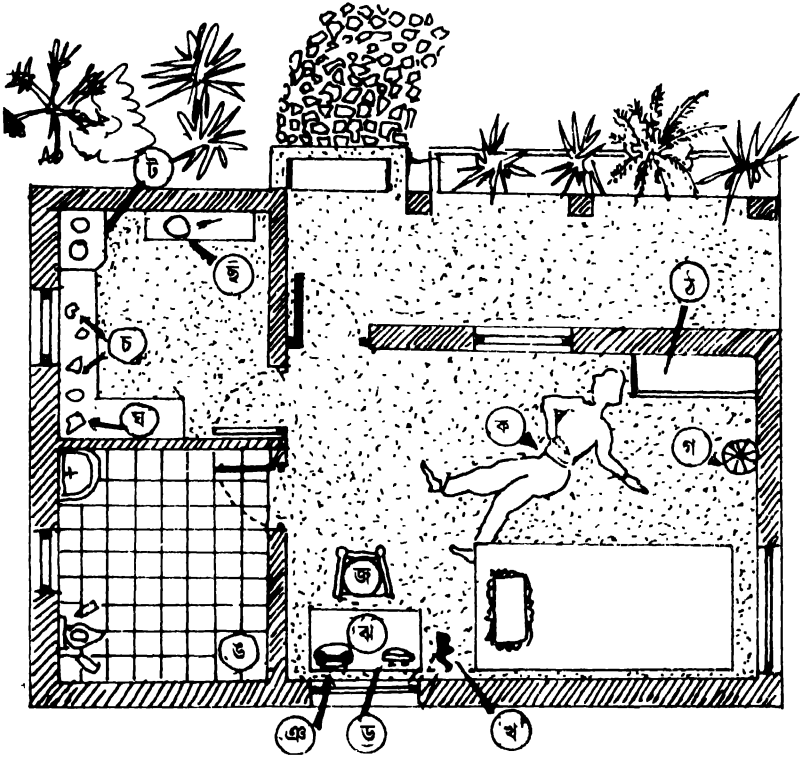
ক—মৃতদেহ
খ—পিস্তল
গ—পাখির খাঁচা
ঘ—ব্রিটানিয়া বিস্কুটের টিন
ঙ—মাছেব পলো
চ—আনাজপাতি
ছ—অর্ধভুক্ত এঁটো বাসন
জ—চেয়ার
ঝ—টেবিল
ঞ—টেলিফোন
ট—উনান
ঠ—আলমারি
ড—অ্যালার্ম ঘড়ি

প্রত্যেককে সে এক কপি করে প্ল্যান দিয়ে দিল।

বাসু বলেন, হত্যামুহূর্তে নয়। বরং বলতে পারেন মৃতদেহ আবিষ্কার মুহূর্তে।

যোগীন্দর তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। এবং এ কথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, হত্যামুহূর্তে না হলেও আততায়ী যখন ঘটনাস্থল ত্যাগ করে যায় তখন এই অবস্থা ছিল।

বাসু যোগীন্দরকে প্রশ্ন করেন, এটা কি আত্মহত্যার কেস হতে পারে?

—আমি তো মনে করি সেটা নিতান্ত অসম্ভব। প্রথম কথা, আত্মহত্যা করলে পিস্তলটা অত দূরে চলে যেতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, পিস্তলে কোনও ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাইনি আমরা। অথচ খান্নাজীর হাতে দস্তানা পরা ছিল না। আত্মহত্যা হলে খান্নাজীর আঙুলের ছাপ অনিবার্যভাবে পাওয়ার কথা।

বাসু বলেন, তাহলে ঐ সঙ্গে আরও একটি অনুসিদ্ধান্তে আসা যায়: হত্যাকারী এটাকে 'আত্মহত্যার কেস' বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। সে যেন সোচ্চার ভঙ্গিতে বলে গেছে: 'তোমরা শোন, এটা হত্যা!'

—কেন? এ কথা বলছেন কেন?—শর্মাজী জানতে চান।

—হত্যাকারী যদি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এটাকে আত্মহত্যার কেস বলে চালাতে চাইত তাহলে পিস্তলটা থেকে নিজের ফিঙ্গার-প্রিন্ট মুছে দিয়ে রুমাল-জড়ানো হাতে সেটা মৃত খান্নাজীর মুঠোয় ধরিয়ে দিত। নয় কি?

—ঠিক কথা। এদিক দিয়ে আমরা ভাবিনি। ধন্যবাদ মিস্টার বাসু।

—এবং হত্যাকারী চেয়েছিল পুলিস ঐ 'মার্ডার-ওয়েপনটা' খুঁজে পাক।

সতীশ বর্মনের আর সহ্য হল না। সে হেসে ওঠে। বলে, হত্যাকারী শুধু চেয়েছে হত্যার সময়ে পিস্তলটা যে তার নিজের হাতে ছিল না এটাই প্রতিষ্ঠা করতে। সব চালাক-চতুর হত্যাকারীই তাই করে। রুমাল দিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট মুছে নিয়ে অকুস্থলেই পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে যায়। ওটা তার পকেটে নিয়ে ঘোরা বিপদজনক। ক্রিমিনোলজি তাই বলে।

বাসু গম্ভীরভাবে বলেন, হবেও বা। হয়তো অপরাধ বিজ্ঞান তাই বলে।

যোগীন্দর নূতন প্রসঙ্গে আসে, ময়নার খাঁচাটা প্ল্যানে গ-চিহ্নিত অবস্থানে মেঝেতে রাখা ছিল। খাঁচার দরজাটা খোলা ছিল, যাতে পাখিটা ইচ্ছামত ঢুকতে বেরুতে পারে। যেহেতু জানলাগুলোয় মশক-নিবারণ জালতি দেওয়া ও দরজাগুলো বন্ধ তাই ময়নাটা পালাতে পারেনি। ওর খাঁচার ভিতর যথেষ্ট খাবার তখনও অভুক্ত ছিল, এবং বাথরুমের মগটা এঘরে এনে আধমগ জলও রাখা ছিল।

বাসু জানতে চান—কী খাবার ছিল খাঁচার ভিতর?

—খান ছয়েক মিইয়ে যাওয়া থিন-অ্যারারুট বিস্কুট এবং তারই ভাঙা টুকরো।

বাসু পুনরায় প্রশ্ন করেন, খবরের কাগজে লিখেছে দেখলাম মৃত্যুর সময় ছয়ই সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটা। এই সময়টা কীভাবে চিহ্নিত হল? অবশ্য এটা যদি পুলিসের 'গোপন তথ্য' হয়...

বাধা দিয়ে শর্মাজী বললেন, বিলক্ষণ। না, আপনি যখন সহযোগিতা করছেন তখন পুলিসের কোনও তথ্যই আপনার কাছে গোপন নয়—

সতীশ বর্মনকে দেখলে মনে হয় উনি বুঝি এইমাত্র একগ্লাস চিরতার-জল খেয়েছেন। শর্মাজীর সেদিকে নজর নেই। তিনি বলে চলেন, মৎস্য এবং বন্যপ্রাণী মন্ত্রকের নির্দেশে এ বছর এই সাবডিভিশনে সিক্সথ্ সেপ্টেম্বর থেকে মাছ-ধরার মরশুম শুরু হয়। মহাদেও খান্না—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, গত দুবছর ধরে প্রায় আধা-ভবঘুরের মত হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক পরিবর্তনের আগে থেকেই—আমার বিশ্বাস গত দশ-বারো বছর ধরেই তিনি এইখানে বাৎসরিক মৎস্যশিকারের উৎসবে যোগদান করে আসছেন। আগেভাগেই একটি কেবিন তিনি 'বুক' করেন, নির্জনে মাছ ধরেন, রেডিও শোনেন, ছবি আঁকেন, পাখি দেখেন এবং তারপর সভ্যজগতে ফিরে যান। অবশ্য গত দু-বছর ধরে তিনি সাধারণ মানুষের বেশে, আত্মগোপন করে—

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, সেসব আমি সূরযপ্রসাদের কাছে শুনেছি। কাগজেও পড়েছি। আপনি শুধু এ বছরের কথাই বলুন।

—এ বছর এখানে আসার আগে উনি গিয়েছিলেন অমরনাথে। সেই তীর্থে যাবার আগেই উনি ওঁর সেক্রেটারী গঙ্গারামজীকে একটি চিঠি লিখে জানান যে, উনি সোমবার, পাঁচই শ্রীনগরে আসবেন এবং কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখনকার লগ্-কেবিনে চলে আসবেন। যে কোন কারণেই হোক প্রত্যাশিত সোমবারের বদলে, দিন-তিনেক আগে, শুক্রবার, দোশরা সেপ্টেম্বর সকালে তিনি শ্রীনগরে এসে পৌঁছান। গঙ্গারামজীকে তিনি বলেন, পহেলগাঁওয়ে তাঁর কী কাজ আছে। দু-একদিন সেখানে থেকে উনি মৎস্যশিকার মরশুমের উদ্বোধনের আগেই এই লগ্-কেবিনে চলে আসবেন। মোট কথা, উনি কিছু জামা-কাপড় ও ময়নাটাকে নিয়ে ঐ দোশরা তারিখেই শ্রীনগর থেকে রওনা হন। ইতিমধ্যে আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। মহাদেওপ্রসাদজী কী একটা জরুরী কাজে তাঁর সেক্রেটারীকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। লগ-কেবিন থেকে তিনি ঐ মর্মে নির্দেশ দেন, এবং গঙ্গারামজী দিল্লী চলে যান।

—লগ-কেবিন থেকে উনি কখন নির্দেশটা দিয়েছিলেন?

—গঙ্গারামজী সোমবার রাত আটটা নাগাদ টেলিফোন পান এবং পরদিন ছয় তারিখ সকালের প্লেন ধরে দিল্লী চলে যান।

—তার মানে মহাদেও খান্নাজী এই কেবিন থেকে সোমবার রাত আটটার সময় একটা টেলিফোন করেছিলেন?

—না, এই কেবিন থেকে নয়। খান্নাজী তাঁর সেক্রেটারীকে বলেন যে, কেবিনের টেলিফোনটা 'ডেড' হয়ে গেছে। তিনি অন্য জায়গা থেকে ফোন করছেন। কোথা থেকে তা তিনি বলেননি, গঙ্গারামও জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা তখন নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন ছিল।

—আপনি এ বিষয়ে গঙ্গারামজীর সঙ্গে কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ। ট্রাঙ্ক-লাইনে। গঙ্গারামজী এখনও দিল্লীতেই আছেন। আজ তাঁর শ্রীনগরে আসার কথা। এলেই তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

—কী জাতের জরুরী কাজ নিয়ে গঙ্গারাম দিল্লী চলে যান তা বলেননি?

—না। টেলিফোনে শুধু বলেছিলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

—গঙ্গারাম কি নিঃসন্দেহ যে, সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত আটটায় মহাদেওপ্রসাদই ফোন করেছিলেন? কেউ তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করে...

বাসুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শর্মাজী বলেন, গঙ্গারামজী নিঃসন্দেহ। তিনি গত দশ বছর ধরে ঐ সেক্রেটারীর কাজ করছেন। অন্য কেউ খান্নাজীর কণ্ঠস্বর নকল করে ওঁকে ঠকাতে পারবে না। তাছাড়া যে বিষয়ে ওঁদের কথাবার্তা হয় সেটা নাকি অত্যন্ত গোপনীয়—তৃতীয় ব্যক্তির তা জানার কথা নয়।

বাসু বললেন, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো খতিয়ে দেখা যাক। সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত খান্নাজী যে জীবিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ভাল কথা, তারপর, অর্থাৎ সোমবার রাত্রি আটটার পর কি কেউ তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে?

—না। ঐ সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটার পর থেকে বাকিটা অনুমাননির্ভর। টেবিলের উপর একটা ঘড়ি ছিল। সেটা দুটো সাত মিনিটে দমের অভাবে থেমে গেছে। দেখা যাচ্ছে অ্যালার্ম-কাঁটাটা আছে সাড়ে পাঁচটায়। সেটারও দম ফুরিয়ে থেমেছে।

ঠিক ঐ সময়েই লগ-কেবিনের টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠল। যোগীন্দর সিং ছিল টেবিলের কাছে। তুলে নিয়ে শুনল। টেলিফোনের কথা-মুখে চাপা দিয়ে বলল, মিস্টার বাসু—ইয়ে হ্যায় আপকো লিয়ে।

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা নিয়ে সাড়া দিতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি কৌশিক বলছি। লগ্-কেবিন থেকে আপনি কি এখন আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারবেন?

—না। অসুবিধা আছে।—বললেন বাসু।

—তাহলে এক-তরফা শুনে যান। সম্ভবত আমি হত্যাকারীকে খুঁজে পেয়েছি। শ্রীনগরে সেন্ট্রাল মার্কেটে একটা দোকান আছে, যেখানে পুষবার জন্য পাখি কিনতে পাওয়া যায়। দোকানের মালিক স্বীকার করেছে কিছুদিন আগে সে একজনকে একটি পাহাড়ী ময়না বেচেছে। ক্রেতার চেহারাও ওর পরিষ্কার মনে আছে।

—ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় কাজটা?

—উলের দোকান? অসংখ্য আছে। নামঠিকানার লিস্ট তৈরী করেছি।

—দ্যাটস্ ফাইন। পরে কথা হবে।

টেলিফোনটা স্বস্থানে বসিয়েই বাসু-সাহেবের নজর হল সতীশ বর্মন প্রতিটা কথা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। শর্মাজী কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করলেন না, যেন তাঁর কোন কৌতূহলই নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ শুরু করেন, পুলিস খবর পাওয়া মাত্র যোগীন্দর আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে—খান্নাজীর

একটা পোলিটিক্যাল ইমেজ আছে হযতো সে জন্যই যোগীন্দব আমাকে জানায। আমবা দুজনেই চলে আসি। ডুপ্লিকেট চাবি দিযে দবজা খুলে ঘবে ঢুকে দেখি

বাসু সাহেব বাধা দিযে বলেন কবে? কখন?

—এগাবো তাবিখ বেলা দশটায। ঘবে ঢুকতেই একটা দুর্গন্ধ পেলাম। না, মৃতদেহ থেকে নয, পচা মাছগুলো থেকে সেগুলো বাক্সবন্দী কবে থানায পাঠিযে দিলাম। অনুসন্ধান কবে পবে জানা গেছে ট্রাউট মাছগুলোব সমবেত ওজন দেড কে জি অর্থাৎ দৈনিক যতটা মাছ ধবাব অনুমতি আছে তাব সমান। মাছগুলো কিন্তু কাদামাখা ছিল অর্থাৎ খান্নাজী সেগুলি ধুযে সাফা কবাব সময পাননি। বান্নাঘবেব সিংক-এ একটা প্লেটে প্রাতবাশেব কিছু অভুক্ত অংশ ছিল—পাঁউরুটিব টুকবো, ডিমেব চিহ্ন। ওযেস্ট পেপাব বাস্কেটে দুটো ডিমেব খোলাও ছিল মৃতদেহেব পবনে ছিল পাযজামা, উর্ধ্বাঙ্গে একটা পুবোহাতা শার্ট ও একটা হাফ হাতা সোযেটাব। কোটটা টাঙানো ছিল ঐ চেযাবেব গাযে তাব পকেটে হাত দস্তানা ছিল একজোডা এ ছাডা ছিল মানিব্যাগ, শ তিনেক টাকা সমেত, রুমাল এবং সিগ্রেট দেশলাই দবজাব পাশে একজোডা গামবুট কাদামাখা। ওপাশে দাড কবানো হুইল-ছিপ। খাটেব নিচে ছিল স্যুটকেস। তালা খোলা। তাতে জামা-কাপড, মুখ ধোওযাব সবঞ্জাম, শেভিং সেট ছাডাও ছিল নগদে সাডে পাচ হাজাব টাকা—একশ টাকাব নোটে। একটা গোদবেজেব নম্ববী চাবি।

বাসু বলেন কিন্তু হত্যাব সমযটা আপনাবা কীভাবে নিধাবণ কবছেন?

শর্মাজী বলতে থাকেন যোগীন্দবেব ধাবণা --এবং আমিও তাব সঙ্গে একমত—খান্নাজী হত হযেছেন ছযই সেপ্টেম্বব বেলা এগাবোটা নাগাদ। আমাদেব যুক্তিটা এই বকম

খান্নাজী পাচ তাবিখ বাত্রি আটটা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাব প্রমাণ আছে। দেখা যাচ্ছে ঘডিতে অ্যালার্ম বেজেছে সকাল সাডে পাঁচটায। তাহলে ধবে নিতে পাবি, উনি খুব ভোবে উঠে পডেন। তাডাতাডি মুখহাত ধুযে নেন এবং একজোডা পোচ তৈবী কবে, রুটি টোস্ট কবে এবং কফি বানিযে প্রাতবাশ সেবে নেন ঘণ্টা দেডেক তাতেই কেটে যায সুতবাং সকাল প্রায সাতটা নাগাদ উনি ছিপ নিযে মাছ ধবতে বেবিযে যান। লক্ষণীয, উনি এটো বাসন ধুযে যাননি—অর্থাৎ তাডাতাডিই বেব হতে চেযেছিলেন তখনও মেছুডেদেব ভিড হযনি। ফলে বেলা দশটাব মধ্যেই তিনি নির্দিষ্ট সীমাবেখায পৌছে যান এবং মাছ ধবায ক্ষান্ত দেন। ঘবে ফিবে আসেন। লক্ষণীয, মাছগুলি তিনি ধুযে বাখাব সময পান না। উনি বুট-জোডা খুলে ফেলেন, কোটটাও খুলে চেযাবে টাঙিযে দেন। প্যান্ট বদলে পাজামা পবেন ঠিক এই সমযেই হঠাৎ হত্যাকাবীব আবির্ভাব ঘটে এবং অনতিবিলম্বেই তিনি হত হন। তখন বেলা এগাবোটা।

—কেন এগাবোটা কেন? এমনও তো হতে পাবে প্রাতবাশ তিনি কবেছিলেন ক্রিম-ক্র্যাকাব বিস্কুট—যাব খালা টিনটা দেখতে পাওযা যাচ্ছে—এবং কফি দিযে। ফিবে এসেই ডিমেব পোচ ও রুটি টোস্ট কবে খান। দুপুবে বনেব মধ্যে বসে কাঠবিডালীদেব ছবি আঁকেন এবং বিকালে হত হন।

শর্মা বলেন, না দুপুব পাব হযনি। তাব কাবণটা এই—এই লগ-কেবিনটা সকাল সাডে দশটা পর্যন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। এগাবোটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত এ কেবিনেব ছাদে সবাসবি বোদ পডে। করোগেট টিনেব ছাদ। সেটা উত্তপ্ত হযে উঠলে ঘবটা বেশ গবম হযে যায। বিকাল চাবটে নাগাদ আবাব বেশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। বাত্রে তো খুবই ঠাণ্ডা হযে যায। এ জন্য ঘবে একটি ফাযাব-প্লেস আছে। ঐ দেখুন, তাতে কাঠ সাজানো বযেছে। সুতবাং আমাদেব সিদ্ধান্ত ঘটনাটা বেলা সাডে দশটাব পব ঘটে যখন ঘবটা বেশ গবম। তাই কোট ও গবম প্যান্টটা খুলে বাখা হযেছে। এবং ঘটনা তিনটাব পবেও নয। তাহলে কোটটা ওঁব গাযে থাকত। আবাব বেলা বাবোটা থেকে দুটোব মধ্যে হলে হযতো উনি সোযেটাবটাও খুলে ফেলতেন। সুতবাং মৃত্যুব সময—হয এগাবোটা থেকে বাবোটা অথবা বেলা তিনটে থেকে বিকাল চাবটা। শেষোক্ত সম্ভাবনাটা এইজন্য বাদ দিচ্ছি যে, বিছানাটা দেখুন পবিপাটি কবে পাতা আছে।সকালবেলা শয্যাত্যাগ কবে তিনি যেমন পবিপাটি কবে পেতে গিযেছিলেন ঠিক

তেমনই আছে। মধ্যাহ্ন আহার করলে তিনি নিশ্চয়ই বিছানাটায় একটু শুতেন। তাছাড়া ট্রাউট মাছগুলোও রান্না করে খেতেন।

বাসু বললেন, সুন্দর যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত। আচ্ছা ঐ ঘড়িটা দম দেবার পর কতক্ষণ চলে সেটা আপনারা পরীক্ষা করে দেখেছেন?

যোগীন্দর বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, বত্রিশ ঘণ্টা। যেহেতু ওটা বন্ধ হয়েছে দুটো সাত মিনিটে তাই ধরে নেওয়া যায় যে শেষবার যখন দম দেওয়া হয়েছে তখন ঘড়িতে বেজেছিল ছয়টা-কুড়ি। সকালই হোক বা রাতই হোক।

বাসু বলেন, ধন্যবাদ, এবার আমি ঘরটা এক নজর দেখে নিয়েই বিদায় নেব।

ঘর, রান্নাঘর এবং বাথরুমটা দেখে ফিরে এসে উনি বললেন, রান্নাঘরে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের একটা টিন, কফি, চিনি, কন্ডেন্সড্ মিল্ক, একটা জ্যামের শিশি আর কিছু টিন্ড খাবার ছাড়া যা আছে তা আনাজপাতি। এখান থেকে আর কোনও খাদ্যদ্রব্য কি অপসারিত হয়েছে? যেমন মাখন, চায়ের কৌটা, কোনও টিন্ড খাবার অথবা বিস্কুটের টিন?

যোগীন্দর সিং দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, না!

শর্মাজী বলেন, কেন বলুন তো?

—কারণ এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে হত্যাকারী জানত এখানে একটি পাখি আছে, তাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। থিন্ অ্যারারুট বিস্কুট ছয়খানা সে পকেটে করেই নিয়ে আসে। যেহেতু খান্নাজীর ভাঁড়ারে ছিল শুধুমাত্র ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট।

শর্মাজী কিছু বলার আগেই সতীশ বর্মন বলে ওঠেন, আপনার সিদ্ধান্তগুলি আপনার নিজের মনেই রাখুন বাসু-সাহেব। আমরা তাতে উৎসাহী নই। আমি তো মনে করি—খান্নাজীর টেবিলে দশ-পনেরো খানা—মাইন্ড য়ু ছয়খানা নয়—থিন্ অ্যারারুট বিস্কুট ছিল, এবং আততায়ী গোটা ঠোঙাটাই তুলে নিয়ে পাখিটার খাঁচার কাছে নামিয়ে দিয়ে যায়। তার খানকতক পাখিটা খেয়েছে এবং মাত্র ছয়খানা অভুক্ত পড়ে আছে! এনি ওয়ে, আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে কি?

বাসু বলেন, হয়েছে। শুধু আর একটি প্রশ্ন আছে। মিস্টার শর্মা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি—আমার ক্লায়েন্ট বলেছিলেন, এ ঘরে মেয়েদের একটি ব্র্যাসিয়ের, একজোড়া উলের কাঁটা, একটা আধবোনা সোয়েটার ও কিছু উল পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা সত্য?

বর্মন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শর্মাজী বলে ওঠেন, হ্যাঁ সত্য। সূরযপ্রসাদ সে তথ্যটা গোপন রাখতে চায় বলে এতক্ষণ বলিনি। সেগুলি থানায় জমা দেওয়া আছে। আপনি দেখতে চান?

সতীশ বর্মন দুম দুম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসু বলেন, হ্যাঁ চাই। আপনাদের আপত্তি নেই তো?

—নিশ্চয় নয়। এ কথা তো আমি বারে বারেই বলেছি।

—ধন্যবাদ। তাহলে ফেরার পথে আমি থানাতে যাব। জিনিসগুলি দেখব, আবার একই কথা বলি, আপনার আপত্তি না থাকলে ঐ উলের কিছু নমুনা আমি নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে, পাবেন।

বাসু-সাহেব বের হয়ে আসছিলেন, হঠাৎ নজর হল দরজার বাইরে শুধু সতীশ বর্মনই নয়, আরও একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। প্রৌঢ়, স্যুট পরা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শর্মাজীও বেরিয়ে এসেছিলেন। নবাগতকে দেখে বলে ওঠেন, গঙ্গারামজী?

—ইয়েস স্যার। আমি আজই শ্রীনগরে পৌঁচেছি। এসেই শুনলাম আপনারা সবাই এখানে এসেছেন। আপনি টেলিফোনে বলেছিলেন, শ্রীনগরে ফিরেই যাতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাই তৎক্ষণাৎ এখানে চলে এসেছি।

—কিসে এলেন আপনি?

—মোটর বাইকে।

শর্মা বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। যোগীন্দরকে তো আপনি চেনেনই। ইনি হলেন সি. বি. আই.য়ের অফিসার মিস্টার সতীশ বর্মন। আর উনি—

বাধা দিয়ে গঙ্গারাম বললেন, ওঁকে আমি চিনি স্যার।সূরযপ্রসাদ আমাকে বলেছে এখানে হয়তো ব্যারিস্টার সাহেবের দেখাও পেয়ে যাব আমি।

গঙ্গারাম বাসু-সাহেবকে করজোড়ে নমস্কার করে শর্মাজীর দিকে ফেরেন। বলেন, আপনি টেলিফোনে যা যা বলেছিলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। প্রথমত—

—জাস্ট এ মিনিট! বাধা দিয়ে সতীশ বর্মন বলে ওঠে, আপনার জবানবন্দি আমরা একটু পরে নেব। মিস্টার বাসুর তাড়া আছে। উনি চলে যাচ্ছেন—

গঙ্গারাম বিহ্বলভাবে বলেন, কিন্তু আমার যা বলার আছে—

আবার বাধা দিয়ে বর্মন বলে, তা শুধু পুলিসকে জানাবেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে নয়। বুঝেছেন?

গঙ্গারাম কী বলবেন ভেবে পান না।

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, কী হল? বুঝতে পারলেন না? আপনার যা বলার আছে তা আপনার এমপ্লয়ারকে এবং তাঁর নিয়োজিত উকিলকে বলবেন না। এটা তো সোজা কথা!

গঙ্গারামেব সব কিছু একেবারেই গুলিয়ে গেল।

বাসু যোগীন্দরকে বললেন—আমরা একটু ঘুবে বেড়াবো। ঘণ্টা দুই পরে থানায় গেলে আপনার দেখা পাব কি?

—নিশ্চয়ই। আমি অপেক্ষা করব।

বাসু তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শর্মাজীর দিকে ফিরে বললেন, আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমি আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে—যাতে পুলিস কোনও নিরপরাধীকে ডকে তুলে আমার বদনাম আরও বৃদ্ধি করতে না পারে। নমস্কার।

সতীশ বর্মনকে তিনি কোনও সম্বোধন না করেই পথে নামলেন।

তিন

পরদিন সকালে হাউসবোটের ডাইনিং রুমে সবাই সমবেত হবার পর কৌশিক বলল, কাল আপনাদের ফিরতে এত দেরী হল কেন? আমি ইয়াকুবের দোকানে চুপচাপ বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ও ঝাঁপ বন্ধ করার পর হাউসবোটে ফিরে এলাম।

বাসু বললেন, ফেরার পরে পহেলগাঁও থানাতে যেতে হল যে।

পকেট থেকে এক টুকরো উলের নমুনা বার করে সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, এটাকে কী রঙ বলবে সুজাতা?

সুজাতা সেটা হাতে নিয়ে পরখ করে দেখে বলল,'পেল লাইলাক'।

বানী দেবীব দিকে সে নমুনাটা বাড়িয়ে ধরে। তিনি বললেন, না শুধু লাইলাক নয়, একটু নীলের ছোঁয়াচ আছে—যাতে রঙটা ভায়োলেট ঘেঁষা লাইলাক বলা যায়।

বাসু বললেন, রঙটা কি 'কমন'? সহজেই উলের দোকানে পাব?

সুজাতা এবং রানী দেবী দুজনেই স্বীকার করলে,—না।

বাসু বললেন, তাহলে সুবিধাই হল আমাদের। কৌশিক, আজ তোমার ডিউটি হল এই নমুনা নিয়ে শ্রীনগরের সব কয়টা উলের দোকানে যাচাই করে দেখা—কোনও দোকানদার মনে করতে পারে কিনা এই রঙের উল সে সম্প্রতি কাউকে বিক্রি করেছে কিনা। করে থাকলে ক্রেতার কথা তার মনে আছে কিনা—সে পুরুষ, না স্ত্রীলোক, কত বয়স, কী রকম দেখতে।

কৌশিক বলে, এভাবে সন্ধান পাওয়ার আশা খুবই কম।

বাসু বলেন, কেন? তুমি তো একবেলার মধ্যেই ইয়াকুবের কাছে ময়নাক্রেতার সংবাদটা পেয়েছ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে উলের খদ্দেরকেও হয়তো আমরা খুঁজে পাব। মোট কথা, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

সুজাতা প্রশ্ন করে, আমি আর রানীমাসী সারাদিন কী করব?

—একটা শিকারা ভাড়া করে ডাল লেকে চক্কর দিতে পার। চশ্‌মশাহী, মোঘল-গার্ডেন, নিশাতবাগ দেখে আসতে পার।

রানী দেবী টিপটের লিকারটা পরীক্ষা করতে করতে বলেন, আর তুমি সারাদিন কী করবে?

—আমি আর কৌশিক প্রথমে যাব ইয়াকুবের দোকানে। ময়না-ক্রেতার খোঁজে। তারপর খুঁজতে বের হব সেই ময়না-ক্রেতাকে। হয়তো একবার পহেলগাঁও যাব। ঠিক বলতে পারছি না।

এই সময়ে ছোকরা চাকরটা প্রাতরাশের টেবিলে এনে দিল সেদিনের সংবাদপত্র। কৌশিক সেটা তুলে নিয়ে বলল, আজকের কাগজে মহাদেওপ্রসাদের একটা ছবি বেরিয়েছে দেখছি। কাগজে লিখেছিল ওঁর বয়স ছেচল্লিশ, কিন্তু ফটো দেখে আরও কম মনে হয়। চল্লিশের কাছাকাছি। নয়?

সুজাতা ছবিটা দেখে বলে, হাঁ, তাই মনে হয় বটে। হয়তো বয়সের তুলনায় তিনি অতটা বুড়িয়ে যাননি।

বাসু পকেট থেকে একটা চাবির রিঙ বার করেন। তাতে আটকানো পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে নিখুঁতভাবে ছবিটা কাটতে কাটতে বলেন, অথবা ছবিটা বছর পাঁচ-সাত আগে তোলা। যখন তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রী জীবিতা।

রানী বলেন, তুমি সাততাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা কাটছ কেন? কেউই তো পড়েনি এটা।

—ওর উল্টো দিকে একটা বিজ্ঞাপন। ওটা কেউ পড়বে না।

ছবিটা উনি বুকপকেটে ভরে নিলেন।

রানী বলেন, পনের দিনের মেয়াদ আমাদের। তোমার কি মনে হয়, এর মধ্যেই ব্যাপারটা মিটবে?

—মনে হয় না। কেসটা ঘোরালো। মার্ডারারের সম্বন্ধে কোনও ক্লুই তো এখনও পাইনি আমরা।

সুজাতা বলে, কেন? অনেক কিছুই তো জানা গেছে—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, 175 থেকে 180 সেন্টিমিটার লম্বা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা!

বাসু বলেন, তাহলে অবশ্য মার্ডারার সুচিহ্নিত—গঙ্গারাম যাদব! লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দৈর্ঘ্যও ঐ রকম, গোঁফ-দাড়ি কামানো, এবং যদিও তার চশ্‌মা রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের তবু কালোফ্রেমের চশমা পরাটা খুব কিছু কঠিন নয়। দুর্ভাগ্যবশত লোকটার মোক্ষম অ্যালেবাই আছে। ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টার ফ্লাইটে সে দিল্লি চলে যায়, এবং খুন হয়েছে ঐদিন বেলা এগারোটায় পহেলগাঁওয়ের কাছাকাছি। কিন্তু হত্যাকারীর ঐ সব স্ট্যাটিসটিক্স তুমি কোথায় পেলে সুজাতা?

—কেন? ও তো বলল, ইয়াকুবের দোকান থেকে যে লোকটা ময়না পাখিটা কিনেছে তার...

—কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে লোকটা ময়না কিনেছে, সেই খুন করেছে মহাদেও প্রসাদকে?

—সেটাই কি আপনাদের হাইপথেসিস্ নয়?

—'আমাদের' কিনা জানি না, অন্তত 'আমার' নয়।

কৌশিক কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, তাহলে আমাকে ওভাবে নাকে দড়ি দিয়ে কাল ঘোরালেন কেন?

—আমি একথা বলিনি, যে ঐ লোকটা হত্যাকারী নয়। আমি শুধু বলেছি—এমন কোনও সূত্র আমরা পাইনি যাতে ময়না-ক্রেতাকে হত্যাকারী বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। আর আগেই তো বলেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসল 'ক্লু'টা আমরা খুঁজে পাব ঐ 'মুন্না'র মাধ্যমেই—কে-কেন-কখন তাকে বদলিয়ে দিল। আর সবচেয়ে বড় কথা আসল 'মুন্না' কোথায় আছে?

ঘণ্টাখানেক পরে অ্যাম্বাসাডাব গাড়িটা এসে দাঁড়ালো কাশ্মীরের সেন্ট্রাল মার্কেটের সামনে। সূরযপ্রসাদ এ গাড়িটা ওঁকে সর্বক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছে।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ওঁরা দুজনে মার্কেটে ঢুকলেন। এটা একটা নতুন বাজার। পাশাপাশি টুরিস্ট-নিধন দোকান। কাশ্মীরী শাল, কাঠের কাজ, নানান রকম কিউরিওর দোকান প্রচুর। এত সকালে দোকানে ভিড় নেই। প্রথম চত্বরটা পার হয়ে কৌশিক বাজারের পিছনদিকে ওঁকে নিয়ে এল ইয়াকুব মিঞার দোকানে। ইয়াকুব ওঁদের আপ্যায়ন করে বসালো। আদাব জানালো। কৌশিক বললে, মিঞা-সাহেব এঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম, কলকাতার ব্যারিস্টার সাহেব।

ইয়াকুব পুনরায় আদাব জানিয়ে শুধু বলল, বহুৎ খুব!

বাসু প্রশ্ন করেন, এ দোকান কতদিন হল হয়েছে মিঞাসাহেব?

ইয়াকুব বললে, এ দোকান মাত্র পাঁচ বছরের, কারণ এ বাজারটারই বয়স তাই। তবে আমি এ কারবারে আছি অন্তত 'বিশ-তিশ্-সাল'।

বাসু-সাহেব দোকানটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিচির-মিচির শব্দে কান ঝালাপালা। নানান জাতের টিয়া, ময়না, কবুতর, ল্যভ-বার্ড, থ্রাশ, বজরিকা মায় দাঁড়ে বসা একটা ধনেশও। আছে খাঁচাবন্দী খরগোশ, গিনিপিগ্, সাদা ইঁদুর ইত্যাদিও।

বাসু-সাহেব বলেন, কাল আমার ভাইয়ের কাছে আপনি বলেছেন যে, কিছু দিন আগে একটি পাহাড়ী ময়না একজনকে বিক্রি করেছেন, তাই নয়?

ইয়াকুব বিশুদ্ধ উর্দুতে বললে, হুজুব, আমি সব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলব, কিন্তু তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন—।

—বলুন?

—আপনি কি আমাকে আদালতে সাক্ষী হতে বলবেন? তাহলে হুজুর আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। আদালতকে আমি ভীষণ ডরাই।

বাসু হেসে বলেন, ঠিক আছে ইয়াকুবমিঞা। আপনাকে আমি সাক্ষী হিসাবে সমন ধরাবো না। এবার বলুন!

—জী হাঁ। সাচ্চা বাৎ। আমি কিছুদিন আগে—না, তাই বা বলি কেন, ঐ বাবুজী চলে যাবার পরে আমি আমার হিসাবের খাতা ঘেঁটে দেখেছি, তাই আজ বলতে পারছি দোশরা সেপ্টেম্বর, জুম্মাবারে আমি মাঝারি সাইজের একটা পাহাড়ী-ময়না এক সাহেবকে বিক্রি করেছি।

—সাহেবের চেহারা আপনার মনে আছে?

—জী সাব। উমর হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। আপনারই মতন লম্বা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। ওঁর পরনে ছিল পাৎলুন আর ওভারকোট। ওঁর চোখে ছিল কালো-ফ্রেমের চশমা।

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, কালো ফ্রেম? ঠিক মনে আছে আপনার? রোল্ডগোল্ড নয়?

—জী না। অন্তত তখন তাঁর চোখে ছিল কালো ফ্রেমের চশমা।

—লোকটাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

—খুব সম্ভবত পারব। চেহারাটা আমার বেশ মনে আছে।

বাসু বলেন, ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, আপনার যতদূর মনে আছে বলে যান দিকি?

—সেদিন ছিল জুম্মাবার। দুপুরে আমি নমাজ করতে গিয়েছিলাম, সামনের ঐ মসজিদে। পাশের দোকানের ছবীরলালকে বলেছিলাম দোকানটা দেখতে। ছবীরলাল সজ্জন ব্যক্তি। ওর দোকান তো দেখতেই পাচ্ছেন হুজুর, কাশ্মীরী শালের। কোনও প্রয়োজন হলে ও যদি দোকান ছেড়ে যায়, আমি দেখ্ভাল করি; আবার আমি বাইরে গেলে ও আমার দোকানটা দেখে। সেদিন নমাজ সেরে ফিরে এসে দেখি ঐ বাবুটি দোকানের সামনে বসে আছেন। আমি তাঁকে আদাব জানিয়ে বললাম, ক্যা চাহিয়ে

বাবুজী? উনি বললেন, একটা পাহাড়ী ময়না। আমার দোকানে তখন চারটে ময়না ছিল। টেবিলের উপর তাদের সাজিয়ে দিলাম। উনি তার ভিতর একটিকে পসন্দ্‌ করে বললেন, 'ঐটা নেব। কত দাম দিতে হবে?' আমি ওঁকে বললাম, 'হুজুর এটার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বেশিদিন বাঁচবে না। তখন আপনি আমাকে দুষবেন। তার চেয়ে এই ছোটটাকে কিনুন, এটা অনেক 'বোল' শিখেছে। ঐ ধাড়ি ময়নাটা কিছুই বোল' শেখেনি।' উনি আমার কথার জবাবে বললেন, 'না আমি ঐ ধাড়িটাকেই নেব। কত দাম দেব?' আমি আবার বললাম, 'ঐটাব দাম দুশ টাকা; কিন্তু ঐ ছোট ময়নাটাকে আমি দেড়শ টাকায় দেব। আপনি এটাকেই নিন।' বলেই আমি পাখিটাকে দিয়ে শিষ্‌ দেওয়ালাম, 'বোল' শোনালাম, নানাভাবে ছোট ময়নাটাকে গছাবাব চেষ্টা কবলাম—কিন্তু উনি কিছুতে শুনলেন না। ঐ ধাড়ি ময়নাকে বিনা দরদামে দুশ' টাকা দিয়ে কিনে নিলেন।

বাসু বলেন, কিন্তু ধাড়ি ময়নাটাকে বেচতে আপনাব অত আপত্তিই বা ছিল কেন?

—তার কারণ ঐটা খুব পয়মন্ত ময়না। ওটাকে দোকানে নিয়ে আসার পর থেকেই আমার দোকানে লাভ বেড়ে যায়। আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল ঐ ময়নাটার উপব। ওর এতটা বয়স হয়েছে, এবং যেহেতু ও একটাও 'বোল' শেখেনি তাই ওর বাজারদর টাকা পঞ্চাশ হয় কি না হয়। উনি নগদ দুশ' টাকা দেওয়ায় আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি। উনি কেন যে দেড়শ টাকা দিয়ে বোল-পড়া কমবয়সী ময়নাকে নিলেন না তা আমি আজও বুঝতে পাবিনি। আর সেজন্যই ঐ ক্রেতাব কথা আমাব স্পষ্ট মনে আছে।

বাসু-সাহেব বলেন, স্পষ্ট মনে আছে? বেশ, দেখুন তো এই লোকটা কিনা?

বুক পকেট থেকে ভাঁজ-করা একখণ্ড কাগজ বার করে দেখান।

ইয়াকুব দর্শনমাত্র চিনে ফেলল, জী হাঁ হুজুর। এই তো সেই লোক!

তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে, লোকটা কি ফেরারী আসামী? কাগজে ওব ছবি ছাপা হয়েছে কেন?

বাসু বলেন, ইয়াকুব-মিঞা, আমি যে দোকানে এসে আপনাকে এই ছবি দেখিয়েছি, এতসব প্রশ্ন করেছি, তা স্রেফ ভুলে যান। তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারলে থানা-পুলিসেব হাঙ্গামায় পড়ে যাবেন।

ইয়াকুব ছা-পোষা মানুষ। দু-হাত কানে ঠেকিয়ে বললে, আমি কাউকে কিছু বলব না হুজুর।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কৌশিক বলল, আপনি কেমন করে আন্দাজ করলেন মহাদেও প্রসাদ ওটা নিজেই কিনেছেন?

—দেখলে না, সূরযের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী দোশরা শুক্রবার দুপুরে মহাদেও শ্রীনগরে ছিলেন। আব ক্রেতার যে বর্ণনা লোকটা দিল তার সঙ্গে মহাদেওর যথেষ্ট সাদৃশ্য।

কৌশিক আবার বলে—আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না। মহাদেও প্রসাদ নিজেই ঐ ময়নাটা কিনেছেন? তাহলে আসল 'মুন্না' কোথায় গেল? আর কেনই বা তিনি নিজে ময়নাটা বদলে দিলেন?

বাসু বললেন, দ্যাটস্‌ দ্য মিলিয়ান-ডলার কোশ্চেন!

চার

পহেলগাঁওয়ে গাড়িটা এসে পৌঁছালে কৌশিক প্রশ্ন করে, প্রথমে কোথায় যাবেন? থানায়?

—না, প্রথমে আমরা একটা স্ন্যাক-বারে ঢুকব, আমার শীত-শীত করছে, গরম এক পেয়ালা কফি পান সেরে কাজে নেমে পড়ব।

সূরযপ্রসাদের ড্রাইভার নির্দেশমত ট্যুরিস্ট-অফিসের পাশে কাফেটেরিয়ায় গাড়িটা পার্ক কবল।

বাসু-সাহেব সোয়েটারের উপর কোটটা চড়িয়ে নেমে এলেন। ওরা দু'জনে ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁটায়। বেশ ভিড় আছে। দূরের একটি টেবিল বেছে নিয়ে দুজনে বসলেন। বয় মেনু-কার্ড নিয়ে হাজির হল। বাসু বললেন, এক প্লেট চিকেন স্যাণ্ডুইচ আর একপট কফি দাও। দুধ-চিনি মিশিও না। আর দরজার সামনে একটা সিনেমন-রঙের অ্যাম্বাসাডার আছে, তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এস—কী খাবে। যা চাইবে তা দিও।

ছোকরা চলে যেতেই কৌশিক বলে, আপনি তখন বললেন, আমার কাজ হচ্ছে শ্রীনগরের যাবতীয় উলের দোকানে সন্ধান করা, তাহলে মত বদলিয়ে আবার আমাকে এখানে নিয়ে এলেন যে?

বাসু বললেন, ভেবে দেখলাম, শ্রীনগরের চেয়ে এখানকার কোন উলের দোকানেই সূত্রটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানে উলের দোকান দু-তিনটির বেশি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এখানে আজ তালিম নিয়ে নেবে। কাল সারাদিন শ্রীনগরে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করে 'অ্যারিয়াডনেজ থ্রেড' খুঁজবে।

—'অ্যারিয়াডনেজ থ্রেড' মানে?

—'লিজেন্ডস অব গ্রীস্ অ্যান্ড রোম' পড়নি? মিনটর-কে খুঁজে পেতে স্বয়ং থেসিয়াস অ্যারিয়াডনের সুতো ধরে গুটি গুটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছিলেন।

—এখানকার থানা অফিসে যাবেন নাকি?

—যেতে হতে পারে। যোগীন্দর সিং যদি একা থাকে তাহলে ইতিমধ্যে পুলিস কতটা এগিয়েছে জানতে পারব। আর সেখানে যদি শ্রীমান বর্মন বহাল তবিয়তে হাজির থাকেন, তাহলে কোন আশা নেই।

স্যান্ডুইচ-কফি পানান্তে দু'জনে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে-বসা ক্যাশিয়ারকে বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন—কিছু উল কিনতে চাই। এখানে কোথায় পাব বলতে পারেন?

—উল? নিটিং উল?

— হ্যাঁ, এই নমুনা আছে।—পকেট থেকে অ্যারিয়্যাডনের সুতোটা বার করে দেখান।

সেদিকে নজর না দিয়েই ছেলেটি বললে, ঠিক উল্টো ফুটপাথে একটা বড় দোকান আছে, 'পহালগাঁও ভ্যারাইটি স্টোরস্'। ওখানে খোঁজ করুন। না পেলে স্টেট ব্যাঙ্কের উল্টো দিকে 'নিউ উলেন স্টোরসে' পেতে পারেন।

ভ্যারাইটি স্টোরসের দোকানদার বলল, হ্যাঁ উল ওরা বেচে কিন্তু এই নমুনার উল ওদের স্টকে নেই। অর্ডার দিলে সাতদিনের মধ্যে আনিয়ে দিতে পারে।

বাসু-সাহেব বলেন, দিন-দশেক আগে কিন্তু আপনার দোকান থেকেই আমি চার আউন্স কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই নমুনার!

লোকটি আবার ওঁর হাত থেকে নমুনাটা নিয়ে যাচাই করল। বলল, মনে হচ্ছে আপনি গলতি করছেন। আপনি নিজে এসেছিলেন?

—না, আমার বোন এসেছিল।

—তাহলে আমাদের দোকান নয়। 'নিউ উলেন স্টোরস্' থেকে হয়তো তিনি কিনেছিলেন। ওখানে খোঁজ করুন। নেহাৎ না পেলে আমাদের অর্ডার দিতে পারেন; দিন-সাতেক পরে পাবেন।

বাসু বলেন, সাত দিন তো আমি এখানে থাকব না। শ্রীনগরে সব চেয়ে বড় দোকান কোনটা? আপনারা যেখান থেকে 'হোলসেল' মাল আনেন?

—আপনি খামোকা দৌড়াদৌড়ি করবেন না। শ্রীনগরের সেন্ট্রাল মার্কেটে 'নিউ কাশ্মীর এম্পোরিয়ামে' খোঁজ করবেন। সেখানে না পেলে বুঝবেন এ নমুনার মাল এ তল্লাটে মিলবে না। দিল্লি থেকে আনাতে হবে।

বহুৎ সুক্রিয়া জানিয়ে বাসু পথে নামলেন।

'নিউ উলেন স্টোরসে'র সেলস্‌ম্যান নমুনা দেখেই বলল, জী হাঁ, পাবেন। তবে কতটা চাই? আমার কাছে একটা পেটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। অবশ্য আপনি অর্ডার দিলে আমি আনিয়ে দিতে পারি। হপ্তাখানেক দেরি হবে।

বাসু বললেন, সাতদিন তো আমরা এখানে থাকব না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে দিন পনের আগে আপনার দোকানে এই নমুনার উলের অনেকগুলো পেটি দেখেছিলাম।

লোকটি বলল, হিসাবে আপনার গলতি হল দাদা, পনের দিন নয়, দিনসাতেক আগে ঐ নমুনার চার-ছয় পেটি ছিল। সে মাল বিক্রি হয়ে গেছে।

বাসু বললেন, আচ্ছা আপনার দোকানে আর একজন বসেন না? ফর্সা মতন দেখতে?

—জী হাঁ, যমুনাপ্রসাদ, কেন কী হয়েছে?

—আমি তো তাকে বলে গিয়েছিলাম, ঐ ছয় পেটিও আমি কিনব। তখন আমার কাছে টাকা ছিল না।

—অ্যাডভান্স দিয়ে গিয়েছিলেন? স্লিপ দেখান?

—না। অ্যাডভান্স দিইনি; কিন্তু...

—'কিন্তু' কিছু নেই দাদা। ওটা অর্ডারি মাল ছিল। যমুনাপ্রসাদ অমন কথা বলতেই পারে না।

—অর্ডারী মাল? কে অর্ডার দিয়েছিল বলুন তো?

ইতিমধ্যে আর একজন খদ্দের আসায় সেলসম্যান তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাসু নীরবে পাইপ টেনে চলেন। ভদ্রলোক দু-তিন রকম উলের নমুনা দেখে, দরদাম করে, কিছু না কিনেই চলে গেলেন।

সেলস্‌ম্যান ওঁর দিকে ফিরে বলল, ইয়েস স্যার, আর কোনও মাল দেখবেন? ঐ শেডের কাছাকাছি?

বাসু বলেন, দেখব। কিন্তু তার আগে বলুন তো অর্ডারটা কে দিয়েছিলেন?

লোকটা পিছন ফিরে মাল বার করছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ উর্দুতে যা বলল, বাঙলায় তার নির্গলিতার্থ: এ-সব খেজুরে আলাপ করে কি পেট ভরবে দাদা? সে মাল তো এতদিনে বোনা শেষ হয়ে গেছে।

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, না, আমার বোনের জন্যই কিনতে এসেছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি আমার বোনই মালটা কিনেছে কি না। তাহলে হয়তো আর উলের দরকারই হবে না।

লোকটা এর জবাবে যা বলল তা অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞাসা করল: ক্যা আপ্ বাংগালি হ্যয় সার?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আর আপনার ঐ বহিনজী সামনের স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করেন?

—বাসু উল্লসিত হয়ে বলেন, একজ্যাক্টলি! তাহলে সেই কিনেছে?

সেলস্‌ম্যান উলের পেটিগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে উর্দু ছেড়ে এতক্ষণে বাঙলা বলবার চেষ্টা করে: পহিলে তো বহিনকে পুছ্ করবেন, তবনা খরিদ্ করতে আসবেন?

বাসু একগাল হেসে বলেন, তা ঠিক। তা হোক ঐ এক পেটি যেটা আছে ওটা আমি নিয়ে যাব। কী জানি যদি কম পড়ে।

এক পেটি উলের দাম মিটিয়ে বহুৎ ধন্যবাদ দিয়ে বাসু পথে নামতেই কৌশিক বলে, ভদ্রমহিলার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বাসু গম্ভীর ভাবে বললেন, তাহলে ঠেঙানি খেতে হত। বোন উল্ল কিনেছে কিনা সেই খবরটা না জানাতেই লোকটা আমাকে পাঁচ কথা শোনালো, তারপর কোন্ আক্কেলে জিজ্ঞাসা করব—আমার বোনের নাম কী?

—না একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেত।

বাসু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, বেশ তো, আমি অপেক্ষা করছি। তুমি জেনে এস। মাসির

সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে তথ্যটা জানা আছে তা হচ্ছে তার 'ব্রা'-র মাপ বত্রিশ। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ না—আগে যিনি উল কিনেছেন তাঁর ব্র্যাসিয়ারের মাপ কি বত্রিশ ইঞ্চি?

কৌশিক হাত দুটি জোড় করে বলে, ঘাট হয়েছে মামু। মাপ চাইছি। অতঃ কিম্?

—স্টেট ব্যাঙ্কে গিয়ে বোনের তত্ত্ব তালাশ নেওয়া।

—কিন্তু আপনার বোন মানে আমার সেই অজ্ঞাত মাসিমার সম্বন্ধে মাত্র দুটি তথ্যই তো শুধু আমরা জানি—তিনি হপ্তাখানেক আগে চার পেটি উল কিনেছিলেন এবং তাঁর ব্র্যাসিয়ারের মাপ মাত্র বত্রিশ। খোঁজটা নেবেন কেমন করে?

বাসু বলেন, আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে রানুর সঙ্গে দিয়ে সুজাতাকে নিয়ে এলে কাজটা সহজ হত। এস, দেখ কিভাবে বোনেব নাড়ি-নক্ষত্র বার করি।

স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকে বাসু-সাহেব একটি কাউন্টারে এগিয়ে গেলেন। ওয়ালেট থেকে একখানা পাঁচশ' টাকার ট্রাভেলার্স চেক বার করে বললেন, ক্যাশ করব।

কাউন্টারে-বসা অল্পবয়সী ছেলেটি বলল, তারিখ বসিয়ে সই করে দিন।

তাবিখ বসিয়ে, সই কবে ট্রাভেলার্স চেকটা দিয়ে বাসু বলেন, পাঁচখানা একশ টাকার।

ছোকরা যতক্ষণ এন্ট্রি করতে ব্যস্ত ততক্ষণে বাসু-সাহেব মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। মহিলা কর্মী না-হোক জনা-পাঁচেক। সকলের বয়সই পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ। একজনকে বাদ দেওয়া যেতে পাবে—তিনি নিঃসন্দেহে অবাঙালিনী। আরও একজন ছাঁটাই হল—তাঁর ব্রা-র মাপ অন্তত আটত্রিশ, সম্ভবত চল্লিশ। বাকি রইল জনা তিনেক। এর মধ্যে কে হতে পারে?

কাচের খোপেব ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। তাতে পাঁচখানা করকরে একশ টাকার নোট।

বাসু ইংরাজীতে বলেন, মাপ করবেন, আপনাদের এখানে একজন বাঙালী মহিলা কর্মচারী আছেন। তাই না?

ভদ্রলোকের ভ্রূকুঞ্চন হল। বলেন, কেন বলুন তো?

—না, মানে দিন পাঁচেক আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গে এখানেই আলাপ হয়। নামটা ভুলে গেছি। আমিও বাঙালী কি না। তাই অনেক কথা হয়েছিল। আমি শ্রীনগর যাচ্ছি শুনে উনি একটি উলের নমুনা দিয়ে বলেছিলেন এক পেটি উল কিনে আনতে।

বাসু-সাহেব উলের পেটিটা তুলে দেখান।

ভদ্রলোক বলেন, আই সী। আপনি তাহলে রমা দাসগুপ্তার কথা বলছেন। হ্যাঁ মিস্ দাসগুপ্তার উল-বোনার বাতিক আছে বটে। কিন্তু তিনি তো ছুটিতে আছেন।

—ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা যদি কাইন্ডলি—

—কিন্তু বাড়িতে তো ওঁকে পাবেন না। উনি স্টেশান-লীভ করার অনুমতিসহ ছুটি নিয়েছেন দিন সাতেকের। আজ থেকেই। তবে আপনার অসুবিধা কিছু নেই। প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন। মিস্ দাসগুপ্তা ফিরে এলে দিয়ে দেব।

—না, সেজন্য নয়। মিস্ দাসগুপ্তা বলেছিলেন, ক'লকাতা ফেরার পথে ওঁর বাড়ি থেকে একটা প্যাকেট উঠিয়ে নিতে। ওঁর কোন ক'লকাতাবাসী আত্মীয়ের জন্য পাঠাতে চান। ওঁর বাড়ির লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই প্যাকেটটা রেখে গেছেন।

—না, তারও সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে উনি একাই থাকেন। মিস্ দাসগুপ্তা একজন 'কনফার্মড-স্পিন্সটার'। তবে হ্যাঁ, ওঁর প্রতিবেশিনী মিসেস্ কৃষ্ণমাচারীর কাছে রেখে যেতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন। এই রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলেই দেখতে পাবেন একটা মস্ত বাড়ি তৈরী হচ্ছে—একটা নতুন সিনেমা 'হল'। সেটাকে বাঁয়ে রেখে আরও একটু আগিয়ে গেলে পাবেন একটা মেথডিস্ট চার্চ। তাব পিছনেই পর পর তিনখানা বাড়ি। মাঝেরটা মিস্ দাসগুপ্তার। শেষ বাড়িটা মিস্টার কৃষ্ণমাচারীর।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বাসু-সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন ম্যানেজারের ঘরের সুইং ডোরটা

খুলে গেল এবং বের হয়ে এলেন সি. বি. আই. কুলতিলক সতীশ বর্মন। ওকে দেখেই থেমে পড়েন।

—গুডমর্নিং বাসু-সাহেব। আপনি এখানে?

হাতেই ধরা ছিল পাঁচকেতা একশ টাকার নোট। সেটা দেখিয়ে বললেন, ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে। আর আপনি?

—বহাল তবিয়তেই আছি। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

সতীশ বর্মন একটু দ্রুতগতিই স্থানত্যাগ করলেন। যে ছেলেটি ট্রাভলার্স চেক ভাঙিয়ে দিয়েছিল তাকেই প্রশ্ন করলেন বাসু, পুলিস কেন? চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি কিছু?

—ছেলেটি ভুরু কুঁচকে বললে, পুলিস? উনি কি পুলিসের লোক?

—হ্যাঁ, তাই তো জানি।

—আশ্চর্য। আমাকে উনি বললেন, লাইফ ইন্সিওরেন্সে-এর অফিসার।

—তাই নাকি? কী জিজ্ঞাসা করছিল আপনাকে?

—আমাদের দারোয়ান মন-বাহাদুরের ঠিকানা। বললে, মন-বাহাদুরের একটা ইন্সিওরেন্স পলিসির ব্যাপারে তার হোম অ্যাড্রেস চায়। ওকে তাই ম্যানেজার-সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

বাসু অতঃপর এগিয়ে গেলেন ম্যানেজারের ঘরের দিকে। সুইং ডোরের উপর দিয়ে দেখলেন, ম্যানেজার একাই বসে কাজ করছেন।

—আসতে পারি ভিতরে?

—ইয়েস, কাম ইন প্লীজ। টেক যোর সীট।

বাসু আসন গ্রহণ করেই নিজের ভিজিটিং কার্ডখানা বার করে দিয়ে ইংরাজীতে বললেন, আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

ম্যানেজার কী জানি কেন চটে উঠলেন। বললেন, প্রশ্নগুলো কি আমাদের দারোয়ান মন-বাহাদুর সংক্রান্ত?

—একজ্যাক্টলি!

ভদ্রলোক তিক্তবিরক্ত স্বরে বললেন, একই কথা আমি কতবার বলব মশাই? মন-বাহাদুরের হোম-অ্যাড্রেস দিয়েছি, তার রিভলভারটা তার নিজস্ব, সরকারী নয়। তার নম্বর কত তা আমি জানি না, আমার জানার কথাও নয়, সে রিভলভার নিয়ে দেশে গেছে না এখানে কারও কাছে রেখে গেছে তা আমি জানি না।আমাদের খাতায় সে ছুটিতে আছে। আর কী বলতে হবে? বলুন?

বাসু ধীরেসুস্থে বললেন, ধন্যবাদ। কিন্তু এ কথাগুলি কি আপনি আমাকে ইতিপূর্বে বলেছেন? এবং আমি একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করছি?

—আপনাকে বলিনি, কিন্তু এস. ডি. সাহেবকে বলেছি, কী নাম যেন ঐ পাঞ্জাবী ও. সি.-কে বলেছি, এইমাত্র যে ভদ্রলোক এজাহার নিয়ে গেলেন তাঁকে বলেছি।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনাকে কি বলা হয়েছে—এক্স-এম. পি. লেট মহাদেওপ্রসাদ খান্না যে রিভলভারের গুলিতে হত হয়েছেন সেটি আপনাদের দারোয়ান মন-বাহাদুরের?

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন: বলেন কী মশাই?

বাসু গম্ভীরভাবে বলেন, আমি গ্র্যাটিস্ লীগাল অ্যাডভাইস কাউকে দিই না; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দিচ্ছি, কারণ আপনি আমার প্রশ্নে বিরক্ত হয়েছেন। আপনার দারোয়ানের রিভলভার তার নিজস্ব সম্পদ হলেও সেই অস্ত্রটা দিয়েই সে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা রক্ষা করে। ফলে সেই রিভলভারের নম্বর না-জানা ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের একটা ত্রুটি। আপনার ডিপার্টমেন্ট কী বলবে জানি না, কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় যখন সে কথা স্বীকার করবেন...

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, সাক্ষী! আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব?

—যেহেতু আমি আপনাকে 'সমন' ধরাবো।

ভদ্রলোক আবার বসে পড়েন। বলেন, কিছু মনে করবেন না, একই কথা বারে বারে বলতে কার ভালো লাগে বলুন। তাছাড়া কেসটার সত্যিকারের গুরুত্বের বিষয়ে কেউই আমাকে কিছু জানাননি। আর য়ু শ্যিওর, স্যার? মন-বাহাদুর মহাদেও প্রসাদকে খুন করেছে?

—ডিড আই সে দ্যাট?

—না, মানে তার রিভলভারের গুলিতেই...

বাসু বলেন, মিস্টার সূরযপ্রসাদ খান্না আমার ক্লায়েন্ট। ঐ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করছি। এবার কি আপনি জানাবেন আমি যা জানতে চাই?

—কেন জানাব না? বলুন, কী জানতে চান? চা খাবেন?

—মন-বাহাদুর কবে থেকে ছুটিতে আছে?

—সাতই অগস্ট থেকে। যতদূর জানি সে দেশে আছে, মানে নেপালে। হোম অ্যাড্রেসটা চাই?

—হ্যাঁ চাই। আচ্ছা, মন-বাহাদুর তার রিভলভারটা নিয়ে দেশে গেছে অথবা এখানে রেখে গেছে তা জানতে পারেন না?

—কেমন করে জানব বলুন? মন-বাহাদুর এক্স-আর্মি ম্যান। একজন ব্রিগেডিয়ারের দেহরক্ষী ছিল। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাঁরই সুপারিশে ব্যাঙ্কে ওর চাকরি হয়েছিল। এবং এও জানি তাঁরই সুপারিশে ও একটি রিভলভারের লাইসেন্স পায়। অস্ত্রটা ওর নিজের। নম্বরটা আমার টুকে রাখা উচিত ছিল, নয়?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করেন, মন-বাহাদুর এখানে কোথায় থাকত? তার লোক্যাল অ্যাড্রেসটাও চাই।

—মন-বাহাদুর এখানে সপরিবারে থাকত না। আমাদের একজন এমপ্লয়ীর সঙ্গে থাকত।

—আই সী। তাঁর কী নাম?

—শ্রীরমা দাসগুপ্তা। তিনিও ছুটিতে আছেন।

—ও! তিনি কতদিন এখানে পোস্টেড আছেন?

—বছর তিনেক। কেন বলুন তো?

এ কথারও জবাব না দিয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন বাসু-সাহেব।

বাইরে আসতেই কৌশিক বলে, মন-বাহাদুরের রিভলভারটাই যে মার্ডার-ওয়েপন তা কেমন করে বুঝলেন?

—নিশ্চিতভাবে জানি না। সম্ভাবনা নিরানব্বই পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট। যেহেতু শর্মা, যোগীন্দর এবং বর্মন মন-বাহাদুরের খোঁজ নিচ্ছে এবং ম্যানেজার কথাপ্রসঙ্গে নিজেই স্বীকার করে বসল বর্মন ঐ রিভলভারের বিষয় প্রশ্ন করেছিল। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট—ঐ 'অ্যারিয়্যাডনেজ থ্রেড'।

—আবার 'অ্যারিয়্যাডনেজ থ্রেড'?

—নয়? লগকেবিনে যে রিভলভারটা পাওয়া গেল তার মালিক মন-বাহাদুর। এবং সে বাস করে স্টেট ব্যাঙ্কের এমন একজন কর্মচারীর বাড়িতে যেখানে বন্দী হয়ে আছেন অ্যারিয়্যাডনে!

পথে বেরিয়ে কৌশিক বলল, আচ্ছা, অমন বে-মক্কা মিথ্যা কথা বলতে আপনার বাধে না?

—মিথ্যা কথা আবার কখন বললাম?

—বললেন না? এক এক জায়গায় এক এক ঝুড়ি বলেছেন। নিউ উল হাউসে বলেছেন, যমুনাপ্রসাদকে—

—জাস্ট এ মিনিট! 'যমুনাপ্রসাদ' নামটা আমি বলিনি। বলেছি 'ফর্সামতন আর একজন লোক'।তা কাশ্মীরের কোন দোকানে তোমার মত কালো বিক্রেতা বসে থাকে? আর ব্যাপারটা কী জানো—এন্ড জাস্টিফাইজ দ্য মীনস্। উদ্দেশ্য সৎ হলে,—হলপ যখন নেওয়া নেই তখন অমন দু-চারটে মিথ্যে কথায় দোষ ধরতে নেই। 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন'—বুঝলে না? আমরা তো উলের কাঁটায় জড়ানো অ্যারিয়্যাডনের সুতোয় বাঁধা পুতুল। তিনি যেমন নাচাচ্ছেন তেমনি নাচছি।

গাড়িটা যখন মেথডিস্ট চার্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল তখন উলের প্যাকেট হাতে এগিয়ে চললেন বাসু-সাহেব। পিছন পিছন কৌশিক। প্রথম বাড়িটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। ছোট একতলা বাড়ি। সামনের দরজায় তালা ঝুলছে। দেওয়ালের পাশে একটা ছোট্ট নেমপ্লেট: রমা দাশগুপ্তা।

দরজায় যখন তালা মারা তখন খবরটা ঠিকই। ভদ্রমহিলা পাহেলগাঁওয়ে নেই, অন্তত বাড়িতে বা তাঁর কর্মস্থলে নেই। বাসু-সাহেব অগত্যা শেষ বাড়িটায় হানা দিলেন। এটাও ছোট একতলা বাড়ি। করোগেটেড টিনের ছাদ। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ; তা হোক চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে।এখানেও অনুরূপ নেম প্লেট: এ.জে.কৃষ্ণমাচারী।

বাসু-সাহেব কলিং বেল বাজালেন। দরজা খুলে গেল। একজন মাদ্রাজী ভদ্রমহিলা দরজা অল্প একটু ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে ইংরাজীতে বললেন, কাকে চাই?

বাসু-সাহেব বললেন, রমা দাসগুপ্তাকে।

দরজায় ল্যাচ-কী লাগানো আছে। ফাঁক দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, পাশের বাড়ি; কিন্তু সে তো নেই।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, তালা-মারা দেখলাম। সে পাহেলগাঁওয়েই আছে তো?

—না নেই। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। মাপ করবেন, এক গ্লাস জল পাব?

—ও শ্যিওর। আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট বসার ঘর; কিন্তু শৌখীন ভাবে সাজানো। আড়ম্বর নেই, রুচির পরিচয় আছে। ভদ্রমহিলা কাচের গ্লাসে দু-গ্লাস জল নিয়ে এলেন ট্রে-তে করে। সামনের টি-পয়ে নামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি কি রমার কোনও আত্মীয়?

—না, আত্মীয় ঠিক নয়, তবে আমিও বাঙালী। একটা বিশেষ প্রয়োজনে মিস্ দাসগুপ্তাকে খুঁজছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার একটু ভুল হল। রমা এখন মিস্ নয়, মিসেস্।

—তাই নাকি? ওর বিয়ে হয়ে গেছে? কতদিন?

—সপ্তাহখানেক। খবরটা এখনও জানাজানি হয়নি। বেশি বয়সের বিয়ে তো। তাই ওর নেমপ্লেটটাও এখনও বদলানো হয়নি; ওর নাম এখন মিসেস রমা কাপুর।

কৌশিকের মনে পড়ল স্টেট-ব্যাঙ্কের সকলেই ওকে মিস্ দাসগুপ্তা বলে উল্লেখ করেছিল। নিতান্ত পাশের বাড়ি বলেই এ ভদ্রমহিলা খবরটুকু জেনেছেন।

বাসু প্রশ্ন করেন, ওর স্বামীর নাম কী?

—জে. পি. কাপুর।

—তিনিই বা কোথায়?

—তিনি এখন এখানে থাকেন না। কোথায় থাকেন, তাও জানি না। আপনি কি মিসেস্ কাপুরের জন্য কোনও চিঠি রেখে যাবেন?

—চিঠি নয়, একটা উলের প্যাকেট।

সেটা হাতে নিয়ে মিসেস কৃষ্ণমাচারী বলেন, হ্যাঁ, এই রঙেরই একটা সোয়েটার ও বুনছিল বটে; আপনাকে আনতে বলেছিল বুঝি?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু বলেন, মিসেস্ কাপুর কখন বেরিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে?

—এই তো আধঘণ্টা আগে। সকালবেলা অফিস গেল। তারপরই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। আমাকে বললে, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। আড়াইটার বাসটা হয় তো এখনও গেলে পাব। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

—আড়াইটার বাসটা এখান থেকে কোথায় যায়?

—শ্রীনগর।

ঠিক তখনই ভিতব বাড়ি থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আইয়ে বৈঠিয়ে চায়ে পিজিযে।'

মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী হেসে বললেন, চা খাবেন নাকি?

বাসু-সাহেব সে কথাব জবাব না দিয়ে বললেন, ভিতর থেকে কে ও কথা বলল?

—ও কিছু নয়। একটা পাহাড়ী ময়না। রমাব। যাবাব সময় পাখিটা আমার বাড়িতে রেখে গেছে। চা খাবেন?

—গরজ বড বালাই। বাসু বললেন, চা তেষ্টা পেয়েছে বটে তবে শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করা।

—কিছুমাত্র না। আমি চাযের জল বসাতেই যাচ্ছিলাম। এক কাপের বদলে কেৎলিতে তিনকাপ জল নেওয়া বই তো নয়।

ভদ্রমহিলা প্রস্থানোদ্যতা হতেই বাসু বলেন, পাখিটাকে একটু নিয়ে আসবেন? দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। এমন সুন্দব 'বোল' পডল যে, আমি ভাবলাম মানুষ কথা বলছে।

মিসেস কৃষ্ণমাচাবী ভিতব থেকে কালো-কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা নিয়ে এসে টেবিলের উপর বাখলেন। ভিতর থেকে পাখীটা বলল, 'হ্যালো।'

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলল, 'রাম-রাম।'

খাঁচার ভিতব থেকে প্রতিধ্বনি হল: রাম রাম!

ভদ্রমহিলা চায়ের জল বসাতে চলে গেলেন। বাসু-সাহেব ঝুঁকে পড়ে অস্ফুটে বললেন: রাম নাম সৎ হ্যায়!

পাখিটা শুধু বলল: বাম নাম!

—রাম নাম সৎ হ্যায়!

—রাম নাম সৎ হ্যায়!

কৌশিক বললে, সবই যখন হল তখন ফিঙ্গাব-প্রিন্ট ভেরিফিকেশনটাও হয়ে যাক। সন্তর্পণে সে কালো কাপড়টা সরিয়ে দিল। দুজোড়া চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল যেখানে ময়নাটার ডান পায়ের অনুপস্থিত মধ্যমাটা থাকার কথা।

বাসু অস্ফুটে বললেন, মুন্না! তোর চূড়ান্ত সনাক্তকবণটা হয়ে গেল!

ময়নাটা ঘাড কাৎ করে অপরিচিত মানুষ দুটোকে দেখে নিল। তারপর সে যে দীর্ঘ বোলটা পড়ল তাতে দুজনেই বজ্রাহত হয়ে গেলেন। পাখিটা স্পষ্টভাবে বলল:

—বমা! মৎ মারো...পিস্তল নামাও!...দ্রুম!...হায় রাম!

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িযে ওঠে! বাসু দু-হাতে ওর খাঁচাটাকে চেপে ধরে বললেন, কী? কী বললি? ফের বল!

যেন বুঝতে পারল ওঁর কথা। একই 'বোল' আবার পড়ল ময়নাটা।

—রমা! মৎ মারো...পিস্তল নামাও!...দ্রুম!...হায় রাম!

মাঝের ঐ 'দ্রুম' অবিকল পিস্তলের শব্দ।

একটু পবেই মিসেস কৃষ্ণমাচারী চায়ের সরঞ্জাম নিযে হাজির হলেন। বাসু বললেন, এ পাখিটা রমা দেবী কতদিন পুষছেন?

—এটা ওকে ওর স্বামী উপহাব দিয়েছে। দিনসাতেক আগে। এটাকে ভিতরে রেখে আসি। না হলে টেবিল নোঙরা করবে।

ভদ্রমহিলা প্রস্থান করতেই কৌশিক বলে, মামু! কিছু বুঝতে পারছেন?

বাসু বলেন, চুপ!

একটু পরেই ভদ্রমহিলা ফিরে এসে চা বানাতে বসলেন।

বাসু বললেন, আমারটা দুধ-চিনি বাদে।

তিনজনে তিন কাপ চা টেনে নেবার পব বাসু বলেন, মিসেস কৃষ্ণমাচাবী, আমাব পবিচযটা আপনাকে দেওয়া হয়নি।

পকেট থেকে একটি নামাঙ্কিত কার্ড বার কবে টেবিলে রাখলেন।

মিসেস কৃষ্ণমাচারী সেটা দেখলেন। পি. কে. বাসু বাব-অ্যাট-ল'ব কোন কীর্তি-কাহিনী সম্বন্ধে দক্ষিণ ভাবতীয় ঐ মহিলা যে অবহিত নন তা বেশ বোঝা গেল। উনি শুধু বললেন, সো গ্ল্যাড টু মীট য়ু মিস্টার বাসু।

—আব এ আমার সহকারী কৌশিক মিত্র।

ভদ্রমহিলা এদিকে ফিবে নড করলেন।

বাসু বলেন, মিস্টার কাপুরকে আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি বইকি। কেন?

—ওদের বিয়েটা কোথায় হল? কী মতে?

—বেজিস্ট্রি বিয়ে, শ্রীনগরে। আমাব স্বামী উইটনেস্ ছিলেন। কিন্তু কেন বলুন তো?

বাসু বলেন, বাই এনি চান্স এই ফটোটা কি মিস্টাব কাপুবেব? পকেট থেকে ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ তিনি বাড়িয়ে ধবেন।

ভদ্রমহিলা দেখেই চমকে ওঠেন, ইযেস! অফকোর্স! এই তো যশোদা কাপুর! ওব ছবি আপনি কোথায় পেলেন?

—এখনই তা আপনাকে জানাতে পারছি না। তবে এটুকু আপনাকে বলি, মিস্টাব কাপুব বিবাহিত। বমাকে যদি তিনি বিবাহ করে থাকেন, তাহলে 'বাইগামি'র চার্জে তিনি অভিযুক্ত হবেন!

ভদ্রমহিলা শুধু বললেন, মাই গড!

—আপনার প্রতিবেশিনীকে এখনই কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। সে যে বিবাহ করেছে এটা তাব অফিসও জানে না দেখলাম। আমি চেষ্টা করব যাতে ব্যাপাবটা নিজেদের মধ্যেই 'অ্যামিকেবলি সেটল' করা যায়। আশা করি আপনাব সাহচর্য পাব?

—সার্টেন্‌লি। রমার মতো মেয়ে হয না। খবরটা শুনলে সে একেবারে মুষড়ে পড়বে।

—আচ্ছা আপনি বলতে পারেন মিস্ দাসগুপ্তা কেন এমন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বিবাহ কবল?

—রমাও কিছু কচি খুকি নয। তার বযস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। আব কেন পছন্দ করল? ওটা বলা কঠিন; যাব যাতে মজে মন। তবে কাপুরও আকর্ষণীয পুরুষ। সুন্দর স্বাস্থ্য, দিলদরাজ মানুষ। যদিও বেকার!

কৌশিক আর বাসু উঠে দাঁড়ালেন। চা-পান শেষ হয়েছিল তাঁদেব। বাসু শেষ প্রশ্ন পেশ করেন, আপনার কাছে আজকেব 'কাশ্মীর টাইমস'টা আছে?

—না নেই। আমরা 'হিন্দুস্থান টাইমস' রাখি। তবে আপনার বিশেষ প্রয়োজন থাকলে আমি—

—না, না তার দরকার হবে না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

গাড়িতে ফিরে এসেই বাসু ড্রাইভাবকে বলেন, বাস-স্ট্যান্ডে চল।

অনতিবিলম্বেই বাস-স্ট্যান্ডে এসে খবর পেলেন শ্রীনগরগামী যে বাসটা বেলা আড়াইটায় ছেড়েছে সেটা শ্রীনগরে পৌঁছাবে বিকাল সওয়া ছয়টায়। সেটা এক্সপ্রেস বাস নয়। বাসু হাতঘড়িতে দেখলেন তখন তিনটে চল্লিশ। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সওয়া ছ'টার আগে শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাতে পারবে?

—জরুর!

—তাহলে সোজা চল শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ড। সওয়া ছ'টাব আগে পৌঁছানো চাই।

—বে-ফিকর রহিয়ে সাব।

পাঁচ

ওঁদের অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা যখন শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে এসে ঢুকছে তখনও 'পহেলগাঁও শ্রীনগর' সার্ভিসের বাসটা থেকে লোক নামতে শুরু করেনি। বোধ হয় আধমিনিট আগে সেটা ঐ গোলাকৃতি বাস স্ট্যান্ডে প্রবেশ করেছে। কন্ডাক্টার পা-দানি থেকে ঝুলে পড়ে পিছনটা দেখছে ও ক্রমাগত টিং-টিং বাজিয়ে চলেছে: ঠিক হ্যয, ঠিক হ্যয়, ঔর যাইয়ে।

দুটি যাত্রীহীন বাসের মাঝখানেব ফাঁকে ব্যাক-গিয়ারে বাসটা নৈশ-বিশ্রামের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। যাত্রীরা অনেকেই নিজ নিজ সীটে দাঁড়িযে পড়েছেন, কুলিরা ছেঁকাবান করে ঘিরে ধরেছে; একজন উপরে উঠে দড়ি দিয়ে ত্রিপল ঢাকাটা ছাদ থেকে সরিযে দিচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দোকানে, পথে আলো জ্বলে উঠছে।

কৌশিক ও বাসু-সাহেব দ্রুতগতি বাসটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধানসূত্রের পুঁজি তো কুল্লে তিনটি: বাঙালী মহিলা, বয়স পঁয়ত্রিশ ও মাঝারি গডন। বাসু-সাহেব মহিলা যাত্রীদের উপর একবাব দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। কৌশিকও। জনা দশেক মহিলা যাত্রী আছেন। জনা চারেক বৃদ্ধা, ছটি অল্পবযসী; একজন নিঃসন্দেহে পাঞ্জাবিনী ও দুজন পিছনে কাছা-সাঁটা গুজরাটিনী। বাকি দুজন সন্দেহজনক। একজন আছেন পিছনের সীটে অপবজন একেবারে সামনের দিকে। দুজনেরই বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, আধুনিক সাজ-পোশাক, মাঝারি গড়ন। শাড়ি পরার ধরন উত্তর এবং পূর্ব ভারতীয়—যাকে বলে হাবলস করে পবা। পিছনের সীটে যিনি বসেছেন তাঁর বব্-ছাঁটা চুল, নীলচে রঙের সিন্থেটিক শাড়ি, ম্যাচ করা ব্লাউস, ম্যাজেন্টা রঙের টিপ। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ড্রাইভারের ঠিক পিছনেই যিনি বসেছেন তাঁব চুল খোঁপা বাঁধা, পবনে একটা মাস্টার্ড রঙের সিল্কের শাড়ি—কাঁধে একটা এয়াববাগ, এক হাতে দু-গাছি চুড়ি, আর হাতে সরু রিস্টওয়াচ।

কৌশিক বাসু-সাহেবের কানে কানে বলল—আপনি একজনকে ট্রাই করুন, আমি দ্বিতীয়াকে।

বাসু বলেন, আমাব ইন্টুইশান বলছে সামনেব দিকের মুর্শিদাবাদিনীই আমাদের টার্গেট; তুমি বব্-হেয়ারিনীকেই ফলো কর।

গাড়িটা পার্ক কবার পর প্রথমেই নেমে এলেন বব্-চুলো মহিলাটি এবং ঠিক তার পিছনেই একজন মধ্যবয়সী পুরুষ। পুরুষটির কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু। তিনি বাচ্চাটিকে কোলান্তরিত করে বললেন, বহ্ বারান্দা পে চলি যাও, ময় সামান লাতা হুঁ।

ব্যাস্! হারাধনের দশটি মেয়েব রইল বাকি এক।

বাসু-সাহেব বাসের পিছনদিকে সরে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে অপেক্ষা করেন শর্ট-ফাইন লেগের যুক্তকর ফিল্ডারের মত।

অধিকাংশ যাত্রী নেমে যাবার পর মেয়েটি নামল, ঝোলা-ব্যাগ সমেত। গাড়ির ছাদের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করল না—অর্থাৎ ওর কোনও ভারী লাগেজ নেই। ইতিউতি চাইতে থাকে ট্যাক্সির খোঁজে। শর্ট-ফাইন-লেগের ফিল্ডার এক-পা এগিয়ে এসে হঠাৎ ওর পিছন থেকে ডেকে ওঠেন: রমা!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত মেয়েটি চকিতে পিছনে ফেরে। বাসু-সাহেবকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, ডিড য়ু মেক্ এ সাউন্ড?

বাসু উত্তরে বঙ্গভাষায় জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমিই। তুমিই তো রমা দাসগুপ্তা?

মেয়েটি সামলে নিয়েছে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে বলে, নো!

—বাঃ বাঙলা বল্‌তে না পারলেও ভাষাটা ভোলনি দেখছি এ তিন বছরে, কাশ্মীরে এসে! বুঝতে পার ঠিকই! নয়?

মেয়েটি জবাব দেয় না। কী যেন ভাবছে সে।

বাসু বলেন, ঠিক আছে! তুমি রমা দাসগুপ্তা নও। মিসেস রমা কাপুর। এবার তো স্বীকার করবে?

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে মেয়েটি ইংরাজীতেই জবাব দেয়, আপনি কে? এবং কেনই বা আমাকে বিরক্ত করছেন?

বাসু পুনরায় বঙ্গভাষেই বলেন, সাদা বাঙলায় কথা বল রমা, তাহলে অন্য কেউ বুঝবে না। আমার নাম পি কে. বাসু। আমি ব্যারিস্টার। সূরযপ্রসাদ খান্নার তরফে সলিসিটার। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মেয়েটি আবার বাসু-সাহেবকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিল। এবার বঙ্গভাষে বলল, আপনি যে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু তার প্রমাণ দিতে পারেন?

বাসু পকেট থেকে একটি নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ড ওর হাতে দিয়ে বললেন, এটা অবশ্য চূড়ান্ত আইডেন্টিফিকেশন নয়। তোমার সন্দেহ পুরোপুরি না ঘুচলে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও দেখতে পার। বাই দ্য ওয়ে. তুমি কি আমার নাম জানতে?

—জানতাম। আপনার উপর লেখা অনেকগুলো কাহিনী আমি পড়েছি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে কী বিষয়ে আলোচনা করতে চান?

—স্বর্গত মহাদেও প্রসাদ খান্নার বিষয়ে।

মেয়েটি স্পষ্টতই নিজেকে গুটিয়ে নিল। বললে, সে বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য আছে বলে তো আমি মনে করি না!

—বোকার মত কথা বল না। তুমি জান না, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে আর সেটা সম্পূর্ণ তোমার নাগালের বাইরে।

—আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

—আমি বলতে চাইছি হয়তো পুলিস ইতিমধ্যেই জেনে গেছে নিহত মহাদেও প্রসাদ খান্না যশোদা কাপুরের ছদ্মনামে তোমাকে বিবাহ করেছেন। এটুকু সূত্র আবিষ্কার করলেই তারা তোমার বাড়িতে হানা দেবে আর 'মুন্না'-কে আবিষ্কার করবে: মিসেস্ কৃষ্ণামাচারী তাদের জানিয়ে দেবেন, 'যে 'মুন্না' হচ্ছে কাপুর তথা খান্নারই একটি প্রণয়োপহার। সেই মুহূর্তেই পুলিস এবং সাংবাদিকের দল গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় তোমাকে আতিপাঁতি করে খুঁজবে। এই বাসস্ট্যান্ডে এবং এয়ারোড্রামে, বানিহাল পাস-এর নামায় তোমার জন্য তারা প্রতীক্ষা করবে। তারপর যে মুহূর্তে ওরা শুনবে মুন্নার ঐ মারাত্মক 'বোল'টা—ঐ: রমা...

মেয়েটি মাঝপথে ওঁকে থামিয়ে দিযে বলে, চুপ করুন!

—একজ্যাক্টলি! এখানে এসব আলোচনা করা মারাত্মক। কে জানে ইতিমধ্যেই বাস স্ট্যান্ডে পুলিসের চর এসেছে কি না।

মেয়েটি পুনরায় বলে, আপনি এত সব কথা কী করে জানলেন?

—ঠিক যেভাবে আমার চেয়ে ঘণ্টা দশ-বারো পিছনে পুলিস ও সাংবাদিকেরা জানবে। বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমি ওদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে আছি বলেই তুমি এখনও অ্যারেস্টেড হওনি। তুমি যদি গোঁয়ার্তুমি করে আরও কিছু সময় এখানে নষ্ট কর তাহলে সেই সময়ের ব্যবধানটা আরও কিছুটা কমে আসবে। এই আর কি।

দু-এক সেকেন্ড মেয়েটি নতনেত্রে কী যেন চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে বলে, ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজী। কী জানতে চান আপনি?

—সব কথা। আদ্যন্ত।

—কোথায় শুনবেন? কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকবেন?

—না। কোনও পাব্‌লিক্ প্লেসে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে না। আমার গাড়িতে।

কৌশিক কোনও কথা বলেনি এ পর্যন্ত। এখন বলল, আসুন।

ওঁরা তিনজনে ফিরে এলেন ওঁদের গাড়িতে। বাসু আর মেয়েটি বসল পিছনের সীটে। কৌশিক ড্রাইভারের পাশে। বাসু-সাহেব তাঁর নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কী যেন লিখলেন। তারপর ড্রাইভারকে সেই হাতচিঠি আর একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, গাড়ি এখানেই থাক, গাড়ির চাবিটা রেখে যাও। এই চিঠিটা হাউসবোটে গিয়ে সুজাতাকে দেবে এবং তাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। যাও।

ড্রাইভার রওনা হতেই বাসু বলেন, এ হচ্ছে কৌশিক মিত্র, এর সামনে...

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল, জানি। সুকৌশলীর কৌশিকবাবু।

বাসু বলেন, নাউ স্টার্ট টকিং!

মেয়েটি বলল, প্রথমেই বলে নিই, আমি অন্যায় কিছুই করিনি, অপরাধ তো দূরের কথা। আমি এমন কিছু করিনি যাতে আমাকে লজ্জিত হতে হয়।

—বুঝলাম। বলে যাও।

গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। বাইরে আলো। গাড়ির কাচগুলো ওঠানো। মেয়েটিকে ভালো দেখা যাচ্ছে না সেই আধা-অন্ধকারে। শুধু উজ্জ্বল সার্সির পশ্চাদপটে একটি নারীমূর্তির সিল্যুয়েট। রমার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা আছে; কিন্তু বাচনভঙ্গিতে কোনও নাটকীয়তা নেই। কিছুটা নিরাসক্ত হবার প্রচেষ্টা আছে। তবু যেহেতু অনেকগুলি অনুভূতি—বেদনা, ভয়, উত্তেজনা ওকে আচ্ছন্ন করে আছে তাই তার অনাসক্তিটা বার বার ব্যাহত হয়ে যাচ্ছিল। ও বলতে থাকে:

—আমি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একজন কর্মী। বর্তমানে পহলগাঁওয়ে পোস্টেড। সংসারে আমার আর কেউ নেই—বাবা-মা-ভাই-বোন। আমার বর্তমান বয়স পঁয়ত্রিশ। নানা কারণে আমি বিবাহ করিনি। নাঃ যখন বলতে বসেছি তখন সব কথাই খুলে বলি। তাহলে আমার ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন। প্রায় দশবারো বছর আগেকার কথা। আমি তখন কলকাতায় এম. এ. পড়ি। বাবা-মা দুজনেই বেঁচে। ঐ সময় এক সহপাঠীর প্রেমে পড়ি। ছেলেটি বড়লোকের ঘরের; আমার বাবা ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানী। আমরা দুজনেই পাশ করে বেরিয়ে আসার পর ছেলেটি উচ্চশিক্ষার্থে স্টেটসে যায়। আমরা দুজনেই প্রতিশ্রুত হই পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষা করব। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ডাক-বিভাগে আমরা দুজনেই বহু অর্থব্যয় করি। তারপর যখন সে দেশে ফিরে আসে তখন জানতে পারি সে বিবাহিত এবং তার একটি তিন বছরের শিশু আছে। এরপরও আমার জীবনে পুরুষ যে না এসেছে তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই আমি অনিমেষের,...আই মীন সেই ছেলেটির ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম। এটা আমার অবিবাহিত থাকার কারণ।

—আমার স্বামীর সঙ্গে, আই মীন, মহাদেওপ্রসাদ খান্নার সঙ্গে আমার আলাপ হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। সেদিন ছিল রবিবার। আমি সারাদিনের মতো কিছু খাবার আর ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম। এরকম প্রয়ই আমি পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যেতাম।

বাসু বলে ওঠেন, একা?

—হ্যাঁ, একাও কখনও কখনও গিয়েছি, কখনও বা দু' একজন সহকর্মীর সঙ্গে। বেশির ভাগই সঙ্গে থাকত মন-বাহাদুর। যে রোববারের কথা বলছি, সেদিনও মন-বাহাদুর ছিল আমার সঙ্গে।

—মন-বাহাদুর কে?—জানতে চান বাসু-সাহেব।

—আমাদের ব্যাঙ্কের দারোয়ান। রিটায়ার্ড মিলিটারী ম্যান। ও আমার বাড়িতেই থাকত বাইরের ঘরে। আমার বাজার-হাট করে দিত; আমি দু-বেলা ওকে রেঁধে খাওয়াতাম। তাতে বাহাদুরের ঘরভাড়াটা বাঁচত, আমারও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। সে যাই হোক, সেদিন শহর থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছি আমরা, হঠাৎ নজর হল একজন ভদ্রলোক নিতান্ত নির্জনে বসে জলরঙে একখানা নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকছেন। ভদ্রলোকের পোশাক-পরিচ্ছদে কোনও আড়ম্বর বা বিলাসিতার লেশ ছিল না। একবার চোখ তুলে আমাদের দেখেই আবার ছবির দিকে নজর দিলেন। আমার দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল দেখতে,

ছবিটা কেমন হচ্ছে। কিন্তু আর্টিস্ট নিশ্চয়ই আমার মতো কৌতূহলী মানুষদের এড়িয়ে যাবার জন্য পহেলগাঁও থেকে এতদূরে এসেছেন ছবি আঁকতে। হঠাৎ ভদ্রলোক নিজে থেকেই হিন্দিতে বললেন, 'তোমার ফ্লাস্কে জল আছে?' একটু অবাক হলাম; নিতান্ত অপরিচিতাকে—আর বয়সও আমার কিছু কম নয়—উনি 'আপনি' না বলে 'তুমহারি' বললেন কেন? যা হোক, আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না, কফি আছে। কেন?'

বললেন, আমার জলটা নোংরা হয়ে গেছে। তাই।

উনি উঠবার উপক্রম করতেই মন-বাহাদুর বলল, ম্যায় লা দেতা হুঁ।

ওঁর মগটা উঠিয়ে নিয়ে সে খাড়া পাড় ভেঙে লীডার থেকে জল আনতে গেল। অগত্যা আমার কৌতূহল মিটল। ছবিখানা দেখলাম। দারুণ সুন্দর হয়েছে। প্রশংসা করলাম ছবিখানার। দু-চারটে কথা হল। শুনলাম, ওঁর নাম যশোদাপ্রসাদ কাপুর। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি। পাহাড় পর্বতেই ঘুরে বেড়ান। আমিও আমার নাম বললাম, স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করি সে কথাও বললাম। আমি ওঁকে কফি অফার করলাম। উনি এককথায় রাজি হলেন। দুজনে কফি খেলাম। তারপর আমি ফিরে এলাম।

প্রথম দিন এই পর্যন্তই। পরদিন সোমবার বিকালে—কিসের অমোঘ আকর্ষণে আমি আবার সেই নির্জন স্থানটায় ফিরে এলাম। এবার একাই। কিন্তু ওঁর দেখা পেলাম না। উনি পহেলগাঁওয়ের কোথায় উঠেছেন জিজ্ঞাসা করিনি। ফলে যোগসূত্র হারিয়ে গেল।

দিন-তিনেক পরে একদিন অফিসে যেতেই আমার একজন সহকর্মী বললে, 'এক ভদ্রলোক তোমার জন্য এই ছবিখানা রেখে গেছেন।' অবাক হয়ে দেখি সেই ছবিখানাই। বাঁধানো হয়নি। রোল করে কাগজে মুড়ে দিয়ে গেছেন।

এরপর দীর্ঘ এক বছর আমি তাঁকে চোখে দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথা ভুলতেও পারিনি। দুটি কারণে। প্রথমত তাঁর সেই ছবিখানা বাঁধিয়ে আমার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। আর দ্বিতীয়ত আমি ক্রমাগত তাঁর চিঠি পেতাম। আশ্চর্য, উনি নিজের ঠিকানা জানাতেন না; ফলে উত্তর লেখার কোনও সুযোগই আমি পাইনি। তারপর হঠাৎ এ বছরে অগস্টের পয়লা অথবা দোশরা তারিখে আবার তাঁকে দেখলাম। উনি নিজে থেকেই দেখা দিলেন। অফিস ছুটির পর বেরিয়ে আসছি, দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন। অসঙ্কোচে বললেন, ভালো আছ তোমরা?

জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিতে ঠিকানা দিতেন না কেন? জবাবে বললেন, বে-ঠিক মানুষের আবার ঠিকানা কী? সমস্ত কাজই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিতভাবে করতে হয়, জবাব পাবার প্রত্যাশা নিয়ে তো চিঠি লিখতাম না।

আমি আবার বললাম, 'প্রশংসা করেছি বলেই ছবিখানা আমাকে দিয়ে দিলেন?' সে-কথার উত্তরে বললেন, 'আমি ভবঘুরে মানুষ, ছবি রাখব কোথায়? আঁকি আর বিলিয়ে দিই।' 'আমি জানতে চাইলাম, এবার পহেলগাঁওয়ে উনি কোথায় উঠেছেন। উনি বললেন, সেদিনই এসেছেন, কোথাও ওঠেননি; মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় খুঁজে নেবেন কোথাও। প্রশ্ন করলাম, 'আপনার মালপত্র কোথায় রেখেছেন?' বললেন, 'মালপত্র বল্‌তে তো একজোড়া কম্বল আর ঝোলা। বাস স্ট্যান্ডের কাছে এক দোকানদারের কাছে জমা রেখেছি।'

আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম সে-রাত্রে আমার অতিথি হতে। এককথায় রাজী হয়ে গেলেন। বলেন, এক শর্তে। আমি ঘরভাড়া দিতে পারব না। তার বদলে তোমার একখানা পোর্ট্রেট এঁকে দেব।

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি থামে। তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, প্রথম দিন-সাতেক কোন অসুবিধা হয়নি, কারণ বাহাদুর ছিল। সাত তারিখে বাহাদুর যখন দেশে গেল তখনই বিপদে পড়লাম। কোন মুখে বলি, এখন আমাদের দুজনের এভাবে থাকাটা ভাল দেখায় না। অথচ উনি যেন সে সমস্যা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন।

আবার মেয়েটি থেমে গেল। ম্লান হেসে বলল, বিস্তারিত বলতে আমারও সঙ্কোচ হচ্ছে, শুনতে

আপনাদেরও। মোট কথা গত সাতাশে অগস্ট, শনিবার আমরা শ্রীনগরে এসে রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে করি।

বাসু বলেন, তাব মানে তুমি বলতে চাও যে, গোটা অগস্ট মাসটা তিনি তোমার বাড়িতে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—অসম্ভব! কাবণ সাতাশে অগস্ট যেদিন তোমাদের বিবাহ হয় সেদিন ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। সেদিন মহাদেওপ্রসাদ ছিলেন অমরনাথ তীর্থে।

—না। অমরনাথ দর্শনে যাবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাননি।

—তোমার কোনদিন সন্দেহ হয়নি যে, যশোদা কাপুব একজন ধনীব্যক্তি, ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে বাস করছে?

—না, সেরকম সন্দেহ হয়নি। যদিও মাঝে মাঝে অবাক লাগত, যখন দেখতাম ওঁব কলমটা লাইফ-টাইম শেফার্স, ওঁব তুলিগুলো উইন্ডসর নিউটনের সেবল-হেয়াব ব্রাশ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কথা। বলেছিলেন, ওঁর এক আত্মীয় খুব বড়লোক। এগুলো তারই উপহাব।

—তুমি আন্দাজ কবতে পাব কেন তিনি নিজেব পরিচয় গোপন কবেছিলেন?

—বোধ হয় পাবি। অর্থাৎ এখন পাবি। উনি বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীব সঙ্গ বর্জিত। আব খবরের কাগজকে উনি এড়িয়ে চলতেন।

—কিন্তু এভাবে নিজেব পবিচয় গোপন কবে তোমাকে বিবাহ করাটা তো অপবাধ? আইনত এবং তোমার প্রতি?

—আইনত কি না জানি না; আমার কাছে তিনি কোনও অপরাধ কবেননি।

—তুমি মন থেকে তাঁকে ক্ষমা কবতে পাবছ?

—কিসের ক্ষমা? আমরা দুজনে দুজনকে ভালবেসেছিলাম। এটা কি অপরাধ? উনি আমার পোর্ট্রেট এঁকেছেন, আমি ওঁকে গান শুনিয়েছি—এটা কি অপবাধ?

বাসু বুঝে উঠতে পারেন না—একজন আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতা মহিলা কেন বুঝতে পারছে না মহাদেও প্রসাদ অপরাধী—আইনেব চোখে, সমাজের চোখে, এবং যে উত্তীর্ণযৌবনা মেয়েটির জীবন তিনি পঙ্কিল করে দিয়ে গেছেন তাব প্রতি।

—নিরাসক্তভাবে প্রশ্ন করেন, তুমি কখন জানতে পারলে যে, যশোদা কাপুর হচ্ছে মহাদেও খান্না?

—আজ অফিসে খবরেব কাগজে ওঁর ছবি দেখে। তখনই বুঝতে পারলাম, কেন ওঁর কলমটা অত দামী, কেন উনি নিজেব পূর্বপরিচয় আমাকে দিতেন না—বাল্য-কৈশোরের কোন গল্প করতেন না। আমি এখনও বিশ্বাস কবত পাবছি না যে, তিনি...তিনি...

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। বাসু সন্তর্পণে ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। বললেন, ভেঙে পড়লে তো চলবে না বমা। মনকে শক্ত কর। আমাকে যে আরও অনেক কিছু জানতে হবে।

মেয়েটি চোখ মুছে আবাব সোজা হয়ে বলল. বলুন?

—এবার বলো তোমার বাড়িব ঐ পাহাড়ী ময়নাটার কথা। তার নাম কী, তাকে কবে পেয়েছ, কার কাছ থেকে পেয়েছ?

—আপনি তো জানেনই ওর নাম 'মুন্না', আমার স্বামী ওটা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেটা শুক্রবার, মানে দোশবা সেপ্টেম্বর।

—তুমি কি খবরের কাগজে দেখেছ যে...

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, হ্যাঁ দেখেছি! আব একটা পাহাডী ময়নার কথা তো? এটা কেমন করে হল আমি জানি না।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছ, আজ সকালে খবরেব কাগজ দেখেই তুমি প্রথম জানতে পারলে যে, তোমার স্বামীর নাম মহাদেওপ্রসাদ খান্না? কালকের কাগজ থেকে তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?

এবাব জবাব দিতে ওর দেরি হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, না হয়েছিল। একটা প্রিমনিশান! প্রথম

কারণ ঐ পাহাড়ী ময়নাটা, আর দ্বিতীয় কারণ লগ-কেবিনের ফটোটা।

—লগ্-কেবিন! তুমি সেটা দেখেছ?

—হ্যাঁ, শুধু দেখেছি নয়, বাস করেছি। ওখানেই আমাদের...মানে, বিয়ের পর ওখানেই আমরা দু-রাত্রি বাস করি। সাতাশে শ্রীনগরে আমাদের বিয়ে হল। পরদিন আমরা ফিরে আসি। ঊনত্রিশ আর ত্রিশ তারিখে আমরা ঐ লগ্-কেবিনে ছিলাম।

—লগ-কেবিনের ভাড়াটা মেটালো কে? তুমি না তিনি?

—না, উনি বললেন ওঁর এক আত্মীয় কেবিনের ভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন। আমাদের ভাড়া লাগবে না। এখন মনে হচ্ছে, আমি কেমন করে সরল বিশ্বাসে এসব মেনে নিয়েছিলাম!

—ঊনত্রিশ ও ত্রিশ অগস্ট তোমরা দুজনে ওখানে ছিলে। তারপর?

—তারপর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমি পহেলগাঁও ফিরে এসে কাজে জয়েন করলাম। উনি বললেন, উনি দিন-দশ বারোর জন্য শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছেন। সেখানে ওঁর একটা ঘর আছে—বিয়ের সময় যে ঘরখানায় আমরা উঠেছিলাম—সেখানেই উনি উঠবেন প্রথমে। তারপর অন্য কোথাও যাবেন।

—এ ঘরখানাতেও উনি থাকতেন না, অথচ ভাড়া গুনতেন?

—তাই তো বলেছিলেন।

—তবু তোমার সন্দেহ হল না যে, লোকটা ভবঘুরে বেকার নয়?

—হয়তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার হয়নি, বিশ্বাস করুন।

—তোমরা যে দুদিন ঐ লগ-কেবিনে ছিলে তার মধ্যে তোমার স্বামী কি কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, বার দুই বলেছিলেন।

—তুমি নিশ্চয়ই কান করে শোননি?

—না শুনিনি।

—বমা, তুমি আমারই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছ না, কাঠগড়ায় উঠলে তোমার কী দশা হবে! তোমার স্বামী বেকার, ভবঘুরে—অথচ সে লগ্-কেবিনের ভাড়া মেটায়, শ্রীনগরের ফাঁকা ঘরের ভাড়া মেটায়। তুমি বলেছ, সে তার অতীতের কথা কিছু বলেনি তবু তুমি তাকে বিয়ে করলে এবং তবু সে যখন টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে তখন তোমার নিতান্ত মেয়েলি কৌতূহলও হল না?

—এর কী জবাব বলুন? আমি শুনিনি, টেলিফোনে কার সঙ্গে কী কথা তিনি বলেছেন।

—লগ্-কেবিনে গিয়ে তোমার কি মনে হয়েছিল তোমার স্বামীর কাছে জায়গাটা নতুন লাগছে?

—না। বরং উল্টো। উনি বলেও ছিলেন—ওখানে উনি এর আগেও এসেছেন।

—আর ওঁর সেই বড়লোক আত্মীয় সেবারও ওঁর হয়ে ভাড়া মিটিয়েছিল নিশ্চয়?

—সেটা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

—যে বিভলভারটাতে উনি খুন হয়েছেন সেটার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চযই কিছু জান না, নয়?

—না, জানি। ওটা মন-বাহাদুরের রিভলভার। সে দেশে যাবার সময় আমার কাছে ওটা গচ্ছিত রেখে যায়। সেটা আমিই ওঁকে দিয়েছিলাম।

—কেন?

—উনি আমার কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

—কেন?

—মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল. ও-কথা থাক। ওর জবাব আমি দেব না।

—বাসুও কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ বলেন, মহাদেওপ্রসাদ খান্নার মৃত্যুতে তোমার আর্থিক লাভ কী হল?

অন্ধকারে মেয়েটির মুখ দেখা গেল না। কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের চিহ্ন। বললে, মানে?

—উনি কি কোনও উইল করেছেন? অথবা তোমাকে নমিনি করে কোনও ইন্সিওরেন্স?

—কী বলছেন আপনি? বিয়ের পর তো সাতটা দিনও তাঁর সঙ্গে বাস করিনি। আর তাছাড়া আমার জ্ঞানমতে তো তিনি নিঃস্ব। উইল বা ইনসিওরেন্সের প্রশ্নই তো ওঠে না

এই সময়েই ওদের গাড়ির কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে সুজাতা এগিয়ে এল এই গাড়িটার কাছে। বাসু বললেন, কৌশিক, তুমি সুজাতাকে নিয়ে ঐ চায়ের দোকানে একটু বস। আমার সওয়াল হয়ে গেছে। একটু পরেই তোমাদের ডাকব।

কৌশিক বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল।

বাসু বলেন, এখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। খোলাখুলি একটা কথা বল রমা! এমন তো হয়নি যে, তুমি হঠাৎ জানতে পেরে গেলে যে, তোমার স্বামী বিবাহিত, নাম ভাঁড়িয়ে তোমাকে বিয়ে করেছে, তারপর তর্কাতর্কি রাগারাগির মধ্যে হঠাৎ...

—আমি ওঁকে গুলি করে মেরে ফেললাম?

—হতেও তো পারে?

—আপনি বদ্ধ উন্মাদ! আমি নিজ হাতে...কী বলছেন আপনি!

বাসু বলেন, আর একটা কথা। মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী তোমার হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত?

—না বোধ হয়। কেন?

—আমি চাইছি তোমাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিতে। যাতে উনি 'মুন্না'কে আর খান্নাজীর চিঠির বাণ্ডিল যে বাক্সে আছে সেইটা আমাকে দিয়ে দেন।

রমা বলল, চিঠিগুলো কোনও বাক্সে নেই। আছে আমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। তার চাবিটা আপনি নিয়ে গেলে আমার হাতচিঠিতে ওঁর অবিশ্বাস হবে না। কিন্তু কথা দিন, চিঠিগুলো আপনি পড়বেন না?

—পড়ব না মানে? আলবৎ পড়ব। পুলিস সেগুলো 'সীজ' করার আগে আদ্যন্ত পড়ে নোট নেব।

রমা বলল, তাহলে চাবি আমি দেব না।

—কী আশ্চর্য! কেন? দেবে না কেন?

—না! সে আমার নিজস্ব জিনিস। আপনাদের পড়তে দেব কেন?

—দিতে তুমি বাধ্য হবে রমা। বুঝতে পারছ না—তুমি খুনের আসামী হতে চলেছ! ও চিঠি পুলিসে দেখবেই!

—না। দেখবে না। আমি শুধু 'মুন্না'কে নিয়ে আসার কথা লিখে দিচ্ছি।

—বেশ তাই দাও। কিন্তু চিঠিগুলো তোমার 'সীজ' হবেই।

রমা কলম বার করে মিসেস্ কৃষ্ণমাচারীকে একটা হাতচিঠি লিখে দিল। বাসু-সাহেবকে পাখিটা দিয়ে দেবার জন্য।

বাসু বললেন, তুমি শ্রীনগরে এসেছিলে কেন? আমার দেখা না পেলে কোথায় যেতে?

—একবার সেই ঘরটা দেখতে যেতাম। উনি যেখানে থাকবেন বলেছিলেন।

—শুধু সেই জন্যেই ছুটে এসেছ এমন করে? সে ঘর তো এখন তালাবন্ধ!

—না। শুধু সেজন্য নয়। তারপর আমি সূরযপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করতাম আর সব কথা খুলে বলতাম।

—তুমি কি জান যে, মহাদেওপ্রসাদের স্ত্রী এখন ও বাড়িতে আছেন? এবং মহিলা অত্যন্ত দুর্মুখ?

রমা চুপ করে কী ভাবতে থাকে।

—কী হল? যাবে সেই মহিলার সামনে?

—আপনি কী পরামর্শ দেন?

—আমাব পবামর্শ তুমি শুনবে?

—শুনব।

বাসু সাহেব সুজাতাকে ডেকে আনালেন। বললেন এ হচ্ছে বমা দাশগুপ্তা। আমি চাই সংবাদপত্রেব অতি উৎসাহী সংবাদদাতাদেব হাত থেকে একে বাঁচাও। আশা কবি তুমি বুঝতে পাবছ আমি কী বলতে চাই। যে জন্য লিখেছিলাম, একটা ওভাবনাইট ব্যাগ নিয়ে এস।

সুজাতা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

বমা বেঁকে বসল। বলল, না, আমি কোথাও যাব না।

—তাব মানে সুবমা খান্নাব সামনেই তুমি দাঁড়াতে চাও?

—না। নিশ্চয নয়।

বাসু বললেন, বমা, তুমি কেন বুঝতে পাবছ না মন বাহাদুব বিভলভাবটা কাব কাছে গচ্ছিত বেখে গিযেছিল জানাব সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তোমাকে খুঁজবে তুমি ঐ লগ কেবিনে গিযেছিলে জানতে পাবাব পব তোমাকে সবাসবি অভিযুক্ত কববে।

—মার্ডাব চার্জে?

—হ্যাঁ।

—আপনি আমাকে আত্মগোপন কবতে বলছেন?

—আদৌ নয। মাত্র চব্বিশ কি ছত্রিশ ঘণ্টাব জন্য তুমি সহজলভ্য থাকবে না। ব্যস।

বমা একটু ভেবে নিযে বলল, বেশ, কোথায যেতে হবে বলুন?

সুজাতা কথোপকথনেব সূত্রটা তুলে নিযে বলল, আসুন। আমাব সঙ্গে। বাসু-সাহেবেব দিকে ফিবে বলল, হোটেলে উঠে কি আপনাকে ফোন কবব?

বাসু একটু ধমকেব সুবে বললেন, তুমিও যে কৌশিকেব মতো নিবেট হযে উঠছ সুজাতা। আমি যখন কোনও বহস্য সমাধান কবতে বসি তখন কতকগুলো তথ্যেব বিষযে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেইলস খুঁজতে থাকি, আব অপব একজাতেব তথ্য সম্বন্ধে আমাব স্ট্যান্ড হচ্ছে হোয্যাব ইগনবেন্স ইজ ব্লিস ইটস ফলি টুবি ওযাইজ। কিছু বুঝলে?

সুজাতা হেসে বললে জলেব মত।

ছয়

সুজাতা বমাকে নিযে বওনা হযে পড়াব পব কৌশিক বলে এব পব? আজকেব মত কি খেল খতম?

বাসু ব্যঙ্গেব স্ববে বলেন, আজ্ঞে না। সার্কাসেব শেষ খেলা হচ্ছে বাঘিনীব। ড্রাইভাবকে নির্দেশ দিলেন—সুবযপ্রসাদেব প্রাসাদে গাড়ি নিযে যেতে।

প্রকাণ্ড হাতাওযালা বাড়ি। গেটে বন্দুকধাবী গুর্খা প্রহবী। গাড়ি গিযে পোর্চে থামতেই বেবিযে এলেন এক ভদ্রলোক। বাসু দেখলেন, গঙ্গাবামজী। এগিযে এসে বললেন, আসুন স্যাব, সুবয আপনাকে প্রতি পনেব মিনিট পব পব হাউসবোটে ফোন কবে চলেছে।

—নতুন কোন ঝামেলা বেধেছে নাকি?

—বিশেষ কিছু নয, গৃহকর্ত্রী এসে পৌঁচেছেন। ঐ শুনুন না—

ইতিমধ্যে ওবা সোপান অতিক্রম কবে প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে প্রবেশ কবেছেন। ড্রইংরুমেব পিছনেই দ্বিতলে ওঠাব সিঁড়ি। উপব থেকে ভেসে আসছে একটি মহিলাকণ্ঠ—বীতিমতো রূঢ় ও কর্কশ।

গঙ্গাবামজী বলেন, ওঁবা দুজন আব সুবয একা। পাববে কেন?

—কেন? আপনি তো সূরযকে মদৎ দিতে পারতেন?

—কী করে দেব স্যার? আমি তো এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না—কে আমার মনিব। সদ্যোবিধবা, না সূরয?

—তাহলে আমি ববং সূরযেব পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

কৌশিক বলে, আমিও আসব?

—না। তুমি হাউসবোটে ফিবে যাও। বানু একা পড়ে গেছে।

—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বাসু বলেন, ভদ্রমহিলার তরফে কোনও উকিল নিয়োজিত হয়েছেন কি?

—আজ্ঞে না। উনি বলছেন, ওঁব উকিল দরকার হবে না। অনেক উকিলের উনি নাক কাটতে পারেন!

বাসু-সাহেব রুমাল দিয়ে নিজের নাকটা মুছলেন।

দুজনে ঢুকতেই সূবযপ্রসাদ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, গুড ইভনিং স্যার। আপনাকেই খুঁজছিলাম। আসুন।

মায়ের দিকে ফিরে বললে, মিসেস্ খান্না, ইনিই হচ্ছেন আমার সলিসিটার, মিস্টার পি. কে. বাসু। আব ও হচ্ছে জগদীশ মাথুর।

বাসু-সাহেবেব লক্ষ্য হল—সূরয মহিলাকে মাতৃসম্বোধন করেনি। বাসু মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম মিসেস্ খান্না।

ভদ্রমহিলা শাণিত দৃষ্টিতে একবার বাসু-সাহেবকে দেখে নিয়ে অস্ফুটে একটি মাত্র শব্দে কী যেন স্বগতোক্তি করলেন। বঙ্গভাষে বোধ কবি সেটা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: আদিখ্যেতা!

জগদীশ কিন্তু সোৎসাহে এগিয়ে এল। বাসু-সাহেবেব সঙ্গে কবমর্দন করে বললে, আপনার সব কেসগুলো হিন্দি বা ইংরাজীতে অনুবাদ করাচ্ছেন না কেন? আমি মাত্র দুটি কাহিনী...

হঠাৎ মাঝখানে ওর মা ধমক দিয়ে ওঠেন: জগু! বস চুপ করে। এখন আমাদের খোশগল্প করার সময় নয়।

বাসু মহিলার দিকে ফিরে বললেন, তাহলে কিভাবে আমরা সময়টা কাটাবো?

—জরুরী ব্যাপারটার আশু ফয়সালা করে। সূরয আপনাকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছে খোশগল্প করার জন্য নয়। আমাকে আমার স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে। ক্ষমতা থাকে আপনি চেষ্টা করে দেখুন। বলুন, আপনার কী বলার আছে?

বাসু বলেন, সব চেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি একজন এটর্নি নিযুক্ত করেন, যিনি আপনার স্বার্থ দেখবেন। আইনঘটিত ব্যাপার তো—

মহিলা খনখনে গলায় বলেন, আমাকে আইন দেখাতে আসবেন না মশাই। দরকার হলে দশ-বিশটা উকিল আমি আমাব ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরে ফেলতে পারি। বুয়েছেন? বলুন, কী বলতে চান?

বাসু বলেন, বিষয়টা কী আগে শুনি। নিচে থেকেই আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে আলোচনাটাই শুরু হক না আবার?

—বেশ। শুনুন মশাই। সূরযকে বলেছি। আপনাকেও বলি। আমার বিয়ে হওয়া ইস্তক সূরয আমাকে বিষ-নজরে দেখে। নানাভাবে আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে এসেছে। সেসব কথা যদি আমি খোলাখুলি ওর বাপকে বলতাম তাহলে এতদিনে সে ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে ছাড়ত। আমি বলিনি। কী দরকার ওসব নোংরামির মধ্যে যাবার? কিন্তু সূরযের অত্যাচারে এ সংসারে টিকতেও পারিনি। গত এক বছর ধরেই তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেরিয়েছি। আমি জানতাম ও সুবিধা পেলে আমাকে বিষ খাওয়াতো—তাই শ্রীনগরে এলেও আমি বরাবর হোটেলে উঠেছি। এ-বাড়ির ছায়া মাড়াইনি। কিন্তু সে খেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন সব কিছু বর্তেছে আমাতে। সব কিছু আমাকে বুঝে নিতে হবে। দেখতে

হবে, কোম্পানির কত লাখ টাকা ও ইতিমধ্যে হাতিয়েছে। ওকে বলেছি, খাতা-পত্র সব নিয়ে আসতে। ও শুধু ঢিলিমিশি করছে।

বাসু বলেন, ব্যবসায়ের খাতাপত্র দেখতে চাওয়ার আগে আপনিই যে মালকিন এটা প্রমাণ হওয়া চাই তো? সেটার কতদূর কী হয়েছে?

—বেশ। সে-কথাই বলি। আমি যদ্দূর জানি—মহাদেও আমাকে বলেও ছিল—সে একটা উইল করেছে। সব কিছু স্থাবর-অস্থাবর স্বত্ব আমাকেই দিয়ে গেছে। সূরয বোধ হয় একটা কী-যেন মাসোহারা পাবে।

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, উইলটা আছে আপনার কাছে?

—আপনি কি আমাকে সেইরকম মেয়েছেলে ভেবেছেন? জ্যান্তস্বামীর উইল ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবো? উইলটা এখানেই, এ বাড়িতেই ছিল এবং আছে, যদি না সূরয সেটা ইতিমধ্যে পুড়িয়ে ফেলে থাকে। ও যেমন ছেলে—ও সব পারে।

বাসু ধীরকণ্ঠে বলেন, ব্যক্তিগত চরিত্রাপহরণ না করেও কি আমরা আলোচনাটা করতে পারি না মিসেস্ খান্না?

এক কথায় ফয়সালা করে দিলেন উনি: না!

গঙ্গারামজী কী একটা কথা বলতে গেলেন—ঠিক সেই সময়ই জ্বলন্ত এক জোড়া চোখ তুলে মহিলা তাঁর দিকে তাকালেন। গঙ্গারামের সব কিছু গুলিয়ে গেল। ঢোক গিলে তিনি স্ট্যাচু মেরে যান।

বাসু বলেন, মিসেস্ খান্না, আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যে এক বছর ধরে তীর্থে-তীর্থে ঘুরছিলেন আর মহাদেওপ্রসাদও যে ঐ এক বছর হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তার কারণটা কি এই নয় যে, আপনাদের 'সেপারেশন' চলছিল?

—নিশ্চয়ই নয়! এসব ঐ সূরযের রটনা।

—আপনারা কি দুজনে এটাই স্থির করেননি যে, ঐ 'সেপারেশন' পিরিয়ড শেষ হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ'টা কার্যকরী করা হবে?

—এক কথা কতবার আপনাকে বলব মশাই? তেমন কোনও কথাই ওঠেনি! সূরয যাই ভাবুক না কেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম মনকষাকষি কোনদিন হয়নি।

সূরয এই সময় বলে ওঠে, মিস্টার বাসু, আমি এখানে একটি তথ্য পেশ করতে চাই। আমি ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গত দোশরা সেপ্টেম্বর পিতাজী এবং চাচাজী ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন এবং পিতাজী কিছু ফিক্সড-ডিপজিট জমা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন চেয়েছিলেন। চাচাজী আমার কাছে স্বীকার করেছেন, এই ব্রাঞ্চ থেকে লোন না পেয়ে পিতাজী তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। চাচাজী দশ তারিখে দিল্লী ব্রাঞ্চে সেই ফিক্সড-ডিপজিট দাখিল করে দুখানি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট করিয়ে আনেন।

মহিলা বলেন, তাতে কী হল?

সে কথায় কান না দিয়ে সূরয বলে, চাচাজী আমার কাছে আরও স্বীকার করেছেন, পিতাজী ঐ টাকাটা একটা মানি সেটল্‌মেন্ট কেসে খরচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে সেই পার্টি তিনি আমাকে বলছেন না।

মহিলা পুনরায় প্রতিবাদ করেন, এসব 'খেজুরে গল্প' কেন শোনানো হচ্ছে?

সূরয তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, বারে বারে আমাকে বাধা দেবেন না। আমার বক্তব্য শেষ হলে, আপনি কথা বলবেন।

মহিলা সোফায় এলিয়ে পড়ে বলেন, বেশ বল। শুধু 'খেজুরে' নয়, 'আষাঢ়ে' গল্প।

সূরয সূত্রটা তুলে নিয়ে বলে, আমার বিশ্বাস, আপনি যে প্রসঙ্গ তুলেছেন—ঐ সেপারেশনের কথা, তার সঙ্গে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার যোগাযোগ আছে। চাচাজী এ বিষয়ে কী জানেন,তা জানা দরকার।

বাসু-সাহেব বলেন, ঠিক কথা। মহাদেওপ্রসাদ জীবিত থাকলে একমাত্র তাঁর কাছেই আপনার

কৈফিয়ৎ দেবার কথা হত। তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের কাছে সব কথা আপনাকে খুলে বলতে হবে। বিশেষ এ একটা মার্ডার কেস।

গঙ্গারাম মিসেস্ খান্নার দিকে তাকাচ্ছেন না। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওঁদের সেপারেশনই চলছিল। মিসেস্ খান্না ডিভোর্সে রাজী হয়েছিলেন,নগদ—

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মহিলা চাপা গর্জন করে ওঠেন, গঙ্গারাম! আমি তোমাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু—

হঠাৎ গঙ্গারামজী সাহস ফিরে পান। সুরমার চোখে চোখ রেখে বলেন, আমাকে বৃথাই ভয় দেখাচ্ছেন, মিসেস খান্না। কী করবেন আপনি? সম্পত্তির অধিকার পেলে আমাকে বরখাস্ত করবেন, এই তো? তা আপনিই যদি এ কারবারের মালিক হয়ে বসেন, তাহলে আমি নিজে থেকেই পদত্যাগ করব! আর আমার ভয়টা কিসের?

মিসেস্ খান্না কালনাগিনীর মত হিস্‌হিসিয়ে ওঠেন, তুমি আমাকে চেন না!

চোখ দুটো জ্বলে উঠল গঙ্গারামের। বললে, চিনি, খুব চিনি। কিন্তু আমি তো আধা-সন্ন্যাসী মহাদেওপ্রসাদ খান্না নই, আমাকে গুলি করে মারা অত সহজ নয়!

যেন জ্যাক-ইন-দ্য-বক্স পুতুল। তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন মিসেস খান্না। চীৎকার করে ওঠেন, কী! কী বললে? আমি মানহানির মকদ্দমা করব।

বাসু তাঁকে থামিয়ে দেন: বসুন, বসুন। মানহানির মকদ্দমা যখন হবে তখন ওসব কথা উঠবে। আপাতত আমরা সম্পত্তির মালিক কে সেটারই ফয়সালা করছি। বলুন, গঙ্গারামজী। আপনি কী যেন বলছিলেন?

মিসেস্ খান্না গোঁজ হয়ে বসে থাকেন। গঙ্গারামজী বলে চলেন, মিসেস্ খান্না ডিভোর্সে রাজী হয়েছিলেন, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তে। আমার মালিক সে শর্ত মেনে নেন। স্থির হয়েছিল, মিসেস খান্না দিল্লি আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আর্জি পেশ করবেন এবং খান্নাজী তা কনটেস্ট করবেন না। ঠিক এক বছর আগে মিসেস্ খান্না আর্জি পেশ করেন। আদালত এক কথায় সে আর্জি মেনে নেন না, ওঁদের এক বছর সেপারেশনে থাকবার নির্দেশ দেন। এ বছর পাঁচই সেপ্টেম্বর মিসেস্ খান্না দলিলটা পাবেন এমন কথা ছিল। আদালত থেকে তিনি নির্দেশ পান সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর আদালত থেকে দলিলটা ডেলিভারি নিয়ে যেতে। মিসেস্ খান্না আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন। ছয়ই সকালের ফ্লাইটে তিনি শ্রীনগরে আসবেন এবং নগদে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা হস্তান্তরিত করবেন। সে-কথা আমি যখন আমার মালিককে জানালাম তখন উনি লিখলেন, সোমবার পাঁচই উনি এসে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আমাকে দিয়ে যাবেন। পরদিন আমি ঐ টাকা মিসেস্ খান্নাকে দেব এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা নিয়ে সিন্দুকে রাখব। যেকোন কারণেই হোক মালিক শুক্রবার দোশরা সকাল সাড়ে নটা নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির সিন্দুক থেকে এক বাণ্ডিল ফিক্সড-ডিপজিট সার্টিফিকেট নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে যান। সেখানে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল যে, এ টাকা পেতে হলে হয় তাঁকে অথবা আমাকে দিল্লি যেতে হবে। উনি সার্টিফিকেটগুলি আমাকে দিয়ে বলেন সেগুলি বাড়িতে রাখতে। আরও বলেন, তিনি অন্য কোনও সূত্র থেকে টাকাটা যোগাড় করা যায় কিনা দেখবেন। নেহাৎ না পারলে উনি টেলিফোন করে আমাকে জানাবেন, যাতে আমি ঐগুলি জামানৎ দিয়ে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট করিয়ে আনতে পারি। এর পর উনি আড়াইটার বাসে পয়েলগাঁওয়ের দিকে চলে যান।

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, বাসে? পাবলিক্ বাসে? গাড়িতে নয়?

—আজ্ঞে না। পাবলিক্ বাসে। যদিও তাঁর দুখানা অ্যাম্বাসাডার, একটা স্টেশন-ওয়াগন, একটা ল্যান্ডরোভার আর একত্রিশখানা ট্রাক আছে। যা হোক, যে-কথা বলছিলাম, পাঁচই রাত আটটা নাগাদ

তিনি ঐ ট্রাউট-প্যাবাডাইস্ থেকে আমাকে ফোন করে বললেন দিল্লি থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা করিয়ে আনতে।

বাসু বললেন, উনি কি ঐ লগ-কেবিন থেকেই ফোন করেন?

—না। ঐ লগ্-কেবিন থেকে নয়। উনি বললেন, লগ-কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে। তিনি অন্য কোনও জায়গা থেকে ফোন করছেন। কোথা থেকে তা উনি বলেননি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। সে যাই হোক, আমি তৎক্ষণাৎ এয়ার-অফিসে ফোন করি। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন মর্নিং ফ্লাইটে একটা টিকিট পেয়ে যাই। ছয়ই ভোরের প্লেনে দিল্লি চলে যাই। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। দু-তিন দিন আমি হোটেল ছেড়ে বেরুতে পারিনি। দশ তারিখে ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফটটা তৈরী করি। পরদিনই অর্থাৎ এগারোই সূরয আমাকে টেলিফোন করে দুঃসংবাদটা জানায়। আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসি। ড্রাফট দুটি এখনও আমার কাছে আছে।

সূরয ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, কী আশ্চর্য! এসব কথা তো আপনি আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাননি চাচাজী?

—না জানাইনি। কারণ মালিকের নির্দেশ ছিল সব কিছু গোপন রাখতে,—হ্যাঁ, এমনকি তোমার কাছ থেকেও। নির্দেশ ছিল, ঐ দলিলটি সংগ্রহ করে শুধু তাঁরই হাতে দেওয়ার। সে সৌভাগ্য আমার হল না, তার আগেই তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে—

গলাটা ধরে এল প্রভুভক্ত একান্ত-সচিবের। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছে নিয়ে বললেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম মিস্টার বাসুর জন্য। এখন আমার বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।

বাসু মিসেস্ খান্নার দিকে ফিরে বললেন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

মিসেস্ খান্না বলেন, নাটক মঞ্চস্থ করছেন আপনারা, আমি তো দর্শকমাত্র। আমি কী বলব? একটা কথাই বলতে পারি: এনকোর! এনকোর!

বাসু গম্ভীরভাবে বলেন, মিসেস্ খান্না, ব্যাপারটা আশু ফয়সালা হয়ে যাক এটা নিশ্চয় আপনিও চাইছেন। দিল্লি-আদালত আপনাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছেন কি না এটা আমরা ঠিকই জানতে পারব। কিছুটা সময় লাগবে, এই যা। এ-ক্ষেত্রে আপনি কি জানাবেন, দিল্লি আদালত সেটা মঞ্জুর করেছেন কি না?

—হ্যাঁ করেছেন।

—সেটা নিয়েই আপনি এসেছেন শ্রীনগরে? সাত তারিখে?

—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে যাব কেন?

সূরয বলে, বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকাই তার প্রাপ্য, কেমন তো? এ-ক্ষেত্রে উনি আমার বিমাতা নন? তার মানে বাকি সম্পত্তির কিছুই উনি দাবী করতে পারেন, না?

কোথাও কিছু নেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন মহিলা। হাসির দমক সামলে বলেন, তুমি বড় তাড়াহুড়া করে ফেলছ সূরয। একদিন পরে কাজটা হাঁসিল করলে সব কিছুই তোমাতে বর্তাতো!

—কোন কাজ?

—বাপ্‌কে খুন করা, আবার কী?

—শাট আপ্!—গর্জে ওঠে সূরয।

জগদীশ এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার বললে, মা, কী বলছ ভেবেচিন্তে বল!

—আমি জানি, জগু আমি কী বলছি। এই দেখুন ব্যারিস্টার-সাহেব সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা।

সূরয বললে, মিস্টার বাসু, আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি। বিবাহ-বিচ্ছেদ যখন হয়ে গেছে তখন—

মাঝপথেই সে থেমে যায়। দেখে, বাসু-সাহেব মন দিয়ে দলিলটা দেখছেন।

মিসেস্ খান্নার কিন্তু তর সয় না। বলেন, কই ব্যারিস্টার-সাহেব? এবার নাটকে আপনার ডায়ালগ্ যে? আপনার ক্লায়েন্টকে শুনিয়ে দিন কেন ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদ দলিলটা সিদ্ধ নয়?

বাসু বললেন, হ্যাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদের এ দলিলটা সিদ্ধ কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা অনুমোদন করেছেন ছয়ই সেপ্টেম্বর। ঠিক কটার সময়—এমন কি 'ফোরনুন' না 'আফটারনুন' তারও উল্লেখ নেই। অপরপক্ষে মহাদেওপ্রসাদ খুন হয়েছেন ঐ ছয় তারিখেই সকাল এগারোটা নাগাদ। বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটি সিদ্ধ হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরমুহূর্ত থেকে। যদি প্রমাণিত হয়, তিনি বেলা এগারোটার পর সই করেছেন, তাহলে এ ডিভোর্স-সার্টিফিকেট সিদ্ধ নয়। কারণ মৃতব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে না, কাউকে ওকালত-নামা দেওয়া থাকলেও।

মিসেস্ খান্না বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট বিকালবেলা সইটা করেন, এবং আমার তরফে অ্যাটর্নি সেটা ডেলিভারি নেন বিকাল চারটায়। প্রয়োজন হলে আমার অ্যাডভোকেট সেই মর্মে এফিডেবিট করবেন।

বাসু বলেন, তারপর? আপনারা দুজন সাত তারিখের ফ্লাইটে শ্রীনগরে চলে আসেন?

—একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?

—কারণ এমনও হতে পারে যে আপনি ছয় তারিখ মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লি থেকে এসেছেন, এবং আপনার পুত্র পরদিন ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদ দলিলটা নিয়ে এসেছে?

—তাতে কী হল?

—হয়নি কিছুই। আমি জানতে চাইছি আপনি কবে শ্রীনগরে এসেছেন?

—আমি তো বারে বারেই বলছি, সে কথা ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল। ছয় তারিখ সকালে আমি কোথায় ছিলাম, তার সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানার কোন সম্পর্ক নেই। আপনিই না একটু আগে বললেন, আমাদের বর্তমান মামলাটা শুধু সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে?

—তার মানে ছয়ই সকালে আপনার কোন 'অ্যালিবাই' নেই!

—লুক হিয়ার মিস্টার ব্যারিস্টার। এটা আদালত নয়। আপনার অবান্তর প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন—ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদের কাগজখানা নিতান্ত মূল্যহীন।

বাধা দিয়ে সূরয বলে ওঠে, একটু আগে আপনি বলছিলেন, আমিই বাবাকে খুন করেছি। অথচ দেখা যাচ্ছে ছয়ই সকালে আপনি কোথায় ছিলেন তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারছেন না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আপনি হোটেলে চেক-ইন করেছেন সাত তারিখ সকালে। অথচ এয়ারলাইন্স বলছে, ছয়-সাত দু-দিনের প্যাসেঞ্জার লিস্টেই আপনার নাম নেই! তার মানে...

—ব্যাস ব্যাস! ঐ পর্যন্তই থাক। তোমার ব্লাড-প্রেসার বেশি, ডাক্তারে বলেছেন, উত্তেজিত না হতে, তাই না? আচ্ছা চলি ব্যারিস্টার-সাহেব—

পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাটি কক্ষত্যাগ করবার জন্য উঠে দাঁড়ান। বাসু বলেন, বসুন, যাবেন না। আমার আরও একটা কথা বলার আছে—

—আবার কি?—মিসেস খান্না বসে পড়েন।

—খবরটা এখনও জানাজানি হয়নি, কিন্তু পুলিসে এটা শীঘ্রই জানতে পারবে। মহাদেওপ্রসাদ সাতাশে অগস্ট তারিখে একটি মহিলাকে বিবাহ করেন।

সূরয চমকে ওঠে। গঙ্গারামও। কিন্তু মিসেস্ খান্নাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। বললেন, কী দুর্ভাগ্য, আমাদের নিমন্ত্রণ হল না! মহাদেও যে চরিত্রের লোক তাতে আমি অবাক হইনি। লোকটা মরে গেছে, তাই 'বাইগামি'র মামলা আনা যাবে না। তা সে যাই হোক, আমার সঙ্গে যতদিন না বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন সেই মাগির কোনও দাবী আইনত দাঁড়ায় না। মেয়েটি কে তা জানবার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আয় জগু, আমরা যাই। অনেক কাজ এখনও বাকি।

মিসেস্ খান্না চলে যাবার পর বাসু দেখলেন, দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সূরয। তারপর মুখ তুলে বললে, এ তথ্য কী করে পেলেন?

—ঐ উলের কাঁটা আর ব্র্যাসিয়ারের সূত্র ধরে। মেয়েটির দোষ নেই, সে জানত না উনি বিবাহিত।

সূরয বলে, ইতিমধ্যে আর কিছু জেনেছেন?

—জেনেছি। লগ-কেবিন যে ময়নাটাকে পাওয়া গেছে সে মুন্না নয়। যে কোনো কারণেই হোক তোমার বাবা মুন্নাকে কোনও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে ঠিক ঐ রকম দেখতে আর একটি ময়নাকে ঐ লগ-কেবিনে নিয়ে এসেছিলেন।

সূরয চমকে উঠে বলে, তিনি নিজেই? কেন?

—কেন তা এখনও বুঝতে পারিনি। তবে তিনি নিজেই ঐ দ্বিতীয় ময়নাটিকে খরিদ করেন দোশরা সেপ্টেম্বর শ্রীনগরের বাজারে।

তারপর উনি গঙ্গারামের দিকে ফিরে বলেন, দোশরা বেলা দেড়টার বাসে আপনি কি তাঁকে তুলে দিয়ে এসেছিলেন? তাঁর সঙ্গে কি আর একটা ময়না ছিল?

গঙ্গারাম বললেন, আজ্ঞে না। বাসে আমি নিজে তাঁকে তুলে দিতে যাইনি। তাঁর সঙ্গে আর একটা ময়না ছিল কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু তিনি কেন আবার একটা ময়না কিনবেন? আর সেই দ্বিতীয় পাখিটাই বা কোথায়?

বাসু বললেন, দ্বিতীয় পাখি নয় গঙ্গারামজী, সেটাই প্রথম পাখি, তার নাম মুন্না। তার দেখা পেলেই বোঝা যাবে কী কারণে খান্নাজী তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

গঙ্গারাম বললেন, নিরাপদ দূরত্বে মানে? আততায়ী তো ময়নাটার কোন ক্ষতি করেনি। মালিক কেন আশঙ্কা করলেন যে, মুন্নার কোন বিপদ আছে?

বাসু বলেন, যতক্ষণ না 'মুন্না'কে খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে, ঘটনার সময়ে ওঁর লগ-কেবিনে মুন্না আদৌ ছিল না।

সাত

সমস্ত দিনের ধকল তো বড় কম যায়নি। রাত প্রায় দশটার সময় ক্লান্ত শরীরে হাউসবোটে ফিরে এসে বাসু-সাহেব কিন্তু আবার একটি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। হাউসবোটের ড্রইংরুমে বসে আছেন এস. ডি. ও. শর্মা, সতীশ বর্মন, যোগীন্দর সিং আর একজন অফিসার। আর কৌশিক।

বাসু ওঁদের দেখে বললেন, গুড-ইভনিং জেন্টলমেন। আপনারা আমার প্রতীক্ষাতেই আছেন মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার? জরুরী কিছু?

অপরিচিত ভদ্রলোকটি নিজে থেকেই আত্মপরিচয় দেন—আমার নাম প্রকাশ সাক্সেনা, আমি হচ্ছি এখানকার পাবলিক প্রসিকিউটার।

বাসু করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে বললেন, গ্ল্যাড টু নো য়ু।

—আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে।

—সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কী বিষয়ে?

—রমা দাসগুপ্তার বিষয়ে।

—তার বিষয়ে কী কথা?

—সে বর্তমানে কোথায় আছে?

—তা তো জানি না।

সতীশ বর্মন শর্মাজীর দিকে ফিরে বললে, হল? আমি বলিনি?

বাসু ধীরেসুস্থে সোফায় বসে বললেন, ব্যাপারটা কী?

প্রকাশ সাক্সেনা বললেন, আমি জানতে চাই রমা দাসগুপ্তাকে আপনি কোথায় নামিয়ে দিয়ে এলেন?

—আমি তাকে কোথাও নামিয়ে দিইনি।

—আমাদের খবব অন্য রকম।

—নাকি?

—আপনি অস্বীকার কবতে পারেন যে, আজ সন্ধ্যা ছ'টার সময় আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটার দেখা হয়নি? শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে?

—না। অস্বীকাব কবব কেন? দেখা হয়েছিল, কথাবার্তাও হযেছিল। তারপর সে কোথায় গেছে, জানি না।

সতীশ বর্মন একটি স্বগতোক্তি করে, সেই চিবাচবিত খেলা!

তারপর শর্মাজীব দিকে ফিরে বলে, গবিবের কথা বাসি না হলে তো চৈতন্য হয না। এখন দেখছেন তো?

শর্মাজী এবাব কথোপকথনে যোগ দেন। বলেন, মিস্টার বাসু, আপনি তো এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতাই কবছিলেন—

—এখনও করছি। বেশ, আপনাদের খোলাখুলিই জানাচ্ছি—শুধু সূরযপ্রসাদ নয়, রমাও আমার ক্লায়েন্ট। আমি মহাদেওপ্রসাদ খান্নার মৃত্যু বহস্যটা সমাধান করতে পেবেছি। এবং সেটা আমার নিজের পদ্ধতিতে করব। আপনারা যেমন আপনাদেব পদ্ধতিতে কবছেন।

প্রকাশ বললে, আমরা আপনার সেই ক্লায়েন্ট রমা দাসগুপ্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—খুব ভালো কথা। যান, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন!

—সে কোথায়?

বাসু বলেন, এক কথা কতবাব বলব মশাই? আমি জানি না সে কোথায়।

প্রকাশ সাক্সেনা উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু! আপনি অস্বীকার কবলে আমরা আপনাকে 'অ্যাক্সেসাবি'ব চার্জে ফেলতে পারি, সেটা খেয়াল করে দেখেছেন?

বাসু বলেন, লুক হিয়াব মিস্টার পি. পি.! আপনি আমার বিরুদ্ধে কী চার্জ আনবেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তবে আইনের প্রসঙ্গ যদি তোলেন তবে ঐ ধাবাটা আবার আপনাকে দেখতে বলব। যতক্ষণ না আমাব ক্লায়েন্টকে হত্যাকারীরূপে আপনি চিহ্নিত করছেন, ততক্ষণ আমার বিরুদ্ধে ও জাতীয় চার্জ উঠতেই পারে না। আপনারা কি বলতে চান রমা দাসগুপ্তাই খুনটা করেছে?

—প্রকাশ দৃপ্তস্বরে বলেন, হ্যাঁ তাই! এবার?

শর্মাজী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, ওয়েট এ মিনিট সাক্সেনা।—তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন; কিন্তু—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, তাই তো করতে চাই মিস্টার শর্মা! একই লক্ষ্যে আমরা পৌছাতে চাই—মহাদেও প্রসাদ খান্নার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। কিন্তু পথটা বিভিন্ন হয়ে পড়ছে—আপনারা এক পথে চলেছেন, আমি ভিন্ন পথে।

শর্মা বলেন, তাতে আমার আপত্তি হত না, যদি আপনি আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি না করতেন। আপনি তাই করছেন এখন।

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, উনি চিরটা কাল তাই করে এসেছেন।

বাসু সে কথায় কান না দিয়ে শর্মাজীকেই উদ্দেশ্য করে বলেন, তার কারণ চিরটা কাল দেখে আসছি পুলিস নিরপরাধীকে কাঠগড়ায় তুলে আসছে।

শর্মাজী বলে ওঠেন, আপনি জানেন মার্ডার-ওয়েপনটা কার তা আমরা খুঁজে বার করেছি?

—জানি, স্টেট ব্যাঙ্কের দারোয়ান মন-বাহাদুরের। দেশে যাবার সময় সে সেটা ঐ রমা দাসগুপ্তার কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। শুধু তাই নয়, ঐ রমা দাসগুপ্তাব বাড়িতেই আছে 'মুন্না', যাকে খুঁজছেন আপনারা।

শর্মাজী অবাক হয়ে বলেন, আপনি সে কথাও জানেন?

—এবং জানি ঐ ময়নাটা যে অদ্ভুত 'বোল'টা পড়ে: 'রমা' মৎ মারো...পিস্তল গমাও...ক্রম...হায রাম।'

প্রকাশ সাকসেনা গম্ভীর হয়ে বলেন, মিস্টার বাসু, এর পরেও যদি আপনি আমাদের না জানান সেই মেয়েটি কোথায আছে, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমি 'অ্যাকসেসারি'র চার্জ আনতে বাধ্য হব।

বাসু বললেন, এ-কথা আপনি আগেও বলেছেন একবার। আপনি যা খুশী করতে পারেন।

শর্মাও গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার স্ট্যান্ডটা কী? যেহেতু রমা দাসগুপ্তা আপনার ক্লায়েন্ট তাই আপনি তাকে লুকিয়ে রাখছেন, নাকি আপনি সত্যিই জানেন না সে কোথায় আছে?

—আমি সত্যিই জানি না সে কোথায় আছে।

সতীশ বর্মন বললে, আমার মনে হয় মিস্টার বাসুর বিরুদ্ধে আমরা চার্জ ফ্রেম করতে পারি।

শর্মাজী বললেন, না। আমি বিশ্বাস করি উনি সত্যিই কথাই বলছেন—উনি জানেন না মেয়েটি বর্তমানে কোথায় আছে।

বাসু বলেন, থ্যাঙ্কু শর্মাজী। তাহলে আপনাকে আরও একটা সংবাদ জানাই। গঙ্গারামজী কী জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন তা কি আপনাকে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—একথা কি আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে, মিসেস খান্না ছয় তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত ছিলেন না?

শর্মাজীর ভ্রূ কুঞ্চন হল। বললেন, ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

—এবং মিসেস খান্না ছয় তারিখের মর্নিং ফ্লাইটে শ্রীনগরে এসে থাকতে পারেন?

সতীশ বর্মন বাধা দিয়ে বলে, আমরা সে খোঁজ নিয়েছি। প্যাসেঞ্জার লিস্টে মিসেস খান্নার নাম নেই—

বাসু বলেন, তাঁর নাম সাত বা আট তারিখের লিস্টেও নেই। সুতরাং আমরা জানি না ছয় তারিখের টিকিটখানা তিনি স্বনামে বুক করেছিলেন কিনা। এবং মৃত মহাদেওপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীকে 'সুরমা' বলে ডাকতেন, না, শুধু 'রমা' বলে ডাকতেন?

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, সেই এক প্যাঁচ! নিজের ক্লায়েন্টকে বাঁচাতে আর কোন শিখণ্ডীকে পুলিসের সামনে মেলে ধরা।

শর্মাজী গম্ভীর স্বরে বললেন, ধন্যবাদ। সবগুলো তথ্যই জানতাম। শেষেরটা ছাড়া। আচ্ছা চলি, গুড নাইট!

ওঁরা চলে যেতেই বাসু কৌশিককে বলেন, এখনই সুরযপ্রসাদকে একটা ফোন কর। কাল ভোর চারটের সময় গাড়িটা আমার চাই।

আট

কৌশিককে নিয়ে শ্রীনগর থেকে যখন রওনা হয়েছিলেন তখনও রাত কাবার হয়নি। হাড়-কাঁপানো শীত। পহেলগাঁওয়ে যখন পৌঁছালেন তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় বুলেটের মত গাড়িটা চলে এসেছে। বাসু-সাহেব গাড়িটা সেই মেথডিস্ট চার্চের পিছন দিকে দ্বিতীয় বাড়িটার সামনে দাঁড় করালেন। কৌশিককে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তৃতীয় বাড়িখানার সামনে এসে কলিং বেল বাজালেন।

গৃহস্বামিনী বোধ হয় তখনও শয্যাত্যাগ করেননি। একটুবিলম্ব হল তাঁর আসতে। এবারও ল্যাচ-কী দেওয়া দরজা অল্প ফাঁক করে বললেন, কী চাই? ও আপনারা! এত সকালে?

বাসু বললেন, হ্যাঁ রাত থাকতেই বেরিয়েছি। মিসেস কাপুর ফিরে এসেছেন ভেবেছিলাম; কিন্তু ওর দরজাটা তালাবন্ধ।

—না ও ফেরেনি। ভিতরে বসবেন?

বাসু ইংরাজী ছেড়ে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে বললেন, না বসব না। আপনার বোধ হয় এখনও প্রাতঃকৃত্যাদিই সারা হয়নি, নয়?

মহিলা সসঙ্কোচে ইংরাজীতে বললেন, মাপ করবেন। আমি হিন্দি জানি না। কী বলছেন?

—ঐ ময়না পাখিটাকে আর একবার দেখতে চাই।

—ও! কিন্তু ওটা তো ও বাড়িতে আছে।

বাসু বলেন, তাহলে ও বাড়ির চাবিটাই বরং দিন। আমি একটু বাথরুমেও যাব।

মিসেস কৃষ্ণমাচারীর মূর্তি অপসারিত হল। একটু পরে ফিরে এসে একটি চাবি দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বললেন, ওর বেডরুমের চাবিটা ও আমাকে দিয়ে যায়নি। এটা সদরের চাবি। ময়নাটা বারান্দায় টাঙানো আছে, আর ল্যাট্রিনও ব্যবহার করতে পারবেন।

—থ্যাঙ্ক সো মাচ।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই কৌশিক বলল, ভদ্রমহিলা হিন্দি একেবারেই জানেন না, তাই মুন্নার ঐ 'বোল'টার অর্থগ্রহণ হয়নি।

বাসু বললেন, একেবারেই জানেন না, তা নয়। সেদিন যখন মুন্না বলেছিল—'আইয়ে বৈঠিয়ে চা পিজিয়ে' তখন উনি বুঝতে পেরেছিলেন।

কৌশিক বলে, তা তো বুঝলাম। এখন কি ময়না বদল করবেন?

—অফকোর্স! তুমি গাড়ি থেকে ঐ পাখিটাকে নিয়ে এস। আমি এ বাড়ির দরজাটা খুলি।

ময়না বদল করে, চাবিটা ঐ ভদ্রমহিলাকে ফেরত দিয়ে বাসু আবার এসে বসলেন গাড়িতে। বললেন, আমার ভয় ছিল, ইতিমধ্যেই পুলিসে এটাকে না সরিয়ে নিয়ে থাকে।

—সে আশঙ্কাও ছিল নাকি?

—নিশ্চয়! তাই তো রাত থাকতেই চলে এসেছি।

কৌশিক বলে, সতীশ বর্মন এ ভুল করল কেন? কাল তারা বিকালের দিকে নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল। মিসেস কৃষ্ণমাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। পাখিটার অদ্ভুত 'বোলটাও' শুনেছে। তবু পাখিটাকে নিয়ে যায়নি কেন? আন্দাজ করতে পারেন?

—পারি। দুটো কারণে। প্রথমত ওরা রমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়। ঐ পাখিটার টানেই রমা ফিরে আসতে পারে এটাই ওরা আশা করেছিল, ভেবেছিল, আমি এসে যদি জেনে যাই 'মুন্নাকে' পুলিসে 'সীজ' করে নিয়ে গিয়েছে তাহলে রমা আর তার বাড়িতে ফিরবেই না। দ্বিতীয়ত, ওদের থিওরি—রমাই হত্যাকারী; সেক্ষেত্রে পাখিটাকে রমা বাঁচিয়ে রাখবে কেন এটা ওরা বুঝে উঠতে পারেনি। পাখিটা যে 'বোল' পড়ছে তা শুনেও রমা ঘাবড়াচ্ছে না কেন এটা ওদের মাথায় ঢোকেনি। সে যাই হোক, আজ বিকালের মধ্যেই এখানে সতীশ বর্মন আসবে এবং পাখিটাকে 'সীজ' করবে।

—কেন?

—কাল রাত্রে ওরা জেনেছে মহাদেওপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীকে 'রমা' বলে ডাকতেন। সতীশ বর্মন সে-কথার গুরুত্ব না দিলেও শর্মাজীর অর্ডারে যোগীন্দর সিং পাখিটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

পহেলগাঁও থেকে আবার শ্রীনগরে যখন এসে পৌঁছালেন তখন বেশ বেলা হয়েছে। দোকানপাট সব খুলেছে। বাসু-সাহেব গাড়িটাকে নিয়ে এলেন সেন্ট্রাল মার্কেটে। ইয়াকুব মিঞার দোকানে এসে বললেন, মিঞাসাব একটা উপকার করতে হবে। এই পাখিটাকে আপনার জিম্মাদারীতে দিন সাতেক রাখতে হবে। রাজী আছেন?

—আলবৎ। এ-আর বেশী কথা কি?

বাসু-সাহেব একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলেন, নিন ধরুন।

—এটা কেন স্যার?

—আমার পাখির খোরাকি।

—আমি কি ওকে সোনার দানা খাওয়াব?

—না, সেজন্য নয়। প্রথম কথা, দোকানে এটাকে রাখবেন না। আপনার বাড়িতে রাখবেন। আর এটা যে আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছি সে কথাটা যেন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারে। কেমন? কোন ক্রমেই যেন এ পাখিটা খোয়া না যায়।

ইয়াকুব বললে, ঠিক হ্যায় সা'ব। কিন্তু কেন বলুন তে?

ঠিক তখনই বোল পড়ল পাখিটা: রমা! মৎ মারো। পিস্তল নামাও।...ক্রম...হায় রাম।

ইয়াকুবের চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে ওঠে!

বাসু বলেন, শুনলেন তো? এই হচ্ছে আমার একনম্বর সাক্ষী। সেদিন যে লোকটার ছবি দেখিয়েছিলাম তার নাম রমাপ্রসাদ। ডাকনাম 'রমা'; লোকটা যখন হত্যা করে তখন এই ময়নাটা শুনে ফেলেছিল ঐ কথাগুলো। এখন বুঝছেন তো ময়নাটার দাম কত? ওর কিছু ভালমন্দ হয়ে গেলে পুলিস কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ করবে। এজন্যই মাত্র সাতদিনের খোরাকি বাবদ নগদ একশ' টাকা দিচ্ছি। খুব সাবধান! ওকে একেবারে লুকিয়ে রাখবেন। পঞ্চাশ টাকা এখন দিয়ে গেলাম, আবার পঞ্চাশ টাকা এই বাবু দেবেন দিনসাতেক পরে, যখন ময়নাকে ডেলিভারী নিতে আসবেন। ঠিক হ্যায়?

ইয়াকুব মস্ত সেলাম করে বললে, বেফিকর রহিয়ে সা'ব।

সেন্ট্রাল মার্কেট থেকে বেরিয়ে এলেন যখন তখন সূর্য মধ্যগগনে। বাসু বলেন, এবেলার মত খেল্ খতম, চল হাউসবোটে ফিরি।

হাউসবোটে চুপচাপ বসে আছেন রানী দেবী। নিতান্ত একা।

মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হলে বাসু বলেন, কৌশিক এ-বেলায় তুমি রানীকে নিয়ে নৌকায় করে একটু ঘুরে এস। ইচ্ছা করলে গাড়িতেও যেতে পার, কারণ আমার গাড়ি লাগবে না।

—আপনি এ বেলা তাহলে কী করবেন?

—আমি এই হাউসবোটেই থাকব। একটু থিংক্ করব।

এই 'থিংক্'-করা ব্যাপারটার সঙ্গে রানী দেবী ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। উনি এখন হুইস্কির বোতল নিয়ে বসবেন, পাইপ ধরিয়ে। বাইরে যদি সাইক্লোন হতে থাকে, পায়ের নিচে ভূমিকম্পে মাটি দু-ফাঁক হয়ে যায় উনি টের পাবেন না। কায়মনোবাক্যে উনি বুঁদ হয়ে থাকবেন ঐ 'থিংক্' করার ব্যাপারে। রানী দেবী লক্ষ্য করে দেখেছেন, প্রতিবারই রহস্য সমাধানের শেষাশেষি কয়েকঘণ্টা এইভাবে অন্তর্লীন চিন্তায় উনি মগ্নচেতনা হয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাগর-জগতে ফিরে এসে একটা স্বগতোক্তি করেন: লোকটা কে বুঝতে পারছি, কেন করেছে তাও বোঝা যাচ্ছে—কিন্তু প্রমাণ করব কী করে?

বেলা একটা নাগাদ কৌশিক আর রানী দেবী বেরিয়ে গেলেন, নৌকাতেই। বাসু বোতলটা টেনে নিলেন।

তন্ময়তা ভাঙলো খোদাবক্সের ডাকে। যখন সে ফুটখানেক দূরত্বে এগিয়ে এসে তৃতীয়বারের জন্যে বললে, হজৌর?

চমকে জেগে উঠে বললেন, ক্যা বাৎ? ক্যা হুয়া?

একই আর্জি তৃতীয়বার পেশ করল খোদাবক্স, ছোটাহজৌর আয়ে হেঁ। আপকো সেলাম দিয়া।

বাসু হাত-ঘড়িতে দেখলেন বেলা চারটে। হাউসবোটের জানলা দিয়ে নজর পড়ল পড়ন্ত রৌদ্র

ঝিলাম ঝিমাচ্ছে। দূরে সারি সারি গাছের পাতায় সোনা-গলানো রোদ। মনকে গুটিয়ে আনলেন সেদিক থেকে। বললেন, ঠিক হ্যয়: ময় আভি আতাহুঁ।

খেয়াল হল শীত করছে। দুপুরে শুধু পাঞ্জাবি গায়ে বসেছিলেন। হুইস্কির কল্যাণেই বোধ হয় টের পাননি, প্রখর রৌদ্রতাপ অবসৃত হয়েছে অপরাহ্নের নিরুত্তাপ পদক্ষেপে। ঘর ছেড়ে করিডোরে পা দিয়েই আবার ফিরে গেলেন। শালটা খুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন। বাইরের ঘরে এসে দেখেন সূরযপ্রসাদ এবং গঙ্গারামজী এসেছেন।

ওঁরা কিছু বলার আগেই নিজে থেকে বলে ওঠেন, আপনাদেরই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। কাল রাত্রেই তোমাদের বলেছিলাম, আমি মুন্নার তল্লাস করছি। মুন্নাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সে আছে রমা দাসগুপ্তার বাড়িতে—পহেলগাঁওয়ে। সে নাকি একটা অদ্ভুত 'বোল' পড়ছে. 'রমা! মৎ মারো...পিস্তল নামাও...দ্রুম...হায় রাম।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, ময়নাটা এ-কথা কেন বলছে? তোমরা আন্দাজ করতে পার?

সূরয বলে, এর তো একটাই জবাব—লোকটা যখন পিতাজীকে গুলি করে তখন মুন্না সেখানে ছিল। আমি তো সেদিনই বলেছি, মুন্নার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—একবার মাত্র শুনেই কখনও কখনও সে 'বোল' তুলে নিতে পারত। তা পুলিসে কি 'মুন্না'কে সীজ করেছে?

—পুলিস এখনও খবরটা জানতে পারেনি। আমি রমার কর্মস্থল থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। পহেলগাঁওয়ে মেথডিস্ট চার্চের পিছনে পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি, তার মাঝের বাড়িটাই রমার। কিন্তু ওর বাড়িতে তালা ঝুলছে। ওর প্রতিবেশিনী বললেন, রমা কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সূরয বলে, তাহলে আপনি কেমন করে 'মুন্না'কে দেখলেন?

—ওর বাড়ির পিছনের বারান্দায় খাঁচাটা ঝোলানো আছে। আমি দূর থেকে দেখেছি মাত্র। ওর বোল স্বকর্ণে শুনেও এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে 'রমা' কে? রমা দাসগুপ্তা, না সুরমা খান্না?

গঙ্গারামজী বললেন, রমা দাসগুপ্তা হতে পারে না, কারণ তাহলে সে ঐ পাখিটাকে এতদিন জিন্দা রাখত না।

তারপর সূরযের দিকে ফিরে বললেন, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, খান্নাজী মিসেস্ খান্নাকে 'রমা' বলে ডাকতেন?

বাসু বলেন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে সুরমা দেবীর একটা বজ্র-আঁটুনি 'অ্যালেবাই' রয়েছে।

গঙ্গারাম বলেন, তাই নাকি? সেটা কী?

—মিসেস খান্না প্লেনের টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে ছয় তারিখ ভোর দিল্লি থেকে রওনা হন। শ্রীনগরে এসে পৌঁছান ছয় তারিখ সন্ধ্যায়। বাসে ওর সহযাত্রী ছিলেন এমন একজন ভদ্রলোক যিনি সন্দেহের অতীত।

গঙ্গারাম বলেন, কে তিনি?

বাসু সে-কথা কানে না নিয়ে বললেন, ঐ দুজন ছাড়া 'রমা' নামের আর কাউকে তোমরা চেন?

দুজনেই জানালেন, তেমন কোন লোকের কথা ওঁরা মনে করতে পারছেন না।

বাসু বলেন, তাহলে পাখিটা ঐ বোল্ বলছে কেন?

সূরয বলে, ময়নাটার কথা মুলতুবি থাক। যে জন্য আমরা এসেছি সে কথাই বলি। পিতাজীর যে সিন্দুকটা আমাদের বাড়িতে আছে, তাতে কিছু কাগজপত্র ও গহনা ছিল বটে। কিন্তু ক্যাশ ছিল না। পিতাজীর যে সুটকেসটা লগ্-কেবিনে পাওয়া গেছে তাতে একটি গোদরেজের নম্বরী চাবি ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাদের ভল্টের লকারের চাবি সেটা। এইমাত্র আমি সেখান থেকেই আসছি। ভল্টে ছিল কিছু দলিলপত্র, কিছু শেয়ারের কাগজ, একটা খামে 430 খানা একশ টাকার নোট আর ঐ উইলটা! এই দেখুন। বিশেষ করে এই প্যারাগ্রাফটা ঃ

"যেহেতু আমি আমার স্ত্রী শ্রীসুরমা খান্নাব সহিত গত বৎসর বাইশে অগস্ট তাবিখে একটি চুক্তি করিয়াছি যে, আমার স্ত্রী সুরমা খান্না একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন কবিবেন এবং আমি কোনও আপত্তি পেশ করিব না; এবং আমাব আপত্তি বা প্রতিবাদ না থাকায় তিনি একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদেব ডিক্রি পাইবেন এবং সে-কারণে তাঁহাব বাকি জীবনেব ভরণ-পোষণ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের খেসারৎ বাবদ তিনি উক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পাদন-সাপেক্ষে আমার নিকট হইতে এককালীন পঞ্চাশ হাজাব টাকা লাভ করিবেন, সেই হেতু আমি আমার উইলে উপযুক্ত স্ত্রী শ্রীসুবমা খান্নাব জন্য কোনও সম্পত্তি বাখিয়া যাইতেছি না। যেহেতু আমি মনে কবি তাঁহার বাকি জীবনেব ভরণপোষণ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ-খেশাবত বাবদ ঐ 50,000 টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) যথেষ্ট, ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত। উল্লেখ থাকে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ডিক্রি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হইবার পূর্বেই যদি কোন কাবণে আমাব দেহান্তর ঘটে তবে পূর্ব বৎসবের ঐ বাইশে অগস্টের চুক্তি অনুযাযী আমার স্ত্রী শ্রীসুবমা খান্না আমাব সম্পত্তি হইতে ঐ 50,000 টাকাই শুধু পাইবেন—তাঁহাব আর কোনও দাবী-দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না। সেই কারণে এই উইলে আমার সম্পত্তিব আংশিক ওয়ারিশরূপে আমি তাঁহাব উল্লেখ কবি নাই। আমার মৃত্যুর পূর্বে অথবা পরে ঐ 50,000 টাকাই তিনি শুধু পাইবেন; তদ্ভিন্ন আমার শেযার, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, ফিক্সড-ডিপোজিট প্রভৃতি হইতে আমাব একান্ত-সচিব শ্রীগঙ্গারাম যাদব তাঁহাব একনিষ্ঠ সেবা ও বন্ধুত্বের প্রতিদান স্বরূপ 10,000 (দশ হাজার টাকা) পাইবেন। তদ্ভিন্ন 'ক' বর্ণিত সূচী অনুসারে আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য, ড্রাইভার, কর্মচারীর নগদে হাজাব হইতে পাঁচশ টাকা আমার স্নেহেব দান স্বরূপ লাভ করিবেন। এই অর্থ প্রদান করাব পর আমার যাবতীয় স্থাবব ও অস্থাবব সম্পত্তি আমি আমাব একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সূরযপ্রসাদ খান্নাকে নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে প্রদান করিযা যাইতেছি। প্রকাশ থাকে যে, আমার স্বোপার্জিত সম্পত্তি ব্যতিরেকে আমাব পৈতৃক সম্পত্তিব অর্ধাংশ আমার পিতৃদেব আমার ভ্রাতা শ্রীমান প্রীতমপ্রসাদ খান্নাকে দান করিয়া গিযাছিলেন এবং পবে আমার ভ্রাতা প্রীতম তাহাব পৈতৃক সম্পত্তি আমাকেই নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে দান করিয়া সংসাব ত্যাগ করে। আইনত সে সম্পত্তি বর্তমানে আমাব। তবু আমি একান্তভাবে আশা রাখি যে, যদি কোনদিন শ্রীপ্রীতম আমাব পুত্রের সাক্ষাতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে শ্রীমান সূরয এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে প্রীতম অর্থকষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য না হয। শর্তসাপেক্ষে নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে উইল সম্পাদন করা আইনত গ্রাহ্য নহে এ বিষযে আমি অবগত আছি। ইহা আমার পুত্রের নিকট অনুরোধ মাত্র।"

পাঠ শেষ করে সূরয বলে, এখন বলুন স্যার, যদি প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের পূর্বেই পিতাজীর দেহান্তর হয়েছিল, তাহলে কি বিমাতার সে সম্পত্তিতে কোনও অধিকার বর্তায়?

বাসু বললেন, না। উইলের বয়ান এমন নিখুঁত ছকা, যে সুরমা দেবী ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী কিছুই দাবি করতে পারেন না। তুমি বরং বল, তোমার চাচাজী প্রীতমপ্রসাদের কথা।

—কী বলব? আমি জীবনে তাঁকে কোনদিন দেখিনি। যতদূর জানি, পিতাজীর সঙ্গে ইদানীং তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য তিনি যদি কোনদিন সশরীরে এসে উপস্থিত হন এবং নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে পারেন তবে নিশ্চয় আমি তাঁকে সম্পত্তিব অংশ দেব। শুধু তাই নয়, আমি আমার বিমাতাকেও স্বেচ্ছায় বেশ কিছু টাকা দেব?

বাসু সবিস্ময়ে বলেন, কাকে? সুরমা দেবীকে?

—আজ্ঞে না। রমা দেবীকে। তিনি কোথায আছেন জানেন?

—না। এখনও জানি না।

সূরয বলে, আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি মনে করেন রমা দেবী এই জঘন্য ব্যাপারটার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত?

বাসু বললেন, না। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, সে জড়িত নয়। কিন্তু পুলিস যদি একবাব তাকে ধরতে পারে, তাহলে তাকে বাঁচানোও খুব কঠিন।

—কেন? কঠিন কেন?

—আনুষঙ্গিক তথ্য, যাকে বলে 'সারকামস্ট্যান্‌শিয়াল এভিডেন্স' তা রমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো। হত্যাপরাধ প্রমাণ করতে তিনটি জিনিসের দরকার—উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং অস্ত্র। আর হত্যাপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় 'অ্যালেবাই', অর্থাৎ হত্যার সময় সে যে অন্য কোথাও ছিল তার প্রমাণ আছে। বেচারীর অবস্থা দেখ—যশোদা কাপুরের ছদ্মনামে মহাদেও ওকে বিবাহ করেন। তিনি যে বিবাহিত এই তথ্যটা গোপন করে। এর চেয়ে অনেক সামান্য কারণে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে খুন করেছে। অসংখ্য কেস-হিস্ট্রি আছে তার। দ্বিতীয়ত সুযোগ। রমা জানতো কোন লগ্‌-কেবিনে তাঁকে পাওয়া যাবে। তৃতীয় অস্ত্র। সেটা মন-বাহাদুর ওবই জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। আর বেচারীর কোনও 'অ্যালেবাই' নেই। কী জানো সূরয, আইন যাকে বলে 'সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী নেই। ফ্যাক্ট বা তথ্য হচ্ছে ঢোঁড়া সাপ। যেভাবে তাকে ইন্টারপ্রেট করবে, যে-চোখে তাকে দেখবে তাতেই ফ্যাক্টের ফণায় বিষ জমে উঠবে!

গঙ্গারামজী বলেন, তাহলে কেন মনে করছেন রমা দেবী ও কাজটা করেননি?

—যেহেতু আমি প্রমাণ পেয়েছি। কী প্রমাণ তা আমি বল্‌ব না, কারণ রমা আমার ক্লায়েন্ট। তাছাড়া আমি নিশ্চিত, ঘটনার সময় 'মুন্না' ঐ কেবিনে ছিল না।

সূরয বলে, আমাদের কি উচিত নয় পুলিসকে জানানো যে, 'মুন্না' এখন কোথায় আছে তা আমরা জানতে পেরেছি?

—কী দরকার? ওরা ওদের পথে চলুক, আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হব। আমি বরং তোমার মায়ের সঙ্গে আবার একবার কথা বলতে চাই।

—কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তা তো আমরা জানি না। আপনি কাল চলে আসার পরেই ওঁরা দুজন মালপত্র নিয়ে চলে যান। ঘণ্টাদুয়েক পরে টেলিফোন করে জানতে পারি, ওঁরা ঐ হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা কিছু বলে যাননি!

এই সময়েই কৌশিক আর রানী দেবী ফিরে এলেন। সূরয ও গঙ্গারাম বিদায় হলেন। ওঁরা কিছু মার্কেটিং করে এসেছেন। সে সব দেখাতেই কিছু সময় গেল। তারপর খোশগল্প চলল কিছুক্ষণ।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে বাসু-সাহেব বললেন, সূরযকে একবার ফোনে ধর তো?

কৌশিক ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করল। একটু পরেই সাড়া দিল সূরয। বাসু তাকে বললেন, একটা কথা গঙ্গারামজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তোমার পিতাজী কি গঙ্গারামকে কোন নগদ টাকা দিয়েছিলেন—দিল্লি যাবার রাহাখরচ বাবদ?

সূরয বলল, ঠিক জানি না। কেন বলুন তো?

—তুমি গঙ্গারামজীকে একটু জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবে? আমি টেলিফোনটা ধরে আছি।

—চাচাজী তো এখন নেই। ওঁর রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। সেখানেই গেছেন। ফিরতে রাত হবে। কাল সকালে আপনাকে জানাব।

বাসু বললেন, না সূরয, তাহলে সারা রাত আমার ঘুম হবে না। আমি জেগেই আছি। গঙ্গারামজী ফিরে এলে যেন আমাকে ফোন করে খবরটা জানান।

সূরয স্বীকৃতি শুভরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

কৌশিক বলে, ঐ খবরটা সত্যিই এত জরুরী?

—না হলে আমি মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছি?

যাই হোক বাসু-সাহেবকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হল না। গঙ্গারাম রাত প্রায় পৌনে এগারোটায় টেলিফোন করে জানালো, দোশরা তারিখে তার মালিক গঙ্গারামজীকে দশখানি একশ টাকার নোট

দিয়ে বলেছিলেন, যদি দিল্লি যেতে হয় তাই পথ-খরচটা রাখ। আমি টেলিফোনে নির্দেশ দিলেই তুমি ফিক্সড-ডিপজিটগুলি নিয়ে দিল্লি চলে যাবে।

বাসু বললেন, থ্যাঙ্কু!

গঙ্গারাম প্রশ্ন করেন, এ খবরটা হঠাৎ জানতে চাইছেন কেন?

—ডেবিট-ক্রেডিট মেলাতে। ও আপনি বুঝবেন না।

পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাসু-সাহেব প্রাতরাশের টেবিলে এসে দেখেন ডাইনিং টেবিলে খোদাবক্স চারজনের চারখানা প্লেট সাজিয়েছে। রানী দেবী আর কৌশিকই শুধু নয়, প্রাতরাশের টেবিলে বসে আছে সুজাতাও।

—এ কী! তুমি! কোথা থেকে? কখন এসেছ?

সুজাতা বলে, এই মিনিট পনের। আমি ফেল্মু মেরেছি বাসু-মামু। আপনার পাহাড়ী ময়না আমার চোখে ধুলো দিয়ে সটকেছে।

বাসু সক্ষোভে বলেন, যেমন দেবা তেমনি দেবী! তোমরা দুজনেই সমান! এমন করলে তোমাদের 'সুকৌশলী' চল্‌বে কেমন করে?

রানী ওঁকে ধমক দেন, তুমি আর ওকে বকো না। বেচারী এমনিতেই একেবারে ভেঙে পড়েছে।

বাসু-সাহেব জোড়া পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে বলেন, শিকল কাটল কী করে?

—আমরা একটা হোটেলে উঠেছিলাম। এই শ্রীনগরেই। নাম ভাঁড়িয়ে। ডবল্‌-বেড রুম। আমরা দুই বোন এই পরিচয়ে। কাল সারাদিন দুজনে একসঙ্গে ছিলাম। হোটেল ছেড়ে সারাদিনে একবারও বার হইনি। ও বেশ গল্পগুজব করছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—ও পালাবার তালে আছে। ও বরং ভাব দেখাচ্ছিল যেন আপনার ছত্রছায়ায় এসে ও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। যশোদা কাপুরের সঙ্গে ওর প্রেম কী-করে হল সেই গল্পই শোনালো সারাদিন। রাত্রে দরজাটা বন্ধ করে চাবি আমি বালিসের নিচে রেখেছিলাম। তাই প্রথম রাত্রে ও পালাতে পারেনি। পরদিন যখন দেখলাম ওর পালাবার কোনও ইচ্ছাই নেই তখন আমি একটু অসাবধান হয়ে পড়ি। কাল রাত্রে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে চাবি কী-হোলেই রেখে শুয়েছিলাম। আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি পাশের বিছানাটা খালি। প্রথমে ভেবেছিলাম—ও বুঝি বাথরুমে আছে। তার পরই নজর হল টেবিলের উপরে চাবিটা রাখা আছে, আর তার নিচে একখণ্ড কাগজ চাপা দেওয়া। এই দেখুন:

এক লাইনের চিঠি: কিছু মনে করো না ভাই, চলে যাচ্ছি।

কৌশিক বলে, পালালো কেন? কোথায় যেতে পারে?

বাসু বলেন, ও গেছে পহেলগাঁও। তার দেরাজ থেকে একবাণ্ডিল চিঠি বার করে আনতে! নিতান্ত ছেলেমানুষী!

রানী বলেন, তা ছেলেমানুষ ছেলেমানুষী করবে না?

বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন, ছেলেমানুষ! জানো, ওর বয়স কত?

রানী বলেন, বছর দিয়ে কি ছেলেমানুষী মাপা যায়?

* * *

বিকেলবেলা বাসু-সাহেব একটি টেলিফোন পেলেন। রিসিভারটা তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করা মাত্র ও-প্রান্ত থেকে শর্মাজী বলেন, দুঃসংবাদ আছে মিস্টার বাসু। মানে আপনার তরফে।

—বুঝেছি। আমার ক্লায়েন্টকে আপনারা খুঁজে পেয়েছেন।

—হ্যাঁ। শুধু খুঁজেই পাইনি? তাকে হাতে-নাতে ধরা গেছে।

—হাতে-নাতে মানে?

—পুলিস আজ সকাল দশটা নাগাদ ওকে ওর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেছে। ও তখন অর্গলবদ্ধ ঘরে

বসে একরাশ এভিডেন্স পোড়াচ্ছিল। আর ওর বারান্দায় মরে পড়েছিল সেই ময়নাটা: মুন্না!

—মরে পড়েছিল? রমা মেরেছে?

—তাছাড়া আর কে?

বাসুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। বলেন, সে কেন মারতে যাবে?

—পাখিটা কি 'বোল' পড়ে তা নিশ্চয় আপনি ভুলে যাননি?

—সে কথা নয় মিস্টার শর্মা। আপনি কি কোনও যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন—সেক্ষেত্রে এতদিন কেন ঐ মেয়েটি এমন একটা মারাত্মক এভিডেন্সকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখল? কেন তাকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলল না?

—মিস্টার বর্মন বলছেন, হয়তো পাখিটা এই নতুন বোলটা সম্প্রতি পড়তে শুরু করেছে। উনি ক্রিমিনোলজি বিষয়ে এক্সপার্ট—

—টু হেল্ উইথ্ বর্মন অ্যান্ড হিজ এক্সপার্ট ওপিনিয়ান! আপনি নিজে বিশ্বাস করতে পারেন—একটা 'বোল পড়া' পাখি একটা বাক্য একবার মাত্র শুনে দশ-বারোদিন সেটা স্মৃতিতে পুষে রাখল, তারপর হঠাৎ একদিন বোল পড়ল? যে কোনও প্রাণীবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করলেই...

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে শর্মাজী বলেন, বাই দ্য ওয়ে, মিসেস্ সুরমা খান্না কোথায় গেছেন আপনি জানেন?

—না। আমরা কেউই জানি না। আপনি কি তাঁর অ্যালেবাইটা যাচাই করতে পেরেছেন?

—তাঁর কোনও 'অ্যালেবাই' আছে নাকি?

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন।

—আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছি না। আশ্চর্য মানুষ! স্বামী মারা গেছেন আর এখন উনি এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন কেন?

—এবং সেটাও আমার প্রশ্ন।

—সে যাই-হোক, যে জন্য আপনাকে ফোন করছি সেই আসল কারণটা এবার বলি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস্ জাজ আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। কাল কখন আপনার সময় হতে পারে?

—সাক্ষাৎটা কোথায় হবে? পহেলগাঁওয়ে?

—না, শ্রীনগরেই। ধরুন যদি কাল সাড়ে নটা নাগাদ আপনাকে পিক্ আপ করে নিই? অসুবিধা আছে কিছু?

—তার আগে আমি আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে কোথায় আছে? আই মীন, রমা দাসগুপ্তা?

—শ্রীনগরের জেল-হাজতে।

—তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে কাল আটটার সময় আমি জেল-হাজতে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি। তারপর আপনার অফিসে নটায় যাব। গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। সুরযের গাড়িতেই যাব।

—দ্যাটস্ অল র‍্যাইট।

—একটা কথা, আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজের নামটা কী?

—জাস্টিস্ জে. পি. লাল.

—জাস্টিস্ জগদানন্দ প্রসাদ লাল কি?

—হ্যাঁ, আপনি চেনেন?

—নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষের এমন কোন প্র্যাকটিসিং ল'ইয়ার নেই যে তাঁর নাম জানে না। আইনের ওপর অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। ইট উড বি রিয়াল অনার টু মীট হিম্।

নয়

জেল-হাজত সংলগ্ন একটি বিশেষ কক্ষে বসেছিলেন বাসু-সাহেব। এ ঘরেই অভিযুক্ত আসামীরা তাদের উকিল বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে। ওঁকে একটি চেয়ারে বসিয়ে রেখে মেয়ে-কয়েদীদের 'মেট্রন' ভিতরে গিয়েছে অভিযুক্তাকে নিয়ে আসতে। শর্মাজী পূর্বাহ্নেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাসু-সাহেব ঘরটিকে লক্ষ্য করে দেখছিলেন। দেওয়ালে একটাও ছবি নেই। ব্লিচিং পাউডারের একটা উগ্র গন্ধ। এই সূর্যোকবোজ্জ্বল দিনের প্রথম প্রহরেও ঘরের ভিতরটা আলো-আঁধারি—একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস যেন আটকে আছে।

একটু পরেই মেট্রন নিয়ে এল রমা দাসগুপ্তাকে। ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেবকে বললে, ম্যয় বাহার রহুঙ্গী।

দরজাটা টেনে দিয়ে সে চলে যায়।

রমা ওঁকে দেখে ম্লান হাসল। দরজার কাছেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, আবার কেন এসেছেন? আপনার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এই বিপদ ডেকে এনেছি। তবু আপনার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি?

বাসু শুধু বললেন, বস ঐ চেয়ারটায়। কথা আছে।

রমা বসল। সপ্রতিভভাবে বললে, কথা সব ফুরিয়ে গেছে বাসু-সাহেব। এখন শত চেষ্টা করলেও আপনি আর আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

বাসু বলেন, আমি কিন্তু অতটা নিরাশ নই। হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে ওরা অনেকগুলি 'এভিডেন্স' দাখিল করবে বটে—কিন্তু তোমার স্বপক্ষেও যুক্তি কম নয়।

রমা এ-কথায় আশ্বস্ত হল না একটুও। ম্লান হেসে বললে, এটা আপনাদের একটা বাঁধা বুলি, না ব্যারিস্টার সাহেব? অভিযুক্তের মনোবল ফিরিয়ে আনতে?

বাসু বলেন, তুমি এবার আমাকে সব কথা খুলে বলবে?

—সেটা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ দুনিয়ায় আমার দু-কড়ি-সাতের খেলা শেষ হয়ে গেছে! পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে আমার! যে মানুষটাকে ভালবাসলাম—এত...এতদিন পরে, সে মাত্র সাত দিনের মধ্যেই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর ভাগ্যের কী প্রহসন দেখুন, ওরা বলছে আমি নাকি নিজে হাতে সেই মানুষটাকে খুন করেছি! আমি...আমি ..

হঠাৎ গলাটা ধরে এল ওর। অসীম মনোবলে উদ্গত অশ্রুকে সম্বরণ করে বললে, না। যা ভাবছেন তা নয়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ব না। কারণ সত্যিই বাঁচতে আর ইচ্ছা নেই আমার! আচ্ছা, একটা কথা—ওরা ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দেবে না তো?

বাসু বলেন, রমা, তুমি তো বুদ্ধিমতী। এ রকম পাগলামি করছ কেন? আমি তোমাকে অহেতুক মিথ্যা বলে উৎসাহ যোগাচ্ছি না। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছি—তুমি খুন করনি। বললে তুমি বিশ্বাস করবে রমা কী যুক্তিতে আমি ঐ সিদ্ধান্তে এসেছি? একটি মাত্র যুক্তি—কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে তা আমি জানি। কিন্তু যে ধরনের প্রমাণের সাহায্যে তাকে অপরাধী বলে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা যায় সে ধরনের প্রমাণ আমার হাতে নেই। তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে, সব তথ্য আমার হাতে তুলে না দিলে আমি কেমন করে লড়ব?

ধীরে ধীরে অবসন্নতার একটা মেঘ যেন সরে গেল মেয়েটির মুখের উপর থেকে। বললে, আপনি জানেন, কে ওঁকে খুন করেছে? কেন করেছে?

বাসু নীরবে শিরশ্চালনে সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর করলেন।

—কে সে? আমাকে বলতে কী বাধা?

— না। তোমাকেও এখনও বলা চলবে না। তবে তুমি তো আমার পদ্ধতি জান। সওয়াল জবাবের মাধ্যমে আদালতেই অপরাধীকে আমি চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করি—আমি শুধু চাইছি, তুমি আমাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করে যাও শুধু।

সোজা হয়ে বসল রমা। বললে, বেশ। বলুন কী জানতে চাইছেন?

—প্রথমে বল, কেন তুমি আমার অবাধ্য হলে? কেন সুজাতার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পহেলগাঁওয়ে গিয়েছিলে?

ওঁর চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে। আপনি বলেছিলেন, পুলিসে সেগুলি নিয়ে যাবে, পড়বে, আদালতে দাখিল করবে। আমি সেটা চাইনি। তাই।

—কী এমন মারাত্মক কথা ছিল সেসব চিঠিতে!

এতক্ষণে হাসল মেয়েটি। বললে, মারাত্মক কথা কিছুই ছিল না। কিন্তু চিঠিগুলো এমনই ব্যক্তিগত যে,—কী বলব, আদালতে সেগুলো পড়া হচ্ছে মনে করলেই আমার আপাদমস্তক জ্বালা করতে থাকে। কেমন করে বোঝাব আপনাকে বুঝতে পারছি না। এ শুধুই একটা সেন্টিমেন্টাল অনুভূতি।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তাহলে তুমি 'মুন্না'কে মেরে ফেললে কেন?

—ঐ কথাটা পুলিসেও জিজ্ঞাসা করেছিল। কী আশ্চর্য—আপনারা সত্যিই বিশ্বাস করছেন—ওকে আমি মেরেছি?

—তুমি মারোনি?

—নিশ্চয়ই না। আমি তাকে কেন মারতে যাব?

—হয়তো তুমি ওর একটা অদ্ভুত বোল শুনেছিলে...

—জানি, কিন্তু সেটা তো সে সেই প্রথম দিন থেকেই বলছে—সেই দোশরা সেপ্টেম্বর থেকে। তখন তো উনি বেঁচে। উনিই তো নিজের হাতে ওটাকে আমার কাছে দিয়ে গেলেন। মুন্না তো আদৌ কোনদিন ঐ লগ-কেবিনে যায়নি।

—তাহলে? কে ওকে মারল? তুমি কখন সেটা জানতে পারলে?

—শ্রীনগর থেকে আমি ভোর ছ'টা পনেরোর বাসে রওনা হয়েছিলাম। ন'টা নাগাদ বাড়িতে এসে পৌঁছাই। পাশের বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলে চিঠিগুলো পোড়াতে শুরু করি। তার মিনিট দশেকের মধ্যেই সদর দরজায় কে কড়া নাড়ল। খুলে দেখি একজন পাঞ্জাবী পুলিস অফিসার এবং আর একজন লোক। তাঁরা তখনই বললেন, 'যুআর আন্ডার অ্যারেস্ট'। তাঁরা আমার সামনেই ঘরটা সার্চ করলেন। তাঁরাই আবিষ্কার করলেন—মুন্না মরে পড়ে আছে খাঁচায়। যুনিফর্ম যিনি পরেননি তিনি বাঙালী। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পাখিটাকে এভাবে মেরেছেন কেন?' আমি বললাম, 'আমি মারিনি'। তখনই ঐ পাঞ্জাবী অফিসারটি ইংরাজীতে বললেন, মিস দাসগুপ্তা আপনি আমাদের প্রশ্নের জবাবে যা বলছেন বা বলবেন, তা প্রয়োজনবোধে আমরা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে ব্যবহার করতে পারি। তখনই আমার সন্দেহ হল—ওরা আমাকে, আমাকে...একটা জঘন্য অপরাধে ফাঁসাতে চায়। আমি আপনার অনেকগুলো কাহিনী পড়েছি। তাই আমার মনে পড়ল—এ-ক্ষেত্রে সংবিধানগত অধিকারে আমি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করতে পারি। তাই আমি আর কোন কথা বলিনি। আমি কি ভুল করেছি?

—না। তুমি ঠিকই করেছ। এবার বল, মন-বাহাদুর তোমার কাছে যে পিস্তলটা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল সেটা কেমন করে লগ-কেবিনে পাওয়া গেল? তুমি কি সেটা নিজেই লগ্-কেবিনে নিয়ে গিয়েছিলে?

—না। আমি বলছি বিস্তারিত। শুক্রবার দোশরা সেপ্টেম্বর ভোর ছ'টার বাসে উনি পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরে যান। ফিরে আসেন ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়। ওঁর সঙ্গে ছিল 'মুন্না'। সেটা আমাকে উনি উপহার

দেন। শনি আর রবি উনি পহেলগাঁওয়ে ছিলেন। রবিবার বিকালের দিকে উনি বললেন, দিন দশ-বারোর জন্য বাইরে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাইলাম, কোথায়? বললেন, ভবঘুরেকে বিয়ে করেছ রমা, সব কথার জবাব পাবে না। তবে দিন দশ-বারো পরে ফিরে আসব। তারপর কী ভেবে নিজে থেকেই বলেন, এখন সংসারী হয়েছি, এবার থেকে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে। শুনে আমার কেমন যেন খটকা লাগলো। প্রশ্ন করলাম, তুমি কি কিছু বিপদের আশঙ্কা করছ? উনি ম্লান হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছ তুমি। আজকালের মধ্যেই একজনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। ভাবছি একটা ছোরা কিনে ফেলি। তোমার কাছে গোটা কুড়িক টাকা হবে? আমি বললাম, টাকা দিচ্ছি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আরও একটা জিনিস তোমাকে দিতে পারি—একটা লোডেড রিভলভার। উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তখন বুঝিয়ে বললাম, বাহাদুর সেটা আমার কাছে রেখে গেছে। ফিরে এসে নেবে। উনি তখন বললেন, তাহলে টাকা চাইনে। তুমি ঐ রিভলভারটাই দাও। দিন সাতেক পরে ফেরত পাবে। ভয় নেই, ওটা আমি ব্যবহার করব না। কিন্তু ওটা কাছে থাকা ভালো। আমি তখন ওঁকে রিভলভারটা দিলাম। উনি সেইদিনই বিকালে চলে গেলেন। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে উনি ঐ লগ্-কেবিনেই যাচ্ছেন। তারপর আর তাঁকে কোনদিন দেখিনি।

বাসু মিনিটখানেক কী ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার কাছে কিছু গোপন করোনি তো?

মেয়েটিও এতক্ষণ নতমুখে কী ভাবছিল। বললে, হ্যাঁ একটা কথা এখনও আপনাকে বলিনি। সেটাই বোধহয় আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ এভিডেন্স।

বাসু সোজা হয়ে বলেন, কী?

—আমি মঙ্গলবার খুব ভোরে উঠে ঐ লগ-কেবিনের দিকে গিয়েছিলাম। মঙ্গলবার, ছয় তারিখ বেলা দশটা নাগাদ আমি ঐখানেই ছিলাম।

—কেন? তুমি তো জানতে না উনি ওখানেই গেছেন?

—না। তা জানতাম না। এটাও নিতান্তই সেন্টিমেন্ট। ঐ কেবিনটার কাছে যাওয়ার একটা দুরন্ত কামনা হল। ঐ পাইনবনের মৃদু গন্ধ, কাঠবিড়ালী আর পাখিগুলোর...কী বলব, আমি একটু পাগলাটে ধরনের। যখন যা খেয়াল চাপে...

—ঠিক আছে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। তুমি কী করেছিলে শুধু তাই বল। কেমন করে গেলে ওখানে?

—ভোরবেলা রওনা হয়েছিলাম। কিছুটা বাসে, কিছুটা হেঁটে। ওখানে গিয়ে পৌঁছাই দশটা নাগাদ। তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ ওখান থেকে ফিরে আসি। অফিসে যাইনি। ক্যাসুয়াল লীভ নিয়েছিলাম।

—তোমাকে লগ্-কেবিনের কাছাকাছি কেউ দেখেছিল?

—হ্যাঁ। ওখানকার দারোয়ান।

—তুমি কি দেখলে লগ্-কেবিনটা বন্ধ?

—হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি, উনি তখন কাছেই কোথাও বসে মাছ ধরছিলেন।

—জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দাওনি?

—না। আমি তো শুধু বেড়াতেই গিয়েছিলাম।

আবার দুজনেই কিছুটা চুপচাপ।

হঠাৎ মেয়েটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। বলল, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, উনি নেই! কেন—কেন এমন করে ওঁকে মারল বলুন তো? এমন একজন সবল, শান্ত, প্রকৃতিপ্রেমিক...

বাসু ওর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, মনকে শক্ত কর রমা। দু-চার দিনের মধ্যেই তোমার কেস উঠবে আদালতে। প্রাথমিক শুনানী। তোমার বিরুদ্ধে যে রকম কেস, আমার আশঙ্কা হয় দায়রা-সোপর্দ হবেই। যদি না আমি তার আগে কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ সংগ্রহ করে...

মেয়েটি ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি ওদের কী বলব? ওরা যদি সব কথা জানতে চায়? কতটা বলব? আমি কি বলব যে, কোনও কথার জবাব আমি দেব না?

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, না! ঠিক উল্টোটা। তুমি আদ্যন্ত সত্য কথা বলবে। কোন কিছু গোপন করবে না। মনে থাকবে?

—ছয় তারিখ সকালে যে আমি, আমি ওখানে গিয়েছিলাম...

—বললাম তো, দ্য হোল ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ!

মেয়েটি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বললে, কিন্তু কাল বিকালে তো আপনি আমাকে পুলিসের কাছ থেকে লুকিয়েই রাখতে চেয়েছিলেন?

বাসু হাসলেন। বললেন, না, রমা, পুলিসের কাছ থেকে নয়। আমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম সেই লোকটার কাছ থেকে যে মুন্নাকে মারতে আসছে।

—সে কে?

—বুঝলে না? আমি জানতাম, লোকটা মুন্নাকে খুন করতে আসবে। তুমি যদি তাকে দেখে ফেলতে পাখিটাকে মারতে বা প্রতিবাদ করতে যেতে তাহলে লোকটা তোমাকেও মেরে ফেলত! লোকটা একটা খুন আগেই করেছে—মহাদেওপ্রসাদকে;— প্রয়োজন হলে সে আর একটা খুনও করে বসত!

—কিন্তু, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন লোকটা মুন্নাকে মারতে আসবে?

—'পিওর ডিডাক্শান' রমা! পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব। এখন বল, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলতে পারবে তো?

আবার ম্লান হাসল মেয়েটি। বললে, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলা কি এতই কঠিন? দেখবেন, আমি পারব।

দশ

সেশনস্ চলছে। জাস্টিস্ লাল দশটার সময় আদালতে যাবেন। আদালত অবশ্য ঠিক পাশের ঘরখানাই। এখানা ওঁর চেম্বার। ঠিক সাড়ে নটার সময় বাসু-সাহেবকে নিয়ে শর্মাজী ওঁর ঘরে এলেন। জাস্টিস লাল বাসুরই সমবয়সী, দু-এক বছরের ছোট-বড় হতে পারেন। একমাথা ধপধপে চুল, গোঁফদাড়ি কামানো। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েননি। চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা। বাসু-সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ডিলাইটেড টু মীট য়ু মিস্টার বাসু। আপনার সব কীর্তি-কাহিনীই আমার জানা, চাক্ষুষ কখনও দেখিনি এই যা।

বাসু আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলেন, স্যার, আপনার বিরুদ্ধে আমি ডাকাতির অভিযোগ আনব...

—মানে?

—এখানে এসে প্রথমেই আপনাকে যে কথাগুলো বল্‌ব ভেবে এসেছিলাম, তা আপনি ছিনিয়ে নিয়ে বলে ফেললেন।

হো-হো করে হেসে উঠলেন লাল।

বাসু যোগ করেন, আইন এবং আদালত বিষয়ে আপনার মৌলিক চিন্তা আমাদের মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে শেষ বইখানা: *অ্যান অ্যানালিসিস অব্ জুডিশিয়ারি।*

—যাক, ওটা পড়া আছে আপনার। তাহলে অল্প কথায় সারা যাবে। দশটায় আমার একটা কেস আছে। তাই সংক্ষেপে সারতে চাই। আপনাকে ডেকেছি; একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশানে; মানে আইন-আদালত সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায়। বস্তুত আমি একটি প্রস্তাব রাখব আপনার সামনে। আপনি গ্রহণ করতেও পারেন, বর্জন করতেও পারেন।

—বাসু বলেন, বলুন?

লাল বলেন, সময় কম। সরাসরি বিষয়বস্তুতে আসা যাক। আপনি আমার বইটা পড়েছেন। আপনি জানেন, আমি তাতে ভারতীয় জুডিশিয়ারির সমস্যাগুলি এবং তার সমাধানের বিষয় আলোচনা করেছি। যে কোন আদালতে যান, দেখবেন মামলা পাঁচ-সাত দশ বছর ধরে ঝুলে আছে। শুধু হিয়ারিঙ ডেট আর হিয়ারিঙ ডেট। অথচ বছরের 365 দিনের মধ্যে আদালতই সবচেয়ে বেশি দিন বন্ধ থাকে। কল-কারখানার কথা ছেড়ে দিন— স্কুল-কলেজ-সরকারী-বেসরকারী অফিসের তুলনায় কোর্টের ছুটি অনেক-অনেক বেশি। যদি প্রশ্ন করেন—কেন? জবাবে শুনবেন জজ-সাহেবদের বেশি বিশ্রামের দরকার। তাঁদের ল-পয়েন্টের পড়াশুনা করার সময় চাই। যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তা চাই না। দ্বিতীয় কথা, এই গোটা কাঠামোটাকেই আমি আমার গ্রন্থে আক্রমণ করেছি।আপনার মনে আছে নিশ্চয়, শেষদিকে আমি বলেছি 'পিপল্‌স্-কোর্ট' বা গণ-আদালতের কথা। আমি বলেছিলাম, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে বিচার-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আংশিক ভাবে ন্যস্ত করে ঐ পর্বতপ্রমাণ এরিয়ার কেসগুলো শেষ করা যায় কিনা। দেশে 'পঞ্চায়েত-রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেখানে আছেন দেশ-দশের আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা। আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম, সেইসব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে জুরির মাধ্যমে আমরা কিছুটা সুবিধা করতে পারি কিনা। আমার প্রস্তাবটা ছিল এই রকম:

বর্তমানে একশ্রেণীর ক্রিমিনাল কেসগুলোর প্রাথমিক বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। সেখানে 'প্রাইমা-ফেসি' কেস প্রতিষ্ঠিত হলে সেগুলি দায়রার সোপর্দ করা হয়। অর্থাৎ সেশনসে আসে। শুধুমাত্র কলকাতা আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে হোমিসাইড কেসগুলোর বিচার হয় তিন ধাপে—প্রথমে করোনারের আদালত, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের এবং সবশেষে সেশনসে। তারপর আপীল হলে তো হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট আছেই। কলকাতা বা মাদ্রাজ ছাড়া বোম্বাই বা দিল্লির মতো শহরেও করোনারের ব্যবস্থা নেই। যদি জানতে চাই, কেন? তাহলে জবাবে শুনতে হবে ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল 1861 সালে, যখন বোম্বাই জমজমাট হয়নি, দিল্লি রাজধানী ছিল না। আমি প্রস্তাব করেছিলাম, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজধানীতে করোনারের আদালত থাকবে এবং করোনার হবেন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত কোনও 'সভাধিপতি'। এটাই আমার প্রথম পর্যায়ের পিপল্‌স্-কোর্ট বা গণ-আদালত। সভাধিপতি-করোনার হোমিসাইড কেসগুলার প্রাথমিক শুনানী নিলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে যাবে। এ পরীক্ষা ফলপ্রসূ হলে আমরা দেখব ঐ সভাধিপতি-করোনার'কে প্রাথমিক আইনের শর্ট-কোর্স দিয়ে তাঁদের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা। সেক্ষেত্রে ঐ করোনার আদালত থেকে কেস সরাসরি দায়রায় আসবে।

এ নিয়ে আমি সুপ্রীম কোর্টের কয়েকজন জাজের সঙ্গে এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে কথা বলি। ওঁরা পরীক্ষামূলকভাবে একটি কেস করতে সম্মত হয়েছেন। বিশেষ আদেশনামা জারী করে আমাকেই সেই পরীক্ষাটি করতে বলেছেন। ঐ বিচারের প্রসিডিংস্ আদ্যন্ত টেপ করা হবে, যেটা শুনে সুপ্রীম কোর্ট বিধান দেবেন এজাতীয় বিচারের সম্ভাবনা কতখানি। মুশকিল হচ্ছে এই যে, সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি পেলেও আমি সেটা কার্যকরী করতে পারছিলাম না নানান কারণে। সে যাই হোক, এখন দেখছি একটি অপূর্ব সুযোগ এসেছে। লেট মহাদেওপ্রসাদ খান্নার খুনের মামলাটা। মহাদেওপ্রসাদ এক্স-এম. পি.। স্বনামধন্য ব্যক্তি, সুতরাং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস। এদিকে দেখা যাচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই কেসটার জন্য সি. বি. আই. থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে এনেছেন। ফলে এই কেসটা একটা সর্বভারতীয় রূপ নিতে চলেছে। তারপর যখন শুনলাম ডিফেন্স কাউন্সেল হচ্ছেন 'পেরী মেসন অফ দ্য ঈস্ট' তখনই আমি মনস্থির করেছি। এখন আপনি বলুন, আপনি কি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?

বাসু বলেন, আমি এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ঐ সভাধিপতিকে কি ফার্স্টক্লাস

ম্যাজিস্ট্রেটের পদাধিকার-বলে-প্রাপ্ত অধিকার দেওয়া হবে? জুরি থাকবে কি? ক্রস এক্সামিনেশন, রি-ডাইরেক্ট, ইত্যাদি থাকবে? বিচারক যেহেতু আইন জানেন না, তাই বে-আইনি কিছু হলে তা কে দেখবে?

—না। দেড় দু'শ বছর আগে যেভাবে বিচার হত সেভাবেই হবে। বাদী ও প্রতিবাদী তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছামত সাক্ষীদের সমন ধরাবেন। করোনার আদালতে যেভাবে বিচার হয় সেভাবেই হবে। আর একটা কথা—আমি নিজে উপস্থিত থাকব। বিচারক অনভিজ্ঞতার জন্য বে-আইনি কিছু করলে আমি সম্পূর্ণ বিচারটাকেই বিধিবহির্ভূত বলে পুনর্বিচারের আয়োজন করব। সে অধিকারও আমাকে দেওয়া হয়েছে।

বাসু বললেন, সে-ক্ষেত্রে আমি সম্মত।

—থ্যাঙ্ক মিস্টার বাসু।

বাসু বলেন, আমি ভেবেছিলাম লেট মহাদেওপ্রসাদের কেসটার বিষয়েই বুঝি আপনি কিছু আলোচনা করতে চান।

লাল হেসে বলেন, তাই কি পারি? ওটা যে সাবজুডিস!

এগারো

আদালতে অপ্রত্যাশিত জনসমাগম হয়েছে। একাধিক কারণে। এ কয়দিন সংবাদপত্রে নানান খবর ফলাও করে ছাপা হওয়াতে সাধারণ মানুষ স্বতই উৎসাহী। ওদিকে এই 'করোনারের-আদালত' নিয়ে জাস্টিস্ লাল যে পরীক্ষা করতে চলেছেন সে বিষয়েও আইনজ্ঞ মানুষদের কৌতূহল।

সভাধিপতি-করোনারের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। মাঝারি গড়ন, গম্ভীর এবং আত্মপ্রত্যয়ের একটা ভাবব্যঞ্জনায় মনে হয় তিনি দৃঢ়চেতা। সমবেত জনমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি বললেন, বন্ধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আজকের এই বিচার নানান কারণে আইন-বিভাগের একটা বিশিষ্ট দিক চিহ্ন। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি স্বর্গত মহাদেও প্রসাদ খান্নার রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করতে—কেন তিনি মারা গেলেন। এবং যদি দেখা যায়, তিনি স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি, কেউ তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে তাহলে কে সেই লোক, সে কথাও আমরা ভেবে দেখব। আমরা এখানে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আসামীর বিচার করতে বসিনি। আমরা শুধু নির্ধারণ করতে বসেছি পহেলগাঁওয়ের অদূরে ট্রাউট-প্যারাডাইসের একটি নির্জন লগ্-কেবিনে কীভাবে মহাদেও প্রসাদ খান্না মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিছু ক্যামেরাধারী সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের আমি জানাচ্ছি—বিচার চলাকালে তাঁরা যেন কোন আলোকচিত্র গ্রহণ না করেন। সাধারণ দর্শকদের আমি বলব, তাঁরা যেন কোনও গণ্ডগোল না করেন।

আমি করোনারের প্রচলিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হতে চাই। করোনার অধিকাংশ সময়েই বাদীপক্ষের প্রতিনিধিকে—এক্ষেত্রে পাব্লিক প্রসিকিউটার শ্রীপ্রকাশ সাক্সেনাকে—প্রশ্নগুলি করে যাওয়ার সুযোগ দেন। তার মানে এই নয় যে পি. পি.ই এ বিচার পরিচালনা করবেন। তার মানে এই যে, পি. পি. আমাকে সাহায্য করবেন সত্যে উপনীত হতে। এবং এ-ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গে তিনি সম্ভাব্য হত্যাকারীকে চিহ্নিত করবার প্রচেষ্টা করবেন। এস. ডি. ও. সদর শ্রীশর্মাও এখানে উপস্থিত—তিনিও ঐ কাজে আমাদের সাহায্য করবেন, যেহেতু তদন্তে তিনিও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশানস্ জাজ জাস্টিস্ লালও এখানে উপস্থিত। তিনি বস্তুত আমার বিচারক। যদিও তিনি এ বিচারে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। সে যাই হোক, আমাকে জানানো হয়েছে—একজন

বিশেষজ্ঞকেও কেন্দ্রীয় সি. বি. আই.য়ের সংস্থা থেকে আনানো হয়েছে—যিনি এজাতীয় হত্যারহস্য উদ্ঘাবনে পারদর্শী; তাঁর সাহচর্যও আমরা পাব। এছাড়া মৃত খান্নাজীর পুত্র শ্রীসুবযপ্রসাদ খান্নাব তরফে উপস্থিত আছেন শ্রীপি. কে. বাসু, ব্যারিস্টার। প্রসঙ্গত তিনি শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তার কৌঁসিলীও বটে।

আমি সকলকেই পরিষ্কাবভাবে জানিয়ে বাখতে চাই যে, দীর্ঘ বক্তৃতা বা চুলচেরা আইনঘটিত অবজেক্শান' শুনবার জন্য আমরা সমবেত হইনি। নিছক 'তথ্য' ছাডা আমাদের আব কোনও কিছুতে কৌতূহল নেই! সুতরাং সওয়াল-জবাবের প্যাঁচে সাক্ষীকে কাযদা কবা, বা গবম-গরম বক্তৃতা দিয়ে জুরি ও বিচারককে অভিভূত কবার চেষ্টাকে আমরা ববদাস্ত কবব না।

সাধারণ বিচাবসভায় বাদী তাঁব ইচ্ছামত সাক্ষীদেব ক্রমান্বয়ে আহ্বান করেন, তাঁকে প্রশ্ন কবেন এবং প্রতিবাদী তাঁকে জেবা করেন। বাদীব সাক্ষীব তালিকা শেষ হলে প্রতিবাদী তাঁব সাক্ষীদের একে একে আহ্বান কবেন এবং সাক্ষ্যগ্রহণ কবেন। সেবাব বাদী সাক্ষীদেব জেবা করেন। আমরা এই পদ্ধতিতে অগ্রসব হব না। কাবণ ঐ পদ্ধতি অবলম্বন কবাব একমাত্র হেতু বাদী অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ কবতে চান, প্রতিবাদী প্রমাণ কবতে চান সে নির্দোষ; এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কেউ নেই। আবক্ষা বিভাগ যদি কাউকে এই কেস-এ আটক কবে থাকে, তা তাদের ব্যাপার। আমাব সামনে এমন কোনও তথ্য নেই যাতে কাউকে অভিযুক্ত বা আসামীরূপে চিহ্নিত কবা যায়। যেহেতু আসামী বলে কিছু নেই, তাই বাদী ও প্রতিবাদীও কেউ নেই। সুতবাং সত্য উদ্ঘাটন মানসে আমিই সাক্ষীদেব পর্যায়ক্রমে আহ্বান কবব এবং 'তথ্য' সংগ্রহেব উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশ্ন কবব। আমার প্রশ্ন শেষ হলে পি. পি. এবং শ্রীবাসু যাতে সাক্ষীকে প্রশ্ন করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে আমাদের সাহায্য করতে পারেন সেটাও আমরা দেখব।

আশা করি আমি আমার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিটা বোঝাতে পেরেছি। এখানে 'তথ্য' সংগ্রহেব মাধ্যমে সত্য' প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য নেই। জেরার মাধ্যমে সাক্ষীকে দিয়ে কিছু কবুল করানো, লম্বা বক্তৃতা বা 'টেক্‌নিক্যাল অবজেক্শান' আমরা কোনমতেই বরদাস্ত কবব না।অ্যাম আই ক্লিয়ার?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পি. পি. প্রকাশ সাক্সেনা এর পর উঠে দাঁডিযে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু 'টেক্‌নিক্যাল অবজেকশান' বল্‌তে ঠিক কী বোঝায় সে বিষয়ে করোনারের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকটি বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে আমি যেভাবে সেটাকে 'ইনটারপ্রেট' করব সেটাই গ্রাহ্য হবে। লুক হিয়ার সারস্! আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আইন কিছুমাত্র জানি না। আমার জুবিরাও সাধারণ মানুষ—ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, বিজনেসম্যান ইত্যাদি। তাঁবাও আইন জানেন না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে যে সব 'তথ্য' এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে তাই সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে দেওয়া, যাতে জুরিরা বুঝতে পারেন কী-ভাবে মহাদেও প্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন। জুরিরা জানেন, তারা এখানে কেন সমবেত হয়েছেন। অন্তত আমি জানি আমি এ চেয়ারে কেন বসেছি। সুতরাং 'টেক্‌নিক্যালিটি' বলতে কী বোঝায় তার ভাষ্য আমি চূড়ান্তভাবে দেব।

সর্বপ্রথমে আমি আহ্বান করতে চাই মহম্মদ খুরশেদকে, যিনি মৃতদেহ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। মিস্টার খুরশেদ, আপনি এগিয়ে আসুন এবং হলফনামা পাঠ করুন।

খুরশেদ হলফ নিলেন, নিজের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচয় দিলেন। বিচারক প্রশ্ন করেন, মিস্টার খুরশেদ, আপনিই প্রথম মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন, তাই না?

প্রকাশ সাক্সেনা তার পার্শ্ববর্তী ডেপুটিকে বলল, প্রথম প্রশ্নটাই লীডিং কোশ্চেন।

ডেপুটি জনান্তিকে বলল, চেপে যান স্যার! এখানে আইন মোতাবেক কিছুই হবে না!

খুরশেদ শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায়?

—পহেলগাঁওয়ের উত্তরে ট্রাউট-প্যারাডাইসের একটি লগ্-কেবিনে।

—আপনাকে আমি একটি ফটো দেখাচ্ছি। দেখে বলুন এই কেবিনটিই কি?

সাক্ষী আলোকচিত্রটি দেখে স্বীকার করলেন, এই কেবিনই। বিচারক তখন ওঁকে আনুপূর্বিক সব কিছু একটা বিবৃতির আকারে বলতে বলেন। কবে, কখন, কী ভাবে উনি মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন।

সাক্ষী যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার এই রকম মৃতদেহটি উনি আবিষ্কার করেন রবিবার, এগারোই সেপ্টেম্বর। উনিই একটি লগ কেবিন ভাড়া নিয়েছিলেন। রবিবার এগারোই সেপ্টেম্বর সকাল আটটা নাগাদ যখন উনি ঐ লগ কেবিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ঐ লগ-কেবিনটার ভিতর থেকে একটা ময়নার ডাক শোনেন। ময়নাটা ক্রমাগত কর্কশ স্বরে ডাকছিল। উনি লক্ষ্য করে দেখেন, লগ কেবিনের সদর দরজাটা বন্ধ। তখন ওঁর মনে পড়ে দিন দুয়েক আগেও উনি দেখেছিলেন ঘরটা তালাবন্ধ এবং তখনও একটা পাখির ককশ ডাক শোনেন। উনি ভাবেন, এই লগ-কেবিনটি যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি হয়তো শহরে গিয়ে কোনও কারণে আটকে পড়েছেন এবং অভুক্ত ময়নাটা তাই ক্ষুধার তাড়নায় ডাকছে কৌতূহলী হয়ে উনি এগিয়ে আসেন। জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে একজন মানুষকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখনই উনি নিজের লগ কেবিনে ফিরে যান এবং পুলিসকে টেলিফোনে খবর দেন। তারপর ও সি যোগীন্দর সিং এবং এস ডি ও শর্মাজী এসে পড়েন। দারোয়ানের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে ঘরটা খোলেন।

করোনার বলেন, ঠিক আছে। এর পর কী হয়েছিল তা আমরা ও সি যোগীন্দর সিংয়ের কাছে শুনব মিস্টার পি পি অ্যান্ড মিস্টার বাসু আপনাদের কোনও প্রশ্ন আছে?

দুজনেই জানালেন তাদের কোনও জিজ্ঞাস্য নেই। অতঃপর বিচারকের আহ্বানে সাক্ষী দিতে উঠলেন যোগীন্দর সিং। করোনার বলেন এবার আপনি বলুন ঘরে ঢুকে আপনারা কী দেখলেন?

যোগীন্দর প্রথমেই লগ-কেবিনের একটি প্ল্যান দাখিল করে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি কোন্‌টা কোথায় ছিল তা ঐ নক্সাতে দেখানো হয়েছে. তিনি জানালেন, মৃতদেহটি মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়েছিল। বা হাতটা বাড়ানো, ডান হাত বুকের উপর' পিস্তলটা ছিল মৃতদেহ থেকে অনেক দূরে। বললেন প্রথমেই আমরা ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলাম। না হলে পচামাছের গন্ধে ঘরের ভিতর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না' মাছের পলোটা প্রথমেই ঘর থেকে বার করে বাইরে রাখা হল। ময়নাটাকে আমরা খাচায় পুরে ফেললাম। মৃতদেহের এবং পিস্তলের আউট-লাইনটা কাঠের মেঝেতে চক দিয়ে দাগিয়ে দিলাম। মৃতের পরনে ছিল পায়জামা। উর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা শার্ট ও হাতকাটা সোয়েটার ছিল। হাতে দস্তানা পরা ছিল না। আমি থানাতেই বলে গিয়েছিলাম, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স, ফটোগ্রাফার ও ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট এসে গেল। কয়েকটা ফটো নিয়ে মৃতদেহকে আমরা মর্গে পাঠিয়ে দিলাম। ঐসঙ্গে মাছের পলোটাও। ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট আঙুলের ছাপ নেন।

করোনার বলেন, জাস্ট এ মিনিট' ফটোগুলো কি আপনি সঙ্গে করে এনেছেন?

—ইয়েস স্যার'- খান ছয়েক হাফ-সাইজ ফটো তিনি দাখিল করেন।

করোনার সেগুলি নিজেও দেখলেন এবং জুরীদের দেখতে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করেন, আঙুলের ছাপ কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?

–আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকগুলি। মহাদেও প্রসাদের এবং দারোয়ানের। একটা কাচের গ্লাসে শ্রীরমা দাসগুপ্তার একটি এবং আরও তিন-চারটি অজানা লোকের, যাঁরা হয়তো আগে ঐ ঘরে বাস করে গেছেন।

—শ্রীরমা দাসগুপ্তার আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আছে কি?

—আজ্ঞে না, নেই। উনি গ্রেপ্তার হওয়া, পরে ওঁর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। একটি জলের গ্লাসে ঐ আঙুলের ছাপ নিঃসন্দেহে পাওয়া গেছে।

—ঠিক আছে। তারপর কী হল বলে যান।

যোগীন্দর তাঁর জবানবন্দি দিয়ে বলেন, তারপর এস ডি ও শর্মাজী এবং আমি লগ্-কেবিনটাকে

ভালোভাবে পরীক্ষা করি। প্রথমে রান্নাঘরের কথা বলি সেখানে কিছু আনাজপাতি ছিল কিছু টিনের খাবার। কফি, বিস্কুট, চিনি, কন্ডেন্সড মিল্ক ইত্যাদি ছিল রান্নাঘরে ময়লাফেলা ঝুড়িতে দুটি ডিমের খোলা, পাঁউরুটি জড়ানো পাতলা কাগজ ছাড়া আর কিছু ছিল না স্টোভের উপর সসপ্যানে কিছু ঘন হয়ে যাওয়া কফি ছিল। সিংক-এ একটা কাচকড়ার প্লেটে পাউরুটির টুকরো এবং ডিমের ভুক্তাবশেষ ছিল। মনে হল, খাবার পর ঐ প্লেটটা সিংক-এ নামিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু ধোয়া হয়নি।

বাথরুমে একটা ব্যবহৃত তোয়ালে এবং ছাড়া আন্ডারওয়ার ছিল সোপকেস স্ট্যান্ডে একটা সাবানও ছিল কিন্তু বাথরুমের মগটা ছিল না।

শয়নকক্ষে লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে চেয়ারের পিঠে ঝোলানো একটা গরম কোট তার পকেটে রুমাল, একটা ক্যাপস্টান সিগ্রেটের প্যাকেটে আটটি সিগ্রেট একটি দেশলাই। কোটের ইনসাইড পকেটে মনিব্যাগ ছিল। তাতে ছিল শ তিনেক টাকা—নোটে ও খুচরায়, আর ছিল একখণ্ড কাগজ তাতে শ্রীরমা দাসগুপ্তার নাম ঠিকানা যদিও নামটা লেখা ছিল রমা খান্না।

—এক মিনিট। কাগজটা আপনি এনেছেন?

যোগীন্দর সেটি দাখিল করেন। করোনার সেটা পরীক্ষা করেন বাসুও এবং জুরীরাও। ইংরেজী হরফে লেখা ছিল মিসেস রমা খান্না মেথডিস্ট চার্চের পিছনে মাঝের গোথাটাস পহেলগাঁও।

বাসু-সাহেব জনান্তিকে রমাকে প্রশ্ন করেন, এটার কথা তো কিছু বলনি?

—আমি এটার অস্তিত্বের কথা জানতামই না কী বলব?

করোনার বলেন, য়ু মে প্রসীড—

যোগীন্দর বলেন, দেওয়ালে পেরেকে আটকানো হ্যাঙার থেকে ঝুলছিল একটা গরম প্যান্ট টেবিলের উপর ছিল একটা অ্যালার্ম ঘড়ি। দুটো বেজে সাত মিনিটে দম ফুরিয়ে থেমে ছিল অ্যালার্ম কাটাটা ছিল সাড়ে পাঁচটার ঘরে। অ্যালার্ম দমও সম্পূর্ণ শেষ হয়েছিল মানে দম বাজার পর ঘড়ির অ্যালার্ম দম ফুরিয়ে থেমে গিয়েছিল। এ ছাড়া ছিল টেলিফোন খাটের নিচে সুটকেস—তাতে জামা-কাপড়, শেভিং সেট, দশ প্যাকেট সিগ্রেট টুথব্রাশ পেস্ট, কিছু ঔষধপত্র ও খাম পোস্টকার্ড এবং একশ টাকার চুয়ান্নখানা নোট। সুটকেস তালাবন্ধ ছিল না। ফায়ার প্লেসে কাঠগুলি সাজানো ছিল। বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা, তাতে পাটভাঙা একটা চাদর।

শয়নকক্ষে একটা গা আলমারি ছিল। তার নিচের তাকে একজোড়া ধুলোমাখা জুতো মোজা জুতো-ঝাড়া ব্রাশ ছিল মাঝের তাকে আধডজনখানেক ধোপদস্ত বিছানার চাদর ও কিছু তোয়ালে। উপরের তাকটা এতই উঁচুতে যে, মেঝেতে দাঁড়িয়ে সহজে নজর চলে না। চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম—সেখানেও কিছু জিনিসপত্র আছে একটা মেয়েদের অন্তর্বাস, মানে বক্ষবন্ধনী মেডেনফর্ম, 32" মাপের। একজোড়া উলের-কাঁটা, কিছু উল ও আধবোনা সোয়েটার এবং খান দুয়েক ছবি। জলরঙে আঁকা। ঐ লগ-কেবিনের কাছ থেকে দেখা নিসর্গ চিত্র। এছাড়া ঘরে ছিল হুইল ছিপ।

পিস্তলটাতে দুটো চেম্বার। দুটি থেকেই ফায়ার করা হয়েছে, কিন্তু স্পেন্ট-আপ বুলেটগুলি ঐ পিস্তলেই আছে। সেটি স্যাক্সবি কোম্পানির। তার নম্বর পি 293750।

করোনার প্রশ্ন করেন, ঐ পিস্তলটার বিষয়ে শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তা কি আপনার কাছে কোনও স্বীকারোক্তি করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটা কিন্তু অনেক পরে। মাত্র গত পরশুদিন। উনি বলেছিলেন, ঐ পিস্তলটা স্টেট-ব্যাঙ্কের দারোয়ান মন-বাহাদুরের। সে দেশে যাওয়ার সময় ওটা রমা দেবীর কাছে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেটি তিনি তাঁর স্বামী মহাদেও প্রসাদ খান্নাকে দিয়েছিলেন শুক্রবার দোশরা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়।

পাবলিক প্রসিকিউটার প্রকাশ সাকসেনা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, জাস্ট এ মোমেন্ট। রমা

দেবী সেই স্বীকারোক্তি কি স্বেচ্ছায় করেছিলেন, না পুলিস তাঁকে ভয় দেখিয়ে, বা লোভ দেখিয়ে সে-কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল?

—না কোনরকম ভয় বা লোভ তাঁকে দেখানো হয়নি। আপনিই আমার সম্মুখে রমা দেবীকে প্রশ্ন করেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় ঐ স্বীকৃতি দেন।

করোনার বলেন, বর্তমান সাক্ষীকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করবেন?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার দু-একটা প্রশ্ন আছে।

—জিজ্ঞাসা করুন।

বাসু বলেন, যোগীন্দর সিংজী, আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন, শয়নকক্ষের মাঝের তাকে আধ-ডজন-খানেক পাটভাঙা বিছানার চাদর ছিল। আধডজন-খানেক বলতে পাঁচ থেকে সাতখানা যা কিছু হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি গুনে দেখেছিলেন কটা চাদর ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছয়টা।

—মিস্টার সিং, আপনি কি বলতে পারেন অতগুলো চাদর কেন ছিল?

—হ্যাঁ পারি। লগ-কেবিনে সপ্তাহে একদিন মাত্র লন্ড্রির ব্যবস্থা আছে। অতগুলি চাদর থাকে যাতে সেলফ-হেলপে বিছানা পরিষ্কার রাখা যায়।

—ধন্যবাদ। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি ঘরের যে নক্সাটা দিয়েছেন তাতে খাটের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তার একদিকে দেখছি একটা ছোট্ট আয়তক্ষেত্র আছে, ওটা কি মাথার বালিশের অবস্থান দেখানো হয়েছে?

—ইয়েস। দ্যাটস্ ইট।

—আমার তৃতীয় প্রশ্ন, টেবিলের উপর ঘড়িটা ছিল একথা আপনি জানিয়েছেন। সেটা টেবিলের কোনখানে ছিল? খাটের দিকে না বাথরুমের দিকে?

—খাটের দিকে।

—দ্যাটস্ অল।—বাসুর প্রশ্ন শেষ হল।

করোনার বললেন, এবার আমি শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তাকে সাক্ষী দিতে ডাকব। তারপর জুরীদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা হয়তো জানেন, মহাদেওপ্রসাদের হত্যাপরাধে পুলিস শ্রীমতী দাসগুপ্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আর শ্রীযুক্ত পি. কে. বাসু তাঁর কৌসিলী। এ-সব ক্ষেত্রে অভিযুক্তের কাউন্সেলার তাঁর মক্কেলকে এই রকম করোনার-আদালতে কোনও কথা না বলাতে বলেন। সুতরাং শ্রীমতী দাসগুপ্তা সম্ভবতঃ আমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না। তবু আমি তাঁকে সাক্ষী দিতে ডাকছি, যাতে আপনারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পান, চিহ্নিত করেন, এবং কী ভাষায় তিনি উত্তরদানে অস্বীকৃত হচ্ছেন, তাও লক্ষ্য করেন।

রমা দাসগুপ্তা সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ায় ও শপথবাক্য পাঠ করে।

বাসু বলেন, মহামান্য করোনার ও জুরীদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি—প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে আমি আমার মক্কেলকে পরামর্শ দিয়েছি সব কিছু অকপটে বলতে। শ্রীমতী দাসগুপ্তাকে আমি অনুরোধ করছি, জিজ্ঞাসিত হলে তিনি যেন প্রশ্নগুলির যথাযথ জবাব দেন।

জাস্টিস লাল ঝুঁকে পড়ে বাসুকে ভাল করে দেখলেন।

রমাকে দেখে মনে হয় সে খুবই ক্লান্ত, দেহে ও মনে অবসাদগ্রস্ত। তবু তার ঋজু ভঙ্গিমায় কিছুটা প্রশান্তি এবং সম্ভবত দার্ঢ্যের ব্যঞ্জনা। দীর্ঘসময় ধরে সে তার অভিজ্ঞতার একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনিয়ে গেল। গত বছর কী ভাবে সে পহেলগাঁওয়ের অদূরে চিত্রাঙ্কনরত খান্নাজীর সাক্ষাৎ পায়, কী ভাবে এক বছর ধরে তাঁর চিঠি পায়। তারপর এ বছরের ঘটনা। কীভাবে তাদের বিবাহ হয়, এই লগ-কেবিনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে এবং গত দোশরা সেপ্টেম্বরে সে তার স্বামীর কাছ থেকে একটি

ময়না উপহার পায়। তাঁকে একটি পিস্তল দেয়। সবশেষে জানালো, খবরের কাগজে মহাদেও প্রসাদের ছবি থেকে সে জানতে পারে তার স্বামীর পরিচয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদে মর্মাহত হয়ে পড়ে।

প্রকাশ সাক্‌সেনা লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ওর দীর্ঘ জবানবন্দি শেষ হওয়া মাত্র। বলে, মিস্ দাসগুপ্তা, এ-কথা কি সত্য যে, আপনি সংবাদপত্রে ঐ ছবিটি দেখেই তৎক্ষণাৎ আপনার কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং আত্মগোপন করেন?

—হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ আমি কর্মস্থল ত্যাগ করে শ্রীনগরে আসি। কিন্তু আত্মগোপন করিনি। আমি নিজেকে বিপদগ্রস্তা ভেবেছিলাম; তাই শ্রীপি. কে. বাসুর শরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রকাশ বলে, ছদ্মনামে একটা হোটেলে উঠতে পরামর্শ দেন?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ব্যস্! এ প্রশ্নের জবাব আমার মক্কেল দেবে না। সে বলেছে শ্রীনগরে পৌঁছেই সে আমাকে তার কাউন্সেলার হিসাবে নিযুক্ত করে। ফলে এর পর সে যা কিছু করেছে, তা আমার নির্দেশে করেছে। তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। ময়না তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিও না।

প্রকাশ বলে, আমার ধারণা, করোনার বলেছিলেন, এখানে টেক্‌নিক্যাল অবজেকশান কিছু থাকবে না।

—আমি তো টেক্‌নিক্যাল অবজেকশান কিছু দিইনি। আমি আমার মক্কেলকে শুধু বলেছি, ও প্রশ্নের জবাবটা না দিতে।

—আই ডিমান্ড দ্যাট শী আনসার ইট!

করোনার বললেন, মিস্টর পি. পি., আপনি এ দাবী করতে পারেন না। বস্তুত শ্রীবাসুর নির্দেশে শ্রীমতী দাসগুপ্তা কোন প্রশ্নের জবাবই না দিতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃত্য সত্য উদ্ঘাটনে শ্রীবাসু স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সাক্ষীকে প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছেন। আপনি যে প্রশ্নটি বর্তমানে পেশ করেছেন, সে বিষয়ে শ্রীবাসু বলেছেন—তাঁর নির্দেশেই সাক্ষী যা কিছু করার তা করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাক্ষী বাধ্য নন। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

প্রকাশ সাক্‌সেনা তখন সাক্ষীকে অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে, এ-কথা কি সত্য যে, যেদিন আপনি গ্রেপ্তার হন সেদিন সকাল ছয়টার বাসে আপনি শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁওয়ের বাসায় ফিরে আসেন?

—হ্যাঁ, সত্য।

—এবং বাড়িতে ফিরেই আপনি কিছু কাগজপত্র পোড়াতে শুরু করেন!

—হ্যাঁ, তাও সত্য।

—কারণ ঐ কাগজপত্রের মধ্যে এমন তথ্য ছিল যাতে আপনার হত্যাপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়?

—না, সেকথা ঠিক নয়। আমি যে কাগজপত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলছিলাম তা শুধু চিঠি। আমার স্বামী গত এক বছর ধরে যেগুলি আমাকে লিখেছেন। আমি চাইনি তা পুলিসের হাতে পড়ুক—এবং প্রকাশ্য আদালতে তা পড়া হয়।

—কেন? তাতে আপনার আপত্তি কিসের? যদি তাতে আপনার হত্যাপরাধ প্রতিষ্ঠিত না হয়?

—চিঠিগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমি চাইনি তা প্রকাশ্য আদালতে পড়া হোক।

—সে কথা আপনি আগেও বলেছেন। আমি জানতে চাইছি: কেন?

—এটা সেন্টিমেন্টের কথা। এর জবাব হয় না।

—বেশ! এ-কথা কি সত্য যে, যেদিন মহাদেও প্রসাদ খুন হন,সেদিন সকালে আপনি বেলা দশটা নাগাদ ঐ লগ্-কেবিনে উপস্থিত ছিলেন?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন বাসু: অবজেকশান য়োর অনার। কোন্ তারিখে মহাদেও প্রসাদ খুন হয়েছেন তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং প্রশ্নটি অবৈধ!

প্রকাশ রুখে ওঠে, আপনি বলতে চান মহাদেও প্রসাদ ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা নাগাদ খুন হননি?

বাসু বলেন, আমি বলতে চাই—সেটাও এই করোনার-এন্‌কোয়ারির অন্তর্ভুক্ত! কে-কবে-কখন-কেন মহাদেও প্রসাদকে হত্যা করেছে—যদি আদৌ তিনি খুন হয়ে থাকেন—তাই এখানে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

প্রকাশ বলে, অলরাইট। আমি প্রশ্নটা সাক্ষীকে অন্যভাবে করছি, একথা কি সত্য যে, গত ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা নাগাদ আপনি ঐ লগ্‌-কেবিনে ছিলেন?

—না। আমি...

—প্রকাশ রুখে ওঠে, না? আপনি অস্বীকার করছেন? আমি যদি প্রমাণ দিই?

রমা বলে, আপনার আগেকার প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে দেননি। মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন। আপনি কী চান? আগেকার প্রথম প্রশ্নটার জবাবটা শেষ করব, না পরেকার প্রশ্নটার জবাব দেব?

—হোয়াট ডু য়ু মীন?

—আমি বলতে চাই—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব, না, আমি ছয়ই সেপ্টেম্বর সকালে ঐ লগ-কেবিনে উপস্থিত ছিলাম না। আমি ঐ লগ্‌-কেবিনের কাছাকাছি গিয়েছিলাম। সেটাকে বন্ধ দেখি। এবং ফিরে আসি।

—তাই বলুন. আপনি কেন গিয়েছিলেন ওখানে?

—বেড়াতে। যেখানে আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রিটা কেটেছিল সেটা দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল. তাই।

—আপনি কী দেখলেন তাই বলুন।

রমা উত্তরে জানায় যে লগ-কেবিনটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। না, কোনও ময়নার ডাক সে শোনেনি। একমাত্র লগ্‌-কেবিনের দারোয়ান ছাড়া জনমানবের সাক্ষাৎ সে পায়নি। আধঘণ্টাখানেক ওখানে ঘোরাঘুরি করে সে পহেলগাঁওয়ে ফিরে আসে।

প্রকাশ বলেন, এ কথা সত্য নয়। আপনি ঐ লগ্‌-কেবিনের ভিতরে ঢুকেছিলেন। মহাদেওপ্রসাদের সঙ্গে আপনার কথা-কাটাকাটি হয়, কারণ তার পূর্বেই আপনি জানতে পেরেছিলেন যে মহাদেও বিবাহিত। সেই সময় আপনি পিস্তল দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখান। তারপর...

রমা তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, না! এসব কিছু হয়নি!

প্রকাশ বলে, আমার প্রশ্নটা শেষ হয়নি...

বাসু বাধা দিয়ে করোনারকে বলেন, য়োর অনার, আমি মনেকরি, আমার মক্কেল ঐ ব্যাপারে যতটুকু জানেন, তা বলেছেন। এর পর যদি প্রশ্ন করা হয় তবে তা ক্রস-এক্‌জামিনেশান ছাড়া আর কিছু নয়। যদি অন্য কোনও প্রশ্ন করবার না থাকে তাহলে আমি আমার মক্কেলকে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে বলব।

প্রকাশ বললে, না আমার অন্য প্রশ্ন আছে। বলুন, রমা দেবী, যেদিন আপনি গ্রেপ্তার হন, সেদিন ময়নাটাকে কেন আপনি মেরে ফেললেন?

—আমি মারিনি। কে মেরেছে তা আমি জানি না।

—অথচ পাখিটা আপনার তালাবন্ধ বাড়িতে ছিল।

—না, বারান্দায় ছিল। পাঁচিল টপ্‌কিয়ে যে কেউ ওটাকে মেরে ফেলতে পারত।

—পারত কি পারত না, সে-কথা অবান্তর!. আপনি নিজে হাতেই পাখিটাকে মেরে ফেলেছিলেন, কারণ সেটা একটা অদ্ভুত বোল পড়ত। তাই না?

—না, একথা সত্য নয়।

প্রকাশ বলল, বোধ হয় আপনার স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে আমি একটু সাহায্য করতে পারি, দেখুন তো—

প্রকাশের ইঙ্গিতমাত্র তার একজন সহকারী কালো কাপড়ে ঢাকা একটা পাখির খাঁচা এনে রাখল সামনের টেবিলে। আর যাদুকর যেমন নাটকীয়ভাবে ঢাকা খুলে দেখায় টুপির ভিতর খরগোশ—ঠিক সেই ভঙ্গিতে কালো কাপড়টা তুলে দিয়ে খাঁচাটাকে অনাবৃত করে ফেলল, ঠেলে দিল রমার দিকে। দেখা গেল, খাঁচাটার ভিতরে একটা রক্তাক্ত ময়নার ধড়—তার মুণ্ডটা দেহ-বিযুক্ত হয়ে পড়ে আছে। বীভৎস দৃশ্য!

—এ কীর্তিটা আপনারই, তাই না রমা দেবী?

রমা দুই হাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, ওটা...ওটা সরিয়ে নিন! আমার গা গুলাচ্ছে...প্লীজ...

প্রকাশ নাটকীয় ভঙ্গিতে জুরিদের সম্বোধন করে বলে, বিবেকের দংশন! অপরাধের প্রমাণে অপরাধীর আর্তি! পাপের স্বীকৃতি!

বাসু একলাফে এগিয়ে যান। প্রকাশের সহকর্মীর হাত থেকে কালো কাপড়টা কেড়ে নিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দেন। জুরিদের দিকে ফিরে বলেন, মোটেই এটা পাপের স্বীকৃতি নয়, ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, ঐ মেয়েটির প্রতি কী অমানুষিক মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে! ও বেচারী মাত্র সাতদিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যেই জানতে পারল ও বিধবা। তারপর পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করে বলল—তুমিই হত্যাকারী। জেল হাজতে জেরায়-জেরায় তাকে পাগল করে তুলে এখানে তাকে টেনে আনা হয়েছে। এই কদিনে কেউ ঐ সদ্য বিধবাকে কোনও সহানুভূতির কথা শোনায়নি। তার উপরে পাবলিক প্রসিকিউটার একটা রক্তমাখা পাখি...

প্রকাশ বললে, সহযোগী কি একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন?

—না, আমি আপনার বক্তৃতার উপসংহার টানছি!

করোনার সজোরে তাঁর হাতুড়িটা ঠুকে বললেন, অর্ডার, অর্ডার!

বাসু-সাহেব বললেন, আদালতে শৃঙ্খলা আনতে হলে আপনি পি. পি.-কে বলুন—এসব বিবেক-বাণীর নাটকীয়তা আমরা শুনতে রাজী নই! ঐ মেয়েটির স্নায়ুর উপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছে। তারপর একটা রক্তমাখা নিহত পাখি ওর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলতেও সহযোগীর দ্বিধা হল না। এবং তারও পরে মেয়েটির স্বাভাবিক বিবমিষাকে তিনি বলছেন, বিবেকের দংশন! বিচারালয়ে আপনি যদি 'অর্ডার' চান, তাহলে সহযোগীকে নাটক করতে বারণ করুন!

—আমি কিছুই নাটক করিনি; প্রকাশ সাকসেনা বলে।

করোনার বলেন, আমি দুপক্ষকেই বক্তৃতা দিতে বারণ করছি। করোনার মনে করেন, যেভাবে ঐ মৃত পাখিটাকে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে ঐ মহিলার বিচলিত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত আমারও গা গুলিয়ে উঠেছিল।

বাসু বলেন, য়োর অনার! আমাদের সকলেরই একই অনুভূতি হয়েছে। নাটকীয় ভাবে ওটা উপস্থাপনের একটি ইউদ্দেশ্য—দৃঢ়চেতা সাক্ষীর মনোবলে আঘাত করা।

—সেরকম কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না—প্রকাশ বলে।

—তাহলে ওটা উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? করোনার জানতে চান।

—আমি মৃত পাখিটাকে সনাক্ত করতে চেয়েছিলাম মাত্র।

বাসু বলেন, তা করবার প্রয়োজনে রক্তমাখা পাখিটা সাক্ষীর কোলের উপর টেনে এনে ফেলার প্রয়োজন ছিল না।

—ছিল, কি ছিল না, সেটা আমি বুঝব।

শর্মাজী উঠে দাঁড়ান। বলেন, জাস্ট এ মিনিট! করোনার এ বিষয়ে কোনও রুলিং দিলে আমি দেখতে পারি সেটা কার্যকরী করা হচ্ছে কি না।

পদার্থের অধ্যাপকটি বলেন, করেনার রুলিং দিচ্ছেন। করোনার রুলিং দিয়ে বলছেন—এ আদালতে ব্যক্তিগত বাদানুবাদ বরদাস্ত করা হবে না। করোনার আরও বলছেন, দু-পক্ষই নাটকীয়তা বর্জন করে শুধু মাত্র তথ্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করুন।

প্রকাশ বলে, আমি শুধু পাখিটাকে সনাক্ত করতে চেয়েছিলাম।

করোনার বলেন, এ-কথা আপনি আগেও বলেছেন, আমি শুনেছি। সে বিষয়ে আমি যা রুলিং দেবার তাও দিয়েছি, আশা করি আপনি শুনেছেন। মিস্টার পি. পি. আপনার আর কোনও জিজ্ঞাস্য আছে?

—নো স্যার।

—মিস্টার বাসু? আপনার?

—আছে য়োব অনার।

বাসু একটু আগিয়ে যান। বমার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, রমা! জানি, ঐ পাখিটার দিকে তাকিয়ে দেখতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি বলব, তুমি ওটার দিকে তাকিয়ে দেখ একবার। আমি জানতে চাই—এই ময়নাটাকেই কি তোমার স্বামী তোমাকে উপহার দিয়েছিলেন?

রমা দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা কামড়ায়। বাসু ইতিমধ্যে কালো কাপড়ের ঢাক্‌নাটা সরিয়ে নিয়েছেন। রমা সেদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে। পারে না। বলে, আমি...আমি ওটার দিকে তাকাতে পারছি না। তবে আমাব স্বামী যে পাখিটা আমাকে দিয়েছিলেন তার ডান পায়ের মাঝের আঙুলটা কাটা ছিল। উনি বলেছিলেন, 'ইঁদুর-মারা কলে ওর ঐ একটি আঙুল কাটা গিয়েছিল।'

বাসু বলেন. কিন্তু এই মৃত ময়নাটার দু পায়ের সব কটা আঙুলই তো রয়েছে।

—তাহলে ঐ মরা পাখিটা 'মুন্না' নয়।

বমা একথা বলল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। বাসু কৌশিককে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। সে কাপড়ে-ঢাকা আর একটা খাঁচা হাতে এগিয়ে এল। খাঁচাটা ওর হাত থেকে নিয়ে বাসু বলেন, রমা, এবার এটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ভয় নেই, এটা মরা পাখি নয়। দেখ তো, এটাকে চিনতে পার কিনা।

রমা তখনও সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। ঠিক তখনই ওই পাখিটা 'বোল' পড়ল আইয়ে বৈঠিয়ে, চায়ে পিজিয়ে!

যেন সম্বিৎ পেয়ে বমা এদিকে ফিরল, বলল, এই তো! এই তো মুন্না! তবে যে পুলিসে বলল, মুন্নাকে কে যেন মেরে ফেলেছে!

পাখিটা আবার বোল পড: রাম নাম সৎ হ্যায়!

রমা বলে, ঐ তো ওর মাঝের আঙুলটা কাটা।

ঠিক তখনই মুন্না বোল পড়ল:' রমা...মৎ মারো...পিস্তল নামাও! দ্রুম্‌...হায় রাম!

পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠস্বর। সমস্ত আদালতে একটা চাপা উত্তেজনা।

রমা বলল. ঐ তো সেই বোলটা বলেছে! ও নির্ঘাৎ মুন্না!

প্রকাশ সাক্‌সেনা এগিয়ে এসে করোনারকে বলে, য়োর অনার! আমি মুন্নার ঐ বোলটা টেপ্-রেকর্ডারে টেপ করতে চাই।

বাসু বলেন, সহযোগী কি মুন্নাকে সাক্ষী হিসাবে তুলতে চান?

—না! পাখিটা একটা বিচিত্র 'বোল' পড়েছে। আমি সেটা টেপরেকর্ড করতে চাই মাত্র।

—কিন্তু পাখিটার ঐ বক্তব্য তো হলফনামা নিয়ে নয়। মি লর্ড! সহযোগী যদি মুন্নাকে সাক্ষী হিসাবে তলব করতে চান, তাহলে আমার দাবী, প্রথমে তাকে দিয়ে হলফ্‌নামা পাঠ করাতে হবে!

প্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! পাখিটাকে সাক্ষী হিসাবে আমি আদৌ দেখছি না। তার একটা বোল এভিডেন্স হিসাবে রেকর্ড করতে চাইছি মাত্র। আমি করোনারের রুলিং চাইছি।

করোনার বললেন, না, পাখির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু পাখির কোনও 'বোল' একটা তথ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। পাখিটা কী বলেছে তা আমি শুনেছি, জুরিরাও শুনেছেন। পাখির ঐ উক্তি

আইন-মোতাবেক গ্রাহ্য কিনা তা পরবর্তী আদালতে—যদি এ মামলা আদৌ দায়রায় সোপর্দ করা হয়—আইন-বিশারদেরা বিচার করবেন। আপাতত যেমন সাক্ষ্য চলছিল চলুক।

বাসু বলেন, রমা, তুমি কি মুন্নার মুখে ঐ 'বোল'টা আগেও শুনেছ?

—হ্যাঁ, প্রথম দিন থেকেই। অর্থাৎ সেই দোশরা সেপ্টেম্বর থেকেই।

বাসু বলেন, তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

করোনার বলেন, অতঃপর শ্রীযুক্তা সুরমা খান্নাকে আমি সাক্ষী হিসাবে ডাকছি।

প্রকাশ সাক্‌সেনা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, শ্রীযুক্তা সুরমা খান্না, অথবা তাঁর পুত্র জগদীশ মাথুরকে সমন ধরানো যায়নি। তাঁরা কোথায় আছেন আমরা জানি না।

করোনার বলেন, আর মহাদেওপ্রসাদের একান্ত সচিব? গঙ্গারাম যাদবকে?

প্রকাশ বলেন, তিনি উপস্থিত। তাঁকে সমন দেওয়া হয়েছে। ঐ তো বসে আছেন।

করোনার বলেন, ঠিক আছে। তাঁকে এর পর আমি সাক্ষী দিতে ডাকব। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। এখন আমি শ্রীসতীশ বর্মনকে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে বসতে অনুরোধ করছি।

বর্মন সাক্ষীর মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসলেন। করোনার বলেন,আপনি সি. বি. আই.য়ের একজন অফিসার, কাশ্মীর প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধ পেয়ে সি. বি. আই. আপনাকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পাঠিয়েছে—এ কথা সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

—আপনি বারোই সেপ্টেম্বর এস. ডি. ও. শর্মাজী এবং ও. সি. যোগীন্দর সিং এর সঙ্গে ঐ লগ্‌-কেবিনে গিয়ে তদন্ত করেছিলেন। এ কথা সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেখানে আপনি কী দেখেন বলে যান।

সতীশ বর্মন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিতে থাকেন।পথে তাঁরা বাসুর সাক্ষাৎ পান সেকথাও বলেন। তারপর বাসু প্রস্থান করলে গঙ্গারামজী বলেন—

বাধা দিয়ে করোনার বলেন, তিনি কী বলেন, তা আমরা তাঁর মুখেই শুনব। আমরা বরং শুনতে চাই তদন্ত করে আপনি কী সিদ্ধান্তে এসেছেন।—তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি হয়তো বলবেন, সাক্ষীর সিদ্ধান্ত আমাদের শোনার কথা নয়; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাক্ষী হচ্ছেন একজন বিশেষজ্ঞ। অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এঁকে কেন্দ্রীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সংস্থা এখানে পাঠিয়েছেন এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত করতে। ফলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর সিদ্ধান্ত কী, তা আমরা জানতে ইচ্ছুক। আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

বাসু বলেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন; আমরা এখানে কারও বিচার করতে আসিনি। এসেছি সত্যানুসন্ধানে। কেন্দ্রীয় সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে কী মনে করেন, কী তাঁর সিদ্ধান্ত তা শুনতে আমরাও আগ্রহী। উনি ওঁর মতামত ব্যক্ত করুন। আমিও প্রশ্নের মাধ্যমে আমার মনে যেটুকু সংশয় আছে তা পরিষ্কার করে নেব।

সতীশ বর্মনকে এখন বেশ ডগমগ মনে হচ্ছে। সে তার বক্তব্য শুরু করল শেষ সিদ্ধান্ত দিয়ে: আমার মতে মহাদেও প্রসাদ খান্নাকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তা। যেহেতু তাঁর বিবাহটা আইনানুসারে সিদ্ধ নয়, তাই আমি তাঁকে রমা খান্না বলতে চাই না। রমা দাসগুপ্তার বিরুদ্ধে যুক্তি পর্বতপ্রমাণ এবং অকাট্য। প্রথম কথা: মোটিভ বা উদ্দেশ্য। মহাদেও নিজেকে যশোদা কাপুরের পরিচয়ে অবিবাহিত বলেছিলেন; ভুল বুঝিয়ে রমা দেবীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিলেন। যে মুহূর্তে রমা দেবী জানতে পারলেন তাঁর স্বামী যশোদা কাপুর বিবাহিত; সেই মুহূর্তে—আই মীন ছয়ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা তিনি ঐ পিস্তলটি নিয়ে লগ্‌-কেবিনের দিকে যান। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—স্বামীকে খুন করার বাসনা হয়তো তাঁর ছিল না। তবে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখানোর ইচ্ছাটা ছিল। তাই তিনি করেছিলেন।

সে সময় খান্নাজী এমন কোনও কথা বলেন যাতে উত্তেজিতা অবস্থায় রমা দেবী পিস্তলের দুটি ট্রিগারই টেনে দেন। 'ডেলিবারেট মার্ডার' হয়তো নয়, কিন্তু কালপেব্‌ল্ হোমিসাইড। অর্থাৎ সুপরিকল্পিত হত্যা নয়; উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ হত্যা করে বসা।

উদ্দেশ্যের কথা বলেছি। দ্বিতীয় কথা: সুযোগ। বাহাদুর নিজে থেকেই ওঁর জিম্মায় পিস্তলটা রেখে যাওয়ায়, এবং নিতান্ত নির্জনে খান্নাজী আছেন একথা জানা থাকায় রমা দেবীর সুযোগ পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এটা আত্মহত্যার কেস কিছুতেই হতে পারে না। কারণ পিস্তলটা ছিল মৃতদেহের নাগালের বাইরে এবং তাতে কারও আঙুলের ছাপ ছিল না।

তৃতীয়ত: অ্যালেবাইয়ের অভাব। শুধু অভাব নয়, ঘটনার সময় রমা দেবী যে ঐ লগ্-কেবিনের ধারে-কাছেই ছিলেন তা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। না করে তাঁর কোন উপায় ছিল না। ওখানকার দারোয়ান তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, চিনতে পেরেছিল। তাই লগ্-কেবিনের কাছে যাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বীকার করছেন, কিন্তু ভিতরে ঢোকার কথা অস্বীকার করছেন।

চতুর্থত: রমা দাসগুপ্তার গল্পটা যে আদ্যন্ত বানানো তার প্রমাণ তাঁর তথাকথিত স্বামীর বুক-পকেট থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ঐ কাগজখানায়। তিনি স্ত্রীর ঠিকানায় লিখেছেন 'মিসেস্ রমা খান্না', 'মিসেস্ রমা কাপুর' নয়। সুতরাং মহাদেওপ্রসাদ যে যশোদা কাপুর নন, একথা রমা দেবীও জানতেন, খান্নাজীও জানতেন। আমরা মৃতের পকেটে প্রাপ্ত ঐ কাগজখানা হস্তরেখাবিদ্‌দের দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা সন্দেহাতীত ভাবে বলেছেন হাতের লেখা মহাদেও প্রসাদ খান্নার।

পঞ্চমত: পাখিটাকে হত্যা করা। পাখিটা ঘটনার সময় ঐ লগ্-কেবিনেই ছিল। রমা দেবীর বাসায় নয়। পাখিটার এমন ক্ষমতা আছে যে, একবার মাত্র শুনেই কোনও বোল তুলে নিতে পারে। সূরযপ্রসাদ এবং গঙ্গারামজীর সাক্ষ্য এখনও গ্রহণ করা হয়নি। এ তথ্যটা তাঁদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হবে—ঐ যে 'রাম নাম সৎ হ্যয়' বোল্‌টা ও একটু আগে পড়ল, ওটা সে একবার মাত্র শুনেই শিখে ফেলেছিল। এ-ক্ষেত্রেও রমা দেবী যখন পিস্তল দেখিয়ে মহাদেওকে ভয় দেখাচ্ছেন তখন খান্নাজী বলে ওঠেন: 'রমা, মৎ মারো... পিস্তল নামাও'! ঠিক সেই মুহূর্তেই রমা দেবী গুলি করেন। পাখিটা সেই শব্দটাও তুলেছে। এবং তারপরে মহাত্মাজীর উচ্চারিত দুটি অন্তিম শব্দ: হায় রাম! মহাদেওপ্রসাদ খান্নার জীবনেও ঐ দুটি শব্দের সঙ্গেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে, রমা দেবী জানতেন—খান্নাজী তাঁর স্ত্রীকে 'রমা' বলে ডাকেন। মুহূর্তমধ্যে ওঁর মনে হয় হত্যাপরাধটা সেই সুরমা দেবীর স্কন্ধে চাপানো যায় কি না। কারণ রমা দেবীকে কেউই চেনে না, স্বতই ঐ বোলটা 'সুরমা'কে চিহ্নিত করবে। অথচ তিনি তখন জানতেন না, সুরমার কোনও অকাট্য অ্যালেবাই আছে কিনা। তাই তিনি দুএক দিন পরে আর একটি ময়না এনে ঐঘরে টাঙিয়ে দিয়ে মুন্নাকে নিজের বাসায় নিয়ে যান। তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন সুরমার অ্যালেবাই বিষয়ে। প্রশ্ন হতে পারে, পরে এসে উনি কেমন করে ঐ বন্ধ ঘরে ঢোকেন। এর সহজ জবাব হচ্ছে, ঐ লগ্-কেবিনে তিনি খান্নাজীর সঙ্গে তথাকথিত মধুচন্দ্রিমা যাপন করে যান। ফলে তাঁর কাছে একটি ডুপ্লিকেট চাবি থাকা খুবই সম্ভব। তারপর যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন যে, তাঁকে পুলিস খুঁজছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাউন্সেলের আদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর বাসায় ফিরে যান ও মুন্নাকে হত্যা করেন।

সংক্ষেপে এইটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি, রমা দেবীর বিরুদ্ধে এভিডেন্স এমন জোরালো যে, যে-কোন আদালতেই বিচার হ'ক না কেন 'গিল্‌টি' ভার্ডিক্ট হবেই। যত বড় ব্যারিস্টারই হন, রমা দেবীকে বাঁচাবে পারবেন না।

করোনোর প্রশ্ন করেন, মৃত্যুর সময়টা কিভাবে আপনি চিহ্নিত করছেন? ঐ যে বললেন ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা—

—সেটা হাইলি টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার, স্যার। ওর পিছনে অপরাধবিজ্ঞানসম্মত নানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিডাক্‌শান আছে। সে সব কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তাছাড়া অনেক 'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইল্‌স্'...ওয়েল, ওটা স্যার একজন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত বলেই আপাতত ধরে নিন।

করোনার কী বলবেন ভেবে পান না।

বাসু বলেন, য়োর অনার! যতই 'হাইলি টেক্‌নিক্যাল' হোক, ব্যাপারটা আমরা একটা আপ্তবাক্য বলে মেনে নিতে পারি না। আমি মনে করি, এ-কেসে মৃত্যুর সময়টাই হচ্ছে একটা ভাইটাল ক্লু; সুতরাং সাক্ষীর যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তটা আমরা শুনতে চাই।

করোনার বলেন, মৃত্যুর সময়টা যে ছয় তারিখ সকাল এগারোটা এটা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। আমি সময় সংক্ষেপ করতে চাইছিলাম মাত্র।

বাসু বলেন, 'সবাই' বলতে কে কে আমি জানি না। আমি মেনে নিইনি। অটোপ্সি সার্জেনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে। তিনি বললেন, পাঁচ-সাত দিনের বাসি মড়া—এতদিনে সব পচে ঢোল হয়ে যাবার কথা। নিতান্ত ঠাণ্ডার মধ্যে ছিল বলে তা হয়নি। মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে তিনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না। অপর পক্ষে ছয়ই সেপ্টেম্বর সকালে, ঘটনাচক্রে আমার মক্কেল সেখানে উপস্থিত ছিল। এজন্য আমি জানতে চাই কী কী এভিডেন্সের মাধ্যমে ঐ বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক মৃত্যুর সময়টা চিহ্নিত করছেন।

করোনার কিছু বলার আগেই সতীশ বর্মন বলে ওঠে, স্যার। ওঁর মনে যখন সংশয় জেগেছে, তখন সেটা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম এ জন্য যে, ব্যাপারটা 'হাইলি টেক্‌নিক্যাল'! অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ে যাঁর অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের পক্ষে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রের ধারণ করা কঠিন। যা হোক আমি বলছি, শুনুন। বুঝবার চেষ্টা করুন। প্রথমতঃ জানা তথ্যগুলি তৌল করে দেখুন। আমরা জানি যে, খান্নাজী উদ্বোধনের দিনে ওখানে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি দোশরা শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে অন্য কোথাও দিন দু-তিন ছিলেন বটে তবে পাঁচই বিকাল নাগাদ তিনি নিশ্চয়ই লগ্-কেবিনে পৌঁছান। পহেলগাঁও থেকে ঐ পথে যে বাসটা যায় সেটা ঐ ট্রাউট-প্যারাডাইস্ বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছায় বিকাল তিনটায়। ফলে তিনি পদব্রজে লগ্-কেবিনে সওয়া তিনটার মধ্যেই পৌঁছান। রাত আটটা পর্যন্ত যে তিনি জীবিত ছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ আছে। কারণ ঐ সময়ে তিনি ঐ অঞ্চল থেকে টেলিফোনে তাঁর সেক্রেটারি গঙ্গারামজীর সঙ্গে কথা বলেন। গঙ্গারামজী ঐ সামনেই বসে আছেন, তাঁর সাক্ষ্য এখনও নেওয়া হয়নি। যখন নেওয়া হবে তখন সে তথ্যটা জানবেন। গঙ্গারামজী দীর্ঘ দশ বছর ধরে খান্নাজীর একান্ত সচিব; মনিবের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে তিনি ভুল করবেন না। তাছাড়া ওঁরা টেলিফোনে এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করেন যা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে জানা অসম্ভব। ফলে প্রমাণ হল, পাঁচই সেপ্টেম্বর সোমবার, রাত আটটা পর্যন্ত তিনি ঐ লগ্-কেবিনেই জীবিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিলেন এবং সেটা সাড়ে পাঁচটায় বেজে দম খতম হয়ে থেমে গেছে। সুতরাং বোঝা যায় তিনি পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় গাত্রোত্থান করেছিলেন। দ্রুতগতি প্রাতঃকৃত্যাদি সেবে উনি কফি বানান, ডিমের পোচ বানান এবং প্রাতরাশ সেরে নেন। উনি খুব সকাল সকাল মাছ ধরা শুরু করতে চেয়েছিলেন, কারণ রোদ বেশি উঠে গেলে মাছে টোপ খায় না। ফলে এঁটো বাসন ধোওয়ার সময়ও তাঁর ছিল না। আন্দাজ সাড়ে ছয়টা সাতটা নাগাদ তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে যান। উনি একজন দক্ষ মেছুড়ে। অন্যান্য মেছুড়ের ভিড় তখনও হয়নি। ফলে বেলা দশটার মধ্যেই তিনি দৈনিক ঊর্ধ্বসীমায় যতটা মাছ ধরা আইন-সম্মত সেই দেড় কে-জি মাছ ধরে লগ্-কেবিনে ফিরে আসেন। ফিরে এসে এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম কাজই হওয়া উচিত ছিল মাছগুলো ধুয়ে কেটে পিত্তি ফেলে দেওয়া। তিনি সেসব কিছুই করেননি। মানে করার সময় পাননি। কোট ও প্যান্ট খুলে পায়জামা পরে তিনি হয়তো আবার এক কাপ কফি বানাতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই রমা দেবী এসে পৌঁছান। তারপর কী হয়েছিল আমি তা আগেই বলেছি।

করোনার প্রশ্ন করেন, *কিন্তু ঠিক এগারোটা কেন বলছেন?*

—ঠিক এগারোটা বলিনি। বলেছি, সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। ঐ সময়টা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করছি শুনুন। বস্তুত এখানেই অভিজ্ঞতার দরকার—এগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ক্লু' যা

সাধারণ মানুষের নজরে পড়বে না, অপরাধবিজ্ঞানীরই শুধু নজর হবে। প্রথম কথা: মৃতদেহের পরনে ছিল পায়জামা এবং সোয়েটার, এবং চেয়ারের হাতলে গরম কোট, দেওয়ালে ঝোলানো ছিল গরম প্যান্ট। আমরা থার্মোমিটারের সাহায্যে ঐ লগ্-কেবিনের তাপমাত্রার একটি গ্রাফ তৈরী করেছি। দেখা যাচ্ছে, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঐঘরের চালে সরাসরি সূর্যালোক পড়ে না, তাই ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বেলা এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত সরাসরি রোদ পেয়ে ঘরটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। এবং চারটের পর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রাত্রে রীতিমতো শীত করে। মৃতের পোশাক প্রমাণ করে মৃত্যু সময়টা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। বেশী ঠাণ্ডা হলে উনি কোটটা পরে থাকতেন। বেশী গরম হলে উনি সোয়েটারটা খুলে ফেলতেন। ফলে মৃত্যুর সময়টা হয় সকাল সাড়ে দশটা এগারোটা অথবা বিকাল তিনটে চারটে। শেষোক্ত সময়টাকে বাদ দিচ্ছি এজন্য যে, তিনি মধ্যাহ্ন আহার করেননি। করলে নিশ্চয়ই তিনি ঐ মাছগুলি ধুয়ে কেটে রান্না করতেন। ফলে রমা দেবীর প্রবেশমুহূর্তটা হচ্ছে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা!

বাসু বললেন, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম কথা, আপনার থিওরি অনুসারে খান্নাজী ঐ লগ্-কেবিনে আসেন পাঁচই বিকালে এবং হত হন ছয় তারিখ বেলা সাড়ে দশ-এগারোটায়। আমরা জেনেছি, খান্নাজীর সুটকেসে দশ-প্যাকেট সিগারেট ছিল—যা থেকে মনে হয় তিনি বেশ হেভি স্মোকার। অথচ লগ্-কেবিনের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে অথবা কাছেপিঠে কোনও খালি সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যায়নি। শুধু যোগীন্দর সিং বলেছেন—ওঁর পকেটে একটা প্যাকেট দেখেছিলেন যাতে আটটা সিগারেট ছিল। এ-ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন খান্নাজীর মত স্মোকার পাঁচ তারিখ বিকাল থেকে ছয়ই বেলা এগারোটার মধ্যে মাত্র দুটি সিগারেট খেয়েছিলেন?

সতীশ বর্মন হেসে বললেন, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন—ছয়ই সকালে তিনি নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ঠিক কোথায় বসে তিনি মাছ ধরেছিলেন তা আমরা জানি না। হয়তো সেখানে পড়ে আছে একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট। শুধু তাই নয়—ওঁর লগ্-কেবিনের টেলিফোনটা বিকল হয়ে পড়ায় উনি পাঁচই রাত আটটা নাগাদ অন্য কোনও জায়গা থেকে ওঁর একান্ত সচিবকে টেলিফোন করেন। ফলে সেখানেও খালি প্যাকেটটা ফেলে আসতে পারেন!

বাসু বলেন, আই সী! আচ্ছা এবার অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যাক। যোগীন্দর সিং বলেছেন—ফায়ার-প্লেসে কাঠগুলো সাজানো ছিল, আগুন জ্বালার অপেক্ষায়। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনার থিওরি অনুসারে খান্নাজী সকালবেলা সাড়ে পাঁচটায় উঠে খুব তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে দ্রুতহাতে প্রাতরাশ বানিয়ে খেয়ে নেন। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই; কারণ সকাল-সকাল তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

—প্রাত্যঃকৃত্যাদির মধ্যে দাঁতমাজা ও দাড়িকামানো নিশ্চয়ই পড়ে?

—সেটা উনি আগের দিন সন্ধ্যা বা রাত্রেও করে থাকতে পারেন। আমরা জানি না, উনি রাত্রে দাঁত মাজতেন না সকালে।

—সে যাই হোক উনি লগ্-কেবিনে পৌঁছে অন্তত একবার দাঁত মাজেন ও দাড়ি কামান—কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর টুথব্রাশ, পেস্ট ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব কিছু ছিল তাঁর সুটকেসে। এটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না কি? কোন নতুন জায়গায় কেউ গেলে এবং সেখানে পাঁচ-সাতদিন থাকবেন জানা থাকলে দাঁতমাজা ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম কেউ বারে বারে সুটকেসে তোলে না। বাথরুমের তাকে রেখে দেয়। নয় কি?

বর্মন একটু অশান্তভাবে বলে, তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না; হয়তো উনি স্নান করার সময় দাঁত মাজেন ও দাড়ি কামান। মাছ ধরে ফিরে এসে স্নানের আগেই তো তিনি মারা যান।

—রাত্রে দাঁত না মেজে এবং সকালেও না মেজে কেউ ব্রেকফাস্ট করে?

—এসব ছোটখাটো অসঙ্গতি সব কেস-এই থাকে। আমি ববাবর দেখেছি—তদন্ত করতে গেলে এমন দু-একটা ছোটখাটো অসঙ্গতি থেকেই যায়।

—তখন আপনি কী করেন?

—ঐ ছোটখাটো অসঙ্গতিগুলোকে অগ্রাহ্য কবি।

—এমন কতগুলি অসঙ্গতি অগ্রাহ্য করে আপনি আপনাব ঐ থিওরিটা খাড়া কবেছেন?

—ঐ একটাই। মানে স্বাভাবিক হত যদি টুথব্রাশ, পেস্ট এবং দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বাথরুমে থাকত।

—বুঝলাম। আপনাব থিওরি অনুসারে খান্নাজী কখন ঐ ফায়ার-প্লেসের কাঠগুলো সাজিয়েছিলেন?

—সকালে নিশ্চয়ই নয়, তখন তাড়া ছিল। মাছ ধরে ফিবে এসেই নিশ্চয় তা করেছিলেন।

—কিন্তু মাছ ধরে ফিরে এসে তাঁর প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল পলো থেকে মাছগুলো বার করে ধুয়ে ফেলা। মাছের পিত্তি গেলে ফেলা, কারণ কেবিনটা তখন গবম হচ্ছে। রান্নার যোগাড় করা। কাবণ মধ্যাহ্ন আহারটা আগে করতে হবে; তারপর রাত্রের জন্য ফায়াব-প্লেস সাজানো, যেটা বিকালেও কবা চলত। অথচ উনি মাছগুলো না ধুয়ে, রান্নার কোনও যোগাড না করে ফায়ার-প্লেসটা সাজাতে বসলেন? এটাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না কি?

সতীশ বর্মন একটু বিরক্তভাবেই বলল, এমনও হতে পাবে তিনি আগের দিন বিকালেই কাঠগুলো সাজিয়েছেন?

—সে কী? তারপর সারারাত শীতে হি হি করে কেঁপেছেন, আগুন জ্বালেননি?

সতীশ একটু অস্তস্তি বোধ করছে, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বীকার করতে বাধ্য হল—না, আগের দিন সন্ধ্যায় নয়। ছয় তারিখেই তিনি কাঠটা আবার সাজান।

—কিন্তু কখন? মাছ ধরতে যাবার আগে, না মাছ ধরে ফিরে এসে?

সতীশ বিরক্ত হয়ে বলে, তা আমি কেমন করে জানব?

—এক্সজ্যাক্টলি! আপনি তা জানেন না। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর কোনও অনুমানও করতে পারছেন না, কারণ এটাও একটা ছোটখাটো অসঙ্গতি যা অগ্রাহ্য করতে হবে। তৃতীয়ত: আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন লগ্‌-কেবিনের দেওয়ালে একটা নিয়মাবলী টাঙানো আছে এবং তাতে ঐ লগ্‌-কেবিনের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ আছে—একটি টেবিল, একটি চেয়ার, বাসনপত্র কী কী আছে ইত্যাদি।

—হ্যাঁ, দেখেছি। তাতে কী হল?

—তাতে লেখা আছে, সাতদিন অন্তর লগ্‌-কেবিনে লন্ড্রীর ব্যবস্থা করা হয়। এজন্যই আলমারিতে ছয়টি ধোপ বিছানার চাদর এবং বিছানায় পাতা একটি পাটভাঙা চাদর আছে, তাই নয়?

—সম্ভবত তাই।

—এবং যোগীন্দর সিংএর জবানবন্দি অনুসারে দেখা যাচ্ছে বিছানাটি পরিপাটি টান-টান করে পাতা। নিশ্চয়ই ছয়ই তারিখে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে খান্নাজী স্বহস্তে বিছানাটি পাতেন। অথবা ফিরে এসে? তাই নয়! যেহেতু রাত্রে ঐ বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই তাই।

—এক্ষেত্রে কি আমাদের আশা করা উচিত নয় যে, আলমারির তাকে পাঁচটি ধোপ চাদর থাকবে এবং নিচের তাকে একটা সয়েলড চাদর থাকবে?

সতীশ বর্মনের পুনরায় ভ্রূকুঞ্চন হল। বললে, এ-ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে—খান্নাজী সয়েল্ড লিনেনটা পরিবর্তন করেননি।

—কেন? খান্নাজী তো ঐ ট্রাউট-প্যারাডাইস্‌-এ বছর-বছর যান। তিনি তো জানেন—সাত দিনের জন্য সাতটা চাদর আছে?

—এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স নয়।

—আপনি তাই মনে করেন? অর্থাৎ এটাও একটা ছোটোখাটো অসঙ্গতি যা অগ্রাহ্য করতে হবে, তাই নয়? বেশ, চতুর্থত: অ্যালার্ম ঘড়িটার দম শেষ হয়ে থেমে গিয়েছিল, নয়?

—হ্যাঁ।

—অথচ প্ল্যানে দেখছি বালিশটা যেখানে আছে সেদিকে মাথা করে শুলে শুয়ে-শুয়েই অ্যালার্ম ঘড়িটার নাগাল পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলেই খান্নাজী হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে দেবেন, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে?

—কারও কারও ঘুম ভাঙতে দেরি হয়।

—তা তো হয়ই। কিন্তু অ্যালার্ম ক্লকের শব্দে যার ঘুম ভাঙে, তাব ন্যাচারাল রিফ্লেক্স অ্যাকশনই হয় হাত বাড়িয়ে ঘড়িটার শব্দ বন্ধ করা। তাই নয়?

—ওভাবে কিছুই প্রমাণ হয় না। অনেকে অ্যালার্ম ঘড়ি হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেবার পরও ঘুমিয়ে পড়ে।

—তা পড়ুক। এখানে তো তা হয়নি। কারণ ঘড়িটার অ্যালার্ম দম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে থামানো হয়নি।

—তাহলে ধরে নিতে হবে 'অ্যালার্মে'র শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হয়তো আরও আধঘণ্টা পরে তাঁর ঘুম ভাঙে। ধরুন ছ'টায়। তাই হবে, সেজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি করে—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাসু বলেন, ফায়ার-প্লেসে কাঠ সাজাতে বসে যান!

—আমি তা বল্‌তে চাইনি।

—তবে কী বল্‌তে চান? তাড়াতাড়ি করে সযেল্‌ড চাদরটা কেচে ইস্ত্রি করতে লেগে যান?

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, এ সবই অবান্তর কথা! সব অবাস্তব।

—কেন অবাস্তব? কেন এতগুলো সূত্রকে আপনি অগ্রাহ্য করছেন?

সতীশ বর্মন কোনও প্রত্যুত্তর করে না।

বাসু বলেন, মিস্টার বর্মন, আপনি কি বুঝতে পারছেন, আপনার থিয়োরিটা দাঁড়াচ্ছে না! অসংখ্য অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে।

বর্মন রুখে ওঠে, তার মানে আপনি কি বিকল্প কোনও থিয়োরি শোনাতে চান?

—একজ্যাক্টলি। এবং এমন একটা থিয়োরি আমি শোনাতে চাই যাতে কোনও অসঙ্গতি নেই। যা জিগস্‌ ধাঁধার মত খাঁজে-খাঁজে মিলে যাবে। শুনবেন?

—কী আপনার থিয়োরি?

—মহাদেও প্রসাদ খান্না খুন হয়েছেন পাঁচই বিকাল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে!

—পাঁচই? অসম্ভব! ছয় তারিখ সূর্যোদয়ের আগে ট্রাউট মাছ ধরা সম্পূর্ণ বে-আইনি ব্যাপার। লগ্‌-কেবিনের ঐ দেড় কে. জি. মাছের অস্তিত্বতেই প্রমাণিত হচ্ছে খান্নাজী পাঁচ তারিখে খুন হননি!

বাসু বলেন, মিস্টার বর্মন, এবার আপনাকে একটা অতি শক্ত প্রশ্ন করি—এক্সপার্ট হিসাবে বলুন, মানুষ খুন করা কি আইন-সঙ্গত কাজ?

সতীশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জবাব দেওয়া বাহুল্য বোধে!

—সুতরাং মানুষ খুনের মত বে-আইনি কাজ যে লোকটা করতে যাচ্ছে সে কি দেড় কে. জি. মাছ আগের দিন ধরতে পারে না? কিম্বা বাজার থেকে কিনতে? আর তা যদি পারে, তাহলে আপনি কি দয়া করে করোনার এবং জুরি মহোদয়ের কাছে জানাবেন যে, আপনার বিশেষজ্ঞের মতামতের দাম দেড় কে. জি. ট্রাউট মাছের সমান? আপনার সমস্ত যুক্তিটাই ঝুলছে ঐ দেড় কে. জি. মাছের পলোটার সুতোয়?

বর্মন নিষ্পলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকে। জবাব দিতে পারে না। কী যেন ভাবছে সে।

বাসু বলে চলেন, ধীরভাবে চিন্তা কবে দেখুন মিস্টার বর্মন—আপনি প্রথমেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, রমা দাসগুপ্তা ছয়ই সকাল এগারোটার সময় খান্নাজীকে খুন করেছে। তাই ঐ সিদ্ধান্তের পরিপূরক তথ্যগুলিই আপনি বেছে নিয়েছেন—ঐ তথ্যেব পরিপন্থী সূত্রগুলিকে পরিহার করে। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় বিচার করলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন খান্নাজী খুন হয়েছিলেন পাঁচ তারিখ বিকাল চারটায় এবং হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল ঐ নির্জন লগ্-কেবিনে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবে অন্তত চার-পাঁচদিন পরে। তাই ছয় তারিখ সকালের দিকে কোন বস্ত্র-আঁটুনি অ্যালেবাই তৈরী করে সে দেড় কে. জি. মাছও ঐ কেবিনে রেখে যায়। সে জানত, পুলিস ধবে নেবে খুনটা হয়েছে ছয় তারিখ সকালে।

কেউ কোনও কথা বলছে না। আদালত কর্ণময়। সতীশ বর্মন মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে কী ভাবছে। বাসু বলেই চলেন, এবং ভেবে দেখুন মিস্টার বর্মন, এই সিদ্ধান্তে আসতে হলে আপনাকে ছোটখাটো কোন অসঙ্গতিই অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে না। বিছানার চাদরের হিসাব মিলে যাচ্ছে, যেহেতু রাত্রে তিনি ঐ খাটে ঘুমাননি। অ্যালার্ম ঘড়িটা দম ফুরিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই কারণ লগ্-কেবিনের একমাত্র বাসিন্দা পূর্বদিনই মরে পড়ে-আছেন মাটিতে। সিগাবেটের খালি প্যাকেট কেবিনের ধারে কাছে নেই, কারণ মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে তিনি এসেছেন ও দুটি মাত্র সিগারেট খেয়েছেন। ফায়ার-প্লেসেব কাঠগুলো তিনি সাজাননি, ওটা সাজানোই ছিল। কোট ও গরম প্যান্ট না পরা এবং সোয়েটাব গা থেকে না খোলা সঙ্গতিপূর্ণ, কাবণ আপনিই বলেছেন বিকাল চারটে থেকে সাড়ে চারটের সময় ঘরটার অবস্থা না-গরম না-ঠাণ্ডা। সুটকেস থেকে দাঁত মাজা বা দাড়ি কামানোর সবঞ্জাম বার করার কোনও প্রয়োজন হয়নি। আর হত্যাকারী ঐ পাখিটার প্রতি অতি-দবদী হয়ে উঠেছিল শুধু এজন্যেই যে মুন্না ঐ বোলটা পড়ে—যাতে হত্যাপরাধ রমা দেবীর উপব চাপিযে দেওয়া যায়। আমি একটি বিষয়ে আপনাব সঙ্গে একমত, আমারও ধাবণা খান্নাজী ঐ কেবিনে পৌছান পাঁচই বিকাল সাড়ে তিনটায়। কোট প্যাট খুলে পায়জামা পরে নেন। একটু কফি বানিয়ে এবং দুটি ডিম ও রুটি সহযোগে বৈকালিক টিফিন সারেন। চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ দরজায় কেউ টোকা দেয়। খান্নাজী দরজা খুলে আগন্তুককে দেখেন---সে ওঁর পরিচিত ও বিশ্বাসভাজন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি—লোকটা এসেছে তাঁকে খুন করতে। এবং তার পকেটে একটা লোডেড রিভলভার। কিন্তু লোকটা হঠাৎ দেখতে পায় টেবিলের উপর বা খাটের উপর পড়ে আছে মন-বাহাদুরের রিভলভারটা, যেটা খান্নাজী আত্মরক্ষার্থে এনেছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। সম্ভবত পাখিটার ঐ অদ্ভুত বোলটা শুনেই খান্নাজী বুঝতে পারেন কেউ ওঁকে খুন করতে চায় এবং অপরাধটা রমা দেবীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ঐ আগন্তুকই যে সেই হত্যাকারী তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আগন্তুক দ্রুতগতিতে মন-বাহাদুরের রিভলভারটা তুলে নেয় এবং দুটি ট্রিগারই একসঙ্গে টেনে দেয়। সে এটা আত্মহত্যার কেস বলে চালাতে চায়নি—সে হত্যাপরাধটা রমা দেবীর স্কন্ধেই চাপাতে চেয়েছিল! তাই ফিঙ্গার প্রিন্ট মুছে নিয়ে রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে দেয়। দেড় কে. জি. মাছ সে নিয়েই এসেছিল—সেটা রেখে দিয়ে, পাখিটার জন্যে এক মগ জল কিছু বিস্কুট ছড়িয়ে দিয়ে সে চলে যায়—যাবার সময় ইয়েল-লকওয়ালা দরজাটা টেনে দিয়ে। নাউ মিস্টার বর্মন, আপনি অপরাধবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত—সি. বি. আই.-য়ের এক্সপার্ট। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে একটা বিরুদ্ধ যুক্তি—একটিমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসঙ্গতি দেখাতে পারেন যা আমার এই থিয়োরির সাথে মিলছে না?

সতীশ বর্মন এর জবাবে যা বললে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। বললে, না! আমি বিশ্বাস করি না জগদীশ মাথুর এ কাজটা করেছে—কারণ রমা দাসগুপ্তাকে সে আদৌ তখন চিনত না।

বাসু বলেন, এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয় মিস্টার বর্মন! আমি জানতে চাই, আমার ঐ থিয়োরিটা কেন মানতে রাজী নন আপনি? কোথাও কোনও অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছেন?

—হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সতীশ। বলে, পাচ্ছি! প্রকাণ্ড বড় একটা অসঙ্গতি! পাঁচই বিকাল চারটের সময় খান্নাজী হত হলে তিনি কেমন করে ঐদিন রাত আটটার সময় ফোন করলেন?

—কাকে?

—ওঁর একান্ত...জাস্ট এ মিনিট—তাব মানে—

—এই তো! ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন আপনি! তার মানে মহাদেও প্রসাদ খান্না পাঁচই রাত আটটায় কোন টেলিফোন কবেনি!

—বাই জোভ! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সতীশ বর্মন!

—একজাক্টলি। এতক্ষণে আপনি প্রকৃত অপরাধবিজ্ঞানীর মত একটা কথা বলেছেন। খান্নাজীকে যে খুন করে সে লোকটার নাম...গঙ্গারাম যাদব!

শর্মাজীও উঠে দাঁড়িয়েছেন: মিস্টার যাদব! মিস্টার গঙ্গারাম যাদব!

দেখা গেল, যে চেয়ারখানাতে গঙ্গারাম যাদব এতক্ষণ বসেছিলেন সেটা শূন্যগর্ভ!

করোনার বললেন, আধঘণ্টার জন্য আদালতের কাজ স্থগিত রইল। মিস্টার যোগীন্দর সিং...কুইক!

কিন্তু কোথায় যোগীন্দর? সেও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে গঙ্গারাম অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে।

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, রমা, তোমার যন্ত্রণার শেষ হয়েছে। আর কেউ এরপর তোমাকে বিরক্ত করবে না। এখন তুমি প্রাণভরে কাঁদতে পার।

বারো

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। এস. ডি. ও. শর্মাজীর অফিসঘরে বসেছিলেন বাসু আর কৌশিক। শর্মাজীর জীপ গেছে পুলিস হাজতে—রমা দেবীর রিলিজ-অর্ডার নিয়ে। একটু পরেই বন্দিনীকে মুক্ত করে জীপটা ফিরে আসবে। শর্মাজী বলেন, আপনি কী করে আন্দাজ করলেন এটা গঙ্গারামের কাজ? ওর তো কোনও মোটিভ ছিল না?

বাসু বলেন, কেসটার ঐটুকুই ছিল জটিলতা। কে খুন করেছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক আগেই, কিন্তু কেন খুন করেছে তা বুঝতে দেরি হল।

শর্মা বলেন, কে খুন করেছে সেটাই বা কেমন করে বুঝলেন?

—ভেবে দেখুন মৃত্যুর সময় যদি ছয় তারিখ সকাল হয়, যা ছিল আপনাদের থিয়োরি, তাতে অনেকগুলি অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং সিদ্ধান্তে এলাম, সময়টা পাঁচ তারিখ বিকাল। তার অনুসিদ্ধান্ত: রমা দাসগুপ্তা হত্যাকারী হতে পারে না। কারণ রমা ডেলিবারেট মার্ডারার হতেই পারে না; উত্তেজনার মুহূর্তে হত্যা করলে কেবিনে দেড় কে. জি. মাছ থাকতে পারে না।সুতরাং রমা বাদ গেল। সুরমা দেবীর কোনও মোটিভই নেই।'তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছেন। মহাদেওকে হত্যা করার ইচ্ছে থাকলে কোনমতেই তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করার পরে 'হত্যা'টা করতেন না। জগদীশ ছয় তারিখ পর্যন্ত দিল্লিতে ছিল—তার প্রমাণ আছে। যেহেতু 'রমা' এবং 'সুরমা' দুজনের কেউ হত্যাকারী নয়, এবং ময়নাটা আদৌ লগ্-কেবিনে যায়নি, তখন ধরে নিতে হবে ঐ বোলটা মুন্নাকে কেউ 'টিউটার' করেছে, বা বারে বারে শুনিয়ে শিখিয়েছে। কে হতে পারে? এবার চিন্তা করে দেখুন, মহাদেও প্রথমে বলেছিলেন পাঁচই সেপ্টেম্বর এসে মুন্নাকে নিয়ে যাবেন। সুতরাং হত্যাকারী—যে ঐ বোলটা শিখিয়েছে, সে এমন একজন যার কাছে পাখিটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল। কে সে? দুজন মাত্র হতে পারে: সুরয এবং গঙ্গারাম। সুরয না হওয়ারই সম্ভাবনা। তার প্রথম কারণ, সে নিজে থেকে আমাকে 'এনগেজ' করেছে; শ্রীনগর থেকে কলকাতায় 'ট্রাঙ্ক-কল' করে আমাকে নিযুক্ত করতে চেয়েছে। হয়তো একটু অবিনয় থেকে যাচ্ছে, তবে যুক্তির খাতিরে মেনে নিতেই হবে যে, আমার ব্যাক-গ্রাউন্ড জানার পর সে কিছুতেই আমাকে নিযুক্ত করত না—যদি সে নিজেই হত পিতৃহন্তা!

শর্মা বললেন, তাছাড়া তার কোন মোটিভও ছিল না। সে নিজেই যে উইলেব ওয়ারিশ তা সে জানত না।

বাসু বলেন, না, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। তার কোনও মোটিভ থাকা অসম্ভব হত না, যদি ঘটনাচক্রে সে জানতে পারত যে, মহাদেব তৃতীয়বার একটি মহিলার পাণিগ্রহণ করবেছেন। সে যাই হোক, সন্দেহটা ঘনীভূত হচ্ছে গঙ্গারামের উপর, যদিও তার 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ, আপাতত ধরে নিন, গঙ্গারামের কিছু 'মোটিভ' আছে, সেক্ষেত্রে গঙ্গারাম কি এ কাজটা করতে পারে? তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবস্থাটা বিচার করে দেখা যাক:

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গঙ্গারাম জানত: এক: পাঁচই সকালে অমরনাথ তীর্থ থেকে ফিবে মহাদেও শ্রীনগরে আসবেন, পঞ্চাশ হাজাব টাকা নগদে গঙ্গারামকে দিযে, পাখিটাকে নিয়ে লগ্-কেবিনে ফিরে যাবেন। দুই: পরদিন ছয়ই ভোরের প্লেনে সুরমা ও জগদীশ শ্রীনগরে আসবেন ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিতে। তিন: গঙ্গারাম যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে পেয়েছেন এটা গোপন তথ্য। সূরয পর্যন্ত জানবে না, জানেন শুধু মহাদেও। ঐ তিনটি সূত্র অবলম্বন করে গঙ্গারাম প্ল্যান করল—পাঁচ তারিখ বিকালে সে দেড় কে. জি. মাছ নিযে তার মটোরবাইকে চেপে ঐ লগ্-কেবিনে যাবে, মহাদেওকে খুন করে মাছটা সেখানে রেখে ফিরে আসবে এবং পরদিন ছয় তারিখ ভোরের প্লেনে দিল্লি চলে যাবে। এ-ক্ষেত্রে ওর পরিকল্পনা-মত ঘটনা কোন খাতে বইত? সুবমা ও জগদীশ ছযই সকালে এ বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখতেন—শ্রীনগরে মহাদেও বা গঙ্গারাম কেউই নেই। মহাদেও কত নম্বর লগ্-কেবিনে আছেন তা সূরযই জানত না, সুরমা কিছুতেই সেটা খুঁজে পেতেন না। গঙ্গারাম আশা করেছিল, দশ-এগারো তারিখ নাগাদ হযতো মৃতদেহ পচে উঠবে এবং আবিষ্কৃত হবে। তাবপর পুলিস অবধারিতভাবে মৃত্যুর সময়টা ছয়ই সকাল দশটা বা এগারোটা বলে ধরে নেবে। গঙ্গারামের অ্যালেবাই আছে—সে ছয় তারিখ ভোরের প্লেন ধরেছে এবং তার কোনও 'মোটিভ' নেই। অথচ সুরমা দেবীর অ্যালেবাই থাকবে কিনা সে জানে না। যদি না থাকে, পাখির ঐ বোলটা মারাত্মকভাবে তাঁকে চিহ্নিত করবে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কী ছিল তা অনেকেই জানত।

শর্মাজী বলেন, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। গঙ্গারামের 'মোটিভ'টা কি? সে তো জানতই না উইলে মহাদেও তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন? কী লাভ হচ্ছে তার এই হত্যাকাণ্ডে?

—ঐ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা।

—তা কেমন করে সম্ভব? সেটা তো দিল্লি ব্রাঞ্চ শ্রীনগর ব্রাঞ্চের উপর অ্যাকাউন্ট-পেয়ী ব্যাঙ্ক-ড্রাফট দিয়েছে।

বাসু হেসে বললেন, শর্মাজী, কোয়োড্রেটিক্ ইকোয়েশনটার দুটো রুট ছিল—'এক্স' আর 'ওয়াই'; অর্থাৎ 'কে' আর 'কেন' করোনার আদালতে আপনি লক্ষ্য করেছেন—'কে' এই প্রশ্নটা সমাধান করতে আমি দেখিয়েছিলাম 'সময়টা' নির্ধারণ করায় অনেক অসঙ্গতি ছিল। ঠিক তেমনি, 'কেন' এই প্রশ্নটার সমাধানেও এক বাণ্ডিল অসঙ্গতির জট ছাড়াতে হবে আপনাকে। প্রথম কথা : উনি যখন অমরনাথ তীর্থে যান,তখন নিশ্চয়ই কয়েক হাজার টাকা মাজায় বেঁধে নিয়ে যাননি, যেহেতু সেখানে সে টাকা ইচ্ছা থাকলেও খরচ করা যায় না। সুতরাং অমরনাথ থেকে যখন শ্রীনগরে ফিরে আসেন, আই মীন দোশরা সেপ্টেম্বর সকালে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে বেশি টাকা ছিল না, বড়জোর দু'একশ টাকা, কেমন?

—সেটাই সম্ভব। কেন?

—দেখ্ছি দোশরা তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও ঐদিন টাকা তোলেননি। অথচ লগ্-কেবিনে যখন তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর কাছে 5,700 টাকা একশ টাকার নোটে রয়েছে। এ টাকা কোথা থেকে এল?

শর্মা বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি লকার থেকে নগদ টাকা নিয়ে যান!

—এক্সজ্যাক্টলি। তাহলে দোশরা ওঁর ভল্টে ছিল 5,700+43,800 একুনে 49,500 টাকা; নয়? এবং তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও আছে আট হাজারের উপর। সে-ক্ষেত্রে তিনি কেন তাঁর একান্ত সচিবকে প্লেনের ভাড়া দিয়ে দিল্লি পাঠাবেন? তাঁর কাছেই তো রয়েছে নগদে সাতান্ন হাজার টাকা?

—কিন্তু তিনি তো তা সত্ত্বেও গঙ্গারামকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন, দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার মিস্টার সোদ্ধী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন যে, মহাদেও যখন ভল্টে গেলেন তখন ওঁর হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ, যার ভিতরে ছিল ঐ ফিক্সড-ডিপসিটগুলো! তাই নয়? এখন বলুন, উনি তখন ব্যাগ হাতে লকার খুলতে গেলেন কেন?

—আমি তো ভেবেছিলাম ঐ ছয়-সাত হাজার টাকা লকার থেকে বার করে আনতে!

—ছয় নয়, ছাপ্পান্ন হাজার। ঐ লকাবে তখন ছিল একশ টাকার নোটে ঠিক এক লাখ টাকা। ব্ল্যাক মানি। যার সন্ধান সূরযও জানে না, জানেন গঙ্গারাম। একটু অঙ্ক কষে দেখুন, মানে খান্নাজীর ডেবিট ক্রেডিট:

অমরনাম তীর্থে থেকে ফেবার পথে ওঁর কাছে নগদে ছিল, আপনার আন্দাজমত	...	200
মৃত্যুর পরে তাঁর মানিব্যাগে ছিল	...	300
ঐ সুটকেসে ছিল	...	5,400
নগদে একটি ময়না কেনা বাবদ	...	200
গঙ্গারামকে হাতখবচ দেন (গঙ্গারামের কথামত)		1,000
দোশরা থেকে পাঁচই ওঁর হাতখবচ আন্দাজ	...	100
		7,200
লকারে পরে নগদে পাওয়া গেছে	...	43,800
		51,000

হিসাবটা ঠিক মিলছে না, নয়? ব্ল্যাকমানি লোকে নগদে লুকিয়ে রাখে, দশ-হাজারের গুণিতকে। সুতরাং ঐ ডেবিট-ক্রেডিটে হাজার টাকার গরমিল হচ্ছে। কেন? হাজার টাকার একটাই 'এন্ট্রি' আছে। সেটাই ভুল। অর্থাৎ মহাদেও, তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারীকে নগদ হাজার টাকা দেননি। সে গ্যাটের পয়সা খরচ করে দিল্লি গেছে তার অ্যালেবাই-র খাতিরে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও অনেকগুলি যুক্তি রয়েছে যে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী—দোশরা তারিখে মহাদেও তাকে বলেছিলেন ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলি বাড়িতে রাখতে। কারণ তিনি অন্য কোন সূত্র থেকে 50,000 টাকা যোগাড় করবেন। নেহাৎ না পেলে তিনি টেলিফোনে নির্দেশ দেবেন যাতে গঙ্গারাম দিল্লি গিয়ে ড্রাফ্‌টটা নিয়ে আসে। সে-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কি মহাদেও দোশরা দুপুরের বাসে ট্রাউট-প্যারাডাইসে চলে যেতে পারেন? সেখানে ট্রাউট মাছই শুধু পাওয়া যায়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার লোন পাওয়া যায় না।

শর্মাজী বলেন, তা ঠিক।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ লকারে নগদ এক লাখ টাকা ব্ল্যাকমানি ছিল। যে-কথা সূরয জানত না, কিন্তু গঙ্গারাম জানত। এবং এটাও সে জানত যে, মহাদেও 'অ্যালিমনি'র টাকা মেটাবেন ব্ল্যাক-মানিতে। কারণ সুরমা নগদই চেয়েছেন, ঐ দু-নম্বর খাতার অতগুলি টাকার সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই করবেন মহাদেও। সেটা জানা ছিল বলেই গঙ্গারাম ঐ পরিকল্পনা করে। গঙ্গারাম জানত—মহাদেও অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি বেঁচে থাকলে প্রতিশোধ নিতেনই। সোজা পথে না হলে বাঁকা পথে। এজন্য টাকাটা হজম করতে হলে মহাদেওকে হত্যা করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। মহাদেও আত্মহত্যা করেছেন এটা প্রমাণ করা

শক্ত। পুলিস সহজে সেটা বিশ্বাস করত না। হেতুর অভাবে। তার চেয়ে অনেক সহজ: অপরাধটা সুরমার কাঁধে চাপানো। কারণ 'রমা দেবী'র কথা সে জানত না।

যে-হেতু একমাত্র গঙ্গারামই হত্যাকারী হতে পারে, তাই আমি ধরে নিলাম হয় তো দোশরা সেপ্টেম্বর ওঁর লকারে ছিল নগদে এক লাখ টাকা। তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায়:

মৃত্যুর পরে লগ্-কেবিনে পাওয়া গেছে (মানিব্যাগ ও সুটকেসে)	... 5,700
একটি ময়না কেনার খরচ	... 200
দোশরা থেকে পাঁচই ওঁর হাতখরচ (একশ নয়, কিছু বেশি)	... 300
গঙ্গারামকে 'অ্যালিমনি' মেটাতে দেওয়া	50,000
লকারে নগদে পাওয়া গেছে	... 43,800
	1,00,000

আমার এই হাইপথেসিস্‌টা ঠিক কিনা যাচাই করতে আমি একটা ফাঁদ পাতলাম—গঙ্গারামের উপস্থিতিতে সূরযকে জানালাম, সুরমা দেবীর একটা বজ্র-বাঁধুনি 'অ্যালেবাই' আছে। এ-কথা বলার আগেই আমি কিন্তু মুন্নাকে রমার বাড়ি থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় পাখিটকে ওখানে রেখে এসেছি। আর ঐসঙ্গে কায়দা করে জানিয়ে দিলাম, মুন্না আছে রমার বাড়িতে, পহেলগাঁওয়ে, মেথডিস্ট চার্চের পিছনে দ্বিতীয় বারান্দায়, অরক্ষিত অবস্থায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হত্যাকারী প্রণিধান করেছে—সে সূরযই হোক, অথবা গঙ্গারামই হোক, মুন্নার ঐ বোলটা এখন পুলিসের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে। যেহেতু 'রমা' বা 'সুরমা' হত্যাকারী নয়, তখন স্বভাবতই পুলিস ভাবতে শুরু করবে যে, মুন্নাকে সে ঐ বোল্‌টা টিউটার করিয়েছে, শিখিয়েছে। আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, খবরটা শোনার পরেই প্রকৃত হত্যাকারী এই সুযোগে নেবে, আমার ফাঁদে পা দেবে—অর্থাৎ মুন্নাকে হত্যা করতে ছুটবে। ওরা আমাদের হাউসবোট থেকে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যা ছ'টায়। তার ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোন করে দেখলাম সূরয বাড়িতে আছে, কিন্তু গঙ্গারাম কোথায় বুঝি 'নৈশ' নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে। তার ফিরে আসতে রাত প্রায় এগারোটা হল। গঙ্গারাম বাস-এ যায়নি, নিজস্ব মোটরবাইকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হওয়ার মানেই হচ্ছে তার মোটিভ রূপে আমি যা অনুমান করেছি তা সত্য। মুশকিল হচ্ছে এই যে, মোটিভটা আমি প্রমাণ করতে পারতাম না কোনদিনই। যেহেতু ব্ল্যাকমানির হিসাব থাকে না। তাই আমি আপনাদের জানাতে পারিনি আমার সিদ্ধান্তটা। ভেবে দেখলাম, ওর অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে হলে কিছু নাটকীয়তার আশ্রয় আমাকে নিতে হবে। এজন্য সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে তিলতিল করে সমাধানটা দাখিল করতে থাকি। আমি জানতাম, যে-মুহূর্তে মৃত্যুর সময়টা ছয় তারিখ সকাল থেকে পাঁচ তারিখ বিকালে আমি সরিয়ে নিয়ে যাব, সেই মুহূর্তে গঙ্গারাম নার্ভাস হয়ে পড়বে; আর তারপর যখন তিলতিল করে হত্যাকারীর পরিচয়টা স্পষ্ট করতে থাকব তখন আতঙ্কের তাড়নায় গঙ্গারাম পালাবার চেষ্টা করবে। আর তাতেই তার হত্যাপরাধটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঘটনাও ঠিক সেই খাতে বইল।

শর্মাজী বলেন, গঙ্গারাম ধরা পড়বেই। আজকালের মধ্যেই। কিন্তু অপরাধটা আমরা প্রমাণ করব কী করে? কোন প্রমাণ তো নেই।

বাসু বললেন, সম্ভবত আছে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সে মহাদেও প্রসাদের টেলিফোন পায় পাঁচ তারিখ রাত আটটায় এবং পরদিন সে সকালের ফ্লাইটে দিল্লি চলে যায়। দেখুন এজন্য সে বলেছে লগ্-কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে জানত, লগ্-কেবিন থেকে যা টেলিফোন করা হয় তার লিস্ট থাকে; তার বিল বোর্ডারকে মেটাতে হয়। কিন্তু এই সিজন্‌টাইমে অত অল্প সময়ে প্লেনে সীট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া তার নিজস্ব 'অ্যালিবাই'টা পাকা করতে সে নিশ্চয় অনেক আগেই সীটটা বুক করেছিল। সে অনেক আগে থেকেই ঐ পরিকল্পনা করেছিল। একটু খোঁজ নিলেই

আপনি জানতে পারবেন ঐ টিকিটটা কবে বিক্রি হয়। সেটাই চূড়ান্ত প্রমাণ। মহাদেও যদি ব্ল্যাকমানির বদলে হোয়াইট মানিতে 'অ্যালিমনি'র টাকাটা মেটাতেন তাহলে তিনি আদৌ হত হতেন না। কালো টাকাই তাঁকে মেরেছে!

শর্মাজী বলেন, মুন্নার ব্যাপারটা কিন্তু এখনও ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে। ওটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

বাসু বলেন, সত্যি কথা বলতে কি ওটা আমার নিজেব কাছেই পরিষ্কার হয়নি। দোশরা তারিখে মুন্নাকে নিয়ে মহাদেও যখন আড়াইটার বাসে শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও আসেন, তখন বাসের মধ্যেই নিশ্চয় মুন্না ঐ বোলটা দু-একবার পড়ে। মহাদেও অবাক হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন। উনি বুঝতে পারেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে চায়, এবং হত্যাপরাধটা হয় রমা, নয় সুরমার কাঁধে চাপাতে চাইছে। তাই পহেলগাঁওয়ে পৌঁছেই তিনি পাখিটাকে রমাকে রাখতে দিলেন। তিনি রমাকে তার পরেই বলেছিলেন, তাঁর একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, আত্মরক্ষার্থে। তাই রমা তাঁকে ঐ রিভলভারটা দেয়। এ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তারপর মহাদেও যে কেমন করে ময়নাটা বদলে ফেললেন, এটুকুই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

শর্মা বলেন, কেন? আমরা ধরে নিতে পারি, তেশরা কিম্বা চৌঠা আবার শ্রীনগর আসেন এবং দ্বিতীয় ময়নাটা খরিদ করে তাঁর লগ্-কেবিনে ফিরে গেছেন।

—উঁহু! মহাদেও ওটা খরিদ করেছেন দোশরা সেপ্টেম্বর দুপুরে। জুম্মাবারে। শ্রীনগরেই। সেন্ট্রাল মার্কেটে, ইয়াকুব-মিঞার দোকান থেকে। লোকটা হিসাবের পাকা-খাতা দেখে বলেছে। মহাদেওয়ের ফটো দেখে সনাক্ত করেছে।

এই সময়েই যোগীন্দর সিং দ্বারের কাছ থেকে বলে, মে আই কাম্ ইন স্যার?

—আইয়ে, আইয়ে, ক্যা বাৎ?

যোগীন্দর এসে বলে, গঙ্গারাম ধরা পড়েছে। শ্রীনগরে পৌঁছবার আগেই।

শর্মাজী বলেন, কনগ্র্যাচুলেশনস!

যোগীন্দর বলে, কৃতিত্বটা আমার নয় স্যার, ওঁর!—বাসু-সাহেবকে দেখায়।

—ওঁর তো বটেই। উনিই তো আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

— আজ্ঞে না, স্যার, কবোনাবেব আদালতে ঢুকবার আগেই উনি আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, মিস্টার সিং—হত্যাকারী কে আমি তা জানি, নামটা আপনাকে এখনই বলতে পারছি না, তবে সে আদালতে আছে এবং যে মুহূর্তে আমি তাকে চিহ্নিত করব, তখনই সে পালাতে চেষ্টা করবে। আপনি সজাগ থাকবেন। প্লেনড্রেস পুলিস দিয়ে আদালত ঘিরে রাখবেন।

শর্মাজী বাসুকে বলেন, কী আশ্চর্য! শুধু আমাকেই বলেননি?

বাসুর কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করল না। উনি তখনও কী যেন ভাবছেন। চোখ দুটি বোঁজা, পাইপটা ধরা আছে বাঁ হাতে। ডান হাতে গায়ত্রী জপ করার ভঙ্গিতে উল্টো করে এক দুই তিন গুনছেন।

একটু পরেই একটা জীপ এসে থামল। দ্বারপথে রমার মূর্তিটা আবির্ভূত হতে শর্মা বলেন, কাম্ ইন প্লীজ—কনগ্রাচুলেশন্স!

রমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বাসুকে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাসু বলেন, জাস্ট এ মিনিট! রমা, সেই দোশরা সেপ্টেম্বরের কথা তোমার ঠিক ঠিক মনে আছে?

রমা তখনও আসন গ্রহণ করেনি। বলে, কোন কথা?

দোশরা সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটার বাসে মহাদেও শ্রীনগর থেকে রওনা দেন। তার মানে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি পহেলগাঁও বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছান। বাস স্ট্যান্ড থেকে তোমার বাড়ি হাঁটাপথে দশ-বারো মিনিট, তার মানে...

বাধা দিয়ে রমা বলে, না, বাস স্ট্যান্ডেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আর আড়াইটায় নয়, উনি দেড়টার বাসে শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও আসেন।

বাসু বলেন, অসম্ভব! দেড়টার বাসে তিনি আসতেই পারেন না। কারণ ঠিক বেলা দুটোয় তিনি ছিলেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানজারের ঘরে। উনি আড়াইটার বাসে গিয়েছিলেন।

রমা বললে, না, আপনি ভুল করছেন। উনি দেড়টার বাসেই এসেছিলেন। কারণ দেড়টার বাসটা পহেলগাঁওয়ে পৌছায় চারটে চল্লিশে। আমার ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। তাই চারটে চল্লিশের বাসটাকে স্ট্যান্ডে ঢুকতে দেখি। আর আড়াইটার বাস পহেলগাঁওয়ে পৌছায় পাঁচটা চল্লিশে—তার অনেক আগে আমি বাড়ি চলে যাই।

বাসু অনেকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বলেন, তুমি ভুল করছ রমা। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার সোন্ধী আমাকে বলেছিল, মিস্টার খান্না দ্বিতীয়বার যখন ব্যাঙ্কে ফিরে আসেন তখন ব্যাঙ্কের আওয়ার্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুটো বেজে গিয়েছিল। তুমিই কিছু গণ্ডগোল করছ—

রমা রাগ করে না। বলে, না, ভুল করলে করেছে ঐ সোন্ধীই। আমার পরিষ্কার মনে আছে—উনি যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন দেড়টার বাসে ফিরবেন। তাই অফিস যাওয়ার সময়েই আমি বাস-স্ট্যান্ডে টাইম-কীপারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দেড়টার বাসটা কখন পৌছায়। সে বলেছিল বিকাল চারটে চল্লিশ। তাই অফিস ছুটি হতেই আমি তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডে চলে যাই। তখন দেড়টার বাসটা 'ইন' করছে। বাসটা রাইট-টাইম ছিল।

বাসু বলেন, তুমি তাহলে ওঁকে বাস থেকে নামতে দেখেছ?

—হ্যাঁ। কেন?

—তখন ওঁর কাছে ক'টা ময়না ছিল?

—একটাই। ঐ মুন্নাই। কেন?

বাসু বলেন, স্ট্রেঞ্জ!

—স্ট্রেঞ্জ মানে?

—জিগস্ ধাঁধার আবার একটা মিসিং পীস্!

এরপর যোগীন্দর, শর্মাজী, কৌশিক, সুজাতা এবং রমা নানা কথা আলোচনা করতে থাকেন। বাসু-সাহেবের কর্ণকুহরে কোনও কথাই যাচ্ছিল না। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্নচৈতন্য। হঠাৎ একটা কথায় তাঁর ধ্যানমগ্নতা ভেঙে গেল। শর্মাজী বলছেন, সত্যিই মহাদেওপ্রসাদ খান্নাজী ছিলেন একজন দিলদরাজ মানুষ! কখনও কারও প্রতি কোনও অন্যায় করেননি।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি তখন থেকে কী ভাবছেন, বলুন তো?

—ঐ কথাই ভাবছিলাম। আমিও কি একই জাতের ভুল করছি? বর্মন যা করেছিল? অর্থাৎ একটা পূর্ব-সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে এভিডেন্সগুলোকে ইন্টারপ্রেট করছি—যে সূত্রগুলো আমার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী সেগুলো অগ্রাহ্য করছি?

শর্মাজী বলেন, আপনি তো চূড়ান্ত সমাধান করেই ফেলেছেন। এখন আবার...

—না, না। কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছেই। না হলে আমার সলিউশান জিগস্ ধাঁধার মতো খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে না কেন?

—একটাই তো অসঙ্গতি আছে। তাই নয়? দ্বিতীয় পাখিটা কী করে এল?

—না, শুধু একটাই নয়! আরও আছে। দেড়টার বাস না আড়াইটার বাস? তাছাড়া ঐ উইলটা!

—উইলে কী অসঙ্গতি?

—দেখছেন না, আপনি এখনই বলছিলেন, মহাদেওপ্রসাদ কখনও কারও কাছে কোনও অন্যায় করেননি। কিন্তু রমাদেবীর প্রতি তাঁর আচরণটা দেখেছেন? উইলটা অত্যন্ত নিপুণভাবে বানানো।' তিনি

এ-কথাও লিখেছেন, বিবাহ বিচ্ছেদ আইনত সিদ্ধ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হলে মিসেস্ সুরমা খান্না ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্রই পাবেন। উনি ওঁর প্রত্যেকটি কর্মীকে কিছু না কিছু দিয়ে গেছেন। এমন একজন বিচক্ষণ মানুষ উইলে রমার কোনও উল্লেখই করবেন না?

ঐ সময় ট্রেতে করে শর্মাজীর বেয়ারা চা-বিস্কুট নিয়ে এল। সকলকে বিতরণ করল। শর্মাজী বলেন, হয়তো রমা দেবীকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি উইলটা করেন।

—তা তো করেনই। কিন্তু বিবাহের পরে কেন তিনি ওটা নতুন করে লিখলেন না? তিনি তো দোশরা শ্রীনগরে এসে লকারটা খুলেছিলেন! এবং তখন তিনি জানতেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে? না, মিস্টার শর্মা। কোথাও প্রকাণ্ড একটা ফ্যালাসি আছে! লোকটার পকেটে স্বহস্ত-লিখিত মিসেস্ রমা খান্নার স্বীকৃতি আছে, অথচ উইলে তার উল্লেখ নেই?

কৌশিক বলে, আপনার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মামু।

বাসু-সাহেবের হুঁশ হল না। আবার আলোচনা এগিয়ে চলে।

কোথাও কিছু নেই, শর্মাজীর গ্লাস-টপ টেবিলে একটা মুষ্ট্যাঘাত করে বসলেন বাসু। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল চায়ের কাপগুলো।

শর্মাজী অবাক হয়ে বলেন, কী হল?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন উত্তেজনায়। বলেন, রমা তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে! নয়? আমার দেখা না পেলে তুমি যেন কোথায় যেতে?

রমা বলে, সে-কথা এখন কেন? আপনি এ-প্রশ্ন সেদিনই করেছিলেন, আমি বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে আমি সেই ঘরটাতে যেতাম যেখানে...

—কারেক্ট! ঘরটা তুমি খুঁজে বার করতে পারবে?

—কেন পারব না?

—দেন গেট আপ্। ও বাকি চা-টুকু তোমার না খেলেও চলবে। চল ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দেবে চল।

—এখনই! কেন?

—ডোন্ট আর্গু! জিগ্‌স্ ধাঁধার একটা ছোট্ট টুকরো ঐ ঘরে পড়ে আছে। দেখি সেটা কুড়িয়ে পাই কিনা!

রমার বাহুমূল চেপে ধরে তিনি নির্গমন-দ্বারের দিকে এগিয়ে চলেন। কৌশিক পিছন থেকে বলে, আমরা? আমরা কী করব?

—য়ু শাট আপ্! চা খাও বসে বসে!

রমার বাহুমূল যেমন ধরা আছে তেমনি ভাবেই বন্দিনীকে নিয়ে এসে উঠলেন সেই সিনেমন-রঙের অ্যাম্বাসাডারে। বললেন, ড্রাইভারকে বল, কোন দিকে যেতে হবে।

মিনিট পনের পরে গাড়িটা এসে থামল সেন্ট্রাল মার্কেটের পিছনে একটা ঘিঞ্জি অঞ্চলে। সারি সারি লরি, ঠেলা। মালপত্রের গুদাম। রমা বলল, আর গাড়ি যাবে না। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে।

—অল রাইট! চল, হেঁটেই যাব।

সরু গলিপথ দিয়ে দুজনে এসে থামলেন একটা দোতলা বাড়ির সামনে। এতক্ষণে অন্ধকার হয়েছে। রাস্তায় মাতালের ঘোলা চোখের মত বাতি। সবটাই আলো-আঁধারি। বাড়িটার নিচে গুদামঘর। লরি থেকে মালখালাস হচ্ছে। পাশ দিয়ে একটা নড়বড়ে সিঁড়ি উঠে গেছে কাঠের বাড়িটায়। রমা আঙুল তুলে বললে, ঐ ঘরটা!

বাসু বললেন, ঘরের দরজাটা বন্ধ কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে। কে থাকতে পারে ঘরটার ভিতর?

রমা বললে, আমি কী জানি?

—লেটস্ ইন্‌ভেস্টিগেট! চল আমরা তদন্ত করে দেখি। এস।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠে এলেন দ্বিতলে। বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়ালেন বাসু-সাহেব। বাঁ-হাতে তখনও ধরা আছে রমার বাহুমূল। কড়া নাড়লেন দরজায়।

ভিতর থেকে অর্গলমোচনের শব্দ হল। দ্বার খুলে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলেন, কাকে চাই?

যেন লিভিংস্টোন সম্বোধন করছেন স্ট্যানলিকে।

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব .বলেন, মিস্টার যশোদা কাপুর, আই প্রিজ্যুম?

পাশ থেকে রমা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল: ও...ও কে?

ভদ্রলোক বাসু-সাহেবের প্রসারিত করটা গ্রহণ করলেন না। রমার পতনোন্মুখ দেহটা ধবে ফেলে বললেন, কী হয়েছে রমা? তুমি অমন করছ কেন?

—তুমি!

—হ্যাঁ, আমিই। তুমি কি ভূত দেখছ?

রমা বোধ হয় খণ্ডমুহূর্তের জন্য ভুলে গেল বাসু-সাহেবের উপস্থিতি। সবলে জড়িয়ে ধরল ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে।

বাসু বলেন, একটা কথা! আপনি কি জানেন, মিস্টার মহাদেও প্রসাদ খান্না মারা গেছেন?

—চমকে উঠল লোকটা: মারা গেছেন! মানে! কবে? কী করে?

—সেটা আপনার স্ত্রীর কাছে শুনবেন। গুড নাইট!

তেরো

আরও ঘণ্টাদুয়েক পরের কথা।

হাউসবোটের ড্রইংরুমে সমবেত হয়েছেন সবাই। বাসু-সাহেব রানী দেবীকে সর্বশেষ ঘটনার চুম্বকসার শোনাচ্ছিলেন। সুজাতা কফির পটে কফিটা তৈরী হয়েছে কিনা দেখছে। কৌশিক এবং সূরয ঘরের অপর প্রান্তে নিম্নস্বরে কথোপকথনে ব্যস্ত।

দ্বারের কাছে ধ্বনিত হল: আসতে পারি?

সবাই চোখ তুলে তাকায়—যশোদা কাপুর এবং রমা দাসগুপ্তা।

বাসু-সাহেব এগিয়ে এসে আগন্তুকের করগ্রহণ করে বলেন, আইয়ে আইয়ে খান্নাজী।

সূরয উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। নত হয়ে প্রণাম করতে যায়। তার আগেই প্রীতম প্রসাদ খান্না ওকে সবলে বুকে টেনে নেন।

রমা এগিয়ে এসে রানী দেবীকে প্রণাম করে। বলে, কী যে বলব আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি...আমি...

রানীও ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, কিছুই বলতে হবে না রমা। তোমার বুকের মধ্যে এখন কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি।

সবাই স্থির হয়ে বসার পর বাসু সূরযকে প্রশ্ন করেন, তোমার কাকাকে দেখতে কি ঠিক বাবার মতো?

সূরয বললে, না। বাবা বেশ বুড়িয়ে গেছিলেন। তবে বছর সাত-আট আগে তাঁকে দেখতে ঠিক এই রকমই ছিল। খবরের কাগজ থেকে যখন ছবি চেয়ে পাঠায়, আমি বাবার একটা পুরানো ফটোগ্রাফই দিয়েছিলাম। তাতেই চাচিজীর ভুল হয়েছে।

প্রীতম প্রসাদজী বলেন, আমি খবরের কাগজ পড়া বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তাই এত বড় খবরটা জানি না। অবশ্যই আমি মাত্র কালকেই শ্রীনগরে ফিরে এসেছি। তার আগের দিন দশেক এমন পাহাড়ী অঞ্চলে ছিলাম যেখানে খবরের কাগজ যায় না।

বাসু বলেন, যদি কিছু না মনে করেন, আপনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কেন?

প্রীতমজী হেসে বলেন, দেখুন, আমি একজন পাগলাটে মানুষ। ভবঘুরে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াই। হয়তো ময়লা বা ছেঁড়া জুতো-জামা পরি। অথচ মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমার চেহারার সঙ্গে দাদার চেহারার খুবই সাদৃশ্য। দাদা একজন খানদানী নামী ব্যক্তি। নিজের উপাধি খান্না বললেই লোকে প্রশ্ন করত, 'মহাদেওপ্রসাদ খান্নাজী আপনার কেউ হন?' জবাবে সত্য কথা বললেই নানান প্রশ্ন উঠে পড়ে। দাদা কেন তাঁর মায়ের পেটের ভাইকে দেখেন না, লক্ষপতির ভাই কেন ভবঘুরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই নিজের নামটাকেই বদলে নিয়েছিলাম।

বাসু বলেন, আমার আরো দুয়েকটি প্রশ্ন আছে। জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়ই করবেন। রমার কাছে শুনেছি, আপনি ওকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি...আমি কী দিতে পারি আপনাকে? বড় জোর আপনার একখানা পোর্ট্রেট...কিন্তু...

—সে সব কথা পরে হবে। আপনি বলুন, দাদার সঙ্গে কি সম্প্রতি দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, হয়েছে। দাদা এবছর অমরনাথ তীর্থে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে পহেলগাঁওয়ে তাঁর দেখা পাই। পহেলগাঁও পোস্ট-অফিসে। অনেক পুরানো দিনের গল্প হল। তারিখটা আমার মনে আছে—ঠিক আমার বিয়ের পরদিন। আঠাশে অগস্ট। আমি দাদাকে বললাম—বিয়ে করেছি। দাদা শুনে খুব খুশী। বলেন, রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিস্ ভালো কথা। শ্রীনগরে হিন্দুমতে আবার আমি তোদের বিয়ে দেব। আমি ওঁকে রমার বাসায় নিয়ে যেতে চাইলাম। উনি রাজী হলেন না, বললেন, ভাইয়ের বৌ কি কেউ খালি হাতে দেখে? তবে তখনই একটা কাগজে রমার নাম-ঠিকানা নিয়ে পকেটে রাখলেন। আমরা দুই ভাই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খেলাম। দাদা বললেন, প্রীতম, এবার আমিও বোধহয় মুক্তি পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন...

একটু ইতস্তত করে বললেন, নাঃ! সব কথাই বলব। আপনারা জানেন কি না জানি না, দাদার এবারকার বিবাহ সুখের হয়নি। উনি আমাকে বললেন, এতদিনে উনি ডাইভোর্স পাচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন, ট্রাউট-প্যারাডাইসের সেই লগ্-কেবিনটা তোর মনে আছে? ওটা এবারও আমি ভাড়া নিয়েছি। ওখানে পাঁচই আমি আসব। আমি তখন ওঁর কাছ থেকে লগ্-কেবিনের চাবিটা চেয়ে নিলাম। বললাম, তুমি তো পাঁচ তারিখে আসবে, তার আগে ওখানে আমি দুদিন থাকতে চাই। সস্ত্রীক। উনি খুশী হয়ে চাবিটা আমাকে দিয়ে দিলেন। দিন দুয়েক আমি আর রমা সেখানে ছিলাম। পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা পহেলগাঁওয়ে ফিরে এলাম। পরদিন ভোরের বাসে আমি আর দাদা শ্রীনগরে আসি। দাদা বলেছিলেন, ব্যাঙ্কে ওঁর কী একটা কাজ আছে, সেটা সেরে দেড়টার বাসে পহেলগাঁও ফিরবেন। আমি তাঁকে বললাম—আমিও ঐ বাসেই ফিরব। শ্রীনগরে পৌছে উনি সূরযের ওখানে গেলেন, আমি আমার ডেরায় চলে এলাম। ঐ ঘরটা মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় আমি রেখেছি আজ বছরদশেক। বেলা একটা নাগাদ বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে আবার দাদার দেখা পেলাম। ওঁর সঙ্গে একটা পাহাড়ী ময়না ছিল। সেটা আমিই ওঁকে দিয়েছিলাম। দাদা বলেন, এটাকে চিনতে পারিস? চিনতে আমার অসুবিধা হল না। তার ডান পায়ের একটা আঙুল কাটা ছিল। দাদা তখন বলেন, প্রীতম, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। ও একটা নোতুন বোল পড়ছে! ভারী অদ্ভুত! একটু পরেই পাখিটা 'বোলটা' পড়ল। শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, দাদা, এ বোল ও কেমন করে শিখল? এর মানে কী?

আমার দাদা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজনীতি করে চুল পাকিয়েছেন। বললেন, ওঁর বিশ্বাস কেউ ওঁকে হত্যা করতে চায় এবং হত্যাপরাধটা ভাবিজীর ঘাড়ে চাপাতে চায়! আমি অবাক হয়ে

বলি—এমনভাবে কে ওঁকে হত্যা করতে পারে? উনি জবাবে বললেন, উনি এককালে সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। তখন অনেক লোকের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনও কোনও লোকের বিরুদ্ধে কমিশন বসিয়েছেন। তাদেরই মধ্যে কেউ হয়তো এতদিন পর প্রতিশোধ নিতে চায়।

এই পর্যন্ত বলে প্রীতমজী থামলেন। নিজের মনেই ম্লান হাসলেন। তারপর বলেন, এই বোধ হয় দুনিয়াদারীর মজা। অত বড় বিচক্ষণ মানুষ হয়েও উনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এর পর আমাকে কী বললেন, জানেন?

—কী?

—বললেন গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে ঐ পাখিটা এতদিন কার কাছে ছিল,—সেই ঐ বোলটা ওকে শিখিয়েছে!

বাসু-সাহেব বলেন, আশ্চর্য! এত বিশ্বাস?

—জী হাঁ! এতটাই বিশ্বাস করতেন উনি গঙ্গারামকে! অথচ কী ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখুন। পরমুহূর্তে বলেন, প্রীতম, তুই তো পাখির বিষয়ে অনেক কিছু খোঁজ রাখিস্! বলতে পারিস, এ-রকম একটা পাহাড়ী ময়না কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? আমি ওঁকে জানালাম শ্রীনগরে সেন্ট্রাল মার্কেটে ইয়াকুব মিঞার দোকানে। উনি বললেন, তাহলে তুই মুন্নাকে নিয়ে পহেলগাঁও ফিরে যা। ওটা তোর বউয়ের কাছে রাখ। আমি আর একটা ময়না কিনে আড়াইটার বাসে ফিরে যাব। লোকটা কে তা জানি না, সুরমার প্রতি আমার কোনও দরদ নেই—তাই বলে, বিনা অপরাধে তাকে ফাঁসির দড়িতেও আমি ঝুলতে দেব না।

পহেলগাঁওয়ের কোন হোটেলে দাদা ছিলেন তা আমি জানতাম। কথা হল, চৌঠা আমি তাঁর সাথে দেখা করব, এবং এ বিষয়ে কী সাবধানতা নেওয়া যায় সে কথা আলোচনা করব। আমি পহেলগাঁওয়ে ফিরে ময়নাটা রমাকেই রাখতে দিলাম। দাদার কথা কিছু বলিনি। আমার সত্যিকারের পরিচয়ও দিইনি। কেন, সে কথা আপনাদের আমি বলব না। শুধু রমাকেই বলব। কারণ ও বুঝবে। ওর সব কথা ও আমাকে বলেছে—কেন ও এত বয়সেও অবিবাহিতা। আমার জীবনেও অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম, আমি নিঃস্ব বেকার একথা জানার পরেও...

হঠাৎ মাঝপথে থেমে বলেন, যাক সে-সব অবান্তর কথা। যে কথা বলছিলাম। চার তারিখে যখন দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তখন মনে হল একটা ছোরা কিনে দাদাকে উপহার দিলে কেমন হয়? রমার কাছে গোটাকুড়ি টাকা ধার চাইলাম।

বাসু বলেন, বাকিটা আমরা জানি—

সূরয বললে, চাচাজী, পিতাজী তাঁর উইলে বলেছেন আপনার যা ন্যায্য...

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন প্রীতমজী: না! তা হয় না!

বাসু বলেন, আমি একটা কথা বলব প্রীতমজী?

—জী হাঁ, বলুন।

—আপনি এখনই বলছিলেন আপনার স্ত্রীকে আমি ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছি, তাই আমার একটা ফি পাওনা আছে। তাই না?

—জী হাঁ! কিন্তু আপনি তো জানেন আমার কতটুকু সামর্থ্য?

—আর আমি যদি এমন কিছু দাবী করি যা আপনার সামর্থ্যের ভিতর?

—হুকুম ফরমাইয়ে সা'ব!

—আপনি আপনার দাদার দানটা অস্বীকার করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি আমি চাই। প্রীতমজী, আমি জানি—আপনি যদি তাঁর স্নেহের দান গ্রহণ করেন, সংসারী হন, সে টাকায় একটা স্টুডিও খুলে বসে মনের আনন্দে ছবি আঁকতে বসে যান, তবে স্বর্গ থেকে তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। তাছাড়া ঐ

মেয়েটাকেই বা কেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দঘন বিবাহিত জীবন থেকে বঞ্চিত করবেন আপনি? ও তো টাকার লোভে আপনাকে বিয়ে করেনি?

হাসলেন প্রীতমপ্রসাদ খান্না। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি বল?

রমা সাড়া দিল না। সে তখন রানী দেবীর কোলে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছে!
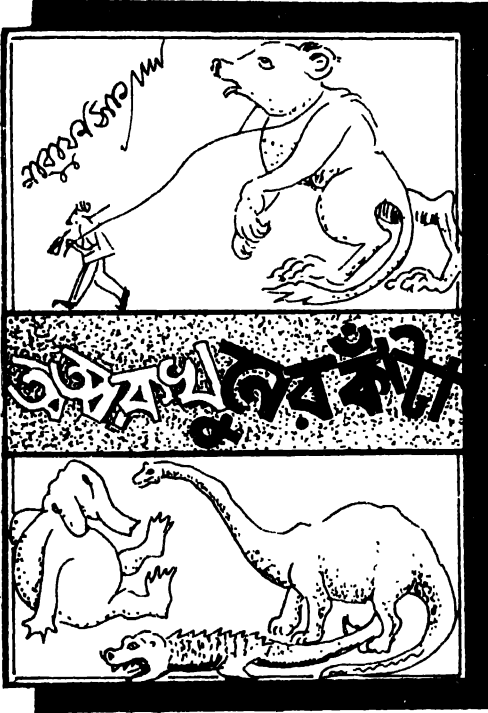
অ-আ-ক-খুনের কাঁটা

রচনাকাল : 1986
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা 1987
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীগৌতম রায়
উৎসর্গ : শ্রীপ্রফুল্ল রায়

—আহ্! ওটা কী করছ! ওটা সল্ট! এই নাও—

নুনের পাত্রটা সরিয়ে শুগার-পটটা রানী দেবী ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে।

—ও, আয়াম সরি! এবার চিনির পাত্র থেকে এক চামচ চিনি তুলে নিয়ে নিজের চায়ের কাপে মিশিয়ে নিলেন বাসুসাহেব।সুজাতা কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে দেখতে থাকে তার বাসুমামার চায়ে চিনি-মেশানোর কায়দাটা। বাসুসাহেব আদৌ ভুলো মানুষ নন।

রানী বলেন, তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? সকাল থেকে ভীষণ অন্যমনস্ক দেখছি!

বাসু জবাব দিলেন না।সুনিপুণভাবে তিনি চায়ের কাপে চিনি মেশাতে থাকেন। 'সুনিপুণভাবে' অর্থে এক বিন্দু চা যেন ছল্‌কে প্লেটে না পড়ে, কাপের কাঁধায় চামচের আঘাত লেগে যেন ঠুনঠুন শব্দ না ওঠে। এ সব অসৌজন্য নাকি টেবিল-ম্যানার্সের বিরুদ্ধে। এ জাতীয় আচরণ ওঁর মজ্জায় মজ্জায় মেশানো——সচেতনভাবে করেন না। এ কিছু খানদানী টী-পার্টী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে প্রাতরাশের টেবিলে বসেছেন ওঁরা চারজন—বাসুসাহেব, রানী দেবী, কৌশিক আর সুজাতা। বিশে, মানে ওঁর ছোকরা চাকর, রান্নাঘর থেকে খানকয় গরম টোস্ট এনে রেখে গেল খাবার টেবিলে। রানী দেবী কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, কী ডিটেক্‌টিভ সাহেব ? আমার ডিডাকশান ঠিক ? তোমাদের আবার কোন কেস্ এসেছে নিশ্চয় ? খুনটা হল কে?

কৌশিক আর সুজাতা থাকে ঐ একই বাড়িতে। ভাড়াটেও নয়, পেয়িং-গেস্টও নয়, ব্যবসায়ের পার্টনার। বাসুসাহেব প্রখ্যাত ক্রিমিনাল লইয়ার, আর কৌশিক-সুজাতা যৌথভাবে খুলেছে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা-অফিস: 'সুকৌশলী'। একতলার একদিকে ব্যারিস্টার সাহেবের অফিস, অপরদিকে সুকৌশলীর; মাঝখানে দুই অফিসের যৌথ রিসেপ্‌শান কাউন্টার। তাতে বসেন মিসেস্ রানী

বাসু—বাসুসাহেবেব পঙ্গু সহধর্মিণী। দ্বিতলটা কৌশিক-সুজাতার রেসিডেন্স। বাসুসাহেব সস্ত্রীক একতলাতেই থাকেন, কারণ রানীর পক্ষে হুইল-চেয়ারে দ্বিতলে ওঠা সম্ভবপর নয়।

রানীর প্রশ্নে কৌশিক টোস্টের কর্তিত অংশটা গলাধঃকরণ করে বলে, আমি যদ্দূর খবর রাখি—এ হপ্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর চৌকাঠ পার হয়নি!

বাসু বললেন, ভুল হল তোমার।

কৌশিক প্রশ্ন করে, এসেছে? আমার নজর এড়িয়ে কোন মক্কেল?

—তা বলছি না। বলছি, তোমার 'স্টেটমেন্ট'টা ভুল।

—কী আবার ভুল হল? আমি তো শুধু বললাম: 'এ হপ্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর চৌকাঠ পার হয়নি!'

বাসু জোড়া-পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে বলেন, সুজাতা! তুমি বলতে পার? তোমার কর্তার ঐ স্টেটমেন্টে কোন ভুল আছে কিনা?

কৌশিক তার ধর্মপত্নীর দিকে অসহায়ভাবে তাকায়।

—পারি মামু! 'সপ্তাহ' বলতে আমরা সচরাচর 'বুঝি সোম টু রবি'। সপ্তাহ শুরু হয় 'সোম থেকে। আজই সোমবার। ও 'মীন' করছে গত সপ্তাহ, বলছে 'এ সপ্তাহ'।

—কারেক্ট! আর কোন ভুল?

—হ্যাঁ। আপনার চেম্বারের প্রবেশ-পথে কোনও চৌকাঠের চতুর্থ কাঠ নেই। ইন-ফ্যাক্ট এ বাড়ির কোন ঘরের দরজাতেই তেমন কোন কাঠ নেই। তিন-কাঠের ফ্রেম আছে প্রতিটি দরজায়। সুতরাং 'চৌকাঠ' শব্দটা যদি কেউ উচ্চারণ করে তবে বুঝতে হবে—হয় সে বাংলায় কাঁচা, অথবা 'সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এ'।

রানী দেবী উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। বলেন না, না, কৌশিকের মাতৃভাষা বাংলা, বেচারি বোধহয় সিভিল-এঞ্জিনিয়ারিং-এই একটু কাঁচা। তোমার মতো পাকা এঞ্জিনিয়ার নয়!

কৌশিক শিবপুরের বি.ই.। সিভিল-এরই। বেচারি নিঃশব্দে দ্বিতীয় টোস্টে মাখন মাখাতে থাকে। বাসু বল্লেন, ও যা বলতে চায়, গুছিয়ে বলতে পারল না, সেই স্টেটমেন্টটা কিন্তু ঠিক। অর্থাৎ 'গত সপ্তাহে আমার চেম্বারে কোন মক্কেল আসেনি'। কিন্তু রানুর অবজারভেশানটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছি না—ওর ডিডাক্শানটাও ঠিক—'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'! লবণে শর্করাভ্রম যখন হয়েছে, তখন আমার চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু আছে—পত্রাৎ!

—অর্থাৎ?

—আজকের ডাকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছি। খামের চিঠি। দাঁড়াও দেখাই।

এটি নিশ্চয় শনিবারের চিঠি। এসেছে বিকালের ডাকে। কিন্তু ওঁরা সপ্তাহান্তে বেড়াতে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। ফিরেছেন রবিবার রাত্রে। বাসুসাহেবের ঘুম ভাঙে কাক-ডাকা ভোরে। বাড়ির আর সকলের নিদ্রাভঙ্গের আগেই তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এবং এক চক্কর প্রাতঃভ্রমণ সমাপনান্তে তাঁর চেম্বারে এসে বসেন। গত দিনের বিকালের ডাকে আসা চিঠিগুলি পড়েন এবং তার মাথায় এ.বি.সি. দাগ দিতে দিতেই খাবার টেবলে ডাক পড়ে। প্রাতরাশ শেষ হলে রানী দেবী এসে চিঠিগুলি সর্টিং করেন। কোন্ চিঠি যাবে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, কোন্টা সরিয়ে রাখতে হবে সময়মতো জবাব দিতে, আর কোন্টা জরুরি। যে কোন কারণেই হোক, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ডাকের একখানি চিঠি আশ্রয় পেয়েছে বাসুসাহেবের ড্রেসিংগাউনের পকেটে। খামটা বের করে উনি সন্তর্পণে টেবিলের উপর রেখে বললেন, তোমরা একে একে দেখ। তারপর আলোচনা হবে। না, না, অত সাবধানতার দরকার নেই। খামে কোন ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই।

কৌশিক আর সুজাতার চোখাচোখি হল। কৌশিক স্ত্রীকে বললে, আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তুমিই আগে দেখ, আমি আবার কী বলতে কী বলব!

সুজাতা মুখ টিপে হেসে বলে, বাঃ! তা কী হয়? তুমি হলে গিয়ে 'সুকৌশলী'র সিনিয়ার পার্টনার!

রানী দেবী হেসে বলেন, তোমাদের ঐ অজাযুদ্ধ-ঋষিশ্রাদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার বাপু ধৈর্য থাকবে না। আমিই দেখি প্রথম—

খামটা লম্বাটে। পোস্ট-অফিসে যে রকম খাম কিনতে পাওয়া যায়, তা নয়। বেশ ভালো খাম। দামী, মোটা কাগজ। খামের উপর টিকিট সাঁটা। নাম-ঠিকানা টাইপ করা—মায় কোনায় Q.M.S. ছাপটাও। ভিতরের কাগজখানা কিন্তু খেলো। তার এক পিঠে কিছু অঙ্ক কষা। সম্ভবত বীজগণিতের। মনে হয় কোন বড় কাগজ থেকে লম্বালম্বিভাবে ছেঁড়া। তাই অঙ্কটাব সবটা বোঝা যাচ্ছে না। অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজিতে টাইপ করা একখানি চিঠি। চিঠির উপরে একটি কুমিরেব ছোট্ট ছবি। রঙিন ছবি। কোন ইংরেজি ছবির বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ছবির নিচে টাইপ করা আছে ইংরাজী ব্লক-ক্যাপিটালে—
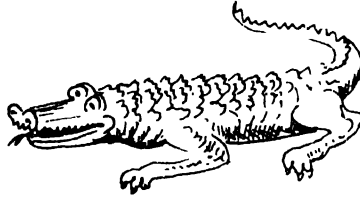
'A'—FOR ALLIGATORAIH NAMAH!

তার নিচে ইংরেজী চিঠিখানির আক্ষরিক অনুবাদটা এইরকম·

"শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-লয়েষু,

"মহাশয়,

"শুনিয়াছি, আপনি কী একটি 'আন-ব্রোকেন-রেকর্ডে'র অধিকারী।

"আপনাকে ষড়বিংশতিটি সুযোগ দিতেছি। হয়তো X, Q অথবা Z-এ পৌঁছিয়া আমি কিছু পোয়েটিক-লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। নিজগুণে ক্ষমা করিবেন!

"ষড়বিংশতিবারই গাড্ডু মারিলে কেদ্দানি প্রদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন কি?

"রেডি-স্টেডি-গো: 'A'ফর ASANSOL। তাং—এ মাসের উনিশে!

ইতি একান্ত গুণমুগ্ধ

"A-B-C"

বার-বার তিনবার পাঠ করে রানী দেবী নিঃশব্দে পত্রখানি সুজাতার হাতে দিলেন। সুজাতাও খুঁটিয়ে দেখল চিঠিখানা। কোন মন্তব্য প্রকাশ করল না। হস্তান্তরিত করল কৌশিককে। কৌশিক কিন্তু চিঠিখানা পড়ে নীরব থাকতে পারল না। বললে, বদ্ধ উন্মাদ!

রানী বললেন, কিন্তু বদ্ধ উন্মাদের ইংরেজি জ্ঞানটা টনটনে। একটাও বানান ভুল করেনি।

—এবং টাইপিং-এ পাকা হাত। ছাপার ভুলও নেই।—যোগ করল সুজাতা।

—কিন্তু ঐ কথাটার মানে কী হল? ঐ ALLIGATORAIH NAMAH'? —জানতে চান রানী।

বাসু বলেন, Alligator শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন। লোকটা সংস্কৃত ভালো জানে। এবং বিসর্গ চিহ্ন যে রোমান হরফে 'H' দিয়ে বোঝাতে হয় সেটাও। শুধু শেয়ানা-পাগল নয়, লোকটা শিক্ষিত। সম্ভবত উচ্চশিক্ষিত।

কৌশিক বলে, মানছি! শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, মহোমহাপাধ্যায়। কিন্তু বদ্ধ-উন্মাদ!

বাসুসাহেব চুরুট ধরাচ্ছিলেন। নিপুণভাবে সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, সুজাতা?

—উ?

—এবার কৌশিকের স্টেটমেন্টে কোনো ভুল নজরে পড়েছে তোমার ?

—পড়েছে বাসুমামু। দুটো ভুল। একটা ভাষার, একটা ডিডাকশনের। কথাটা 'মহোমহাপাধ্যায়' নয়, 'মহামহোপাধ্যায়'; আর বদ্ধ উন্মাদ মানে raving lunatic! সে চিঠি টাইপ করতে কিংবা খামের উপর ঠিকানা লিখতে পারে না, উপযুক্ত টিকিট সাঁটতে জানে না, 'Q.M.S.' শব্দের অর্থ বোঝে না,

—কারেক্ট! ফুল মার্কস!

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। বলে, অনেক কাজ বাকি আছে। উন্মাদের প্রলাপ--

—সুজাতা ?

—হ্যাঁ মামু। আমি লক্ষ্য করেছি। এবারও ওর ভুল হয়েছে। 'ট্রান্সফার্ড এপিথেট'! নিজের বাকপ্রয়োগের আর বিশ্লেষণের ভ্রান্তিকে সে মনে করছে অপরের পাগলামি—

রানী দেবী কৌশিকের পাঞ্জাবির হাতটা খপ্ করে চেপে ধরেন। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, 'লেগপুলিং' থামাও দেখি তোমরা। কৌশিক বলতে চায়, এটা পাগলের কাণ্ড। হতে পারে। 'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ' বলেছে সে—এটাও 'পোয়েটিক লাইসেন্স'। একটু অতিশয়োক্তি। আমারও মনে হয়, চিঠিখানা যে লিখেছে সে একটু—কী বলব? 'একসেন্ট্রিক', আধপাগলা! এরকম প্র্যাক্টিক্যাল জোক করা তার উচিত হয়নি। সে ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছে...আই মীন, সে তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছে! ইঙ্গিত করেছে, উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে, যার কিনারা তুমি করতে পারবে না। খুব সম্ভবত এটা একটা অমূলক হুমকি। তোমার রাত্রের নিদ্রাহরণই তার উদ্দেশ্য।

—কেন? আমার নিদ্রাহরণে তার স্বার্থ?

—যে কোন কারণেই হোক সে তোমার উপর খাপ্পা। চ্যাঙড়া ছেলে হলে বলতে হবে ওদের সরস্বতী পুজোয় তুমি চাঁদা দাওনি, তাই একটা হুমকি দিয়ে তোমার রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিচ্ছে।

—সংস্কৃত বা ইংরেজিতে যার এরকম দখল সে পাড়ায় পাড়ায় মা সরস্বতীর নামে চাঁদা চেয়ে বেড়াবে?

—ওটা একটা কথার কথা।'গাড্ডু' এবং 'কেন্দ্দানি' শব্দ প্রয়োগে ওটা আমার মনে হয়েছে। হয়তো তোমার কল্যাণে বেচারি বেশ কিছুদিন ঘানি ঘুরিয়েছে। বেরিয়ে এসে এভাবেই শোধ নিচ্ছে।

বাসুসাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, আর তোমার মত?

—আমি মামিমার সঙ্গে একমত : প্র্যাক্টিক্যাল জোক!

—আর কৌশিক?

কৌশিক ইতিমধ্যে আবার বসে পড়েছে। বললে, আমার বিশ্বাস সুজাতার স্টেটমেন্টটা ভুল। সে যা 'মীন' করতে চায়, তার উল্‌টো কথা বলছে। ও বলতে চায় 'ইম্-প্র্যাক্টিক্যাল জোক'। পাগলটা ইঙ্গিতে বলেছে, আপনাকে ছাব্বিশটা সুযোগ দেবে! এ টু জেড। শুরু হচ্ছে 'এ ফর আসানসোল' দিয়ে।হয়তো শেষ হবে Zaire বা Zambia দিয়ে। সেটা অসম্ভব! ইম্‌প্র্যাক্টিক্যাল!

বাসু বলেন, এক্ষেত্রে কী আমার কর্তব্য?

কৌশিক বলে, চিঠিখানা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া। ওটার কথা ভুলে থাকা। এবং রাত্রে শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলা।

—এটাই তোমাদের সম্মিলিত অভিমত?

রানী বলেন, তুমি কী করতে চাও?

—কৌশিক! তুমি এই চিঠি আর খামের খান-তিনেক Xerox কপি করে নিয়ে এস। আমি ততক্ষণ ডি. আই. জি., সি. আই. ডি.-কে একটা ফোন করে ব্যাপারটা জানাই।

সুজাতা বলে, আপনি বিশ্বাস করেন—উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে?

—পয়েন্ট-জিরো-ওয়ান পার্সেন্ট চান্স আছে বৈকি। আজ রাত্রে আমাকে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে না; কিন্তু তোমাদের কথামতো চিঠিখানা যদি ছিঁড়ে ফেলি আর বিশ তারিখের খবরের কাগজে যদি

দেখি, আসানসোলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে, তাহলে বিশ তারিখে রাত্রে একমুঠো স্লিপিং ট্যাবলেট খেলেও আমার ঘুম হবে না।

রানী সায় দেন, তা ঠিক। এমনও হতে পারে—ঝড়ে কাক মরবে আর ফকিরের কেরামতি বাড়বে। অর্থাৎ নিতান্ত দৈবক্রমে আসানসোলে একটা খুন-জখম বা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হবে—যার সঙ্গে ঐ পত্রলেখকের কোন সম্পর্কই নেই, অথচ আমরা নিজেদের দায়ী করব।

কৌশিক বললে, সে-কথা ঠিক। দিন খামটা, আমি জ্রেবক্স করিয়ে আনি। হোক পাগলামি, তবু 'আঠারো ঘা' বানানোর দুর্লভ সুযোগ থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত করি?

—আঠারো ঘা মানে?—সুজাতা জানতে চায়।

—'বাঘে ছুঁলে' যা হয়। এটাও 'ট্রান্সফার্ড এপিথেট'! 'বাঘ' অর্থে 'পুলিস'।

রানী দেবী হাসতে হাসতে বলেন, তা ঠিক। এক নম্বর 'ঘা'টা নিয়ে অত চিন্তা করছি না। বহ্বারম্ভে শুরু হলেও সেটা লঘুক্রিয়া; কিন্তু দু-নম্বর ঘা হল কৌশিকের জ্রেবক্স করতে দৌড়ানো। তিন নম্বর এখনি পেট্রল পুড়িয়ে থানায় যাওয়া, চার নম্বর..... '

বাসু বলেন, তবু তো তোমরা আঠারোয় থামবে। আমাকে তো ছাব্বিশ পর্যন্ত ছুটতে হবে।

ডি. আই. জি., সি. আই. ডি. কাগজখানা দেখে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না বাসুসাহেব। এ জাতীয় উড়ো চিঠি আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে পাই। লোকটা যে কোন কারণেই হোক আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। না হলে 'আনব্রোকন রের্কড' কথাটা উল্লেখ করত না। এ পর্যন্ত কোন অপরাধীই যে আপনার হাত এড়িয়ে নিষ্কৃতি পায়নি—এ খবরটুকু তার জানা। হয়তো আদালত এলাকার লোক। আপনার কাছে বেইজ্জত হয়েছে।তা যদি হয় আমি খুশি হব। কারণ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে লোকটা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের। সে ক্ষেত্রে একটু ভাবনার কথা—

—কী ধরনের ভাবনার কথা?

—ধরুন, লোকটা অপরাধ জগতের। আপনি তো জানেনই যে,ওদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ রেশারেশি আছে। এমন হতে পারে লোকটা ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে যে, ওর বিপক্ষ দলের কেউ কেউ উনিশে একটা রাহাজানির পরিকল্পনা করেছে আসানসোলে। খবরটা সে সরাসরি পুলিসকে জানাতে চায় না। পাগল সেজে আপনাকে জানালো। কারণ তার বিশ্বাস—আপনি সেটা আমাদের জানাবেন। পুলিস সতর্ক থাকবে। কিন্তু ওর বিপক্ষদলের লোকেরা তাকে সন্দেহ করবে না। ভাববে, কোনো পাগলের কাণ্ড—যে হতভাগা নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে আর ফকির সেজে ঝড়ে মরা কাকটার কৃতিত্ব দাবী করতে চায়।

—বুঝলাম। এ ক্ষেত্রে আপনি কী করতে চান?

—আসানসোলে কোনো স্পেশাল-স্কোয়াড নিশ্চয়ই পাঠাবো না। ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব অবশ্য। যাতে আসানসোল থানা সজাগ থাকে।

—আমার আর কিছু করণীয় আছে?

—আপনি আবার কী করবেন? আপনি পুলিসে রিপোর্ট করেছেন, পাগলের চিঠিখানার অরিজিনাল কপি পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যস! আপনার করণীয় কাজ একটিই—এ ব্যাপারটা স্রেফ্ ভুলে গিয়ে নিজের কাজকর্মে মগ্ন থাকা।

—থ্যাঙ্কু।

বাসুসাহেব তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে।
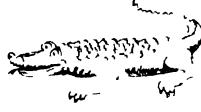
দুই

বিডন স্ট্রীটের একটা ভাঙা দোতলা বাড়ি। একতলায় একজন ডাক্তারের চেম্বার। তিনিই গৃহকর্তা। ডাক্তার দাশরথী দে। একতলার অংশটা ভাড়া দেওয়া। দ্বিতলে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব আস্তানা। স্বামী স্ত্রী আর একটি মেয়ে—মৌ, যাদবপুবে পড়ে।তিনতলায় সিঁড়িঘরের লাগোয়া একটা চিলে-কোঠা। এক বৃদ্ধ ওখানে ভাড়া থাকেন। একা মানুষ। তিনকুলে নাকি তাঁর কেউ নেই। তাঁর গৃহস্থালীর সরঞ্জামও সামান্য। পুব দিকে একটা জানলা, মোটা-মোটা লোহার গরাদ দেওয়া। ঘবে একটি তক্তাপোষ, উপরে সতরঞ্চি পাতা; বিছানাটা মাথার কাছে গোটানো। একপ্রান্তে একটি আলমারি। তালাবন্ধ। সেটা খুললে দেখা যাবে উপরের তাকে শুধু অঙ্কের বই—পাটিগণিত, বীজগণিত, ক্যালকুলাস, জ্যামিতি; কিছু কিছু শিশুসাহিত্যের বইও। বইগুলি জরাজীর্ণ—মনে হয় সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে কেনা। পাতা উল্টে দেখলে বুঝতে পারা যাবে—তা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মালিকের নাম লেখা। শ্রীশিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তী। তারিখ দেওয়া—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার। তুলনায় মাঝের শেলফে এক থাক ঝক্‌ঝকে বই—আনকোরা নতুন; যেন বইযের দোকানের একটি তাক। কিছু বইয়ের পাতা কাটা নেই। কিছু প্যাকেট খোলাই হয়নি। সেগুলি ধর্মপুস্তক। উদ্বোধন কার্যালয়, বেলুড় মঠ অথবা পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত। অবশ্য এসবই দৃষ্টির আড়ালে—যেহেতু কাঠের আলমারিটি তালাবন্ধ।

যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাতে দেখা যায়—ঘরের একপ্রান্তে একটি সস্তা টেবিল। একটিমাত্র খাড়া-পিঠ হাতলহীন চেয়ার। কিছু কাগজপত্র—কাগজ-চাপা, পিন-কুশন, আঠার শিশি। আর এসবের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান একটি প্রায়-নতুন পোর্টেবল্ টাইপ-রাইটার।

বৃদ্ধ তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। স্নান করে এসেছেন তিনি। বাথরুম একতলায়, ডিস্‌পেন্সারির সংলগ্ন। প্রতিবার বাথরুমে যেতে তাঁকে তিনতলা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। উপায় নেই। এর চেয়ে সস্তায় কলকাতা শহরে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া একবেলা তিনি ডাক্তারসাহেবের সংসারে অন্নগ্রহণ করেন। নৈশ আহার। দিনে বাইরেই কোথাও খেয়ে আসেন। সকাল-বিকাল চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। সুতরাং আর কোনো ঝামেলা নেই। ডাক্তারের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, পেয়িং-গেস্ট রাখবার প্রয়োজন। হেতুটা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র হচ্ছেন ডক্টর দে। দীর্ঘদিন পূর্বে যখন গৃহকর্তা স্কুলে পড়তেন শিবাজী ছিলেন ওঁদের স্কুলের থার্ড মাস্টার।অঙ্কের ক্লাস নিতেন তিনি। মৌকে পড়ানোর সুযোগ পাননি, কারণ সে অঙ্ক নেয়নি। কিন্তু মৌ রোজ সন্ধ্যায় ওঁর তিনতলার ঘরে উঠে আসে। টাইপিং শিখতে। সখ হিসাবে।

মাস্টারমশাই তাঁর ঝোলা ব্যাগে খানকতক বই ভরে নিলেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরে পায়ে একটা ফিতে বাঁধা ক্যাম্বিসের জুতো পরলেন। কাল রাত্রেই একটা ছোট স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছিলেন। সেটাও তুলে নিলেন হাতে।ছাতা? না দরকার নেই। বর্ষাকাল পার হয়েছে। অক্টোবরের আঠারো তারিখ আজ। রোদের তেমন তেজ নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। দ্বিতলের ল্যান্ডিঙে নেমে একটু থমকে দাঁড়ালেন। হাঁকাড় পাড়লেন, বৌমা?

মৌ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এসে বললে, মা বাথরুমে আছেন মাস্টারমশাই। আপনি কি বের হচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ। তোমার মাকে বলে দিও, দু-দিন থাকব না। বিশ তারিখ সন্ধ্যায় ফিরব। সেদিন রাতে খাব।

—আজ রাতে খাবেন না?

—না। এই তো ট্রেন ধরতে যাচ্ছি।

—একটু কিছু মুখে দিয়ে যান। একেবারে বাসি মুখে...

— না না, কাল একটু দই এনে রেখেছিলাম। ভিজেচিড়ে দিয়ে সকালেই,...

—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—আসানসোল।

—ও বাবা! সে তো অনেকদূর! থাকবেন কোথায়?

—হোটেল-ধর্মশালা খুঁজে নেব।

মৌ আর কথা বাড়ায় না। বৃদ্ধ টুক্‌টুক্ করে নিচে নামতে থাকেন।

মৌ পিছন ফিরতেই দেখে বাথরুম থেকে প্রমীলা বার হয়ে এসেছেন। বললেন, মাস্টারমশাই কি আবার ট্যুরে গেলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আসানসোল। পরশু সন্ধ্যাবেলা ফিরবেন বললেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রমীলার। যেন আপন মনেই বললেন, কী দরকার এ বয়েসে এতটা পরিশ্রম করার? উনি তো কতবার বলেছেন, 'মাস্টারমশাই, ওসব চাকরি ছেড়ে দিন এবার। আমরা তো আছি। আমার বাবা-কাকা থাকলে কি দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতাম না?' কিন্তু কে কার কথা শোনে!

মৌ বলল, পাগল মানুষ তো!

—মৌ!—ধমকে উঠলেন প্রমীলা।

মৌ সলজ্জে বলে আমি সে কথা বলিনি, মা! কিন্তু আত্মভোলা মানুষ তো! আর সত্যকে তুমিও অস্বীকার করতে পার না। এককালে উনি পাগলা-গারদে আটকও ছিলেন!

—সেই কথাটাই ভুলে যেতে চেষ্টা কর। উনি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তোমার নয়, তোমার বাবারও শিক্ষক উনি। বুড়ো মানুষকে সম্মান দিতে শেখ!

মৌ শ্রাগ্ করল। জেনারেশান গ্যাপ্! সে কী বলতে চায়, আর মা তার কী অর্থ করছে! সে আর কথা বাড়ায় না। আজ তার ফার্স্ট পিরিযডে ক্লাস।
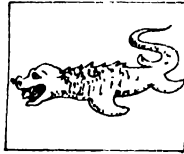
কৌশিক ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখে চতুর্থ চেয়ারটি খালি। রাণী দেবীর দিকে ফিরে জানতে চায়, মামু কোথায়?

—ভোরবেলা মর্নিং-ওয়াকে গেছেন। এখনো ফেরেননি।

কৌশিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।এত দেরী হয় না তাঁর বেড়িয়ে ফিরতে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সদর দরজা খুলে প্রবেশ করলেন বাসুসাহেব। তাঁর পরিধানে সাদা শর্টস, টুইলের জামা, পুলওভার, পায়ে সাদা মোজা আর হান্টিং শ্যু। বগলে একগোছা দৈনিক পত্রিকা। কাগজের বান্ডিলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, তোমাদের ডিডাক্‌শানই ঠিক। স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বসুমতী কোন কাগজেই আসানসোলের কোন খবর নেই।

কৌশিক দ্বিতীয়বার তার মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। এবার সময় নয়, তারিখটা। আজ বিশে অক্টোবর!

ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বললে, সবগুলো কাগজ খুঁটিয়ে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, পার্কের বেঞ্চিতে বসে বসে।

বাড়িতে দুটি কাগজ আসে। একটা বাংলা একটা ইংরাজি। বেলা সাতটা নাগাদ। বেশ বোঝা গেল, বাসুসাহেব মনে মনে একটু চিন্তিত ছিলেন। এ দু-তিন ঘণ্টাও তাঁর সবুর সয়নি। ভোর বেলাতেই পাঁচখানা খবরের কাগজ কিনে নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছেন।

অজ্ঞাত পত্রলেখকের বিষয়েই আলোচনাটা মোড় নিল। কোন্ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সে এমন 'প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক'টা করেছিল? আহারান্তে বিশু যখন চায়ের পটটা রেখে গেল তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। কৌশিক উঠে গিয়ে ধরল। একটু শুনে নিয়ে বলে, মামু, আপনার ফোন, ট্রাঙ্ক-লাইনে।

বাসু এসে ফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, বাসু স্পিকিং ···

—আমি, স্যার, রবি বলছি, রবি বোস...

—রবি বোস? আপনাকে তো ঠিক প্লেস করতে পারছি না...কোথায় আমরা মীট করেছি?...

—চিনতে পারছেন না? আমি ইন্সপেক্টার রবি বোস, সেই কমলেশ মিত্র মার্ডার কেস্-এ।

—ও! আই সী! তুমি সেই রবি? এখনো লটারীর টিকিট কেনার বাতিকটা আছে?

—না, নেই। এক জন্মে কেউ দু-দুবার জ্যাক-পট হিট করে না!

—আই সী! তুমি ইতিমধ্যে একবার লটারীর টিকিটে মোটা দাঁও মেরেছ তাহলে?

—সেটা তো, স্যার, আপনি জানেনই!

—কই না তো! তুমি তো কখনো জানাওনি!

—জানানোর তো প্রয়োজন ছিল না স্যার! ছিল?*

—না, ছিল না। যা হোক, এখন ফোন করছ কেন? কোথা থেকে বলছ?

—আসানসোল থেকে। আমি এখন আসানসোল সদর থানার ও.সি.!

ভৌগোলিক নামটা শ্রবণমাত্র সচকিত হয়ে উঠলেন বাসুসাহেব। পূর্বমুহূর্তের রসিকতার বাষ্পমাত্র রইল না আর। বললেন, ইয়েস? ফায়ার! আয়াম অল ইয়ার্স!

—কাল রাত এখানে একটা খুন হয়েছে। মধ্যরাত্রে। একজন নগণ্য দোকানদার। এসব মামুলি খুন নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু গত সপ্তাহে হেড-কোয়ার্টার্স থেকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছিলাম—একটা 'ফোর-ওয়ার্নিং'। তাই মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য।

—মধ্যরাত্রে দোকানদার খুন হয়েছে বলছ? কোথায়? বাড়িতে, না দোকানে?

—মধ্যরাত্র ঠিক নয়। রাত দশটা পঞ্চান্ন থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। দোকানেই।

—দোকানের মালপত্র বা ক্যাশ্...

—না, স্যার, কিচ্ছু খোয়া যায়নি। মোটিভ অন্য কিছু। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফলে নারীঘটিত ব্যাপার বলে মনে হয় না। রাজনীতির ধারে-কাছে লোকটা কোনদিন ছিল না—সুতরাং পলিটিক্যাল মার্ডারও নয়; বিরাট সম্পত্তির মালিক নয় যে, উইলঘটিত...

—বাট হোয়াই দেন?

—সেটাই চরম রহস্য! আমার তো মনে হচ্ছে—'কে' প্রশ্নটাকে ছাপিয়ে উঠেছে: 'কেন'!

—তোমার বড়কর্তাকে টেলিফোনে জানিয়েছ? তিনি কী বলেন?

—তাঁর মতে পিয়ার কোয়েন্সিডেন্স! কাকতালীয় ঘটনা। অর্থাৎ আপনারা পত্রপ্রাপ্তি এবং অধরবাবুর মৃত্যু···

---

* 'ঘড়ির কাঁটা'-তে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

—কী নাম বললে? হলধর?

না স্যার। অ-ধ-র। A for Alligator, D for Delhi..

—বুঝেছি! অধর! পুরো নামটা কী?

—অধরকুমার আঢ্যি! অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স! নয়?

বাসু বললেন, শোন রবি! তুফান এক্সপ্রেসটা অ্যাটেন্ড কর। আমি যাচ্ছি। আমরা দুজন। কোনও হোটেল...

—হোটেল কেন স্যার? আমার গরিবখানাতেই থাকবেন। আপনাকে ঐ লটারীর টাকা পাওয়ার পর...

—হ্যাং য়োর লটারি! সন্দেহজনক সব কজনকে যেন সন্ধ্যাবেলায় পাই। আমরা আসছি।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে উনি প্রাতরাশের টেবিলের দিকে ফিরে দেখেন সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। উনি কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, তৈরী হয়ে নাও। আমরা তুফানে আসানসোল যাচ্ছি। বুঝেছ নিশ্চয়? লোকটা ফাঁকা হুমকি দেয়নি।

রাণী বলেন, এটা নেহাৎই একটা কাকতালীয় ঘটনা হতে পাবে না?

—সম্ভবত নয়! কারণ মৃত লোকটা 'অধব আঢ্য অফ আসানসোল'—'A'-র অ্যালিটারেশন!

অধরবাবুর দোকানটা খুবই ছোট। একটা ডবল বেড খাটের মাপে। তবে অবস্থানটা জবর, জি. টি. রোডের উপর। আসানসোল ই. আই. আর. স্কুলের বিপরীতে। মনিহারী দোকান। অধরবাবুর আদি-বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বয়স ষাট-বাষট্টি। পার্টিশানেব সময় বাপের হাত ধরে এ দেশে আসেন। দোকানটা খুলছিলেন ওঁর বাবাই। উত্তরাধিকার সূত্রে এখন উনিই ছিলেন তাঁর মালিক। বিপত্নীক। দুই ছেলে, মেয়ে নেই। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, কুলটিতে সস্ত্রীক বাস করছে। সেখানেই চাকরি করে। ছোটটি কাছেই থাকে। ক্লাস টেন-এ পড়ে—সামনের ঐ স্কুলে। দোকানঘরের উপরে এক কামরার একটি ঘরে বাপ-বেটায় থাকতেন। ঠিকে-ঝি বাসন মেজে যেত। রান্না করতেন অধরবাবু নিজেই।

মৃত্যুর সময়টা নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে:

অধরবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষবার দেখেছে ওঁর ছোট ছেলে সুনীল। রাত দশটা নাগাদ সে নেমে এসে বাবাকে বলেছিল, দোকান বন্ধ করবে না? অনেক রাত হয়ে গেল যে!

অধরবাবু ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, দশটা দশ হয়েছে। তুই আর একটু জেগে থাক। আধঘণ্টার মধ্যেই আসব আমি। হিসাবটা আজ রাতেই শেষ করে রাখব।

এরপর সুনীল উপরে উঠে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পড়তে থাকে। তারপর সে দরজা খোলা রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তার বাবা যে রাত্রে খুন হয়েছে তা সে জানতে পারে পরদিন ভোরবেলা। যখন ঘুম ভেঙে দেখে দরজা খোলা। বাবা ঘরে নেই। তখন সবে আলো ফুটছে। ঠিক কটা তা সুনীল জানে না। ওর বাবা খুব ভোরে ওঠেন—কিন্তু ছেলেকে ডেকে দেন। এভাবে দরজা খুলে রেখে নেমে যান না। তাই সুনীল একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একছুটে নেমে এসে দেখে যে, দোকানঘরও হাট করে খোলা। আর কাউন্টারের ঠিক তলাতেই অধরবাবু ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে আছেন। মৃত। রাস্তা থেকে সেটা নজরে পড়ে না! তখন একটু-একটু করে আলো ফুটেছে। দু-চারজন লোক পথ দিয়ে যাতায়াত করছে। মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার নাকে ফেট্টি জড়িয়ে ঝাড়ু চালাচ্ছে।

—তাহলে কেন তখন টেলিফোনে বললে যে, রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে খুন হয়েছে?—জানতে চাইলেন বাসুসাহেব।

বিস্তারিত বিবরণটা শোনাচ্ছিল থানা-অফিসার রবি বোস। থানাতেই। কৌশিক বসে আছে পাশের চেয়ারটায়। তুফান এক্সপ্রেস অ্যাটেন্ড করে ওঁদের দুজনকে রবি নিয়ে এসে বসিয়েছে তার অফিসে। রবি জবাবে বলল, তার কারণ—সাধনবাবুর জবানবন্দি। উনি নাইট শো সিনেমা দেখে রিকশা করে সস্ত্রীক ফিরছিলেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। উনি ধূমপায়ী। পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ দেখেন সিগারেট ফুরিয়েছে। নাইটশো সিনেমাটা ভেঙেছে রাত ঠিক এগারোটা কুড়িতে। ফলে, আন্দাজ এগারোটা পঁচিশ নাগাদ তিনি জি.টি. রোড দিয়ে পাস করছিলেন। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ে একটি দোকান খোলা আছে। লোডশেডিং চলছিল। সব দোকান বন্ধ। শুধু ঐ দোকানটিতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। কাউন্টারের উপর একটা মোমদানিতে। কিন্তু ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, মোমবাতিটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, দপ্ দপ্ করছিল। অধরবাবুর দোকানে যে সিগ্রেট পাওয়া যায় তা ধূমপায়ী ভদ্রলোকটির জানা ছিল। তিনি রিক্‌শা থামিয়ে দোকানের কাছে এগিয়ে যান। কাউকে দেখতে পান না। দোকানের মালিকের নামটা তিনি জানতেন না—তবে টাকমাথা এক ভদ্রলোক যে দোকানটায় বসেন এটা তাঁর জানা ছিল। 'ও মশাই! শুনছেন? ভিতরে কে আছেন?'—ইত্যাদি বার কয়েক হাঁকাড় পেড়েও কারও সাড়া পান না। ঐ সময়ে তাঁর নজরে পড়ে কাউন্টারের উপরে পড়ে আছে একটা খোলা হিসাবের খাতা আর একটা ডট পেন। আর তার পাশেই একটা বই—উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। ইতিমধ্যে রিক্সা থেকে ওঁর গিন্নী তাড়া দিলেন। মোমবাতিটাও দপ করে নিবে গেল। সাধনবাবু টর্চের আলোয় রিক্সায় ফিরে আসেন। সিগারেট কেনা হয়নি তাঁর।

বাসু বললেন, বুঝলাম।খুব সম্ভবত সাধনবাবু যখন হাঁকাহাঁকি করছিলেন, তখন দোকানের মালিক ওঁর কাছ থেকে হাতখানেক তফাতে মরে পড়ে আছেন। কিন্তু কাউন্টারটা আড়াল করায় রাস্তার সমতলে দাঁড়িয়ে তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেননা। ফলে, নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট চান্স সাড়ে এগারোটার আগেই উনি খুন হয়েছেন। কিন্তু দশটা পঞ্চান্নর পরে কেন? ওঁর ছোট ছেলে সুনীল তো তার বাপকে জীবিতাবস্থায় দেখেছিল রাত দশটা দশে?

—কারণ সুনীলের স্পষ্ট মনে আছে যে, সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে লোডশেডিং হয়নি। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঐ এলাকায় কাল রাত্রে লোড-শেডিং শুরু হয় দশটা বাহান্নয়। তারপর অধরবাবু মোমবাতি জ্বালতে আন্দাজ মিনিট-তিনেক সময় নিয়েছেন নিশ্চয়। ফলে দশটা পঞ্চান্ন। এছাড়া আমি একটা বিকল্প পরীক্ষা করেও দেখেছি। অধরবাবুর দোকান থেকে ঐ বান্ডিলের আর একটি মোমবাতি জ্বেলে আজ সকালে দেখেছি সেটা পুড়ে শেষ হতে ঠিক পঁচিশ মিনিট সময় লাগে।

—গুড ওয়ার্ক! কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে যে রবিবাবু। দশটা পঞ্চান্ন থেকে এগারোটা পঁচিশ হচ্ছে আধঘণ্টা। কিন্তু মোমবাতির আয়ু যে পঁচিশ মিনিট।

—কথাটা আমিও ভেবেছি। হয়তো সে মোমবাতিটা একটু বড় ছিল।

—একটু বড় নয়, টুয়েলভ্ পার্সেন্ট বড়! পঁচিশ মিনিটের বদলে আধঘণ্টা। দ্বিতীয়ত—সিনেমা হাউস থেকে জি. টি. রোডের ঐ জায়গাটায় রিকশায় আসতে কতক্ষণ সময় লাগার কথা? আই মীন—গভীর রাত্রে, ফাঁকা রাস্তা পেলে?

—মিনিট পাঁচেক।

—তাহলে আরও অন্তত মিনিট-পাঁচেক আন-অ্যাকাউন্টেড থেকে যাচ্ছে! তাই নয়? সিনেমা ভাঙামাত্র সাধনবাবু সস্ত্রীক 'হল' থেকে ভীড় ঠেলে বার হয়ে এসে রিক্সা ধরেননি নিশ্চয়। তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি যে, 'শো'র শেষ পর্যন্ত ওঁরা দেখেছেন কিনা?

—না স্যার। ও সম্ভাবনাটা আমার মনে হয়নি। থ্যাঙ্কু স্যার। আমি জিজ্ঞাসা করব।

কৌশিক হঠাৎ বলে বসে, খুব সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্তই দেখেছেন। এবং তা হলে টাইম এলিমেন্টটা আরও জটিল হয়ে পড়ছে। যে মোমবাতির আয়ু পচিশ মিনিট তা অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট জ্বলেছে!

বাসুসাহেব পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আদৌ নয়! রবিবাবুর ডিডাকশান কারেক্ট। খুনটা হয়েছে দশটা পঞ্চান্নর পরে এবং সাড়ে এগারোটার আগে।

কৌশিক বলে, কিন্তু মোমবাতিটা তাহলে... ?

বাসু বলেন, মোমবাতি যথারীতি পঁচিশ মিনিটই জ্বলেছে। মোমবাতি যারা বানায় তারা ছাঁচে ঢেলে বানায়। এক-আধ মিনিটের বেশি এদিক-ওদিক হওয়ার কথা নয়।

—তাহলে?

—বুঝলে না? ধরা যাক, এগারোটা পাঁচে উনি দোকানের সামনে এলেন। তখন চতুর্দিকে লোড-শেডিং। একটি মাত্র দোকানে একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। অর্থাৎ নীরন্ধ্র অন্ধকারে একশ গজ দূর থেকেও আবছা দেখা যাচ্ছে দোকানের আলোটা। হয়তো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দোকানদারকে আর আততায়ীর শ্যিলুয়ে। লোকটা দেখতে গেল পিছনের কাউন্টারে কোন জিনিস—সেটা হরলিক্স, মাথার তেল, টুথপেস্ট যাই হোক। সেটাই কিনতে চাইল। ন্যাচারালি দোকানদার পিছন ফিরবে। তৎক্ষণাৎ আততায়ী ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা আর তৎক্ষণাৎ খুন করল লোকটাকে। অন্ধকারেই সে টেনেটুনে মৃতদেহটা ঠেলে দিল কাউন্টারের তলায়। হয়তো দেখে নিল চারিদিক। ঠিক সে সময়ে যদি জি.টি. রোড দিয়ে কোনও ট্রাক বা রিক্সা পাস করে তাহলে অপেক্ষা করবে। চারদিক সুনসান্ হয়েছে বুঝলে লাইটার জ্বেলে মোমবাতিটা আবার জ্বালবে। কারণ সে তখন নিশ্চিন্ত যে, বহুদূরের প্রত্যক্ষদর্শী যদি আদৌ কেউ থাকে সে তখন দেখবে দোকান থেকে একজন খরিদ্দার ফিরে যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় যে মোমবাতিটা নিবে গিয়েছিল সেটা আবার জ্বালা হয়েছে! দোকানি হযতো ভিতর দিকে গেছে অথবা নিচু হয়ে কিছু করছে! ফলে মোমবাতি তার নির্দিষ্ট মেয়াদের একতিলও বেশি জ্বলেনি।

বাসুসাহেব সকলের এজাহার নিলেন। একে একে। রবি বসু তাঁদের আসতে বলেছিল। কারও কোন উক্তি থেকে নতুন কিছু আলোকপাত হল না। ইতিমধ্যে কুলটি থেকে অধরবাবুর বড় ছেলে কার্তিক সস্ত্রীক এসে পড়েছে। সে কুলটিতে একটা কারখানায় কাজ করে। সন্তানাদি এখনো হয়নি। বছরতিনেক বিবাহ করেছে। বাপের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। বাপকে খুন করে দোকানটা দখল করার চেষ্টা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ চাকরী ছেড়ে সে দোকান দেখতে পারে না। কোন বিশ্বস্ত লোক তাকে মোতায়েন করতেই হত। আর বাপের চেয়ে বিশ্বস্ত লোক সে কোথায় পাবে?

হিসাবের খাতা অনুসারে দেখা গেল—চেনা-জানা খরিদ্দারের কাছে বেশ কিছু ধার আছে।'বেশ কিছু' মানে মিলিত অঙ্কটা—প্রায় হাজারখানেক টাকা। কিন্তু কোন একজনের কাছে দেড়শ টাকার বেশি নয়। এত সামান্য টাকার জন্য কেউ মানুষ খুন করে না।

অধরবাবু রাজনীতির ধারে-কাছে ছিলেন না। বার্ণপুর-কুলটি অঞ্চলের লেবার ইউনিয়নের কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই।মস্তান-পার্টিদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি। স্ত্রীলোকঘটিত কোন বদনাম নেই। সে রাত্রে ক্যাশ-কাউন্টারে সাড়ে সাতশ মতো টাকা ছিল। খোলা ড্রয়ারে। সেটা খোয়া যায়নি।

ঠিকই বলেছিল রবি! 'কে' প্রশ্নটা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যে প্রশ্নটা, তা 'কেন' ?

সাধনবাবুকে বিস্তারিত জেরা করলেন বাসুসাহেব। কিন্তু ইতিপূর্বে পুলিসকে যা বলেছেন তার বেশি কিছু যোগ করতে পারলেন না। শুধু বললেন, একটা কথা বলি স্যার, আগে ওটা খেয়াল হয়নি—ঐ দুটো একটু ইনকম্পাটেবল্ নয়? রাত বারোটায় সান-মাইকা-টপ্ দোকানের কাউন্টারে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছেন? একজন মনিহারি দোকানের খাতা আর দ্বিতীয়জন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা!

বাসু বললেন, অধরবাবু বোধ করি আর এক রামপ্রসাদ! হিসাবও কষেন, গীতাও পড়েন।

বইটি উনি পরীক্ষা করে দেখলেন। আনকোরা নতুন। উদ্বোধন প্রকাশনীর। মালিকের নাম লেখা নেই কোথাও। সুনীল বা কার্তিক বইটি কখনো দেখেনি বলল।

সান-মাইকা-টপ্ টেবিলে কোনও ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই। এমন-কি মৃত অধরবাবুরও নয়। আততায়ী সব কিছু মুছে দিয়ে গেছে।

ফিরে আসবার মুখে কার্তিক কাতরভাবে প্রশ্ন করল, কে এভাবে ওঁকে খুন করল স্যার? কী ভাবেই বা মুহূর্তমধ্যে...

বাসুসাহেব বললেন, কে করেছে, কেন করেছে তা বলতে পারছি না কার্তিকবাবু। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি—তিনি খুব বেশি যন্ত্রণা পাননি। মুহূর্তমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আততায়ী তাঁর পিছন ফেরার সুযোগে তাঁর মাথায় খুব ভারি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে। সম্ভবত লোহার ডাণ্ডা অথবা লম্বা হাতলওয়ালা হ্যামার—যেটা সে কোটের আস্তিনে লুকিয়ে এনেছিল। ওঁর ক্রেনিয়াম বিচূর্ণ হয়ে যায়। হয়তো পিছন ফিরে আততায়ীর মুখখানাও তিনি দেখে যাননি।

ঘরের ওপ্রান্তে বসেছিল একটি ষোল-সতের বছরের কিশোর দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। ডুগ্‌রে কেঁদে ওঠে সে। বাসুসাহেব উঠে এসে তার মাথায় হাতটা রাখলেন। অশ্রু-আর্দ্র লাল একজোড়া চোখ তুলে সুনীল বললে, আমি...আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি না স্যার? ...পুলিস কিছু করবে না! আমার বাবা যে গরিব...

বাসু বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পার সুনীল। মাসখানেক পরেই তোমার টেস্ট পরীক্ষা। মন খারাপ না করে বাবা যা বলতেন সর্ব প্রথম তাঁর সেই ইচ্ছাটাই পূরণ করবার চেষ্টা কর। ভালভাবে পাশ করবার চেষ্টা কর। দোকানটা তো তোমাকেই দেখতে হবে।

—না, আমি বলছিলাম, ঐ লোকটাকে ধরবার জন্য...

—আমার মনে থাকবে। প্রয়োজন হলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু ততদিন তুমি নিজেকে শক্ত করে রাখ। পড়াশুনাটা ছেড় না। কেমন?

সুনীল আস্তিনে চোখটা মুছে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তিন

গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। বাসুসাহেবের পত্র এবং অধরবাবুর পঞ্চত্ব এ দুটি 'প্রাপ্তি' যোগ নিঃসম্পর্কিত। 'কে' খুন করেছে সেটা বোঝা না যাবার একটিই হেতু: অধরবাবুর জীবনে এমন একটা অনুদ্ঘাটিত অধ্যায় আছে, যার কথা এখনো জানা যায়নি। হয়তো জানতেন অধরবাবু এবং আততায়ী। এন্‌কোয়ারি? সে তো রুটিনমাফিক হচ্ছেই। খবরটা এত নগণ্য যে, দুদিন পরে দু-একটি সংবাদপত্রে ভিতরের পাতায় 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক আসানসোলে দোকানদার নিহত' সংবাদটা যে ছাপা হয়েছিল তা সুনীল, কার্তিক এবং বাসু-পরিবারের কর্তাদের বাইরে হয়তো কারও নজরেই পড়েনি।

কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল যখন বাসুসাহেব দ্বিতীয় একখানা পত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন পুলিসের কাছে।

একই জাতের খাম, একই জাতের কাগজে, সম্ভবত একই টাইপ-রাইটারে ছাপা। কাগজটার পিছন

দিকে জ্যামিতির একটা প্রতিপাদ্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কাগজটা লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে ফেলায় অঙ্কটা বোঝা যাচ্ছে না। পরপৃষ্ঠায় একটা ছাপা-ছবি অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা। জীবটা অদ্ভুতদর্শন। এবার রঙিন ছবি নয়। একরঙা। তার তলায় লেখা:
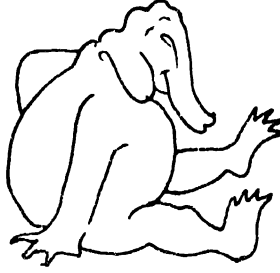
'B' FOR BECHARATHERIUMAIH NAMAH!

"শ্রীযুক্ত বাবু পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-লয়েষু,

"বেচারা মহাশয়,

"পঞ্চবিংশতিটি সুযোগ বাকি থাকিতেই এতটা মুষড়াইয়া পড়িলেন কেন?

"গাড্ডু কে না মারে?

"ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেন: 'B' FOR BURDWAN! তাং· এ মাসের সাতাশে। ইতি

গুণমুগ্ধ

B-C-D"

এস. এস. ওয়ান, অর্থাৎ স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বার্ডওয়ান রেঞ্জ বললেন, দেখা যাচ্ছে, আপনাব অনুমানই ঠিক। অধরবাবুর খুন আর আপনার ঐ রহস্যজনক পত্র সম্পর্ক-বিযুক্ত নয়। লোকটা আবার হুমকি দিয়েছে। আজ বাইশ তারিখ। পুরো পাঁচদিন সময় আছে। রাস্কেলটাকে এবার ধরতেই হবে! যেমন করে হোক!

— কিন্তু কী স্টেপ নিতে চাইছেন আপনারা?

—সমস্ত ব্যাপারটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে।'B' অক্ষর দিয়ে যাদের নাম এবং বর্ধমানে থাকে, তারা যাতে সাবধান হতে পারে।

—নাম না উপাধি?

—ও ইয়েস্। অধর আঢ্যির নাম উপাধি দুটোই ছিল 'এ' দিয়ে।

আই· বি· ক্রাইম বললেন, কিন্তু তাতে কি আমবা রাস্কেলটাব ফাঁদেই পা দিচ্ছি না? আমার ধারণা লোকটা 'মেগ্যালোম্যানিয়াক'—অর্থাৎ তার মস্তিষ্কবিকৃতির অবচেতনে আছে একটা আকাশজোড়া 'হামবড়াই' ভাব! বাসুসাহেবের উপর সে টেক্কা দিতে চাইছে। সে পাব্লিসিটি চাইছে। মানে 'নটোরিটি'। কাগজে সব কথা জানিয়ে দিলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে যা চায়,—বাসুসাহেবের চেয়ে বেশি নাম—তা সে 'বিখ্যাত'ই হোক বা 'কুখ্যাত'ই—তাই সে পেয়ে যাবে।

সি. আই. ডি. সিনিয়ার ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, আপনি কী বলেন বাসুসাহেব?

বাসু বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি একজন পার্টি। আমার কিছু বলা শোভন হবে না। লোকটা আমাকেই 'চ্যালেঞ্জ থ্রো' করেছে। যদি আমি বলি—'খবরের কাগজে সব ছাপা উচিত নয়' তাহলে কেউ মনে করতে পারেন 'ব্যাচারা-থেরিয়াম' মুখ লুকাতে চাইছে। তাই আমার পরামর্শ—আজ সন্ধ্যায় একটা কনফারেন্স ডাকুন। দু-একজন ধুরন্ধর ক্রিমিনলজি এক্সপার্ট এবং মনস্তত্ত্ববিদ, আমরা কজন তো আছিই

আর ও.সি. বর্ধমানকে একটা ফোন করে অ্যাটেন্ড করতে বলুন।আপনারা সবাই মিলে স্থির করুন—কী কী স্টেপ আমবা নেব, খবরের কাগজে সব কিছু ছাপিয়ে দেব কিনা।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। তাই করুন। বিকাল পাঁচটায় আপনার অসুবিধা হবে না তো বাসুসাহেব?

—না। আসানসোলের কেসটার আর কোন ক্লু পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ, একটা মাইনর ক্লু। ঐ আনকোরা 'গীতা' বইখানা কোথা থেকে এল। রবি আরও ইন্টেন্সিভ এন্‌কোয়ারি করে জেনেছে—একজন ফেরিওয়ালা সন্ধ্যা নাগাদ ঐ পাড়ায় কিছু বই বিক্রি করতে এসেছিল। অধরবাবুর দোকানের পরের পরের দোকানদার তার কাছে কী একটা ধর্মপুস্তক কিনেছিলেন। একটা বুড়ো মত লোক, ঝোলায় করে বই ফিরি করছিল। টেন-পার্সেন্ট কমিশনে সে বাড়ি-বাড়ি বই বিক্রি করে। সম্ভবত অধরবাবু তার কাছেই বইটা কেনেন।

—বুড়ো মতন লোক? কী রকম দেখতে কিছু বলেছে? লম্বা না বেঁটে, দাড়ি-গোঁফ...

বাধা দিয়ে আই. জি. সাহেব বলেন, দ্যাটস্ ইম্মেটিরিয়াল। ফেরিওয়ালা বই বেচতে এসেছিল সন্ধ্যায়। অথচ সুনীল তার বাবাকে রাত দশটা পর্যন্ত জীবিত দেখেছে।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, তা বটে! তবু আজ সন্ধ্যায় কি রবি বসুকেও আনানো যায় না?

আই. জি. সাহেব শ্রাগ্ করলেন। বলেন, যাবে না কেন? একটা ফোন করলেই সে চলে আসতে পারবে। এখন তো সকাল সাড়ে দশটা। কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে ব্যারিস্টার সাহেব?

—আছে! আরও একটা অন্যায় অনুরোধ করব, দেখুন যদি মঞ্জুর করা সম্ভবপর হয়।

—বলুন?

—আপনারা মেনে নিয়েছেন 'আসানসোল' আর 'বর্ধমান' দুটো বিচ্ছিন্ন কেস নয়।দুটো খুন একই আততায়ীর হাতের কাজ—

ইন্সপেক্টার বরাট বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার ডিডাক্‌শানটা একটু প্রিম্যাচিওর হয়ে যাচ্ছে না বাসুসাহেব? 'বর্ধমানে' কোন খুন হয়নি। হবেই, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

বাসু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, অল রাইট—চক্রধরপুর, চিনসুরা বা চাকদার কেসের পর না হয় সে বিষয়ে আলোচনা করব—

আই. জি. সাহেব বরাটের দিকে একটা ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলেন, না না, ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত সিরিয়াস। একজন 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়্যাক' সমাজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও সে বাসুসাহেবকে চিঠি লিখছে—কিন্তু চ্যালেঞ্জটা আমাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। আসানসোলের কেসটাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি। এবার আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চাই। বলুন, বাসুসাহেব, কী যেন বলছিলেন?

—আমি বলতে চাই, লোকটা কে জানি না, উদ্দেশ্য কী তাও জানি না; কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি সে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছে। 'এ. বি. সি.' করে সে ক্রমাগত খুন করে যাবে। আসানসোলে সে আমাদের বেইজ্জৎ করেছে। বর্ধমানে করতে যাচ্ছে সাতাশ তারিখে।এর পর 'চুঁচুড়া' 'চাকদহ' 'চন্দ্রকোণা রোড' কোন একটা জায়গা সে বেছে নেবে। প্রত্যেকটি এলাকা ভিন্ন ভিন্ন ও. সি-র এক্তিয়ারে। আপনারা কি মনে করেন না একজন বিচক্ষণ 'অফিসার-অন-স্পেশাল-ডিউটি' নিয়োগ করে প্রতিটি কেস্‌কে লিংক-আপ্ করা উচিত? না হলে প্রতিটি থানা-অফিসার খণ্ড খণ্ড চিত্রই শুধু পাবে। আততায়ীকে ধরা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

—য়ু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট। একজন সিনিয়ার ইন্সপেক্টরকে আমরা O.S.D.করে দেব।সে আপনার সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্ থাকবে। ইন্ ফ্যাক্ট—আপনার নির্দেশেই সে কাজ করবে। আমি আপনাকে পূর্ণ দায়িত্বটা দিতে চাই ব্যারিস্টারসাহেব!

ইন্সপেক্টার বরাট আর এস. এস. ওয়ান-এর দৃষ্টি বিনিময় হল। আই. জি. ক্রাইম যে

আরক্ষাবিভাগের উপর ভবসা রাখতে পাবছেন না এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যাপাবটা নজব এড়ায়নি আই. জি.-বও। তাই ইন্সপেক্টার বরাটের দিকে ফিরে বললেন, আপনাব সি. আই.ডি. সমান্তরালে কাজ করে যাবে। আমি তাতে কোন হস্তক্ষেপ কবছি না। কিন্তু অজ্ঞাত আততায়ী যেহেতু বাসুসাহেবকেই বারে-বারে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখছে তাই তাঁকে আমি এ সুযোগটা দিতে চাই। আমি আশা করব, আপনারা সমান্তরালে তদন্তের বার্তা বিনিময় কবে পরস্পরকে অবহিত করবেন। কোনক্রমেই যেন রাস্‌কেসলটা 'B' পাব হয়ে 'C'-তে না পৌঁছাতে পাবে। এখন বলুন ব্যারিস্টারসাহেব, আপনি কি এ তদন্তের জন্য অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে বিশেষ কাউকে পেতে চান? আপনি এদের অনেককেই চেনেন।

—তা চিনি। আমি খুশি হব যদি আসানসোল সদর থানায় নেক্সট-ম্যানকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে রবিকে আপনারা মুক্তি দেন। মাসখানেকেব জন্য রবি বোসকে আমার সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিন। ছোক্‌রা ভারি কাজের এবং বুদ্ধিমান!

—তাই হবে, আমি ব্যবস্থা কবছি। সে আজ সন্ধ্যাব মিটিঙে আসবে। থানার চার্জ নেক্সট-ইন-কমান্ডকে সাময়িকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে।

—থ্যাঙ্ক!

একুশ তারিখ, সকাল।

ডাক্তার দে তিনতলায় উঠে এসে দেখলেন মাস্টারমশাই টেবিলে বসে একমনে কী যেন টাইপ করছেন। দরজা খোলাই ছিল। ডাক্তার দে ঘরে প্রবেশ কবে ওঁর খাটে বসলেন। তবু বৃদ্ধের হুঁস হল না। দাশরথী ঝুঁকে পড়ে দেখলেন —মাস্টারমশায়ের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা একশ বাহান্ন।

একটু গলা খাঁকারি দিলেন তিনি।

—কে? ও তুই? দাশু? কখন এলি?

—একটু আগে। আপনার লেখা কতদূর হল?

—আর্যভট্ট চ্যাপটারটা শেষ হয়ে এল।

দাশরথী জানেন, এ পাণ্ডুলিপি কোন দিনই ছাপা হবে না। আজ ছয় মাস ধরে তিনি লিখছেন, কাটাকুটি করছেন, আর কপি করছেন।অজ্ঞাত লেখকের "স্টাডি অফ্ ম্যাথমেটিক্স ইন অ্যানসেন্ট (এনশেন্ট?)/ ইন্ডিয়া" কোন প্রকাশকই কোনকালে ছাপবে না। তা জেনেও মাস্টারমশাইকে উৎসাহ দিয়ে যান: 'অকুপেশনাল থেরাপি!' মনোমত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই ওঁর মানসিক ভারসাম্য আবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাবে না।

বললেন, আমি বলি কি স্যার, আপনি ক্যানভাসারের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য ঐ লেখাটা নিয়ে পড়ুন। মাসে-মাসে ঐ কটা টাকার জন্য...

—ঐ কটা নয়, দাশু! সাড়ে চার শ! বইটা ছাপতে খরচও তো আছে।

—সে দায়িত্ব আমাদের। আপনাব ছাত্রদের। আপনি তা নিয়ে কেন ভাবছেন?

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, এসব কথা তুমি আগেও বলেছ দাশু।দুটো কারণে আমি চাকরিটা ছাড়ছি না। এক নম্বব, এতে বাধ্যতামূলকভাবে আমি অ্যাকটিভ থাকছি। আমি যে বকম গেঁতো, চাকরি ছাড়লে দিনরাত বসে বসে লিখব।তার মানেই অজীর্ণ, ব্লাডপ্রেসাব...

—কেন? সপ্তাহে তিনদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরী যাবেন! রেফারেন্সও তো দরকার....

—তা দরকার। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটা কী জানিস দাশু? জীবনভর অঙ্কই শুধু কষে গেলাম।ভগবানের নাম তো কোনদিন নিইনি! পারানির কড়ি গুণে দেব কী দিয়ে? আসলে কাজটা তো ভাল—বাড়ি-বাড়ি ভাল ভাল বই ফিরি করে আসা। কথামৃত, গীতা, রামায়ণ; বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এঁদের লেখা বই!

—এরপরে আর কথা নেই। দেখি, হাতটা দিন। আজ আপনার ইন্‌জেকশান নেবার দিন।

বৃদ্ধ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন , কী ওষুধ রে ওটা?

—নাম শুনে কী বুঝবেন? 'অ্যানাটেন্‌সল ডিকোনায়েড' ।

—এ ইন্‌জেকশনে কী হয়?

ডাক্তাব দে হেসে বলেন, 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন/ইহলোকে সুখী, অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।'

অট্টহাস্য করে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, না।আমি তো একেবারে ভালো হয়ে গেছি। মাস-তিনেকেব মধ্যে একবারও 'এপিলেকটিক ফিট' হয়নি। কারও গলা টিপেও ধরিনি!

—স্মৃতিশক্তি?

—না। সে জটিলতাটা আছে। পিথাগোরাস থিওবেম বল, বাইনোমিয়াল থিওরেম বল, নাইন-পয়েন্ট সার্কেলের প্রুফটা বল—গড়গড় করে বলে যাব। কিন্তু যদি বলিস—কাল বিকালে কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, হয়তো কিছুতেই মনে কবতে পাবব না। ও মাসে মৌ ওদের কলেজ সোশালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হিসাব মতো আমি নাকি বৌমাব সঙ্গে তিন ঘণ্টা নাচ-গান-অভিনয দেখেছি।কিন্তু পরদিন সকালে সব, স—ব ব্ল্যাঙ্ক! মৌ অনেক হিন্টস্ দিল—কিন্তু কিছুতেই মনে কবতে পারলাম না—পূর্ববাত্রের সন্ধ্যাটা আমার কেমন ভাবে কেটেছে।

—হুম্। কিন্তু তাহলে আশ্রমের নির্দেশমত আপনি কী করে বাড়ি-বাড়ি বই ফিরি করেন?

—এই যে, ডায়েরি দেখে দেখে। এই দ্যাখ না, কাল যাব শ্রীরামপুব, পরশু অফ, চব্বিশে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে 'প্রিয়া' সিনেমা থেকে গড়িয়াহাটের মোড পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাঁ-দিকের দোকান, পঁচিশে ছুটি, ছাব্বিশে বর্ধমান—ফিরব আঠাশে সকালে...সব ডায়েরিতে লেখা আছে।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনাব সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে?

—কোন্‌টা রে?

—সেই যে 'পরীক্ষার হল'-এ একটি ছেলেকে টুক্‌তে দেখে আপনি ক্ষেপে গিয়ে তার গলা টিপে ধরেছিলেন?

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ নিজের রগ টিপে বসে রইলেন। বললেন, ছেলেটার নাম মনে পড়ে না! চেহারাটাও নয়!

—আমাদের আগের ব্যাচের ছেলে?

—কী জানি! মনে নেই, কী জানিস দাশু। আসলে ঘটনাটা আমার একটুও মনে পড়ে না। এমনকি সেই পূজা-প্যাণ্ডেলে যে ছেলেটা বেলেল্লাপনা করছিল তার গলা টিপে ধরার কথাও নয়। তবে বারে বারে শুনে শুনে একটা মনগড়া ছবি আমি তৈরী করে নিয়েছি। আমার মনের পটে যে ছবি তাতে পরীক্ষার 'হল'-এ যে টুকছিল তার মাথায় শিং ছিল, পূজা-প্যান্ডেলের মূর্তিটা সরস্বতীর আর বজ্জাত ছেলেটার ল্যাজ ছিল! অথচ ঘটনাটা ঘটে দুর্গা-পূজা প্যান্ডেলে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে—সত্যি ঘটনাগুলো আমার একদম মনে নেই।

—যাক। ওসব কথা জোর করে মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। এখন তো আপনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। না হলে কেউ পারে অমন একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখতে?

মাস্টারমশাই উত্তরটায় সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষ খুন করবার জন্য আমার হাত এমনভাবে নিশ্‌পিশ করে কেন বল তো?

—মাঝে মাঝে তো নয়, এমন ঘটনা আপনার জীবনে মাত্র তিনবার ঘটেছে।

—আসল দোষটা কার জানিস? আমার বাবার!

—আপনার বাবার?

—হ্যাঁ নামকরণ করাটা। শিবাজী, রাণা প্রতাপের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত করে তিনি আমাকে একটা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন। আর আমি হলাম গিয়ে নগণ্য থার্ড মাস্টার। হয় তো সেই বার্থতাই এভাবে তির্যক প্রকাশ পায়!

—ওসব চিন্তা একদম করবেন না স্যার!

—বলছিস?

লডন স্ট্রীটে আই. জি. ক্রাইমের ঘরে বসেছে একটা গোপন মন্ত্রণা সভা।

বাইশ তারিখ সন্ধ্যা পাঁচটায়।

সকাল বেলা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আরও কজন যোগ দিয়েছেন। আসানসোল থেকে বাসি, বর্ধমান থানার ও. সি. আবদুল মহম্মদ, একজন রিটায়ার্ড ক্রিমিনোলজিস্ট এক্সপার্ট ডঃ ব্যানার্জি এবং ডক্টর পলাশ মিত্র, প্রখ্যাত মানসিক চিকিৎসাবিদ। রাঁচী উন্মাদ আশ্রম থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক।

ডঃ ব্যানার্জি পত্র দুটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তিনি একমত। পত্র দুটি একই টাইপ-রাইটারে ছাপা এবং সম্ভবত একই ব্যক্তির ড্রাফ্‌ট। তাঁর ধারণা লোকটা পাগলাটে—পাগল কিনা বলা কঠিন। তবে সে জীবনে ব্যর্থ। প্রতিষ্ঠা চায়। দ্বিতীয় খুনটা সে কাকে করতে যাচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

ডক্টর পলাশ মিত্রর সুচিন্তিত অভিমত: লোকটা 'মেগালোম্যানিয়াক'—অর্থাৎ মনে করে যে, সে এক দুর্লভ প্রতিভা। তার যা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায়নি। এই পথেই সে বিখ্যাত বা কুখ্যাত হতে চায়। তার পড়াশুনার রেঞ্জটা ভাল। ইংরাজী জ্ঞান টনটনে, টাইপিঙের হাত খুব ভাল। কৌতুকবোধ প্রখর। 'পাগল' বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার আকৃতি মোটেই সে রকম নয়। পথেঘাটে দেখলে, বা আধঘণ্টা তার সঙ্গে খোশ গল্প করলেও হয়তো বোঝা যাবে না যে, সে পাগল। আরও বললেন, এ জাতীয় হত্যাবিলাসী বা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'রা দু জাতের হয়ে থাকে। প্রথম জাতের হত্যাবিলাসীরা বিশেষ এক জাতের মানুষকে খুন করে যায়—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বিপরীত-লিঙ্গের মানুষ, স্কুল-টীচার ইত্যাদি। মনঃসমীক্ষণ করে দেখা গেছে তার পিছনে একটা-না-একটা অতীত ইতিহাস থাকে, ঐ জগতের মানুষের কাছ থেকে অতীতে আঘাত পাওয়া। দ্বিতীয় জাতের হত্যাবিলাসী নির্বিচারে তার পথের বাধা সরিয়ে যায়। কোন দোকানদারের সঙ্গে কোন জিনিসের দর কষাকষি করতে করতে হয়তো তার গলা টিপে ধরে...

ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, কিন্তু অধরবাবুকে কোন একটা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল—যে অস্ত্রটা আততায়ী লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং এটা পূর্বপরিকল্পিতভাবে...

ডক্টর মিত্র বাধা দিয়ে বলেন, আমি অ্যাকাডেমিক ভাবে ব্যাপারটা বলছি, স্পেসিফিক এ কেসটার কথা নয়। মানে, 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াকে'র মানসিক বিকৃতিটা কী জাতের হয়।

—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

—বলার বিশেষ কিছু নেই! 'ক্লু' বলতে ঐ দুখানি চিঠি। দ্বিতীয় খুনটা... আই মীন খুনের চেষ্টাটা হলে হয়তো পাগলটার চেহারা আর একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাসু বলেন, আমার মনে একটাই প্রশ্ন! আপনি যে দু-জাতের হত্যাবিলাসীর কথা বললেন, আমাদের পাগলটা তো তাদের কোন দলেই পড়ছেনা! বিশেষ এক জাতের মানুষকে যে সরিয়ে দিতে চায়, অথবা নিজের পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য যে খুন করে, সে কি সে কথা এভাবে সকৌতুকে চিঠি লিখে ঘোষণা করতে পারে?

—আমি এমন কোনো কেস জানি না।

সারা রাত বেচারির ভাল করে ঘুম হয়নি। বার বারে উঠেছে, জল খেয়েছে আর বাথরুমে গেছে। অথচ পাশের খাটে কৌশিক ভোঁস ভোঁস করে মোষের মতো ঘুমিয়েছে, টেরও পায়নি। অবশ্য দোষ তার নিজেরই—ভাবে সুজাতা। লাইব্রেরী থেকে একটা বিশ্রী বই নিয়ে এসে সন্ধ্যারাতে পড়তে শুরু করেছিল। বিশ্রী বই মানে মনস্তত্ত্ব আর অপরাধ বিজ্ঞানের এক জগাখিচুড়ি গবেষণামূলক ইংরাজি বই। হত্যাবিলাসীদের মানসিকতা, কর্মপদ্ধতি, কেস-হিস্ট্রি এবং কীভাবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'জ্যাক-দা-রীপার' এর উপরেই বেয়াল্লিশ পাতা। এককালে লোকটা নাকি লন্ডনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ক্রমাগত সে মানুষ খুন করে যেত। হত্যাতেই তার আনন্দ। বাছবিচার নেই! কী বলবে? লোকটা পাগল? কিন্তু পাগল কি ঐ রকম শেয়ানা হয়? সমস্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কয়েক বছর ধরে হিমসিম খেয়েছে তার হদিস পেতে। আর একটি অদ্ভুত কেস। এ ছোকরা আমেরিকান—তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল: জ্যাক-দা-রীপারের হত্যাসংখ্যাকে অতিক্রম করা। বুড়ো-বাচ্চা, পুরুষ-স্ত্রী কোন বাছবিচার নেই। জ্যান্ত মানুষ হলেই হল। ময় জানলা দিয়ে ঢুকে হাসপাতালের বেডে ঘুমন্ত রোগীকে হত্যা করে এসেছে! যে রোগীকে সে জানে না, চেনে না, অন্ধকারে বুঝতেও পারেনি সে পুরুষ না স্ত্রীলোক। উদ্দেশ্য? বাঃ! রেকর্ড বেড়ে গেল না?

গ্রন্থকার এজাতীয় হত্যাবিলাসীদের মনোবিকলনের বিশ্লেষণ করেছেন। সাত-আটটি কেস-হিস্ট্রি পড়ে সুজাতার মনে হল ওদের এই অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীকে কোন গ্রুপেই ফেলা যাচ্ছে না। সে যেন পরিচিত প্যাটার্নের নয়—সে অনন্য। প্রথম কথা, যে কটা কেস হিস্ট্রি পড়ল তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অততায়ী সযত্নে নিজের পরিচয় গোপন করেছে—সন্তর্পণে সব ক্লু মুছে দিয়ে গেছে। এ লোকটা তা করেনি। আসানসোলে দোকানের সান-মাইকা-টপ্ কাউন্টারে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি, এমনকি দোকানীরও নয়—তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হত্যাকারী স্থানত্যাগের আগে রুমাল দিয়ে টেবিলটা মুছে দিয়ে গিয়েছিল। এই যার মানসিকতা সে কেন একই টাইপরাইটারে দু দুবার চিঠি লিখবে? সে কি জানে না যে, প্রতিটি টাইপরাইটারের ছাপা ফিঙ্গার-প্রিন্টের মতো সনাক্ত করা যায়—বিশেষজ্ঞের চোখে? তার মানে কি লোকটার দ্বৈতসত্তা? ডক্টর জ্যাকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড? এক সময়ে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, সুকুমার রায়ের বই থেকে 'ব্যাচারাথেরিয়াম্'-এর ছবি কেটে চিঠিতে সাঁটছে নিতান্ত কৌতুকবশে, অন্য সময়ে আস্তিনের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে গভীর রাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোন একজন জ্যান্ত মানুষের সন্ধানে? না! তাও তো নয়! যার বাসস্থান, নাম/উপাধির আদ্য অক্ষর মিলে যাবে! কী করে সে খুঁজে বার করছে এমন অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ? ওর মনে পড়ে গেল এক বান্ধবীর কথা—চুঁচুড়ার চন্দনা চ্যাটার্জির কথা। শিউরে উঠল সুজাতা! চন্দনার হাসিখুশি মুখটা মনে পড়ে গেল। বর্ধমানের পরে কি চুঁচুড়া?

ঠিক তখনি মনে হল সন্তর্পণে কে যেন দরজায় নক করছে। ধ্রাশ করে উঠল বুকের ভিতর! পরক্ষণেই মনে হল—এটা বর্ধমান নয়, নিউ আলিপুর, তার নামের আদ্যাক্ষর বা উপাধি 'B' দিয়ে নয়! তবে কি ভুল শুনেছে? দরজায় কেউ ঠকঠক করেনি? এ শুধু অবচেতনের প্রতিক্রিয়া?

নাঃ! আবার কে যেন ঠকঠক করল। সুজাতা বেড সুইচটা জ্বালে। টেবিল ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। রাত সাড়ে চারটে। নাইটি পরে শুয়েছিল সে। চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। কৌশিক এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। প্যাসেজে আলোটা জ্বলছে। দাঁড়িয়ে আছেন বাসুমামু। পরনে গাউন, মুখে পাইপ। বললেন, কৌশিকের ঘুম ভাঙেনি?

—না। কী হয়েছে মামু?

—যা আশঙ্কা করা গেছিল! তুমি মুখে চোখে জল দিয়ে নিচে নেমে এস। কৌশিককে ডাকার দরকার নেই!—সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলেন বাসুসাহেব।

'যা আশঙ্কা করা গেছিল'! অর্থাৎ বর্ধমানে এক হতভাগ্য কাল গভীর রাত্রে ...সে যখন জ্যাক-দ্য-রীপারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড পড়েছিল? কিন্তু লোকটা কে?...পুরুষ? স্ত্রীলোক? আবার দোকানদার? এত—এত পুলিসের সতর্কতা সত্ত্বেও?

একটু পরে নিচে নেমে এসে দেখল বাসুসাহেব টেবল ল্যাম্পের আলোয় কী একখানা চিঠি লিখছেন। সুজাতা নিঃশব্দে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বাসুসাহেব লক্ষ্য করলেন। কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরলেন, উপরে ঠিকানা লিখলেন। খামটা বন্ধ করলেন না। কাগজচাপার তলায় রেখে ঘুরে বসলেন সুজাতার মুখোমুখি। বললেন, বনানী ব্যানার্জি। বয়স সাতাশ-আটাশ। অবিবাহিতা। সুন্দরী। সময় রাত বারোটা থেকে দুটো। শ্বাসরোধ করে হত্যা। মার্ডারার কোন ক্লু রেখে যায়নি।

—এত তাড়াতাড়ি আপনি খবর পেলেন কেমন করে?

—আধঘণ্টা আগে বর্ধমান থেকে রবি ট্রাঙ্ককল করেছিল।

—কিন্তু রবিবাবুই বা রাত ভোর হবার আগে কেমন করে জানলেন—কোন্ বাড়িতে, কোন রুদ্ধদ্বার ঘরে একটা কুমারী মেয়েকে গলা টিপে মারা হয়েছে?

—না! মৃতদেহটা পাওয়া গেছে বর্ধমান স্টেশনে, টু ফিফ্‌টিন আপ বাডওয়ান লোকালের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে! শোন সুজাতা, আমি সকাল ছটা দশ-এর বর্ধমান-লোকালে ওখানে যাচ্ছি। এবার একাই। তোমাদের দুজনের কাজ এখানে, মানে কলকাতায়। এই চিঠিখানা ধর। মৃদুলকে আর্লি-আওয়ার্সে ধরবে। চিঠিখানা পড়লেই বুঝবে কী করতে হবে। সংক্ষেপে বনানীর পরিচয়টা দিই। খুব কিছু বিস্তারিত আমি জানি না। ইন্ ফ্যাক্ট, রবিও এখনো জানতে পারেনি। যেটুকু জানা গেছে তা এই:

বনানী ব্যানার্জির বাড়ি বর্ধমানে, কানাইনাটশাল পাড়ায়। ওরা দু বোন, বাবা-মা জীবিত। বাবা রিটায়ার্ড রেলকর্মী! গার্ড, টিকিট-চেকার অথবা ডি.এস. অফিসের কেরানি ছিলেন। ছোট বোনটা কলেজে পড়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্ভবত বি.এ.। তার নাম জানি না। বনানী বড় বোন। ভাল অভিনয় করত। কলকাতার একটি গ্রুপ-থিয়েটারে—'কুশীলব'-এ হিরোয়িনের পার্ট। সাধারণত সপ্তাহে দুদিন—শনি রবি। প্রতি শুক্রবার কলকাতায় আসে, সোমবার ফিরে যায়। ও দুটো রাত ও কলকাতায় থাকে মাসীর বাড়ি, এক নম্বর ডোভার লেনে। সচরাচর বনানী সোমবার সকাল বা দুপুরের লোকাল ট্রেনে বর্ধমানে ফিরে যায়। কাল ওর কী দুর্মতি হয়েছে—মেইন-লাইনের টু-ফিফ্‌টিন আপ লোকালটা ধরে গিয়েছিল। সেটা বর্ধমানে পৌঁছায় রাত পৌনে দুটোয়। ওর ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে ও একাই ছিল। গাড়ি ইয়ার্ডে নিয়ে যাবার আগে একজন যাত্রীর নজরে পড়ে।

সুজাতা বললে, এ তো অবিশ্বাস্য! রাত দুটোর সময় একটা অবিবাহিতা মেয়ে কেমন করে সাহস পায় একা একা বর্ধমান স্টেশান থেকে কানাইনাটশাল রিকশা করে যাবার? দ্বিতীয়ত আপনি যা বলছেন তাতে তো ফার্স্টক্লাসে ওর যাবার কথা নয়। বাপ রিটায়ার্ড কেরানী, নিজে কতই বা রোজগার করে?...

—তাই জানতেই যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যাতেই ফিরে আসব। বানু ঘুমোচ্ছে, তাকে ডাকিনি। ঘুমোক। তোমরা সারাদিনে দেখ, এ দিককার কতটুকু খবর জানা যায়। মানে 'কুশীলব'-এর। মৃদুল ছোকরা জার্নালিস্ট। বুদ্ধিমান, করিৎকর্মা। প্রেস কার্ড আছে। এ টিপ্‌সটা পেয়ে ও খুশিই হবে। হয়তো পরের সংখ্যা 'সাপ্তাহিকে' মৃদুল একটা ঝাঁঝালো রিপোর্ট ঝাড়বে ঃ 'বর্ধমানে ব্যর্থপ্রেমী বনানী ব্যানার্জির বিদায়।' তোমরা দুজন মৃদুলের সঙ্গে থাকবে। সন্দেহজনক সব কজনের ফটো নেবে...

—সন্দেহজনক মানে?

—ঐ বয়সের একটি অভিনেত্রীর, যে একা-একা অতরাত্রে ট্রেন-ট্রাভল্ করে, তার একটা রোমান্টিক অজ্ঞাত অধ্যায় থাকবার সম্ভাবনা। আর আমার তো বিশ্বাস—নাইন্টি-নাইন-পার্সেন্ট চান্স বনানী একা যাচ্ছিল না, তার কোন পুরুষ সঙ্গী ছিল। যে লোকটা কেটে পড়েছে। সম্ভবত সেই আততায়ী।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে বটে!

—সে-ক্ষেত্রে লোকটা 'কুশীলব'-এর কোন কুশীলব হওয়াই সম্ভব। এবার বুঝলে? 'সন্দেহজনক' শব্দটার অর্থ?

সুজাতা সলজ্জে ঘাড় নাড়ে।

—ও হ্যাঁ। ঐ সঙ্গে ডোভার লেনেও একবার ঢুঁ মেরো। ওর মেসোর নাম এস. রায়!

বাসুসাহেব বাথরুমে ঢুকে গেলেন। এখনো তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়নি।

সুজাতা চট করে রান্নাঘরে চলে যায়। মামুর জন্য ঝটপট্ করে একটা ব্রেকফাস্ট বানাতে।

চার

সকাল নটার মধ্যেই বাসুসাহেব বর্ধমান সদর থানায় উপস্থিত হলেন। মৃতদেহ তার পূর্বেই সদর হাসপাতালে অপসারিত হয়েছে। পোস্টমর্টেম হয়নি। তবে পুলিসের অভিজ্ঞ চোখে মৃত্যুর কারণটা স্পষ্ট—ওর গলার দুদিকে পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ: শ্বাসরোধ করে হত্যা।

বর্ধমান থানার ও. সি. আবদুল সাহেব এবং ববি বোস ইতিমধ্যে প্রাথমিক তদন্ত পর্যায়টা শেষ করেছে। গতকাল সারা বর্ধমান প্লেন-ড্রেস পুলিসে ছেয়ে রাখা হয়েছিল। লোকাল টেলিফোন গাইডে 'B' অক্ষর দিয়ে যে কটা উপাধি আছে প্রত্যেকটি বাড়িতে টেলিফোন করে আবদুল সাহেবের সহকর্মী একটা রহস্যময় বার্তা জানিয়েছেন: 'থানা থেকে বলছি। আপনাদের বাড়িতে আজ একটা হামলা হওয়ার গোপন 'টিপ্‌স' আমরা পেয়েছি। কথাটা জানাজানি করবেন না। পুলিসে নজর রাখছে। আপনারা নিজেরাও একটু সাবধান থাকবেন। বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ির কেউ বাইরে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানান জাতের প্রতিপ্রশ্ন হয়েছে—কী জাতের হামলা? ডাকাতি? পলিটিক্যাল? কোন সূত্রে জেনেছেন আপনারা?

প্রতিক্ষেত্রেই একই জবাব: আতঙ্কগ্রস্ত হবার দরকার নেই। পরিবারস্থ মানুষজনের বাইরে কাউকে কিছু বলবেন না। ঝি-চাকরদেরও নয়। এর বেশি কিছু আপাতত বলতে পারছি না। আজ রাতটা কেটে গেলে বুঝবেন 'টিপ্‌সটা' ভুল ছিল।

কেউ কেউ অতি-সাবধানী একটু পরে রিং ব্যাক করে জেনে নিয়েছিলেন—থানা থেকে সত্যিই একটু আগে ফোন করা হয়েছিল কিনা।

যতই গোপন করার চেষ্টা হোক খবরটা গোপনে পাব্‌লিসিটি পায়। সারা শহরে একটা চাপা উত্তেজনা। কী—কেন—কার বরাতে ঘটতে যাচ্ছে তা কেউ জানত না—কিন্তু জীপের আনাগোনা যে হঠাৎ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে এটাও শহরের মানুষের নজর এড়ায়নি। লোড-শেডিং হয়নি—উপর মহল থেকে কঠিন সতর্কবাণী এসেছিল, সাতাশে রাত্রে যেন গোটা বর্ধমান এলাকায় একেবারে লোড-শেডিং না হয়। প্রয়োজনে আর সব কটা সার্কিট বন্ধ করেও!

মৃতদেহ যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম মনীশ সেন রায়। অ্যান্ড্রুইউলের অফিসার, ব্যাচেলার। বয়স পঁয়ত্রিশ। বর্ধমান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। ফার্স্ট ক্লাস মান্থলি আছে। বনানীকে চেনেন—ব্যক্তিগতভাবে নয়, বর্ধমানের একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী হিসাবে। তাঁর জবানবন্দির সংক্ষিপ্তসার এই রকম:

সচরাচর সেন রায় সাহেব সন্ধ্যা ছ'টা দশের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে রাত আটটার মধ্যে বর্ধমানে পৌঁছে যান। পূর্বরাত্রে, অর্থাৎ সাতাশে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল কলকাতায়। তাই বাধ্য হয়ে মেন-লাইনের শেষ বর্ধমান লোকালটা ধরে ফিরছিলেন। প্রথম যে ফার্স্ট ক্লাস কামরাটায় ঢোকেন তার নিচের দুটি বেঞ্চিতেই চাদর পাতা। একটিতে একজন লোক শুয়ে ছিল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে। বিপরীত বেঞ্চিতে জানলার ধারে একা বসেছিল বনানী। তার পরনে হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদী, গায়ে ঐ রঙেরই ব্লাউজ। উপরের বার্থ দুটি খালি। সেন রায়ের সঙ্গে বনানীর চোখাচোখি হয়। বনানী ওঁকে না চিনবার ভান করে। সম্ভবত বনানী ওঁকে চিনত না—বর্ধমানের একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলে হয়তো সনাক্ত করতে পারত। অথচ উনি জানতেন, বনানী অভিনেত্রী, এবং তার অনেক পুরুষ 'ফ্যান' আছে। বনানীর দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির ভঙ্গি লক্ষ্য করে উনি বুঝতে পারেন,—চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া সহযাত্রীটি ওর 'নাগর'! তাই উনি পাশের কামরায় গিয়ে বসেন। বনানীর সহযাত্রীটিকে উনি দেখেননি; কিন্তু তার পায়ে ফিতেবাঁধা পুরুষদের জুতোটা চাদরের বাইরে বার হয়ে ছিল। তাতেই উনি আন্দাজ করতে পারেন যে, সে লোকটা পুরুষ।

ট্রেন যখন ব্যান্ডেল ছাড়ে- -রাত বারোটা নাগাদ---তখন উনি একবার বাথরুমে যান। লক্ষ্য করে দেখেন, ঐ কামরার দরজাটা টানা। ভেতর থেকে বন্ধ কিনা তা জানতেন না অবশ্য। পরীক্ষা করে দেখেননি।

মনীশবাবুর অভিজ্ঞতায় বর্ধমান লোকালের শতকরা নব্বই ভাগ যাত্রী বর্ধমানের আগেই নেমে পড়ে। গভীর রাতের ট্রেন হলে শেষপ্রান্তের যাত্রীরা ঠাঁই বদল করে এক কামরায় এসে জোটেন, ছিনতাই-পার্টির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের জন্য। এমনকি ফার্স্ট ক্লাস নির্জন হয়ে গেলে সেকেন্ড ক্লাসেও চলে আসেন। ওঁর কামরায় শেষ প্যাসেঞ্জারটি শক্তিগড়ে নেমে গেলে উনি কামরা বদলে এ ঘরে চলে এলেন। দেখলেন, দরজাটা তখনও বন্ধ। কৌতূহলবশে পাল্লাটা ধরে টানতেই সেটা খুলে গেল। উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বনানী একা নিচের বেঞ্চেই লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। কামরায় দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। বনানী উল্টো দিকে মুখ করে ঘুমোচ্ছিল। মনীশবাবু রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। ঐ বয়সের একটি মেয়ে দরজা খোলা রেখে এমন অরক্ষিত কামরায় এত রাত্রে এভাবে ঘুমোয় কী করে! যাই হোক ট্রেন গাংপুর স্টেশান পার হলে তিনি বারকয়েক ওকে নাম ধরে ডাকলেন। ওর নাম যে 'মিস্ বনার্জি' তা জানা ছিল মনীশের। মেয়েটি সাড়া দিল না। তখন বাধ্য হয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন ও অজ্ঞান হয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে না। ট্রেন থামতেই উনি ছুটে দিয়ে গার্ডকে ডেকে আনেন। তখন বোঝা যায়—বনানী অজ্ঞান নয়, মৃত!

ব্যাপারটা ঘোরালো। অত্যন্ত ঘোরালো—যদি মনীশ সেন রায় আদ্যন্ত সত্য কথা না বলে থাকে।

ও. সি. ওঁকে সে-কথা বেশ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, মিস্টার সেন রায়, বুঝতেই পারছেন পুলিস-অফিসার হিসাবে আমাকে এটুকু করতেই হবে। আপনার স্টেটমেন্ট অনুসারে আপনি সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যই করেছেন; কিন্তু আপনার স্টেট্‌মেন্ট করোবরেট করবার কোন উপায় নেই। একটি নির্জন রেল কামরায় ছিলেন আপনারা মাত্র দুজন। আপনি আর মৃত বনানী।

মনীশ সেন রায় রুখে উঠেছিল, আপনি কি সন্দেহ করছেন— আমি খুন করেছি?

—না। কারণ তা করলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতাম। তা করছি না। কিন্তু 'বর্ধমান-কলকাতা' ছাড়া আপনি এক সপ্তাহ আর কোথাও যাবেন না। গেলে থানাকে জানিয়ে যাবেন। আপনি অফিস-বাড়ি

যেমন করছেন তেমনিই করবেন। শুধু আজকের দিনটা ছুটি নিন। কলকাতা থেকে হায়ার-অফিসাররা এন্‌কোয়ারিতে আসবেন।

—কিন্তু আমার যে সকাল এগারোটায় অফিসে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—আপনি আপনার 'বস'-এর নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা দিন, আমি টেলিফোনে তাঁকে জানিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ! সেটুকু আমিই করতে পারব। শুধু আজকের দিনটাই তো?

—হ্যাঁ। আয়াম সরি ফর দ্য ট্রাব্‌ল্‌।

—না! আপনার দুঃখিত হবার কী আছে? আমারই ভুল! গার্ডকে না ডেকে আমার নিঃশব্দে কেটে পড়া উচিত ছিল।

আবদুল মহম্মদ হেসে বলেছিলেন, সেটাই ভুল হত আপনার। কারণ তাহলে এতক্ষণে আপনি থাকতেন আমার লক্‌-আপে!

বনানীর বাবা, মা অথবা ছোট বোন ময়ূরাক্ষীর জবানবন্দি এখনো নেওয়া যায়নি। মানে, তাদের মানসিক অবস্থা বিচার করে। তবে ওদের প্রতিবেশীদের জবানবন্দি থেকে বোঝা গেছে, বনানী চিরকালই একটু ডাকাবুকো ধরনের। অতরাত্রে না হলেও বেশ রাত করে সে অনেকবার কলকাতা থেকে একা একাই ফিরে এসেছে। থিয়েটারে প্রতিরাত্রে ও দেড়শো টাকা করে পেত, তা ছাড়া যাতায়াত খরচ। অর্থাৎ মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার করত। সুন্দরী, গ্ল্যামারাস, অভিনেত্রী। বদনাম কিছুটা থাকবেই। জনশ্রুতি সে নাকি সিনেমায় নামবার একটা চান্স পেয়েছিল। ভয়েস-টেস্টিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। ফলাফল জানা যায়নি।

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলেন, বাপ-মা-বোন কাউকেই জেরা করনি তোমরা, তাহলে এত খবর পেলে কার কাছে?

——অমল দত্ত। বনার্জি মহাশয়ের নেক্সট-ডোর নেবার। সদ্যপাস ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ও পরিবারর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা। ব্যাচিলার, কলকাতায় ফিলিপ্স্‌-এ কাজ করে।

—হুঁ। তার মূল টার্গেটটা কী? রিভার না ফরেস্ট?

—আজ্ঞে?

—সদ্যপাস ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একটি সুপাত্র। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মূল প্রেরণাটা কোথায় ছিল? বনানী, না ময়ূরাক্ষী?

রবি হেসে বলে, আমার ধারণা: বনানী। না হলে এভাবে ভেঙে পড়ত না।

—আর ওঁদের উপাধিটা কী? বনার্জি না ব্যানার্জি?

—ঐ একই কথা। বনানীর বাবা একটা 'জিনিওলজিক্যাল ট্রি'-র মাধ্যমে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি স্বনামধন্য ডব্‌লু. সি. বনার্জির বংশধর। তাই যদিও ওঁর বাবা ছিলেন ব্যানার্জি উনি নিজের নাম লেখেন 'বনার্জি'।

—বুঝলাম। তুমি ঐ দুজনের সঙ্গেই আমার ইন্টারভিয়ুর ব্যবস্থা করে দাও। মনীশ আর অমল দত্ত। আর পোস্ট-মর্টাম রিপোর্টটা এলে তার একটা কপি।

আবদুল মহম্মদ বললে, ও রিপোর্টে নতুন করে জানবার কিছু নেই স্যার।

—য়ু থিংক সো? আমি জানতে চাই— বনানী হেভি ডোজ-এর কোনও ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল কিনা, ওর স্টম্যাকে ভুক্তাবশিষ্ট কী কী পাওয়া গেছে, আহারের কতক্ষণ পর মৃত্যু হয়েছে এবং ওর দাঁতের ফাঁকে পান সুপুরির কুচি ছিল কিনা।

রবি বোস চোখ টিপে ওর সহকর্মীকে বারণ করল। আবদুল আর কিছু প্রশ্ন করল না।

মনীশ সেন রায় থানাতে জবানবন্দি দিতে এল রীতিমতো উদ্ধত ভঙ্গিতে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে একটু থমকে গেল। বাসুসাহেব তখন একমনে পাইপে তামাক ভরছিলেন, চমকটা তিনি লক্ষ্য করেননি। বললেন, প্লীজ টেক য়োর সীট মিস্টার সেন রায়। শুনুন, আমি পুলিসের লোক নই...

বাধা দিয়ে সেন রায় বলে, জানি স্যার! আপনাকে আমি চিনি। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনার কথাই এতক্ষণ ভাবতে ভাবতে আসছিলাম...

—আমার কথা! হঠাৎ আমার কথা কেন?

—এই মাথামোটা পুলিসগুলো নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে কেস সাজাবে। তখন আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে—ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে। তাই।

—আই সী! না, মনীশবাবু! নাইন্টিনাইন-পয়েন্ট-নাইন পার্সেন্ট চান্স তোমার বিরুদ্ধে পুলিস কেস সাজাবে না। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি—তুমি টু হান্ড্রেড-পার্সেন্ট নট্-গিল্‌টি। আমরা যাকে খুঁজছি সে একটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক'! আধা-পাগল! অ্যাণ্ড্রুইউলের অফিসার সে হতে পারে না।

—হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক! কী করে জানলেন?

—সম্ভবত কাল-পরশুর মধ্যেই খবরের কাগজে তার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। এখন তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব তার সত্য জবাব দিও। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আদালতে এসব প্রশ্ন উঠবে না। তা তুমি আসামীই হও অথবা সরকারপক্ষের সাক্ষীই হও। তুমি কি আমাকে আদ্যন্ত সত্য জবাব দেবে? খুনি লোকটাকে ধরতে সাহায্য করবে?

—বলুন স্যার? আমি ওয়ার্ড-অব্-অনার দিচ্ছি।

—বনানীর প্রতি কি তোমার কোনও সফ্‌ট-কর্নার ছিল? রোমান্টিক্যালি অথবা সেক্শ্যুয়ালি?

প্রশ্ন শুনে মনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নড়েচড়ে বললে, ছিল, স্যার। বনানী গ্ল্যামারাস মেয়ে; তার সেক্স্-অ্যাপীল ছিল। স্টেজে এবং ট্রেনে তাকে বারে-বারে দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ ছিল না। কোন দিন কথাবার্তা হয়নি।

—তুমি কি জান তার কোনও লাভার ছিল?

—সঠিক জানি না। আন্দাজ করেছি এবং লোকমুখে শুনেছি সে কন্‌জারভেটিভ্ ছিল না।

—মীনিং...পয়সা খরচ করতে রাজী হলে সে লিবারাল হলেও হতে পারত।

নতনেত্রে মনীশ বললে, হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

—তুমি নিজে কখনো চেষ্টা করেছিলে?

—না, করিনি। আমার মানসিক গঠন সে জাতের নয়। তার সঙ্গে আমার যে আলাপই ছিল না।

—ও কি একা-একা যাতায়াত করতো? কখনো কোন এস্কর্ট তোমার নজরে পড়েনি?

—অন্ দ্য কন্ট্রারি, ওর সঙ্গে বরাবরই একজন থাকত। ওরই প্রতিবেশী। নামটা ঠিক জানি না। ফিলিপ্স্-এর এঞ্জিনিয়ার।

—ওর অভিনয় তুমি দেখনি?

—বহুবার।

—'কুশীলব'-এ কি ওর কোনও প্রেমিক ছিল?

—আমি ঠিক জানি না, স্যার।

—ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্তই। তবে মনে হচ্ছে তোমাকে আবার আমার প্রয়োজন হবে। সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

অমল দত্ত জবানবন্দি দিতে এল ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে। চুলগুলো শুধু অবিন্যস্তই নয়, বুশ-শার্টের বোতামগুলো এক এক-ঘর ভুল ফুটোয় ঢোকানো। তাব মুখে নিদারুণ বেদনা, হতাশা আর বিরক্তি। রবি বোস বলল, বসুন অমলবাবু।

অমল সে কথায় কান দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, আপনারা আর ক-দফা জবানবন্দি নেবেন বলুনতো মশাই?

ও. সি. বলেন, ক্ষুব্ধ হবেন না অমলবাবু। আমাদের উদ্দেশ্যটা তো বুঝছেন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন...

—অ' তা প্রশ্ন করুন। কী জানতে চান?

বাসু মনে মনে একটা ওকালতি লবজ উচ্চাবণ করলেন: 'হোস্টাইল উইটনেস্'! মুখে বললেন, কাল রাত দুটো নাগাদ আপনি কোথায ছিলেন অমলবাবু?

—টু ফিফটিন-আপ বর্ধমান লোকালের ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। কেন?

রবি এবং আবদুল যেন শক খেয়েছে। সোজা হয়ে বসে দুজনেই।

বাসু নির্বিকারভাবে বলেন, আই সী' যে কামরায় বনানী ছিল?

—না হলে তাকে হত্যা করব কী করে? আমিই তো গলা টিপে তাকে মেরেছি। কেন, জানেন না? এঁরা তো সকলেই জানেন।

আবদুল আসন ছেড়ে উঠে দাঁডিয়ে পড়েছে। রবিও সবে গেছে ওর কাছাকাছি। একটা হাত তার পকেটে। বাসুসাহেব কিন্তু এখনো নির্বিকার। বললেন, ফর য়োর ইনফরমেশান, মিস্টার দত্ত। আমি পুলিসের কেউ নই।

—অ! —এতক্ষণে অমল দত্ত বসে পড়ে চেয়ারে। বলে, আপনি ব্যক্তিটি কে?

—আমি একজন ভারতীয়। পুলিসে যখন আততায়ীকে ধরবার চেষ্টা করে তখন মিথ্যা কথা বলি না। যতই ক্ষুব্ধ হই, যতই মানসিক আঘাত পাই। আপাতত এটুকুই আমার পরিচয়।

অমল এবার ওঁকে ভাল করে দেখে বললে, আয়াম সরি, স্যার! আপনি পি. কে. বাসু। কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। কী জানেন স্যার, সকাল থেকে এঁরা আমায় জেরবার করে দিচ্ছেন। যেন মানুষের ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্ট বলে কিছু থাকতে নেই...আমার একমাত্র অপরাধ আমি বনানীকে ভালবাসতাম।

—আই সী! এখন কি শান্তভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? না, আমি পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব? তোমার মানসিক ভারসাম্য ফিরে এলে?

—আয়াম এক্সট্রিমলি সরি স্যার! না, না, আমি ঠিক আছি। কাল আমি ঠিক ওর আগের দশটা পঞ্চান্নর কর্ড লাইনের লোকালটায় বর্ধমানে ফিরে আসি। রাত দুটোয় আমি বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম।

—তুমি কি বনানীকে তোমার মনোভাব কখনো জানিয়েছিলে?

অমল পুলিস-অফিসার দুজনের দিকে দেখে নিয়ে বললে, এঁদের সামনে আমি সেসব কথা বলব না স্যার। আপনি যদি জনান্তিকে জানতে চান এবং এসব কথা খবরের কাগজে ছাপা হবে না গ্যারান্টি দেন...

বাসু-সাহেব পুলিস-পুঙ্গবদ্বয়ের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা কী বল?

আবদুল কিছু বলার আগেই রবি বলে ওঠে, থানার ভিতর সেটা অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে জীপ রেডি আছে। আপনি মিস্টার দত্তকে নিয়ে রেস্ট হাউসে চলে যান। সেখানে উনি যা বলবেন তা উকিলকে বলা 'প্রিভিলেজড় কনফেশন'। আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।

বাসু-সাহেব খুশি হলেন রবির উপস্থিত বুদ্ধি দেখে। উপযুক্ত সহকর্মী বেছে নিয়েছেন তিনি। রবি ভালোভাবেই জানে—অমল দত্ত বাসু-সাহেবের মক্কেল নয়, সে যা বলবে তা আদৌ 'প্রিভিলেজড় কনফেশন' নয়; কিন্তু এভাবেই অমলের আত্মম্ভরিতা বা 'ইগো' চরিতার্থ হবে। এভাবেই তার কাছ থেকে ভিতরের কথা বার করা যাবে।

রেস্ট-হাউসে দু'কাপ কফি নিয়ে বাসু-সাহেব অমল দত্তের এজাহারটা শুনলেন।

হ্যাঁ, অমল দত্ত বনানীকে ভালবাসে, মানে, বাসতো। সে কথা সে তাকে বহুবার বলেছে। বনানী সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিত। তার মনোভাবটা বোঝা যায়নি কোনদিন। কখনো বলেছে, 'বিয়ের পর তো তুমি আমাকে খাঁচার ময়না করে রাখবে, থিয়েটার করতে দেবে না', কখনো বলেছে, 'আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ, তুমি বাতি নেভাও, আর আমি বাতি জ্বালি।' অমল হয়তো সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছে—'তার মানে?' আর বনানী খিলখিল করে হেসে বলেছে—'আমি স্টেজে ঢুকলে স্পট-লাইট আমার মুখে পড়ে, দেখনি? আর তুমি? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার—যার একমাত্র কাজ লোড-শেডিং-এর এন্তাজাম করা!'

মোট কথা, বনানীব মনোভাবটা বোঝা যাযনি। তবে অমলকে সে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিত। অমল বর্ধমানে ওব প্রতিবেশী। ওরা প্রায়ই এক ট্রেনে যাতায়াত করত। একসঙ্গে কলকাতায় ঘোরাঘুরি করত।

বাসু-সাহেবের মনে হল—বনানী যে অমলকে নিয়ে খেলা করতো তার দুটো উদ্দেশ্য। প্রথমটা হচ্ছে স্বভাবগত—পুরুষমানুষকে নিয়ে খেলা করায় তার আমোদ; দ্বিতীয়টা আত্মরক্ষার্থে—অবাঞ্ছনীয় পুরুষমানুষকে দূরে হটাতে। অমল ছিল বনানীর 'গ্লোরিফায়েড এসকর্ট'—রাঙতাব সাজপরা দেহরক্ষী।

অমল জানালো, বনানীব একাধিক পুরুষবন্ধু ছিল। ওর ধাবণা, এইটা বনানীর স্বভাব। ওর আবও ধারণা, এই আপাত—'বেলেল্লাপনা' একেবারে উপরকার জিনিস। অন্তরে মেয়েটা ছিল দারুণ 'পিউরিটান'—অমলকে সে কোনদিন চুমু পর্যন্ত খেতে দেয়নি।

মাসখানেক হল বনানী নাকি একজন বড়লোক কাপ্তেন ফিল্ম-প্রডিউসারের খপ্পরে পড়েছিল। অমল কখনো তাকে দেখেনি। তবে এটুকু জানে, লোকটা বিবাহিত আর বনানীর পিছনে দেদার খরচ করত। সে নাকি ওকে সিনেমায় নামিয়ে দেবার সুযোগ দিতে চাইছিল।

বাসু-সাহেব অনেক জেরা করেও সেই অজ্ঞাত কাপ্তেনবাবু সম্বন্ধে কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারলেন না।

অমলও ওঁকে শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করল—বনানীকে যে এভাবে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার করতে সে সব রকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত।

বাসু-সাহেব তাকেও কথা দিয়ে এলেন, সময় হলে তোমাকে ডাকব।
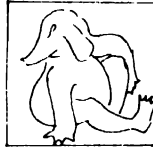
মৃদুল 'শনিবারের চিঠি'র জন্য একটা 'স্টোরি' পেল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সুজাতা একটি মজাদার মেয়ের সন্ধান পেল। তার কণ্ঠটি সোনা দিয়ে বাঁধানো—কী গানে, কী বাকচাতুরীতে। 'কুশীলব'-এর সবাই এবং ডোভার লেন-এর সকলেই মর্মাহত। কথা বলার মত মন-মেজাজ নেই কারও। সবাই মুষড়ে পড়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ ঊষা বাগচী। স্থূলাঙ্গী এবং কুদর্শনা। কিছুটা ভগবান মেরে রেখেছেন, কিছুটা বা তার ভোজনপ্রিয়তা। তবু 'কুশীলব'-এ তার ডাক পড়ে। কারণ ঊষা বাগচী মধুকণ্ঠী। ফরমাসী নাটক যখন লেখানো হয় তখন অন্তত এক সীনের অ্যাপিয়ারেন্সে ভিক্ষুণী বা বৈরাগিনী বেশে ঊষা

একখানি গান গেয়ে যায়—নাটক মুহূর্তে 'পয়োধি'! ওব সঙ্গে আলাপ করে সুজাতা বুঝতে পারে একমাত্র এই মেয়েটাই অতটা মুষড়ে পড়েনি। কিছুটা স্বভাবগত কৌতুকপ্রিয়তায়, কিছুটা বা ঈর্ষায়: জনান্তিক আলাপে সুজাতাকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, কী বলব ভাই—অমন মৃত্যু যেন শত্রুরও না হয়; কিন্তু একথাও বলব—ওজাতের মেয়ে এভাবেই পটলোত্তোলন করে!

—ও জাতের মেয়ে মানে?—সুজাতা মেয়েলী কৌতূহল দেখায়।

—দিনরাত যে মেয়ে গুন্‌গুন্ করে: 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?'

—ওর বুঝি অনেক পুরুষ 'ফ্যান' ছিল?

—তা যদি বলেন, তা হলে বলব—'ফ্যান' বস্তুটা হচ্ছে 'নেসেসারি ঈভল', শিল্পীর কাছে। আচার্য পি. সি. রায়ও তাই বলতেন—কিছুটা 'ফ্যান' হজম করা ভাল। তাই বলে কি গাঁৎ গাঁৎ করে শুধু 'ফ্যান'ই গিলতে হবে? ফ্যানটা গেলে ফেলে ঝরঝরে ভাত খেতে হবে না? নিজের ঝকঝকে ঘর, নিজের তক্‌তকে বর, নিজের বক্‌বকে বাচ্চা?

সুজাতা হেসে বলে, শিল্পীর পক্ষে 'ফ্যান'টা বুঝি 'নেসেসারি ইভল'?

—নয়? এই আমাকেই দেখুন না। কালো-মোটা! তাই বলে কি 'উষা-ফ্যানে'র নাম কেউ শোনেনি? কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—নিজের মান নিজের কাছে। চেনা নেই, অচেনা নেই, যে কেউ এসে পটাস্ করে ফ্যানের বোতাম টিপল আব অমনি বাঁই বাঁই পাক খেতে হবে?

সুজাতা সায় দেয—বটেই তো। বনানীব বুঝি অনেক 'লাভার' ছিল?

—তা ছিল। বৃন্দাবনের কনভার্স থিয়োরেম। ষোড়শ গোপ! থিয়েটার শেষ হলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে ওকে ডোভার লেন তক্ এসকর্ট করে নিয়ে যাবে!

—আপনি তাদের সবাইকে চেনেন?

—কিছু মনে কববেন না ভাই—এটা আপনাব বোকার মত প্রশ্ন হল! ষোড়শ গোপকে কি চিনে রাখা সম্ভব? বনানী নিজেই চিনতে পারত না। তবে হ্যাঁ—'হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, টল, ফেয়ার' এমন কয়েকটি বংশীবাদককে ভুলতে পারিনি। ভোলা শক্ত।

—বংশীবাদক? আপনার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতেন বুঝি?

—আপনি ছেলেমানুষ অথবা অন্ধ! আমার খানদানী বদনখানা দেখছেন না? বংশী অর্থে এখানে 'হর্ন' বা 'হুটার'! 'শো' শেষ হলেই সমস্বরে ওঁরা বংশীধ্বনি করে 'ধনিকে' ডাকতেন।

এর পরেই থিয়েটারের ম্যানেজার আব কৌশিক ওদের দিকে এগিয়ে আসে। ওদের রসসিক্ত নিভৃত কূজন বন্ধ করতে হল।

পাঁচ

পয়লা নভেম্বর বিডন স্ট্রীটেব বাড়ীতে একটা বিশ্রি দুর্ঘটনা ঘটল।

বেলা তখন আটটা। চিলে-কোঠাব ঘর থেকে নিচে নেমে দোতলার ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই হাঁকাড় পাড়লেন, বৌমা?

দোতলায় ওঁরা তিনজনে প্রাতরাশে বসেছিলেন। প্রমীলা এসে বললেন, মাস্টারমশাই? আসুন ভিতরে আসুন।

—না বৌমা, ভিতরে যাব না। তোমার সারা মেঝে নোংরা হয়ে যাবে। এমনিতেই এই দেখনা...হাতটা বিশ্রীভাবে কেটে গেল...ইয়ে, দাশু আছে? একটা ব্যান্ডেজ...

ডান হাতখানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন। ডান হাতের তালু দিয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে। ওঁর ধুতি, জামার আস্তিন রক্তে মাখামাখি!

—ঈস! কী-করে এমন হল!...ওগো...শিগ্‌গির এস...

ডক্টর দে চায়ের কাপটা নামিয়ে ছুটে বেবিযে এলেন। দেখেই বললেন, মৌ! আমার ডাক্তারী ব্যাগটা—কুইক্!

প্রাথমিক চিকিৎসা যা করার তৎক্ষণাৎ করা হল। হাতেব তালুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হল। ডক্টর দে ওঁকে জোর করে একটা খাটে শুইয়ে দিলেন। একটু গরম দুধও খাইয়ে দিলেন স-ব্র্যান্ডি। বললেন,এভাবে হাত কাটলেন কী করে?

--পেন্সিল ছুলতে গিয়ে।

--আপনি নিজে নিজে আর পেন্সিল কাটবেন না। মৌকে বলবেন, আব না হলে ঐ যে ঘোরানো পেন্সিল-কাটা কল পাওয়া যায তাই দিয়ে কাটবেন।

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, আর দাড়ি? শেভ্ করে দেবে কে? তুই?

ঠিকে ঝিকে প্রমীলা বললেন, তিনতলার ঘরটা মুছে দিয়ে আয তো কুসমির মা। ঝি বাসন মাঝছিল, বললে, দেব মা, হাতটো অপ্সর হোক পহিলে।

প্রমীলার মনে হল হয়তো চিলে-কোঠাব ঘরখানা খোলা রেখেই মাস্টারমশাই নিচে নেমে এসেছেন। সে ঘরের একটি ডুপ্লিকেট চাবি ওঁর কাছে বরাবরই থাকে। ঘবে আব কিছু না থাক একটা দামী টাইপ-রাইটার আছে। তাছাড়া রক্তারক্তি কাণ্ড কতটা হযেছে দেখতে প্রমীলা নিজেই চাবিটা হাতে নিয়ে তিনতলায় উঠে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হযে গেলেন তিনি।

সিঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা বক্তের একটা ধারা শেষ হয়েছে ওঁর টেবিলে। সেখানে গিযে দেখলেন, মাস্টারমশায়ের ছড়ানো পাণ্ডুলিপির পাশেই টেবিলেব উপব পড়ে আছে একটা বাঁধানো ফটো। চিনতে পারলেন সেটা। এটা বহুদিন আছে ওঘরে। মাস্টারমশায়ের নয। একজন স্বনামধন্য পুরুষের; গুরুগিরি তাঁর ব্যবসা। অনেক শিষ্য আছে তাঁর। প্রতি বৎসর জন্মোৎসবে খববের কাগজে তাঁর নাম, ফটো আর আশীর্বাণী ছাপা হয়। ভক্তদের খরচে। সম্প্রতি একটি নারীঘটিত ব্যাপারে ঐ প্রৌঢ় গুরুজীব নামে কিছু কেচ্ছা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বিধবার সম্পত্তি গ্রাস অথবা শ্লীলতাহানি, কী-যেন ব্যাপারটা!দাশরথী এঁর শিষ্য নন, গুণগ্রাহীও নন। তাঁর কোনও রুগী রোগমুক্ত হবার পর ফটোখানি ডাক্তারবাবুকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এটা শোবার ঘবে মাথার কাছে টাঙিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু। 'বাবা'র আশীর্বাদ তাহলে নিত্য পাবেন। ডক্টর দে স্নেহেব দানটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'শোবার ঘরে এঁকে রাখা যাবে না। মাথার দিকে রাখলে রোজ ঘুম ভেঙে শ্রীমুখখানি দেখতে পাব না, পায়ের দিকে রাখলে তা পাব—কিন্তু তাহলে 'বাবা'র আশীর্বাদের বদলে হয়তো অভিশাপটাই জুটবে কপালে।' প্রমীলা জানতেন, তাঁব স্বামী এসব গুরুবাদে বিশ্বাসী নন। ছবিখানি তাই দীর্ঘদিন চিলেকোঠার ঘরে হুক থেকে ঝুলছিল।

বর্তমানে দেখলেন, ফটোর কাচটা চুরমার হয়ে ঘরময় ছড়ানো। আর একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি ছবিটার উপর এত জোরে মারা হয়েছে যে, ছবি ও ফ্রেম ভেদ করে ছুরির ফলাটা টেবিলে গেঁথে আছে!!

প্রমীলা ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কাচের টুকরোগুলো কুড়িযে নিলেন। ছুরিটা সাবধানে উপড়ে নিলেন এবং একটি পুরানো খবরের কাগজে সব কিছু জড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে সন্তর্পণে নিচে নেমে এলেন। লুকিয়ে ফেললেন সব কিছু।

একটু পরে ঝি এসে ঘরটা ভিজে-ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে গেল।

মৌ দুপুরে কলেজে বেরিয়ে যাবার পর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা স্বামীকে জানালেন।

মাস্টারমশাই তখন তিনতলায় ঘুমাচ্ছেন। আজ আর বই ফিরি করতে বার হননি তিনি।

বিকেলে দাশরথী ওঁকে দেখতে এলেন। ওঁকে দেখে মাস্টারমশাই উঠে বসে বলেন, আয় দাশু। বোস্। আজ আর বের হইনি। কালও আমার ছুটি।

—দুপুরে ঘুমটা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। তুই বোধহয় ঘুমের ওষুধ কিছু দিয়েছিলি। নয়? দুপুরে এত ঘুমাইনা তো!

ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরেছেন—কী কারণে মাস্টারমশাই ঐ ছবিখানি পেড়ে তাকে ছুরি-বিদ্ধ করেছেন। গুরু মহারাজের কেচ্ছা-সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাখানা পড়ে আছে খাটের উপর। তিনি বরং জানতে চাইলেন— কেন মাস্টারমশাই তখন অমন মিথ্যা কথাটা বললেন: পেন্সিল ছুলতে গিয়ে ওঁর হাত কেটেছে। কিন্তু সরাসরি সে প্রশ্নটা পেশ করলেন না। গল্পগুজবের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে বললেন, ঐ টাইপ-রাইটারটা কত দিয়ে কিনেছিলেন স্যার?

—কিনিনি তো। ওটা আমার এক ছাত্রর উপহার দিয়েছিল।

—ছাত্র? আমাদের ব্যাচের? কী নাম?

—না, তোদের ব্যাচের নয়! সেই যে ছেলেটাকে পরীক্ষার হলে গলা টিপে ধরেছিলুম।

—তাই নাকি? তার সঙ্গে তাহলে আপনার দেখা হয়েছিল? তবু নামটা মনে পড়ে না?

—দেখা তো হয়নি। একটা বেগানা লোক হঠাৎ একদিন ওটা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সেই ছেলেটির একটি চিঠি। সে সময় আমি বেকার! থাকতুম একটা ছাপাখানায়। এক গাড়োল অধ্যাপকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আমার চাকরি যায়। লোকটা অঙ্কের কিছু জানত না, বুঝলি? যে অঙ্ক পাঁচটা স্টেপে কষা যায়, তাকে...

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সে গল্প আপনি আগেও বলেছেন। টাইপ-রাইটারটার কথা বলুন।

—হ্যাঁ। টাইপ-রাইটার। তখন তো আমি বেকার! কী করব, কোথায় দু মুঠো অন্ন সংস্থান হবে এই চিন্তা। এমন সময় একটা বেগানা লোক পৌঁছে দিয়ে গেল ঐ উপহারটা। আর একখানা চিঠি। দাঁড়া তোকে দেখাই...

কাগজপত্র অনেক ঘেঁটেও পত্রটি খুঁজে পেলেন না উনি। শেষে বললেন, তাহলে বোধহয় যত্ন করে রাখিনি। তবে চিঠির বক্তব্যটা আমার মনে আছে। হতভাগা লিখেছিল—"স্যার! আমার অপরাধেই আপনার চাকরি যায়! টুকছিলাম আমি, আর চাকরি খোয়ালেন আপনি! আমি এখন ভালই রোজগার করি। শুনেছি আপনি বেকার। চাকরি জোগাড় করা আপনার পক্ষে শক্ত। কিন্তু আপনি তো ভাল টাইপ করতে পারতেন, স্যার! এক কাজ করুন—হাইকোর্টের কাছে অনেকে ফুটপাথে বসে টাইপ করে, নিশ্চয় দেখেছেন। দলিল দস্তাবেজ কপি করে। স্বাধীন ব্যবস্থা। চাকরি খোয়াবার ভয় নেই। এই সঙ্গে একটি টাইপ-রাইটার, কাগজ আর কার্বন পাঠিয়ে দিলাম। আবার আপনি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ান। এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার নামটা উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। যদি আমার নাম ভুলে গিয়ে থাকেন তবে ভুলেই থাকুন। মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। ইতি আপনার অযোগ্য সেই ছাত্র।" বুঝলি দাশু! চিঠি পড়া শেষ করে তাকিয়ে দেখি যে-লোকটা যন্ত্রটা নামিয়ে রেখেছে সে ইতিমধ্যে হাওয়া?...ছেলেটার মনটা ভাল ছিল, তাই না? ওর গলা টিপে ধরাটা আমার উচিত হয়নি।

ডাক্তারবাবু এবার প্রসঙ্গান্তরে চলে আসেন। দেওয়ালের একটা হুকের দিকে আঙুল তুলে বলেন, ওখানে একটা ছবি ছিল না, মাস্টারমশাই?

শিবাজীপ্রতাপ অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ, হুক আছে, ফ্রেমের অবস্থিতিজনিত কারণে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ঐ জায়গাটার একটা বর্ণপার্থক্যও নজরে পড়ে। দীর্ঘসময় সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, ঠিকই বলেছিস! ওখানে অনেকদিন ধরে একটা ছবি টাঙানো ছিল। কার ছবি বলতো?

দাশরথী স্বীকার করলেন না। বলেন, না, এমনিতেই মনে হল। দেওয়ালে কেমন একটা চৌকো দাগ হয়েছে না? অনেকদিন কোন ছবি টাঙানো থাকলেই সচরাচর এমন দাগ হয়।

—য়ু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট মাই বয়! আশ্চর্য! কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! অথচ এঘরে আমিই তো থাকি! আমার মনে পড়া উচিত! কার ছবি হতে পারে?

দাশরথী বুঝতে পারেন, 'হত্যা' মানে মুছে ফেলা। ছুরিটি গেঁথেই ওঁর মানসিক প্রতিশোধ নেওযা হয়ে গেছে। তাই স্মৃতি থেকে ঐ অপ্রিয় লোকটার ছবিও মুছে ফেলেছেন। এককালে যেমন অঙ্ক কষা হয়ে গেলে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে ফেলতেন।

তাই আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, বাবা অমুক ব্রহ্মচাবীর কি?

—হতে পারে! আই ডোন্ট রিমেম্বার! তবে ভালই হয়েছে, ছবিটা খোয়া গেছে। লোকটা ভাল ছিল না, বুঝলি দাশু? পরশু কাগজে কী লিখেছে দেখেছিস্?

—না! কী?

আশ্চর্য! সংবাদপত্রে যেটুকু বার হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিযে গেলেন বৃদ্ধ। শুধু সেই বিধবাব নামটুকুই নয়, সাল-তারিখ, বিধবাব সম্পত্তির আর্থিক মূল্য—সব কিছু!

সে-রাত্রে প্রমীলা স্বামীকে বললেন, তুমি অন্য কিছু ব্যবস্থা কর বাপু! আমার ভয় কবে! এ কেমন জাতের পাগল?

ডক্টর দে বলেন, কেমন জাতের পাগল তা তোমাকে কী কবে বোঝাই বল? মস্তিষ্কেব যে-অংশটা স্মৃতিকে ধরে রাখে তার কয়েকটা স্নায়ু জট পাকিয়ে গেছে ওঁর! আব উনি একটা মনগড়া দুনিয়া গড়তে চান—এ দুনিয়ার কোন কোন বস্তু বা প্রাণীব উপব প্রচণ্ড বিদ্বেষে ..

—ও সব বড় বড কথা থাক। আজ যে কাণ্ডটা হল, এর পব ওঁকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। কোন দিন হযত ছুরি নিয়ে মৌকেই...

দাশরথী কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে একটি সিগারেট ধরালেন। মাস্টাবমশাইকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। হারানো বাপের মতোই। কিন্তু প্রমীলা যে কথা বলছে সেটাও ভাববার। মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে যে ধরনের আচরণ করেন তা সুস্থ মানুষের নয়। তাকে রীতিমতো 'পাগলামী' বলা চলে। উনি নিজে ডাক্তারমানুষ। যখন বাইরে যান তখন মৌ আর প্রমীলা এ বাড়িতে অরক্ষিত থাকে। স্বজ্ঞানে না হোক 'অজ্ঞান' অবস্থায় যদি মাস্টারমশাই—

ছয়

পুলিস কর্তৃপক্ষ তবু সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। সমস্ত খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার স্বপক্ষে প্রায় সকলেই ভোট দিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ডক্টর ব্যানার্জি। তাঁর মতে A B C—না এখন ওর নামB.C.D.—লোকটা 'নটোরিটিই' চাইছে। কাগজে সব কিছু ছাপা হলে তার হত্যালিপ্সা আরও বেড়ে যাবে। আরও আত্মপ্রচার চাইবে। আরও খুন করবে।

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, ওর 'ইগো' যদি স্ফীত হয়, তাহলেই ওর সতর্কতা কমে যাবে। ও ভাববে—বাসু-সাহেব আর পুলিস তার বুদ্ধির তুলনায় কিছুই নয়। ও ভুল করবে!

মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর পলাশ মিত্র বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলে—তা আদৌ হবে না। ওর হত্যালিপ্সাটাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতাটা হ্রাস পাবে না। আপনারা বারে বারে বলছেন, ওর মনের দুটো অংশ আছে—'ডুয়েল পার্সোনালিটি'। একটা অংশে 'মেগ্যালোম্যানিয়া'—'হাম্বডাই ভাব'! সে অংশটা ওকে বলছে: তুমি একজন দুর্লভ প্রতিভা! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপবাধী! পি. কে. বাসু বা পুলিস বিভাগ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় অংশটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক'—সে হত্যাবিলাসী। জ্যাক দ্য রীপারের মতো মার্ডারার, স্টোনম্যানের মতো। জন দ্য কীলারের মতো। কিন্তু আমার মতে তার মনের ভিতর আরও দুটি সত্তা আছে!

—আরও দুটি?

—হ্যাঁ। তিন-নম্বর—সে শিশুর মতো সরল। কৌতুকপ্রিয়, শিশু-সাহিত্য পাঠে তার আগ্রহ, লুকোচুরি খেলায়, ধাঁধা সল্‌ভ করায়, লেগ-পুলিং করায়। ওর মস্তিষ্কের সে অংশটা পরিণত হয়নি। বাচ্চাদের দলে ভিড়ে সে আজও খেল্‌তে চায়: ও কুমির তোর জল্‌কে নেমেছি! আর চতুর্থ দিক:

লোকটা অঙ্ক কষতে ভালবাসে। থিওরি অব নাম্বার্স, তার প্রিয়। হয় অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডার। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আঙ্কিক ছকে বাঁধা!

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, যেহেতু ওর টাইপ-করা কাগজের পিছনে সর্বদা অঙ্কই থাকে?

—শুধু সে জন্য নয়। আপনার থার্ড লেটারটা দিন তোবাসু-সাহেব?

বাসু-সাহেব ওঁর সকালে পাওয়া তিন নম্বর চিঠিখানা মেলে ধরলেন।

ডক্টর মিত্র তিনখানি চিঠি পাশাপাশি রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, তিনখানি চিঠি যদিও দশ-পনের দিন আগে-পরে টাইপ করা কিন্তু একটা আঙ্কিক যোগাযোগ আছে। যেন একটা ম্যাথমেটিক্যাল সিরিজ! তিন নম্বর চিঠিখানা দেখুন প্রথমে!

সকলে ঝুঁকে পড়েন।

তিন নম্বর চিঠি, যেখানি প্রাপ্তিমাত্র বাসু-সাহেব ছুটে এসেছেন, তার আকৃতি ও বয়ান একই রকম। খাম, কাগজ, টাইপ-রাইটারের সেই ছোট হাতের t' অক্ষরটার একইভাবে লাইন ছাড়া। এবারেও উপরে একটি—একরঙা ছবি। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা। চিঠিটা এই রকম
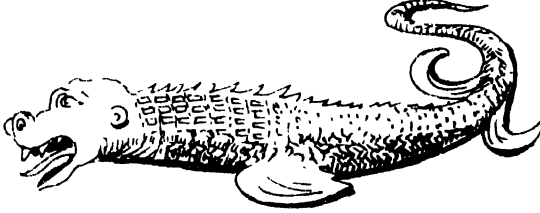
C'-FOR CHILLANOSARAUSAIH NAMAH!

শ্রীযুক্ত পি কে বাসু বার-অ্যাট-লয়েষু,

"...আমরা মনে করিলাম যে, এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ দিন গেল, দশ দিন গেল, কেবল চীৎকারই চলতে লাগল, খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না ।"

কী দুঃখের কথা!

ধেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে যদি নদীর দিকে চলে যেতে রাজী থাকে তাহলে সংবাদপত্রে পার্সোনাল কলমে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অযথা বাকি চতুর্বিংশতিটি হতভাগ্য সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারে।

অধীর আগ্রহে কাগজের পার্সনাল কলম লক্ষ্য করব। ধেড়ে জন্তুটা হার মানল কি?

'C' FOR CHANDANNAGAR তাং: নভেম্বরের সাতই। ইতি

গুণসন্দিগ্ধ
C.D.E.

ডক্টর মিত্র বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, দশ-পনের দিন আগে-পিছে টাইপ করা চিঠিগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আঙ্কিক নিয়মে। প্রথম চিঠির সম্বোধন 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু'; দ্বিতীয়টাতে 'শ্রীল' বাদ গেছে, তৃতীয়টিতে 'বাবু' পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, সৌজন্যবোধ তিল-তিল করে কমছে। ওদিকে পত্রশেষেও 'একান্ত গুণমুগ্ধ,' দ্বিতীয়ে 'একান্ত' পরিত্যক্ত, তৃতীয়তে একটি নূতন শব্দ 'গুণসন্দিগ্ধ'। নিজের নামটাও একটা ম্যাথমেটিকালি প্রগ্রেশানে এগিয়ে চলেছে—A.B.C.; B.C.D.; এবারে C.D.E.! লোকটা অঙ্কের মাস্টার হলে আমি বিস্মিত হব না।

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, দশ-পনেব দিন আগে-পিছে টাইপ করলেও ওর কাছে তো আগেকার চিঠির অফিস-কপি থাকতে পারে?

—পারে? আমার সন্দেহ হয়। ফাইল করে যে অফিস-কপি সাজিয়ে রাখে, সে না পাগল, না ক্রিমিনাল! আমার মতে লোকটা আদৌ কোনও কপি রাখেনি। যাতে তার বাড়ি সার্চ করে আপনারা নিশ্চিত প্রমাণ না পেতে পারেন। আমার তো ধারণা, চিঠিগুলো একই টাইপ-রাইটারে টাইপ করাও নয়। অতি সযত্নে দু-তিনটি টাইপ-রাইটারে 't' অক্ষরটাকে ঐ ভাবে উঠিয়ে ছাপানো হয়েছে।

ডক্টর ব্যানার্জি প্রতিবাদ করেন, না! আমার দৃঢ় ধারণা সব চিঠি একই যন্ত্রে ছাপা। অর্থাৎ 'A' FOR ASANSOL, 7th inst', 'B for BURDWAN, 27th inst' এবং 'C for CHANDANNAGAR, 7th Nov'—এই অংশগুলির টাইপ ভিন্ন যন্ত্রের।

—আপনি বলতে চান, ঐ রকম একটা ধূর্ত ক্রিমিনাল এ ধরনের একটা টাইপ-রাইটার নিজের হেপাজতে রাখবে? বাড়ি সার্চ হলে যা হবে একটা জোরালো এভিডেন্স?

—তা কী করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? হয়তো যন্ত্রটা রাখা আছে অন্যত্র। যেখানে গিয়ে নির্জনে বসে টাইপ করার সুযোগ তার আছে।

বাসু-সাহেব বলেন, আমার প্রশ্ন: খবরটা কি কাগজে ছাপিয়ে দেবেন? দিলে আজই ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ সময়ের ব্যবধান এবার মাত্র দু-দিন।

আই· জি· ক্রাইম বলেন, সেটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। পোস্টাল জোনটা ভুল টাইপ করায় চিঠিখানা অহেতুক ডেলিভারি হতে দেরি হয়েছে।

নিউ আলিপুরের 700053-র বদলে খামে অসাবধানে ছাপা হয়েছে 700035। ফলে খামের উপর পোস্টাল ছাপটা উনত্রিশে অক্টোবরের হওয়া সত্ত্বেও চিঠিখানি বাসু-সাহেবের হস্তগত হয়েছে মাত্র আজই সকালে—অর্থাৎ নভেম্বরের পাঁচ তারিখে। আলমবাজার পোস্টঅফিস থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়ে।

এস· এস· বার্ডওয়ান রেঞ্জ বলেন, দু দিনই যথেষ্ট; আমার ব্যাটেলিয়ান রেডি। আজই খবরটা আমরা প্রেস-এ দিচ্ছি। তিনখানি চিঠির ব্লক সমেত সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যেকটি নামী দৈনিক পত্রিকায় সরকারী প্রেস-নোট হিসাবে ছাপা হয়ে যাবে। এ ছাড়া সরকারী বিজ্ঞাপনও থাকবে। চন্দননগরে প্রতিটি মানুষ—অন্তত 'সি' অক্ষর দিয়ে যার নাম বা উপাধি সে সতর্ক থাকবে। ঐ একটি দিন—সাতই নভেম্বর।

বাসু বলেন, তারিখটা সাতই, কিন্তু তিথিটা স্মরণ আছে আপনার?

—তিথি? মানে?

শুক্লা অষ্টমী। চন্দননগরে ঐদিন জগদ্ধাত্রী পূজা! প্রায় লাখখানেক বহিরাগত ওখানে আসবে। সেটা ভেবে দেখেছেন?

আই· জি· ক্রাইম সাহেব শুধু বললেন, মাই গড!

বাসু বললেন, আমার কিন্তু ধারণা পোস্টাল-জোন নাম্বারটা সজ্ঞানকৃতভাবে ভুল ছাপা। যাতে চিঠিটা ডেলিভারি হতে দেরী হয়।

ইন্সপেক্টার বরাট মুচকি হেসে বললেন, এটা কিন্তু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'বিলো-দ্য-বেল্ট' হিট্ করা হচ্ছে বাসু-সাহেব। প্রতিবারই সে পাঁচ-সাতদিন সময় আমাদের দিয়েছে। ঠিকানার ভুলটা স্বজ্ঞানকৃত নয়!

বাসু কোনও অফেন্স নিলেন না। বললেন, কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছে আমরা ক্রমশঃ সতর্ক হয়ে উঠছি। আশঙ্কা করেছে, এবার হয়তো আমরা ব্যাপারটা কাগজে ছাপিয়ে দেব। সে জন্যই সে ঐ বিশেষ দিনটি বেছে নিয়েছে। কারণ সে জানে, ঐ দিন 'সি' নামের অসংখ্য যাত্রী একবেলার জন্য চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে যাবে। আর হয়তো চিঠিখানা আমরা পাব ঐ সাত তারিখেই!

কিন্তু বহিরাগত যাত্রীর মধ্যে কার নাম অথবা উপাধি 'সি'-অক্ষর দিয়ে তা সে কেমন করে জানবে?

—তা কেমন করে বলব? বনানী ব্যানার্জি যে ঐ ট্রেনে বর্ধমানে যাবে সেটাই বা সে কেমন করে জানল? বনানী তো সারাদিন বর্ধমানে ছিল না!

আই· জি· বললেন, যেমন করেই হ'ক—চন্দননগরেই যেন এই বীভৎস নাটকের যবনিকাপাত হয়!

বরাট বললেন,—আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না স্যার।

স্থির হল, ভোর চারটে চব্বিশের ফাস্ট টু হান্ড্রেড ওয়ান আপ লোকালে শতখানেক প্লেন-ড্রেস পুলিস চন্দননগর যাবে। বিভিন্ন গ্রুপে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে সারা শহরে। নামী খবরের কাগজে পর পর দুদিনই সাবধানবাণীটা ছাপা হবে। ছয় ও সাত তারিখে।

পরদিন সকাল। অর্থাৎ ছয় তারিখ। বেলা নটা নাগাদ। বিডন স্ট্রীট বাড়ির চিলে-কোঠার ঘর। ভিতর থেকে ঘরটা ছিটকিনি বন্ধ। চৌকি এবং টেবিল দুটিই স্থানচ্যুত। চৌকির উপর বিছানো আছে সেদিনের সংবাদপত্র। আর গৃহস্বামী চতুষ্পদের ভঙ্গিতে সারা ঘরটা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রায় মিনিটপনের হামা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো মানুষ, মাজাটা ধরে গেছে। একটু আড়মোড়া ভাঙলেন, তারপর আবার তুলে নিলেন খবরের কাগজটা।

যা খুঁজছিলেন এতক্ষণ ধরে, তা পাননি। একটা পেনসিল-কাটা ছুরি আর পেন্‌সিলটা!

অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে চিন্তা করলেন। সিদ্ধান্তে এলেন—ছুরিটা নিশ্চয় বৌমা অথবা দাশু সরিয়ে নিয়েছে। পাছে তিনি আবার হাত কেটে ফেলেন। এ সিদ্ধান্তের পিছনে দুটি যুক্তি। এক নম্বর, ওঁর টেবিলের উপর রাখা আছে একটা পেনসিল-কাটা কল। যেগুলোয় হাত কাটে না, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পেন্‌সিল-কাটা যায়। নিঃসন্দেহে দাশু রেখে গেছে। দু নম্বর, ওঁর দাড়ি কামানোর সরঞ্জামটি অন্তর্হিত। খোঁজ করেছিলেন সেটার বিষয়ে। দাশু বলেছিলেন, 'আপনি এবার থেকে দাড়ি রাখুন স্যার। বেশ খোলতাই অধ্যাপক-অধ্যাপক দেখাবে।' উনি হেসে জবাবে বলেছিলেন, 'দূর পাগল! দাড়ি রাখলেই কি থার্ড-মাস্টার কলেজের অধ্যাপক হয়?'

কিন্তু বুঝতে পেরেছেন—শেভিং সেটটা ওরা ইচ্ছে করেই সরিয়ে নিয়ে গেছে। সেফটি রেজার নয়, উনি বরাবর ক্ষুর দিয়ে কামাতেন।

তা সে যাই হোক—পেন্‌সিলটা গেল কোথায়?

গভীরভাবে চিন্তা করেও মনে করতে পারলেন না, ওঁর এই চিলে-কোঠার ঘরে কোন পেন্সিল কোন কালে ছিল কি না। কাগজপত্র সব উল্টে-পাল্টে দেখলেন—না! পেন্সিলের লেখা তো কোথাও নেই! সব কলম অথবা ডট্ পেন! তাহলে 'কী' ছুলতে গিয়ে অমন মারাত্মকভাবে হাতটা কাটল সেদিন? তবে কি···

ওঁর ডায়েরিটা বার করে আনলেন। খবরের কাগজের সংবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বৃদ্ধ যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ওঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে। বিচিত্র কোয়েন্সিডেন্স! কাকতালীয় ঘটনা! পর পর দু বার? প্রব্যাবিলিটির অঙ্কটা কীভাবে কষতে হবে?

ডায়েরিতে লেখা আছে: উনিশে অক্টোবর রাতে উনি ছিলেন আসানসোলের একটি হোটেলে। সাতাশে বর্ধমানে যান, ফেরেন আঠাশে! রাত্রে কোথায় ছিলেন? ডায়েরিতে লেখা নেই। রাত দুটোর সময়? ডায়েরি নীরব। সাতাশে কোন ট্রেনে বর্ধমান যান? ডায়েরি নিরুত্তর!

তবে কি...?

অসম্ভব! এ হতে পারে না! তিনি ফার্স্টক্লাস টিকিট কাটবেন কেন? কিন্তু টিকিট ছাড়াই যদি তিনি ঐ কামরায় উঠে থাকেন? একটি অরক্ষিতা মেয়ে...নীল সিল্কের শাড়ি পরা...নীল ব্লাউজ...রেলকামরায় আর কেউ নেই...আবছা-আবছা মনে পড়ছে না?...

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন দশটা আঙুল নিজের অজান্তেই কখন বিস্তারিত হয়ে গেছে। একি? একি! তিনি ওঁর মাথার বালিশটার গলা টিপে ধরেছেন।

নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে ওঠেন বৃদ্ধ।

নিজের কণ্ঠস্বরেই •••

তৎক্ষণাৎ সম্বিত ফিরে আসে।

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ!

বৃদ্ধ দ্রুত হাতে খাট আর টেবিলটাকে স্বস্থানে সরিয়ে দিলেন। খবরের কাগজটাকে বিছানার তলায় চাপা দিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার ছিটকিনি খুলে দিতে।

—কী হয়েছে স্যার? চীৎকার করে উঠলেন কেন?—চৌকাঠের ও প্রান্তে সস্ত্রীক দাশরথী।

—আমি? কই না তো!—দীর্ঘ-দীর্ঘদিন বাদে সজ্ঞানে অনৃতভাষণ করলেন হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলের প্রাক্তন থার্ড মাস্টার।

দাশরথী বললেন, আশ্চর্য! আমি যে স্পষ্ট শুনলাম।

—তা হবে। পাগল মানুষ তো!

দাশরথীর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রমীলা। মাস্টারমশাই বললেন, বৌমা বর্ধমানে যেদিন গেলাম—ও মাসের সাতাশ তারিখে—সেদিন আমি কি সকালের ট্রেনে গেছিলাম, না রাতের ট্রেনে?

প্রমীলা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন বলুন তো?

—ডায়েরিতে লিখে রাখতে ভুলেছি।

একটু মনে করে প্রমীলা বললেন, বর্ধমানে তো? সকালে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে বলে গেলেন বর্ধমান যাচ্ছি, মনে নেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।—আসলে কিন্তু কিছুই মনে পড়েনি ওঁর।

ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক নেমে গেলে উনি একটু চিন্তা করলেন। অঙ্কের মাস্টার।পাঁচ মিনিটেই সলভ হয়ে গেল অঙ্কটা। ডানহাতের তালুটাই কেটেছে। আঙুলগুলো অক্ষত। লিখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ডায়েরির সেদিনের পাতাখানা খুললেন। ছয়ই নভেম্বর। দেখলেন, লেখা আছে: "চন্দননগর—ঘড়িঘর থেকে গঙ্গাঘাট, বাঁ-হাতি প্রত্যেকটি দোকান ও বাড়ি" ওঁর নিজেরই হাতের লেখা। কবে লিখেছিলেন সে-কথা মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে মহারাজের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র এটা লিখেছিলেন ডায়েরিতে। পাতা উল্টে দেখলেন, সাতই নভেম্বরের পাতায় লেখা আছে মহারাজের নির্দেশ: ডুপ্লে কলেজ থেকে ফটকগোড়া—বাঁ-হাতি সব দোকান ও বাড়ি। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন।"

উনি ডায়েরির ছয় তারিখের পাতায় এখন লিখলেন—"সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পেন্সিল খুঁজিলাম। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখ সকলের ট্রেনে বর্ধমান গিয়াছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: স্টেশান অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। উদ্দেশ্য—এগারোটা দশের গাড়িতে চন্দননগর রওনা হওয়া। বাসযোগে হাওড়া যাইব।"

ডায়েরিটা বন্ধ করে এবার আলমারিটা খুললেন। বেছে বেছে খান দশ-বারো বই ব্যাগে ভরে নিলেন।

সবই ধর্মপুস্তক। এখনো অনেক বইয়ের প্যাকেট খোলাই হয়নি। উপায় কী? লোকে যে ধর্মপুস্তক কিনতেই চায় না। শিবাজীপ্রতাপ এজন্য বিব্রত। মহারাজ যদি বিক্রীত বইয়ের উপর কমিশন দিতেন তাহলে সঙ্কোচেব কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি মনি-অর্ডারে ওঁকে মাস-মাহিনা দেন—বিক্রি হোক আর না হোক! নিঃসন্দেহে মহাবাজ ওঁকে তির্যকপন্থায় অর্থ সাহায্য করতেই এ ব্যবস্থা কবেছেন। ভাবখানা: ভিক্ষা নয়, উনি উপার্জন করছেন। উপায় কী?

টাইম টেবলটা দেখলেন। এগাবোটা দশেব লোকালখানা ধরতে চেষ্টা করবেন। নিশ্চয়ই সেটা ধবা যাবে। কিন্তু প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর ডায়েরিতে উনি লিখে যাবেন—সময় উল্লেখ করে—কখন, কোথায় উনি কী করছেন! স্মৃতির উপব আব ভবসা রাখতে পারছেন না। উনি দেখতে চান—আগামীকাল চন্দননগরে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, যদি ইংরাজী 'C' অক্ষবযুক্ত নামের কোনও হতভাগ্য—আহ! সেকথা ভাবাও যায না। না যাক! উনি দেখতে পান, দুর্ঘটনার মুহূর্তে উনি কোথায়, কী করছিলেন। স্মৃতিনির্ভর সিদ্ধান্ত নয়—ডায়েবি কী বলে!

কুঁজো থেকে গডিয়ে এক গ্লাস জল খেলেন। ক্যাম্বিসের জুতোর ফিতে বাঁধলেন। তারপর বইয়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে এবং ডায়েরিখানা ভুলে টেবিলেব উপব ফেলে রেখে অঙ্কেব মাস্টারমশাই ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করেন।

একতলার ডাক্তারখানায় ওঁকে আটকালেন ডাক্তারবাবু। বললেন, আজ আর নাই গেলেন স্যাব? আপনার শবীর এখনো দুর্বল!

—না, না! আমার শবীরটা ভালই আছে। বৌমাকে বলে দিও, কাল সন্ধ্যায় ফিরব।

—কোথায় চলেছেন আজ?

—শ্রীরামপুব।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা!

মুখ ফস্‌কে? না কি পাকা-ক্রিমিনালের মতো?—মনে মনে ভাবলেন অঙ্কের প্রাক্তন থার্ড মাস্টারটি! মুখটা বেদনার্দ্র হয়ে ওঠে। এ কী হোল তাঁব? এত মিথ্যে কথা কী ভাবে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে? জিহ্বা যেন ওঁর শাসন মানছে না! আশ্চর্য! উনি কি নিজের অজান্তেই তিল তিল করে বদলে যাচ্ছেন? নির্বিরোধী গণিতশিক্ষক থেকে একটা পাকা ক্রিমিনালে রূপান্তরিত হচ্ছেন? ডোরিয়ান গ্রে-র ছবিখানার মতো?

ডাক্তারবাবু বললেন, শ্রীরামপুর? চন্দননগর নয় তো?

যেন ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়েছেন বৃদ্ধ। তাঁর আপাদমস্তক একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। দরজায় চৌকাঠখানা ধবে সামলে নিলেন নিজেকে। আমতা আমতা করে বলেন, চ-ন্দ-ন-ন-গ-র! ও...ও-কথা বললে কেন হঠাৎ?

ওঁর ভাবান্তরটুকু ডাক্তারবাবুর নজর হয়নি। তিনি সিরিঞ্জ হাতে রুগীর বাহুমূলটা ধরে ইন্‌জেকশান দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, এক নম্বব: আজ সেখানে প্রচণ্ড ভীড়—কাল জগদ্ধাত্রী পূজা। দু-নম্বর: আজ খবরের কাগজ দেখেননি?

বৃদ্ধ জবাব দিতে পারলেন না। গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠা-নামা করল। ঢোক গিললেন।

যাকে ইন্‌জেকশান দেওয়া হচ্ছিল সেই রোগীটি বলল, সাংঘাতিক খবর মশাই। বিশ্বাস হয়? খুনিটা নাকি দেখতে নিতান্ত সাধারণ—আপনার-আমার মতো।

বৃদ্ধ নতনেত্রে নেমে পড়েন পথে। বিনা বাক্যব্যয়ে।

সামনেই একটা পান বিড়ির দোকান। আয়নাটায় দেখতে পেলেন নিজ প্রতিবিম্ব। নিতান্ত সাধারণ! আপনার-আমার মতো!

ছয় তারিখ রাত আটটা। নৈশাহারে বসেছেন বাসু-সাহেব। সপরিবারে। সচরাচর ওঁরা ডিনারে বসেন রাত সাড়ে নয়টায়।আজ দেড়ঘণ্টা আগে। কারণ আগামীকাল ভোর পাঁচটার মধ্যে উনি গাড়ি নিয়ে চন্দননগর যাবেন। ওঁরা তিনজন। রানী দেবী বাদে। ফলে রাত চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে উঠতে হবে। গাড়িতে পেট্রল ভরা আছে। সঙ্গে যা যাবে সবই গাড়িতে তোলা হয়েছে। শুধুমাত্র বাসু-সাহেবের রিভলভারটা ছাড়া।

কৌশিক বললে, তৃতীয় চিঠিখানার ঐ লাইনটা রোমান হরফে বাঙলায় কেন টাইপ করা হল এটা আমি বুঝতে পারিনি। ঐ যে"Āmrā mone karilām je, aibār Bechārāke khābe bujhi"...ইত্যাদি। ওটার ইংরেজী অনুবাদ করা হল না কেন?

বাসু-সাহেব বললেন, জবাব দেবার আগে একটা প্রতিপ্রশ্ন করি: 'ব্যাচাবাথেরিয়াম' আর 'চিল্লানোসরাস্' জন্তু দুটোকে চেন?

কৌশিক বলে, না; জুরাসিক পিরিয়ডের নয়, এটুকুই শুধু বলতে পারি।

—কেমন করে জানলে?

—'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা' আর 'জুওলজিক্যাল ডিক্সনারি' ঘেঁটে।

—হুঁ! তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন? অথবা রানুকে?

কৌশিক নীরব। বাসু-সাহেবই আবার বলেন, সঙ্কোচে?

কৌশিক আম্‌তা আম্‌তা করে, না, মানে ভেবেছিলাম কাল্পনিক কোনও জীব।

—বটেই তো! কিন্তু কল্পনাটা কার? ...জান না! সুকুমার রায়ের নাম শুনেছ? শোননি! না শোনাই স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি সিনেমা করতেন না! অন্তত সত্যজিৎ রায়ের নামটা শুনেছ? ঐ যে, যে ভদ্রলোক 'পাঁচালীর পথে' না কী যেন একখানা পিক্‌চার তুলেছেন? বিভূতি মুখুজ্জে না বলাইচাঁদ বাঁড়ুজ্জে কার যেন লেখা বইটা। শোননি?

রানীদেবী হাসতে হাসতে বলেন, এতে কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে তুমি ঐ লোকটার চিঠি পেয়ে দারুণ ক্ষেপে গেছ! এতটা মেজাজ খারাপ তো সচরাচর কর না তুমি?

তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে রানী দেবী বললেন, ওটা সুকুমার রায়ের লেখা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' থেকে একটা উদ্ধৃতি। নিছক হাসির গল্প। অবশ্য এখন দেখছি 'নিছক হাসির' নয়, ও গল্পটা পড়ে কেউ কেউ ক্ষেপেও যায়!

আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।

বাসু-সাহেব নির্বাক আহারে মন দিলেন।
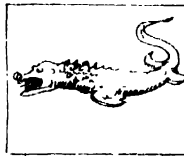
সাত

সাত তারিখ।

গাড়িটা যখন চন্দননগর থানা-কম্পাউন্ডে প্রবেশ করল তখন সকাল ছটা সাতচল্লিশ।

বাসু-সাহেবের নজরে পড়ল—থানা-কম্পাউন্ডে বসে আছেন কয়েকজন: ইন্সপেক্টার বরাট, রবি বোস, আর চন্দননগর থানার ও. সি. দীপক মাইতি। গাড়িটা পার্ক করে উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওঁর পিছন-পিছন কৌশিক আর সুজাতা। কেউ ওঁদের স্বাগত জানালেন না।

সুপ্রভাতও নয়! কেমন একটা খট্‌কা লাগল বাসু-সাহেবের। যেন ওঁরা সবাই কী একটা শোকবার্তা শুনে একমিনিট নীরবতা পালন করছেন।

বাসু সবিস্ময়ে বলেন, কী ব্যাপার? সবাই সাতসকালেই এমন চুপচাপ?

দীপক বিহ্বলভাবে উঠে দাঁড়ায়। রবি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। ইন্সপেক্টর বরাট বলে ওঠেন, উই আর এক্সট্রিমলি সরি বাসু-সাহেব! দ্য ড্রামা ইজ ওভার! নাটকের শেষ যবনিকা পড়ে গেছে।

বাসু নিজের অজান্তেই বসে পড়েন। অস্ফুটে বলেন, মানে?

—বাংলা মতে অবশ্য ছয় তারিখ—যেহেতু সূর্যোদয় হয়নি—কিন্তু ইংরেজী মতে 'সি. ডি. ই.' তার কথা রেখেছে। সাতই সকাল সাড়ে পাঁচটায়!

—কে? কোথায়? কখন খবর পেলেন?

—খবর পেয়েছি মিনিটপাঁচেক আগে। টেলিফোনে। ডেড-বডি এখনো সেখানেই পড়ে আছে। আমরা যাচ্ছিলাম। আসুন, আপনি বরং নিজের গাড়িটাই নিন।

দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল দুখানি জীপ। থানার সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে জনা-দশেক পুলিস—য়ুনিফর্মে এবং ছদ্মবেশে। কে কোথায় পাহারা দেবে সব নির্দেশ এখনো পায়নি ঐ কজন। দীপকের ইঙ্গিতে তাদের কয়েকজন উঠে বসল জীপের পিছনে।

মটোরকেডটা প্রায় গোটা চন্দননগর শহরটা পাড়ি দিল। গঙ্গার কাছাকাছি একটা প্রায়-নির্জন অঞ্চলে এসে থামল। প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা দ্বিতল একটি সাবেকি বাড়ি। সামনে ঢালাই লোহার কারুকার্য করা গেট। বোঝা যায়, এককালে শৌখিন বাগান ছিল বাড়িটা ঘিরে—এখন আগাছায় ভর্তি। দারোয়ান সসম্ভ্রমে স্যালুট করে বললে, ইধার পাধারিয়ে সা'ব!

বাড়িতে ঢুকলেন না ওঁরা। দারোয়ানকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন গঙ্গার দিকে। উঁচু একটা বালিয়াড়ি মতো। হয়তো কোন যুগে গঙ্গার ভাঙন রুখতে কেউ মাটি ফেলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়েছিল। এখন কালকাশুন্দির জঙ্গলে ভরা। সেখানে একটা কংক্রিটের বেঞ্চি পাতা। জায়গাটা এমন যে, রাস্তা থেকেও নজরে পড়ে না, গঙ্গার দিক থেকেও নয়। সেই কংক্রিটের বেঞ্চির ঠিক সামনে পড়ে আছে মৃতদেহটা। মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক, বয়স পঞ্চাশের বেশ নিচে। পরনে ফুলপ্যান্ট, পুরোহাতা শার্ট, হাফহাতা সোয়েটার, গলায় মাফলার জড়ানো। পায়ে মোজা ও হান্টিং শ্যু। একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে একটি সুদর্শন হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা শৌখিন ছড়ি। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট: মাথার পিছন দিকটা থেঁতলে গেছে!

বাসু-সাহেব আপন মনে অস্ফুটে বললেন, আসানসোল!

সুজাতা সবিস্ময়ে একবার তাঁর দিকে তাকালো। কৌশিক কানে কানে তাকে বলল, অর্থাৎ সেই প্রথম পদ্ধতিটা। আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে কোন হাতুড়ি নিয়ে এসেছিল লোকটা।

পুলিস ফটোগ্রাফার চার-পাঁচটা ফটো নিল। স্ট্রেচার নিয়ে যারা অপেক্ষা করছিল তারা বলল, অব্ উঠাই সা'ব?

—জেরা সে ঠাহ্‌র যাও!—বললেন ইন্সপেক্টর বরাট। মৃতব্যক্তির পকেট তল্লাসী করে দেখলেন। লাইফ-টাইম পার্কার কলম, মানিব্যাগ—তাতে শ-দুই টাকা, নোটে ও ভাঙানিতে, রুমাল, নস্যির ডিবে, একটা নোট বই। লিস্ট বানানো হল। দুজন সাক্ষীর সই নিয়ে ইনকোয়েস্টও করা হল। বাঁ-হাতের ঘড়িটা ভাঙেনি—সেটা টেরও পায়নি যে, তার মালিকের হৃদস্পন্দন থেমে গেছে। ঠিকই সময় দিচ্ছে ঘড়িটা: টিক্‌টিক্—টিক্‌টিক্!

বাসু বরাটকে বললেন, কে উনি? কী নাম?

—ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব্ চন্দননগর!

—ডক্টর? মেডিক্যাল প্র্যাক্‌টিশনার?

—না। ডকটরেট। বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।

দারোয়ান পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা খুলে ওঁদের বসতে দিল। গৃহবাসী কেউই এগিয়ে এলেন না ভিতর থেকে। বোধহয় সকলেই শোক-বিহ্বল। মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে অপেক্ষা করে বাসু-সাহেব প্রশ্নটা না করে পারলেন না, আর কে কে আছেন বাড়িতে? আই মীন...

জবাব দিল থানা-অফিসার দীপক মাইতি, আছেন ওঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী। আর আছেন ডক্টর চ্যাটার্জির শ্যালক মিস্টার বিকাশ মুখার্জি। কিন্তু তিনি গতকাল বিকালে কলকাতা গেছেন। আজ সকালেই ফেরার কথা। এনি মোমেন্ট এসে পড়বেন।

—আর কেউ নেই? যার কাছে কিছু জানতে পারি? অন্তত দুটো খবর.

—কী স্যার সে-দুটো? আমি ওঁদের বেশ ভালভাবেই চিনি। আই মে হেলপ য়ু।—জানতে চায় দীপক।

—এক নম্বর: ডক্টর চ্যাটার্জি খবরের কাগজ পড়তেন কিনা, আর দু নম্বর তিনি জানতেন কি না যে, তাঁর নাম চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি।

দীপক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, আমি মিস গাঙ্গুলীকে খবর পাঠিয়েছি। উনি বলতে পারবেন...মানে, গতকালকার কাগজটা ডক্টর চ্যাটার্জি দেখেছেন কি না।

—মিস গাঙ্গুলীটি কে?

—ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

—আই সী! ওঁর কারবারটা কী ছিল?

—কোন কারবারই ছিল না স্যার...আমি যতটুকু জানি বলি, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা—

চন্দননগরের এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার এককালে যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বিশিষ্ট বনেদী পরিবার। চন্দ্রচূড়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ফরাসী সরকারের বেনিয়ান। জাহাজে মাল আমদানি রপ্তানি করতেন। জাহাজ যেত শহর কলকাতা পণ্ডিচেরি হয়ে মার্সেলস্ বন্দরে। এক পুরুষে যা সঞ্চয় করেন বাকি চারপুরুষ তা এখনো শেষ করে উঠতে পারেননি। চন্দ্রচূড়ের পিতামহ ছিলেন আবার অন্য জাতের মানুষ। বিখ্যাত চারু রায়ের ছাত্র ছিলেন তিনি—রাসবিহারী, কানাইলাল, শ্রীশ ঘোষদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ যখন চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী চলে যান তখন তাঁর কিছু প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। তাঁর নাতি চন্দ্রচূড় বাঙলায় এম. এ. পাস করে কিছু দিন অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ রিজাইন দিয়ে বাড়ি বসেই একটি গবেষণা করছেন আজ পাঁচ-সাত বছর ধরে। গুটি পাঁচসাত কলেজের ছেলে প্রতিদিন কলেজ ছুটির পর এ বাড়িতে আসে, কী সব রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়। সে সব ব্যাপার দীপক ঠিক জানে না—ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী অনিতা গাঙ্গুলী বলতে পারে।

চন্দ্রচূড় তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। এবং তিনি নিঃসন্তান। স্ত্রীর স্বাস্থ্য কোনকালেই ভাল ছিল না। মাস ছয়েক হল একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। ঠিকে ঝি, চাকর, দারোয়ান সংসারটা চালায়। মহাদেব ড্রাইভার গাড়ি চালায়। চন্দ্রচূড়ের নির্দেশে নয়—তিনি সাতে-পাঁচে নেই—বিকাশের ব্যবস্থাপনায়। সে এ পরিবারে আছে আজ বছর-দশেক। বাইরের দিকটা সেই দেখে, সংসারটা এতদিন দেখতেন রমলা অর্থাৎ মিসেস চ্যাটার্জি—ইদানিং উনি শয্যাশায়ী হবার পর, অনিতা।

বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ সে এল। একটা রিক্‌শা চেপে। ওর সঙ্গে একটি বছর বিশেকের কলেজী ছাত্র। বস্তুত সেই খবর পেয়ে অনিতাদিকে ডেকে এনেছে।

কৌশিকের মনে হল—অনিতার বয়স ত্রিশের কাছে-পিঠে। কিন্তু মেদবর্জিত সুঠাম দেহ। মাজা রঙ, মুখখানি মিষ্টি—কেঁদে কেঁদে এখন চোখ দুটো রক্তিম। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই।

দীপক ওকে চেনে মনে হল। নাম ধরে ডাকল, এস অনিতা। ব'স, এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার কাছে কিছু জানতে চান।

অনিতা বসল না। প্রতিপ্রশ্ন করল, বিকাশদা কই?

—কলকাতায়। এখনো ফেরেননি।

—সে কী! কাল রাত্রেই তো তাঁর ফিরে আসার কথা। দিদিকে বলা হয়েছে? ...আই মীন, মিসেস্ চ্যাটার্জিকে?

এবার জবাব দিল বলাই—গৃহভৃত্য। বললে, না! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন। কিছু জানেন না।

দীপক পুনরায় বলল, তাকে জানানোটা জরুরী নয়। আদৌ জানানো হবে কি না তা ডাক্তার বলবেন। মোট কথা, বিকাশবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে জানানো হবে না। তুমি বস। এঁরা তোমাকে...উনি হচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স বিভাগের মিস্টার বরাট, আর উনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। প্লীজ টেক য়োর সীট।

তবু বসল না অনিতা। তার হাতব্যাগ খুলে একটা নোট বই বার করল। সঙ্গের ছেলেটিকে বললে, বাবলু, এই নম্বরে তুই একটা কল বুক করতো।

—কার নম্বর ওটা?—জানতে চাইল ইন্সপেক্টর দীপক।

—'সুইট হোম' নামের একটা হোটেল। শেয়ালদায়। হ্যারিসন রোড ফ্লাইওভারের কাছে। বিকাশদা সচরাচর কলকাতায় নাইট হল্ট করলে ওখানেই ওঠে। ম্যানেজারের নাম হলধরবাবু।

কৌশিকের খেয়াল হয়নি, কিন্তু সুজাতার মনে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জেগেছে: বিকাশ দেখতে কেমন? বয়স কত? অনিতা যখন কলকাতায় যায় তখন নিশ্চয় প্রয়োজনে 'সুইট হোমে' ওঠে। তার মানে কি ওরা দুজনে যখন...না, তা হতে পারে না। হলধরবাবুও নিশ্চয় চেনেন ওদের।...কোনও ডবল-বেড রুম.. অসম্ভব।

সম্বিৎ ফিরে পেল যখন, তখন নজর পড়ল—ঘরের ওপ্রান্তে বাবলু টেলিফোন ডায়াল করছে, আর অনিতা বসে বসে তার এজাহার দিচ্ছে।

অনিতা বাঙলায় এম. এ.। ডক্টর চ্যাটার্জিকে রিসার্চে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে নটা নাগাদ আসে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি ফটকগোড়া অঞ্চলে। বাবা নেই, মা আছেন, একটি ভাই আছে। সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। কলকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে চাকরি করে। এভাবে বছরপাঁচেক সে কাজ করছে ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনাকে উনি কোনও রিসার্চ অ্যালাওয়েন্স দেন?

—মাহিনাই বলতে পারেন। মাসে পাঁচ শ। তাছাড়া দুপুরে এখানেই খাই। বলাই রান্না করে। বিকালে যারা আসে—মানে, কলেজের ছাত্ররা—ওরা ঘণ্টা-হিসাবে অ্যালাওয়েন্স পায়। আমিই হিসাব রাখি।

—গবেষণাটা কী নিয়ে?

—উনি একটা 'রবীন্দ্র-অভিধান' রচনা করছেন। আমরা স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনবর্ণের 'প' অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছেছি—

বাসু বলেন, 'রবীন্দ্র-অভিধান' মানে?

মিস্টার বরাট ওঁকে বাধা দিয়ে বলেন, মাপ করবেন, বাসু-সাহেব, এ সব অ্যাকাডেমিক আলোচনা আপনি পরে করবেন। আমাকে কয়েকটা জরুরী ব্যাপার জেনে নিতে দিন আগে।

—অল রাইট! য়ু মে প্রসীড!—বাসু পাইপ ধরালেন।

বরাটের প্রশ্নোত্তরে জানা গেল আরও কিছু তথ্য। বিকাশ ব্যাচিলার। পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয় তাকে। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে কলকাতার একটি মেসে থাকত। ওর দিদি শয্যাশায়ী হবার পর থেকে এখন চন্দননগরই ওর হেড কোয়ার্টার্স। তবে সপ্তাহে তিন রাত্রি থাকে কি না সন্দেহ।...হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জি গতকাল খবরের কাগজটা পড়েছিলেন। চন্দননগরে যে আজ একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড হতে পারে—এবং টার্গেট যে 'C' অক্ষরের নামের অধিকারী এ কথা জানতেন। চন্দ্রচূড়ের নাম ও উপাধি দুটোই 'সি' দিয়ে, সুতরাং...

রবি বোস প্রশ্ন করে, বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি প্রাতঃভ্রমণ করতেন। তা আপনি তাঁকে বলেননি আজ সকালে এভাবে একা-একা বার হওয়া তাঁর উচিত হবে না?

—আমি বলিনি। বিকাশদা বলেছিলেন।

—কেন, আপনি বলেননি কেন?

কাল রবিবার ছিল। ছেলেরা কেউই আসেনি। আমারও আসার কথা ছিল না। কিন্তু খবরের কাগজটা পড়ে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এখানে একটা ফোন করি। বিকাশদা ফোন ধরেন। তিনি বলেন, খবরের কাগজ ওঁরাও পড়েছেন। উনি এবং 'স্যার'। যাবতীয় সাবধানতা ওঁরা অবলম্বন করছেন। তবু আমি শান্ত হতে পারিনি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ একটা রিকশা নিয়ে এ-বাড়ি চলে আসি। কারণ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না—ওঁর নাম ও উপাধি দুটোই 'সি' দিয়ে।

এখানে এসে স্যারের দেখা পাইনি। উনি বিকালেও ঘণ্টাখানেক বাগানে অথবা গঙ্গার ধারে পায়চারি করেন। তাই বাড়ি ছিলেন না। তবে বিকাশদা ছিলেন। গাড়ি নিয়ে কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। মহাদেব ড্রাইভারই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। চন্দ্রচূড়ের নিরাপত্তার বিষয়ে কী কী সাবধানতা নেওয়া হয়েছে বিকাশবাবু তা অনিতাকে বিস্তারিত জানালেন। দারোয়ান সতর্ক থাকবে, কোন লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। গেট সমস্ত দিন-রাত তালাবন্ধ থাকবে। কোন অজুহাতেই যেন বাইরের কেউ না ঢোকে। বড়-সাহেবের অনুমতি নিয়ে কেউ যদি নেহাতই বাড়িতে ঢোকে তাহলে দারোয়ান একটা খাতায় তার নাম, ধাম, সময় ও স্বাক্ষর রাখবে। এরপর নাকি অনিতা ওঁকে অনুরোধ করেছিল, 'আজ কলকাতায় নাই বা গেলেন, বিকাশদা?' তার জবাবে উনি বলেছিলেন, 'আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে অনিতা, তবে আজ তো রবিবার ঘোষিত তারিখটা আগামী কাল, সাতই। আমি আজ রাত্রেই যেমন করে হোক ফিরে আসব।

—তারপর?—জানতে চাইলেন বরাটসাহেব।

—তারপর ওঁরা রওনা হয়ে গেলে আমি দারোয়ানের কাছে খাতাখানা দেখতে চাই। দেখি, সে একটি খাতায় নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে নিষ্ঠাভরে 'এন্ট্রি' করেছে। কে আসছে, যাচ্ছে, সব।

—ডক্টর চ্যাটার্জি জানতেন না এসব কথা?

—কেন জানবেন না? খবরের কাগজ তিনিই সবার আগে পড়েন। পড়ে বিকাশবাবুকে ডেকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমার নামটা যে ভয়াবহ তা অ্যাদ্দিন জানতুম না।' উনিই বিকাশবাবুকে এইসব সাবধানতার কথা বলেছিলেন এবং নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, তিনি সাত তারিখে আদৌ বাড়ির বাইরে যাবেন না।

—মিসেস্ চ্যাটার্জি বা বলাইকে কিছু বলেননি আপনি?

—দিদিকে কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না। আর বলাই সে সময় বাড়ি ছিল না।

—আপনি একটু অপেক্ষা করলেন না কেন? উনি ফিরে আসা পর্যন্ত?

—আমার তাড়া ছিল। আমি আরও কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে সাবধান করে দেব স্থির করেছিলাম—আমার বান্ধবী চন্দ্রা চৌধুরী, এক বুড়ি পিসিমা চন্দ্রমুখী চট্টরাজ, আর ঘড়িঘরের কাছে একজন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, চিমনলাল ছাবরিয়া, ওঁর মেয়েকে আমি পড়াই।

এই সময় বাবলু বলে উঠে, সাইলেন্স প্লীজ!

সকলে তার দিকে ফেরে। বাবলু ততক্ষণে টেলিফোনের কথা মুখে বলছে, 'সুইট হোম'? . . .আমি চন্দননগর থেকে বলছি...হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাঙ্ক লাইনে। মিস্টার বিকাশ মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক...ইয়েস্! ওঁর বাড়িতে একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে...হ্যাঁ, হ্যাঁ চন্দননগরেই...ওঁকে একটু...ঠিক আছে, আমি ধরে থাকছি।

এদিকে ঘুরে বলে, ওদের হোটেলে ঘরে ঘরে ফোন নেই। বিকাশদা ঘরে আছে, ডাকতে লোক গেছে।

ইন্সপেক্টার বরাট এক লাফ দিয়ে এগিয়ে যান। বাবলুব হাত থেকে টেলিফোন রিসিভারটা ছিনিয়ে নেন। বললেন, লেট মি স্পীক...

একটু পরে শোনা গেল একতরফা কথোপকথন: বিকাশবাবু?...হ্যাঁ, চন্দননগর থেকেই বলছি। কী ব্যাপার? কাল রাত্রে ফিরলেন না যে?...না, আপনি আমাকে চিনবেন না।...হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, অ্যাক্সিডেন্ট।...না, না, আপনার ভগ্নিপতি ভালই আছেন?...ও তাই নাকি? তাঁর নামও 'C' দিয়ে?...কী? না, আপনাদের বাড়ির কেউ নয়। যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম চিমনলাল ছাবড়িয়া। গঙ্গার ঘাটে!...হেড ইঞ্জুরি।...বিকজ আপনাদের বাড়ির সামনেই, এবং পুলিস আপনাদের চাকর না দারোয়ান কাকে যেন অ্যারেস্ট করেছে।...অনিতা দেবীর কছে শুনলাম এই নম্বরে আপনাকে পেতে পারি, উনিই আপনাকে ফিরে আসতে...ইয়েস্! যত শীঘ্র সম্ভব!

লাইনটা কেটে দিলেন উনি।

অনিতা বলে ওঠে, মানে? অহেতুক মিথ্যা কথা বললেন কেন?

—এতটা পথ ড্রাইভ করে আসবেন। না হয় বাড়ি এসেই দুঃসংবাদটা শুনবেন!

দীপক বলে, ইতিমধ্যে ওঁর স্টাডিরুমটা কি একটু দেখবেন? সেখানে যদি কোনো ক্লু...

বরাট বললেন, তুমি দেখে এসো, আমরা একটু পরে যাচ্ছি।

অনিতা আন্দাজ করে তার অনুপস্থিতিতে ওঁরা কিছু আলোচনা করতে চান। তাই বলে, চলুন, আমি ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছি। তুইও আয় বাব্‌লু।

ওঁরা ভিতরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করতেই রবি বলে, আপনি হঠাৎ বিকাশবাবুকেই সন্দেহ করলেন যে?

বরাট বলেন, কবি বলেছেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—"কী যেন বাসু-সাহেব?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে পাদপূরণ করেন, 'কাল-কেউটে সাপ!'

রবি বললে, কিন্তু এটা তো একটা 'অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল সিরিজে'র থার্ড টার্ম, বিকাশবাবু!

বরাট বলেন, ইয়াং ম্যান! তার গ্যারান্টি কোথায়? 'C.D.E.' হয়তো সন্ধ্যায় বা দুপুরে আর কোন 'সি'কে খুন করবে। এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্ডার কেস! কেন হতে পারে না? এমনকি হতে পারে না যে, চন্দ্রচূড় একটি উইল করে তাঁর সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যেতে চান? তিনি নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। ফলে তাঁর নিকটতম আত্মীয় এবং ওয়ারিশ ঐ C.D.E.-র ঘোষণার সুযোগ নিয়ে—যেহেতু তাঁর ভগ্নিপতির নাম চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি...এই অপকর্মটা করে বসল? এবং তারপর এমনও হতে পারে যে C.D.E. চন্দননগরে এসে শুনল, সাম মিস্টার 'C C C' ফৌত হয়েছেন! সে ব্যাটা কোন উচ্চবাচ্য না করে কেটে পড়ল। আর ঝড়ে মরা কাকটার কেরামতি বুদ্ধিমান ফকিরের মত দাবী করে বসল? সে-ক্ষেত্রে বিকাশকে পুলিস কোনদিনই সন্দেহ করবে না। তোমার ডিডাক্‌শান মতো চন্দ্রচূড় মার্ডারটা চিরটাকাল ক্রিমিনালদের ইতিহাসে লেখা থাকবে অ্যাল্‌ফাবেটিকাল সিরিজের থার্ড টার্ম হিসাবে।

বাসু বলেন, কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট। শুধু তাই বা কেন বরাট সাহেব? সেই 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক্'টাকে যখন আমরা গ্রেপ্তার করব তখনো হয়তো সে স্বীকার করবে না যে, থার্ড মার্ডারটা সে করেনি। কারণ ফাঁসি তো তার একবারই হবে! একটা খুন করুক অথবা তিনটেই। সে তো হত্যার রেকর্ড তৈরি করে ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে নিজের নাম লিখে দিতে চায়।

বরাট উঠে দাঁড়ান। রবির দিকে ফিরে নিজের মাথায় একটা টোকা মেরে বলেন, এখানকার গ্রে-সেলগুলোকে আর একটু সচল রাখ রবিবাবু। ডোণ্ট টেক এভরিথিং অ্যাট দেয়ার ফেসভ্যালু!

বাসু বরাট-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাউ ডিড্ হি টেক দ্য পাঞ্চ? মানে, জামাইবাবুর বদলে ছাবরিয়া খুন হয়েছে শুনে?

—নরম্যাল রিয়্যাক্‌শন! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কৃত্রিম সৌজন্যবশতঃ বলল, কী দুঃখের কথা! কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল—অ্যাক্‌সিডেন্ট শুনেই সে আঁৎকে উঠেছিল। জামাইবাবু ভাল আছেন শুনে জেনুইনলি রিলিভ্‌ড! আসুন, এবার স্টাডিটাকে স্টাডি করি।

—আপনি দেখুন। আমরা একটু পরে আসছি।

বরাট হাসলেন। বলেন, অল রাইট!

একাই এগিয়ে গেলেন তিনি ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডি-রুমের দিকে। বাসু বলেন, রবি, ঐ দারোয়ান বাবাজীবনকে একটু ডাক দিকিন!

দারোয়ান এল। জেরার উত্তরে জানালো যে, গেট রোজ রাত্রেই তালাবন্ধ থাকে। বড়সাহেব ভোরবেলা রোজই বেড়াতে যান, তখন এসে সে গেট খুলে দেয়। আজ সকালে সে গেট খুলতে আসেনি, কারণ ছোটবাবু বলে গিয়েছিলেন যে, বড়াসাব আজ সকালে বেড়াতে যাবেন না। বড়াসাবের নাকি তবিয়ৎ খারাপ। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, বড়াসাব ডুপ্‌লিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে..

—বড়াসাহেবের কাছে যে ডুপ্‌লিকেট চাবি আছে, তা তুমি জানতে?

—জী নেহী সাব!

—বড়াসাহেবের তবিয়ৎ খারাপ, এ কথা তোমাকে কে বলল?

—ছোটাসাব! তবিয়ৎ খারাপ হ্যয় ইয়ে বাৎ নেহী বোলা, লেকিন বোলা থা কি উনহোনে ঘরসে বিলকুল বাহার নেহি যায়েঙ্গে। ইস্‌ লিয়ে ম্যয়নে সোচা...

—তোম্‌নে অখ্‌বরমে যো খবর...

—জী নেহী সাব! আজই শুনা! 'বিশ্বামিত্র'মে বহ্‌ খবর নেহী থা কল!

বাসু-সাহেব ত্বরিৎগতি রবির দিকে ফিরে বলেন, 'বিশ্বামিত্রে' ইন্‌সার্শন দেওয়া হয়নি?

রবি সলজ্জ বললে, ঠিক জানি না স্যার!

—ছি-ছি-ছি! বিশ্বামিত্রে 'ডবল কলম—পাঁচ সেন্টিমিটার' বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচ পড়ে?

রবি চুপ করে ভর্ৎসনা শোনে।

বাসু-সাহেব বারকতক পায়চারি করে ফিরে এসে বললেন, দারোয়ানজী, তোমার খাতাটা নিয়ে এস তো।

দারোয়ান সেলাম করে তার ঘর থেকে খাতাটি আনতে গেল।

—আশ্চর্য তোমরা! আই. জি. ক্রাইম-সাহেব ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিলেন...আর তোমরা...কী ভেবেছ তোমরা? পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী লোকের নাম 'সি' অক্ষর দিয়ে হয় না? নাকি চন্দননগরে আজ যে কয়েক হাজার মানুষ আসছে তারা সবাই বাংলা-ইংরাজি জানে?

রবি এ কথা বলল না যে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। মাথা নিচু করে ভর্ৎসনাটা শুনল। দোষটা যারই হোক, আরক্ষা-বিভাগের। ফলে, সেও দোষী।

খাতাটা এল। হিন্দিতে লেখা। বাসু-সাহেব বললেন, তুমি পড়ে শোনাও দারোয়ানজী। আমি হাতে-লেখা দেবনাগরী হরফ ভাল পড়তে পারি না।

দারোয়ান পড়ে শোনায়: এতোয়ার: এক বাজ কর দশ মিনিট...পরকাস্‌বাবু...

—প্রকাশবাবুটি কে?

বড়াসাহেবের দোস্ত্‌। তিনি মিনিট-কুড়ি ছিলেন। খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন: প্রকাশচন্দ্র নিয়োগী। তারপর বিকাল চারটেয় এসেছিল স্থানীয় কিছু ছেলে, জগদ্ধাত্রী পূজার চাঁদা চাইতে। বড়াসাহেব ঘুমোচ্ছেন বলে দারোয়ান তাদের তাড়ায়। পাঁচটা দশে অনিতা দিদি। দারোয়ান তাঁর স্বাক্ষর দাবী করেনি। সওয়া ছে বাজে কিতাববাবু—কিন্তু ভিতরে ঢোকেননি।

—কিতাববাবুটি কে?

দারোয়ান জানায় ভদ্রলোককে সে আগে কখনো দেখেনি। বেগানা লোক বলে হাঁকিয়ে দিতে

যাচ্ছিল, কিন্তু খোদ বড়াসাব তাকে ভিতর থেকে দেখতে পান। এগিয়ে এসে কোলাপ্‌সিবল্ গেটে দুপাশ থেকে তাঁদের কী সব বাৎচিৎ হয়। লোকটা আদৌ ভিতরে আসেনি; কিন্তু বড়াসাহেব তার কা থেকে কী একটা কেতাব খরিদ করেন। ওঁর কাছে টাকা ছিল না তখন। বড়াসাহেবের নির্দেশ মত টাকা দারোয়ান ঐ কেতাববাবুকে মিটিয়ে দেয়। খরচটা খাতায় লিখে রাখে।

—তাঁর সই কই?

—না সই রাখা হয়নি। তিনি তো বাড়ির ভিতরে ঢোকেননি।

—বইটা কোথায় আছে জান?

—বড়াসাবকা টেবিল পো হোগা সায়েদ।

—দেখ তো, খুঁজে পাও কিনা।

দারোয়ান স্টাডিরুমে ঢুকে গেল। একটু পরে ফিরে এল একখানি বাঁধানো বই হাতে। প্রকাশক নবপত্র প্রকাশন। গ্রন্থের নাম—'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ'। লেখক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পাতায় ডক্টর চ্যাটার্জির স্বাক্ষর ও গতকালকার তারিখ।

বাসু-সাহেব বলেন, তোমার মনে আছে দারোয়ানজী? লোকটার চেহারা?

—জী হাঁ! বুঢ্ঢা, বড়াসাব সে উমর জেয়াদাই হোগা শায়েদ! পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে এ.. ঝোলা, তাতে বহুত-সে কিতাব!

—গায়ে একটা 'ঢিলে-হাতা' ওভারকোট ছিল কি?

দারোয়ান সবিস্ময়ে বলে, জী হাঁ!

—আর দেখ তো, তোমার হিসাবেব খাতায় যে অঙ্কটা লেখা আছে সেটা কি সাড়ে বাইশ টাকা বইটার দাম?

দারোয়ান দেখে নিয়ে বললে, জী হাঁ! আপকো কৈসে মালুম পড়া?

উত্তেজনায রবি দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলে, স্যার! য়ু মীন...য়ু মীন...

বাসু সাহেব বইটার প্রথম পাতাটা খুলে ধরেন।

ঝুঁকে পড়ে দেখল গ্রন্থটার দাম: পঁচিশ টাকা।

রবি বললে, মনে পড়েছে! আসানসোলের সেই ভদ্রলোকও বলেছিলেন টেন পার্সেন্ট কমিশন লোকটা বই বেচতে এসেছিল। কিন্তু 'ঢিলে-হাতা' কোটটা...

—বাঃ! হাতুড়িটা তো আস্তিনের হাতার মধ্যেই রাখতে হবে!

—মাই গড! একটা বুড়ো ফেরিওয়ালা শেষ পর্যন্ত!

আট

আটই নভেম্বর। বেলা এগারোটা। লডন স্ট্রীটে আই. জি. সি.-সাহেবের ঘরে কনফারেন্স।

ইন্সপেক্টার বরাট বললেন, এখন লোকটাকে খুঁজে বের করা তো ছেলেখেলা। উচ্চতা—এক সত্তর/আশি সে. মি.; ওজন—আন্দাজ সত্তর কে. জি.। রঙ—তামাটে, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। গায় ঢিলে হাতা কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বয়স অ্যারাউন্ড ষাট। ক্যানভাসের ব্যাগে বই ফিরি করে

ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান বলেন, কিছু মনে করবেন না বরাটসাহেব। আপনি যা বলছেন তা অর্ধেক আন্দাজ, বাকি অর্ধেক এফিমেরাল!

—'এফিমেরাল'! মানে?

—ক্ষণস্থায়ী। লোকটা হয়তো ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়েছে, জুতো ছেড়ে চটি পরেছে, ঢিলে-কোটটা বদলে এখন তার গায়ে পুরোহাতা সোয়েটার!

বরাট বলেন, কিন্তু আমরা যখন ওর ঘর সার্চ করব? তখন তো ঐসব জিনিস...

—আগে তার পাত্তা পাই, তার পর তো সার্চ। প্রশ্ন হচ্ছে, ওর যেটুকু বর্ণনা জানা গেছে তা জানি কি আমরা কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেব?

বাসু জানতে চাইলেন, 'বিশ্বামিত্র', 'ইত্তেফাক' ইত্যাদি সমেত?

ডি. আই. জি. কঠিনভাবে বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা বাসু-সাহেব! বিশ্বামিত্রে বিজ্ঞাপন থাকলেও কাজ হত না। ডক্টর চ্যাটার্জিকে মৃত্যু টানছিল! নাহলে সব জেনেশুনেও তিনি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে শহীদ হতে যাবেন কেন?

রবি বলে, কোল্যাপসিব্‌ল্ গেটের দু-পাশ থেকে দুজনের কী কথোপকথন হয়েছে তা দারোয়ান জানে না। লোকটা কি ডক্টরসাহেবকে কোনভাবে সম্মোহিত করে...

ডক্টর পলাশ মিত্র সাইকলজিস্ট। বলেন, অসম্ভব। মানুষ সারারাত ঘুমিয়েও পরদিন ওভাবে সম্মোহিত হয়ে গেট খুলে বেরিয়ে যেতে পারে না। আমি অন্য একটা কথা ভাবছি। এ সংবাদটা কি আপনারা নিয়েছিলেন যে, ডক্টর চ্যাটার্জি 'সোমনাম্‌বোলিস্ট' কি না?

বাসু স্বীকার করেন, দ্যাটস্ আ গুড পয়েন্ট! না, ও সম্ভাবনার কথাটা আমাদের মনেই হয়নি। তা হতে পারে বটে! অনেকে ঘুমের ঘোরে নিজের অজান্তেই হেঁটে চলে বেড়ায়। কিন্তু তারা কি রাতের পোশাক ছেড়ে জামা-কাপড় পড়তে পারে? গেট বন্ধ দেখলে চাবি খুঁজে নিয়ে...

ডক্টর মিত্র বলেন, খুব রেয়ার কেস-এ এমন নজিরও আছে!

আই. জি. ক্রাইম একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলে ওঠেন, অলরাইট! অলরাইট! ডক্টর চ্যাটার্জি কেন সব জেনে-বুঝেও মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছিলেন তার হেতুটা আপনারা খুঁজে বার করেছেন। আমি অন্য একটি বিষয়ে উৎসাহী: ঐ হত্যাবিলাসীটাকে কীভাবে আমরা খুঁজে পাব?

ডক্টর পলাশ মিত্র বলেন, থার্ড-মার্ডার থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটার 'ভিক্‌টিম' চয়নে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। দুটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। দুটি বৃদ্ধ, একটি অল্পবয়সী। প্রথমটি নিম্নবিত্তের, দ্বিতীয়টি মধ্যবিত্তের, তৃতীয়টি উচ্চবিত্তের। এদের জীবনযাত্রা, উপজীবিকা, শিক্ষা-দীক্ষায় কোনই মিল নেই। এ থেকে একটিই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ও 'মেগালোম্যানিয়াক্'—ও মনে করে যে, ও নিজে একজন দুর্লভ প্রতিভার মানুষ। যেহেতু নিজ জীবিকায় সে স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখে রেখে যেতে পারেনি তাই অন্য একটি ক্ষেত্রে—ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে—সে রক্তাক্ষরে নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবে!

রবি বলে, দারোয়ানের জবানবন্দি হিসাবে লোকটাকে আদৌ পাগল বলে বোঝা যায় না কিন্তু।

ডক্টর ব্যানার্জি বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, সে-কথা তো প্রথম দিনেই আমি বলেছিলাম! জ্যাক দ্য রীপার, জন-দ্য কীলারকে দেখেও বোঝা যায়নি যে, তারা হত্যাবিলাসী।

আই. জি. সাহেব বলেন, বাসু-সাহেব! আপনার কী সাজেশান? ঐ খুনিটাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে?

বাসু বলেন, আমাদের প্রথমে ভেবে দেখতে হবে, লোকটা কী ভাবে ভিন্ন-ভিন্ন শহরে ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের নাম-উপাধি জানল? কেমন করে বুঝতে পারল একটি বিশেষ পূর্ব-ঘোষিত দিনে ঠিক কোন মুহূর্তটিতে ঐ বিশেষ নামের মানুষটি সবচেয়ে ভাল্‌নারেব্‌ল্! এ ধাঁধাটা সমাধানের আগে তাকে ধরবার চেষ্টা বৃথা—

—আর একটু বিস্তারিত করে বলবেন?

—ধরুন আসানসোল। অধরবাবু যে অত রাত্রে দোকানে একা থাকবেন, হঠাৎ যে লোড-শেডিং হবে, এসব কথা তো হত্যাকারী জানত না। জানা সম্ভবপর নয়। বনানী যে গভীর রাত্রে ঐ ট্রেনের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় একা থাকবে তাও নয়। তাহলে পাঁচ-সাত দশ দিন আগে থেকেই সে কীভাবে আমাকে ঐ জাতের চিঠি লিখতে পারে? ডক্টর চ্যাটার্জির হত্যাটা তো একেবারে ভেল্কির পর্যায়ে!

ইন্সপেক্টর বরাট মুচকি হেসে বলেন, ভেল্‌কি! তাহলে এতদিনে আপনি আপনার আই. কিউ-র সমতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলুন?

বাসু-সাহেব ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, মিস্টার বরাট! চিঠিগুলো সে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লিখেছে বটে কিন্তু সে ব্যঙ্গ করেছে এই স্টেটের একটি বিশেষ বিভাগের ইন্টেলিজেন্সকে—ট্যাক্সপেয়ারদের অর্থে যাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়! আমি ডিফেন্স-কাউন্সেল! অপরাধী খোঁজা আমার জাত-ব্যবসা নয়।

আই. জি. সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, প্লীজ ব্যারিস্টার সাহেব...

পাইপ-পাউচ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান।

আই. জি. সাহেব বলেন, আপনাকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, বাসু-সাহেব...হ্যাঁ, বরাটের ঐভাবে বলাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

বাসু বলেন, আদৌ না! আমি স্বীকার করছি—লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান , প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তাকে পাকড়াও করা আমার কাজ নয়। আজ মিটিঙের শুরুতেই নিজ পদাধিকার বলে যিনি ঘোষণা করেছেন—'এখন তো লোকটাকে গ্রেপ্তার করা ছেলে-খেলা'—তাঁকে সেই খেলাটা শেষ করতে দিন। তারপর তাকে যখন আদালতে তুলবেন তখন হয়তো আবার আমার ভূমিকা শুরু হবে। ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে।

হঠাৎ ডক্টর মিত্র আই. জি.-কে বলে ওঠেন, স্যার! কিছু মনেকরবেন না। আমরা পুলিস বিভাগের লোক নই। এক্সপার্ট-ওপিনিয়ান নিতে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই আমি, বাসু-সাহেব বা ডক্টর ব্যানার্জি এ মিটিঙে এসেছি...

ইন্সপেক্টার বরাট ধরাগলায় বলেন, অল-রাইট! আই অ্যাপলজাইজ।

বাসু-সাহেব বলেন, অল-রাইট! লেটস প্রসীড!

আলোচনা আরও অনেকক্ষণ চলল। কিন্তু না বাসু-সাহেব, না বরাট—কেউই মুখ খোলেননি। স্থির হল এখনই সন্দেহজনক ব্যক্তিটির আনুমানিক বর্ণনা সংবাদপত্রে ছাপানো হবে না।

নয়-দশ-এগারো। চারদিন পরে বারো তারিখের সকালে বিকাশ মুখার্জি আর অনিতা এসে হাজির হল বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। রানী দেবীর মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁরা দেখা করলেন ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে।

—কী ব্যাপার? আপনারা?

বিকাশ যা বললেন তার সারাংশ—ওঁরা পুলিসের উপর আদৌ ভরসা রাখতে পারছেন না। একটা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' সমাজে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওঁরা টি. এ. বিল বানাতে ব্যস্ত! ডক্টর চ্যাটার্জির কেসটার তদন্ত করবার জন্য বিকাশ মুখার্জি ওঁকে রিটেন করতে চান।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমরা ভুল করছ। আমি গোয়েন্দা নই—

—আমরা জানি। ফর্মালি আমরা 'সুকৌশলী'কেই এনগেজ করব, কিন্তু যদি আমরা নিশ্চিন্ত হই যে, তার পিছনে আপনার ব্রেনটা আছে।

বাসু বলেন, লুক হিয়ার বিকাশবাবু। লোকটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই বারবার তিনবার পত্রাঘাত

করেছে। আমাকেই 'ডি-ফেম' করেছে। এবং আমি সে খবর সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। সুতবাং এটা আমার একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ! তোমরা বিটেন কব বা না কব...

বাধা দিয়ে অনিতা বলে, মাপ করবেন স্যার। আপনি কি আমাদের দিকটাও একটু ভেবে দেখেছেন? একটা নৃশংস খুনী দেবতুল্য ডক্টর চ্যাটার্জিকে খুন করে গেল, আব আমবা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? কবে কোন ক্লুর সাহায্যে ঐ ববাটসাহেব বিকাশদার হাতে হাতকডা পবাবেন?

—বিকাশদা?

—আপনি কি বলতে চান, কেন সেদিন মিস্টাব বরাট টেলিফোনে এক গঙ্গা মিথ্যে কথা বললেন তা বোঝেননি?

—আই সী?

—আপনি বিশ্বাস করেন, এটা সম্ভবপর? স্যারকে উনি বড ভাইয়ের মতো...দিদিকে বিধবা করা...

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে, প্লীজ অনিতা, থাম তুমি—

—না। আমাকে বলতে দাও বিকাশদা।

বাসু বলেন, এ প্রশ্নটাই অবৈধ। ডক্টর চ্যাটার্জি যখন খুন হন তখন বিকাশবাবু কলকাতায়।

—তাহলে? 'স্যার' কত লক্ষ টাকা রেখে গেছেন আমরা জানি না। কিন্তু তা থেকে কিছু খরচ করতে কেন দেবেন না আমাদের? লোকটা আপনাকে চিঠি লিখেছে একথাও যেমন সত্য, তেমনি আমাদের সর্বনাশ করে গেছে এটাও তো মিথ্যা নয়? আপনি একা কেন খরচ-পত্র করবেন। অ্যালাও আস টু হেল্‌প য়ু—

বাসু-সাহেব বললেন, অলরাইট। আই এগ্রি। লেটস্ ফর্ম এ টীম! আরও তিনটি লোকের কাছে আমি প্রতিশ্রুত। তাদের সাহায্যও আমি নেব। তাদের অর্থ নেই তোমাদের মত, কিন্তু আন্তরিকতা একইরকম আছে।

—কোন্ তিনজন স্যার?—জানতে চায় বিকাশ।

—এক নম্বর, অধববাবুর ছোট ছেলে সুনীল আঢ্য, দু নম্বব বনানীর পাণিপ্রার্থী অমল দত্ত আর তিন নম্বর বনানীর ছোট বোন ময়ূরাক্ষী।

বস্তুত সেদিনই সকালে বাসু-সাহেব ময়ূরাক্ষীর একখানি চিঠি পেয়েছিলেন। মেয়েটি লিখেছে, "আপনি সেদিন আমাদেব জবানবন্দি নিতে আসেননি। সত্যই সেদিন আমবা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। পরে পুলিস আমাদেব জবানবন্দি নিয়ে গেছে। সেসব কাগজপত্র আপনি এতদিনে নিশ্চয় দেখেছেন। কিন্তু তারপরে আমি কয়েকটি সংবাদ ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি। চিঠিতে তা জানানো সম্ভবপর নয়। প্রথমত অনেক অনেক কথা লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যাপাবটা একটু ডেলিকেট। আপনি ব্যস্ত মানুষ। আমিও যেতে পারছি না। বাবা-মাকে ছেড়ে এ সময কলকাতা যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, আমাদের আর্থিক অবস্থাটা এখন...জানি না, পরীক্ষাটা দেবার চেষ্টা করব, না চাকরি-বাক্‌রি খুঁজব। টিউশানি একটা ধরেছি। সে যাই হোক, আপনার অধীনে একজন মহিলা সেক্রেটারি আছেন শুনেছি। তিনি কি আসতে পারেন একবার? মহিলা হলেই ভাল হয়। কারণ আগেই বলেছি, ব্যাপারটা ডেলিকেট।"

এত কথা বাসু-সাহেব ভাঙলেন না অবশ্য। ডেকে পাঠালেন কৌশিক ও সুজাতাকে। স্থির হল, ওঁবা একটি বে-সরকারী অনুসন্ধান-দল গঠন করবেন। পরের সপ্তাহে রবিবার, বিশ তারিখে সন্ধ্যায় ওঁব বাড়িতে এই অনুসন্ধানকারী দলটির প্রথম অধিবেশন বসবে।

সুজাতা আর কৌশিক পরদিনই রওনা হয়ে গেল আসানসোল-ভায়া-বর্ধমান। তিনজনকে নিমন্ত্রণ জানাতে এবং সুনীল ও ময়ূরাক্ষীকে আসা-যাওয়ার রাহা-খরচ অজুহাতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করে আসতে। ময়ূরাক্ষীর বক্তব্য সুজাতা একাই শুনবে।

নয়

ঐ বারো তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি।

কলিংবেল বাজাতে কুসমির মা সদর দরজাটা খুলে দিল। মৌ কলেজ থেকে ফিরে এল। খাতাপত্র নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, মুখোমুখি বসে আছেন ওর বাবা আর মা । বাবা ইজিচেয়ারে। তাঁর কোলের উপর একখানা ইংরাজি নভেল। খোলা অবস্থায় উপুড় করে রাখা। তিনি কিন্তু তাকিয়ে বসেছিলেন নিস্পন্দ সিলিঙ ফ্যানটার দিকে। মৌকে দেখে বললেন, আয়! আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

মৌ জবাব দিল না। বইখাতা টেবিলের উপর রেখে ঘুরে দাঁড়াল মায়ের মুখোমুখি। তাঁরও কোলের উপর পড়েছিল একটা আধ-বোনা উলের সোয়েটার। নিটিং-এর সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে বললেন, মিট-সেফে তোর খাবার রাখা আছে। খেয়ে নে।

মৌ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। কলেজে যায় একটু সেজেগুজে। আজ কিন্তু তার প্রসাধনের চিহ্নমাত্র ছিল না—আটপৌরে একটা মিলের শাড়ি পরে কলেজে গিয়েছিল। সে মায়ের নির্দেশ মতো রান্নাঘরের দিকে গেল না। মুখ-হাত ধুতে কলঘরের দিকেও নয়। এসে বসল সামনের একটা সোফায়। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু এক জোড়া চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন।

মৌ বলল, তোমাদের একটা কথা বলব?

কেউ জবাব দিল না। না অনুমতি, না আপত্তি।

—আমি যাদবপুরে ফিলজফি অনার্স নিয়ে পড়ি। আমার বয়স কুড়ি। আমি প্রাপ্তবয়স্ক।

ডাক্তারসাহেব বইটা তুলে নিয়ে নীরবে পাঠে মন দেন। প্রমীলা তাঁর বোনার সরঞ্জামটা নামিয়ে রেখে বললেন, এ-কথার মানে?

-হোয়াই ডোণ্ট্‌ টেক মি ইন কনফিডেন্স? তোমরা নিজেরাই পাগল হতে চাও, না আমাকে পাগল করতে চাও?

কর্তা-গিন্নির চোখাচোখি হল, গিন্নিই বললেন, কেন? আমরা কী পাগলামী করেছি?

—এক নম্বর: সকালে কলেজ যাবার সময় দেখে গেছিলাম বাপি তিপ্পান্ন পাতাটা পড়ছে। এখনও সেই পাতাটাই খোলা আছে। দু নম্বর: তোমার সেলাই এক-কাঁটাও আগায়নি। তিন নম্বর: আমার এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়েছে আজ। আমি সাড়ে পাঁচটায় সচরাচর ফিরে আসি। অথচ আমি ঢুকতেই বাপি বলল—আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

এতক্ষণে কথা বললেন দাশরথী, কারণটা তো তুই জানিস মৌ! একটা জলজ্যান্ত বুড়ো মানুষ পাঁচ-পাঁচটা দিন নিখোঁজ। আমরা বিচলিত হব না? আমরা কী করতে পারি?

—যা তোমার করণীয়। থানায় রিপোর্ট করা। মিসিং স্কোয়াডে! তুমি তা কেন করতে পারছ না, তা আমরা তিনজনেই জানি। কিন্তু আমরা পরস্পর তা আলোচনা করছি না। তোমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছ কিনা তা আমি জানি না— আমাকে কেউ কিছু বলনি। চন্দননগর থেকে মাস্টার মশাই কেন ফিরে এলেন না, হঠাৎ কেন এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন...

দাশরথী বলেন, চন্দননগর নয়, শ্রীরামপুর।

—না। চন্দননগর।

—ওটা তোর ভুল আন্দাজ। যেহেতু তুই ভেবেছিস...

—কী?

—তা তো বুঝতেই পারছিস! আমার মুখ দিয়ে নাই বলালি?

—অলরাইট! তোমাদের যখন এতই সঙ্কোচ, তখন আমিই মুখ ফুটে বলি; হ্যাঁ। আমার সেটাই

আশঙ্কা। ওঁর স্মৃতি মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। উনি মনে করতে পারেন না যে, একটা ফটো হুক থেকে পেড়ে তাকে ছুরি বিদ্ধ করতে গিয়ে ওঁর হাত কেটে গিয়েছিল...

ডাক্তার-সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। প্রমীলা বললেন, হ্যাঁ, ওকে আমি বলেছি। ওর জানা থাকা দরকার। অনেক সময় একা একা থাকে...মাস্টারমশাই...

ডাক্তার দে চট করে উঠে পড়েন। বারকয়েক নিঃশব্দে পায়চারি করে বলেন, কুসমির মা কি...

—চলে গেছে। আমি সদরে ছিটকিনি দিয়ে এসেছি। তুমি মন খুলে বল—বললে মৌ।

—তোমরা ভুল করছ! ইয়েস্, আই অ্যাডমিট। ইতিপূর্বে তিনি মেন্টাল অ্যাসাইলামে দু'বছর ছিলেন। আমার জ্ঞাতসারে তিন-তিনবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই প্ররোচনা ছিল।...না, না, প্রতিবাদ করিস না খুকু. .আমি জানি, প্ররোচনাটা সামান্য। তোর-আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য জাতের ছিল। পরীক্ষার খাতায় নকল করা, পূজামণ্ডপে মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা...ঐ গুরুমহারাজের ভণ্ডামী ওঁর দৃষ্টিতে ছিল হিমালয়ান্তিক অপরাধ! কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখেছি, গায়ে মশা বসলে উনি চাপড় মারতেন না, হাত নেড়ে মশাটাকে উড়িয়ে দিতেন!...ইয়েস! আসানসোল আর বর্ধমানের ঘটনা দুটো যেদিন ঘটে উনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। নিতান্ত কাকতালীয় যোগাযোগ। বর্ধমানে উনি গেছিলেন সকালের ট্রেনে—তোর মার স্পষ্ট মনে আছে...

—কিন্তু চন্দননগর?

—আঃ! আবার বলছিস চন্দননগর! উনি সেদিন শ্রীরামপুরে গেছিলেন। অবশ্য বলতে পারিস আবার কোনও লোকাল ট্রেন ধরে...

—এক সেকেন্ড! আমি আসছি।

মৌ উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। একটু পরে ফিরে আসে একটা ডায়েরি হাতে। বললে, এই পাতাটা পড়ছি শোন...ছয়ই নভেম্বরের পাতা—

"চন্দননগর-ঘড়িঘর হইতে গঙ্গা ঘাট। বাঁ-হাতি প্রত্যেকটা দোকান ও বাড়ি।"

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে দাশরথী বলেন, কই দেখি ডায়েরিটা? ওটা তুই কোথায় পেলি?

—দিচ্ছি। সবটা আগে পড়ি। ঐ লাইনটা নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন্-এ লেখা। তারপর ডট্-পেন-এ—মনে হয় অন্য সময়ে লেখা: "সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পেন্সিল খোঁজা। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখে সকালের ট্রেনে গিয়েছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: এগারোটা চল্লিশের গাড়িতে রওনা হইতেছি। বাসযোগে হাওড়া স্টেশন যাইব।"

—তুই...তুই ওটা কোথায় পেলি?

মৌ সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। একই সুরে বললে, নেক্সট পেজ—

আবার নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন-এ এন্ট্রি—মানে অনেক আগে—"সাতই নভেম্বর: ডুপ্লে কলেজ হইতে ফটকগোড়া—বাঁহাতি সব কয়টি দোকান ও বাড়ি। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন।" এর পর বাকি পাতা সব খালি।

এবার সে ডায়েরিটা বাপের হাতে তুলে দেয়। তিনি নিজেও আদ্যন্ত পড়লেন। আগেকার কিছু পৃষ্ঠাও উল্টে দেখলেন। সম্ভবত আসানসোল ও বর্ধমানের বিশেষ দিন-দুটির পাতা। প্রমীলাও দেখছিলেন ঝুঁকে পড়ে।

কন্যার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে, তোমার প্রশ্নটার জবাব মুলতুবি আছে। এটা খুঁজে পেয়েছি তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরে। তোমাদের কিছু বলিনি। যেহেতু তোমরা আমাকে কনফিডেন্সে নিচ্ছ না! বেশ বোঝা যায়, মাস্টারমশাই নিজেও নিজের স্মৃতির উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। আশঙ্কা হয়েছিল—নিজের অজান্তেই তিনি খুনগুলো করেছেন। আই মীন, ছ'তারিখের কাগজ পড়েই হয়তো একথা মনে হয়। তাই ছয় তারিখে ঐ আপাত-অসঙ্গত কথাটা লেখা—"সকাল আটটা দশ:

খবরের কাগজ ক্রয়।"আধঘন্টা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন, তাই "পেন্সিল খোঁজা, পাইলাম না।" ওঁর হয়তো একটু একটু মনে পড়ছিল—পেন্সিল কাটতে গিয়ে হাত কাটেনি। কাউকে খুন করতে গিয়েই ওভাবে হাতটা কেটেছে। কিন্তু কে সে? ওঁর মনে পড়েনি। স্থির করেছিলেন, আর স্মৃতির উপর নির্ভর করবেন না। চন্দননগরে যাচ্ছিলেন তিনি—সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রতি দশ মিনিট অন্তর ডায়েরিতে লিখবেন, কখন কী করছেন। যাতে পরদিন যদি দেখেন চন্দননগরে কেউ খুন হয়েছে তখন স্মৃতিনির্ভর সমাধান নয়, ডায়েরির মাধ্যমে উনি জানতে পারবেন—হত্যামুহূর্তে তিনি ঠিক কোথায়, কী করছিলেন। অথচ ভুলোমানুষের মতো যাবার সময় ডায়েরিটা ফেলে যান।

ডক্টর দে বললেন, তাহলে তিনি আমাকে কেন মিছে কথা বলে গেলেন? কেন বললেন, শ্রীরামপুর যাচ্ছি!

—'গিল্ট কনশাস্' মাইন্ডের জন্য। তিনি যে তখন নিজেই জানেন না, তিনিই ঐ 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' কি না। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে বাপি! তুমি এবার থানায় গিয়ে রিপোর্ট কর।...ভাবছ কেন? তুমি তো শুধু বলবে যে, তোমার বাড়ি থেকে একজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধ নিখোঁজ হয়েছেন। আর তো কিছু বলবে না তুমি।...না হয় চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। দাশরথী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ভগবান আমার প্রার্থনাটা শুনলেন না তাহলে?

মৌ যেন ছোট ছেলেকে আদর করছে। বাপের মাথায় ব্যাকব্রাশ চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে সেও ধরা-গলায় প্রশ্ন করে, কী? কী প্রার্থনা করছিলে এ কয়দিন?

মেয়ের চোখে চোখ রেখে প্রৌঢ় বলে ওঠেন, একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট. .মাস্টারমশাই...ইন্সট্যান্ট ডেথ!

প্রমীলা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। তিনি জানতেন, ঐ বৃদ্ধ ছিলেন তাঁর বিকল্প শ্বশুর।

দশ

তের তারিখ সকাল আটটা।

আজও ব্রেকফাস্ট-টেবিলে এসে কৌশিক দেখে চতুর্থ চেয়ারখানি শূন্যগর্ভ। বললে, কী ব্যাপার? বাসুমামু এখনো ফেরেননি?

রানী দেবী টোস্টে জ্যাম মাখাচ্ছিলেন। বললেন, ফিরেছেন । ঘণ্টাখানেক আগে। স্টাডি-রুমে ঢুকেছেন।

সুজাতা বলে, ডেকে আনি?

রানী বলেন, না থাক। আমিই যাচ্ছি—

—কেন? আপনি কেন আবার কষ্ট করবেন?

রানী তাঁর হুইলচেয়ারে ইতিমধ্যেই একটা পাক মেরেছেন। থমকে থেমে গিয়ে বলেন, তোমাদের মামুর ভাষায় 'নাইন্টি-নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টি চান্স'—চতুর্থ চিঠিখানা এসেছে।

কৌশিক চমকে ওঠে। বলে, মানে? আপনি কী করে জানলেন?

—আমি একে ব্যারিস্টারের বউ তার উপর গোয়েন্দার মামী। আমাকেও একটু-একটু ডিডাকশান করতে হয় কৌশিক। উনি সব বিষয়েই ওভার-পাঞ্চুয়াল। ঘড়ি ধরে সাড়ে ছয়টায় মর্নিং-ওয়াকে গেলেন, কিন্তু এক ঘণ্টা বেড়ালেন না। ফিরে এলেন সাতটায়। ঢুকে গেলেন স্টাডি-রুমে। সেখানে সচরাচর মিনিট পনের থাকেন। আজ আছেন এক ঘণ্টার উপর।

সুজাতা বলে, তাই যদি হয়, তবে আপনাকেই যে চাকা-দেওয়া গাড়িতে ডাকতে যেতে হবে তার মানেটা কী?

—বুঝলে না? স্কাউনড্রেলটা এবার আরও অবমাননাকর ভাষায় লিখেছে। মহাদেবের ত্রিনয়ন থেকে যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হয় তখন ত্রিনয়নী শিবানীই তাঁকে ঠাণ্ডা করতে পারেন।

সুজাতা ও কৌশিক বসল নিজ নিজ আসনে। রানী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে চলে এলেন স্টাডি-রুমে। দ্বারপ্রান্ত থেকে বললেন, ব্রেকফাস্টে আসবে না?

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, এগিয়ে এস। দেখ, তোমার কর্তার রাইভালটার খানদানি বদনখানা!

মেলে ধরলেন সংবাদপত্রটা।

প্রথম পাতায় শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর একটি আলোকচিত্র। নিরীহ গোবেচারী ইস্কুলমাস্টার-মার্কা চেহারা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী—যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে এ পর্যন্ত—তা প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে:

হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলের থার্ড মাস্টার। অঙ্কের টীচার ছিলেন। বদমেজাজী। এ পর্যন্ত তিনবার তিনি মানুষ খুনের চেষ্টা করেছেন এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত। তিনবারই গলা টিপে। পরে তাঁর চাকরি যায়। মানসিক চিকিৎসালয়ে বছর দুই ছিলেন। যে মানসিক চিকিৎসালয়ে বন্দী ছিলেন তার ডাক্তারের ইন্টারভ্যু নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে বৃদ্ধ 'মেগালোম্যানিয়াক'! মনে করতেন তিনি ছত্রপতি শিবাজী অথবা চিতোরের রাণাপ্রতাপের সমপর্যায়ের এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। সমাজ-সংসার এটা বুঝতে পারছে না। এটাই তাঁর পাগলামি। ঐ সঙ্গে ছিল মৃগীরোগ ও 'ক্রনিক অ্যামনেশিয়া'—দীর্ঘস্থায়ী 'অস্মার রোগ'—অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিশেষ সময়ের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া। গোয়েন্দা বিভাগ ও আরক্ষা বিভাগের মতে সাম্প্রতিক কালের তিন তিনটি বীভৎস খুনের ইনিই হচ্ছেন নায়ক। প্রথমে আসানসোলের অধর আঢ্য, তারপর বর্ধমানের বনানী ব্যানার্জি এবং শেষে চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়। ঐ তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের পরেই আততায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর পরিধানে ছিল...ইত্যাদি ইত্যাদি।

রানীর প্রত্যাবর্তনে দেরি হচ্ছে দেখে কৌশিক ও সুজাতাও গুটিগুটি এসে জুটেছে।

টোস্ট-ডিম-কফির কথা আর কারও মনেই রইল না। তিন-চারখানি কাগজ ওঁরা ভাগাভাগি করে পড়তে থাকেন।

রানী বলেন, তোমাদের বিশ্বাস হয়?

কৌশিক বললে, বলা কঠিন। লোকটা ব্যাগে করে বই ফেরি করত—আসানসোল ও চন্দননগরে হয়তো সে উপস্থিত ছিল। এছাড়া তো সবই খবরের কাগজের রিপোর্টারের আপ্তবাক্য।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু তুলে নিয়ে আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে রবি বোস বলে, গুডমর্নিং স্যার। খবরের কাগজ দেখেছেন? আততায়ীর ছবি?

—দেখেছি। কিন্তু এভিডেন্স কোথায়? লোকটার একমাত্র অপরাধ তো দেখছি বই ফেরি করা।

—না স্যার। ক্লিয়ার কেস্! এভিডেন্স সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। এখনি আসছি আমি।

রবি বসুর কাছ থেকে বিস্তারিত অনেক কিছু জানা গেল। ঐ শিবাজীপ্রতাপ চক্কোত্তির পূর্ব-ইতিহাস। অনেকটাই অবশ্য এখনো কুয়াশা ঢাকা।

গতকাল সন্ধ্যা ছটা নাগাদ বিডন স্ট্রিট থানাতে এক ডাক্তার ভদ্রলোক আর তাঁর কন্যা মিসিং স্কোয়াডে একটা এজাহার দিতে আসেন। হারিয়েছেন একজন বুড়ো মানুষ, ওঁর বাড়ির তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরে ভাড়া ছিলেন। একাই। তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। জগদ্ধাত্রী পূজার দিন চন্দননগর যান, তারপর থেকে নিখোঁজ। তাঁর বিবরণ এবং তিনি ফেরি করে বই বেচতেন শুনে থানা অফিসার সন্দিগ্ধ হন। লালবাজারে জানান আর রবিকেও টেলিফোন করেন, কারণ প্রতিটি থানায় জানানো হয়েছিল, রবি বোস ঐ 'এ. বি. সি.—হত্যা' রহস্যের 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি'।রবি বারবার বাসু-সাহেবকে টেলিফোনে খবর দেবার চেষ্টা করে কিন্তু টেলিফোনে কিছুতেই লাইন পায় না। ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টার বরাট বারবার তাগাদা দেওয়ায় তাকে যৌথ তদন্তে যেতে হয়।

ডাক্তার দাশরথীর কাছ থেকে ওঁর পূর্ব-ইতিহাস যা জানা গেছে তার বেশির ভাগই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। বাড়তি খবর—যেটা প্রকাশ করা হয়নি, তা বৃদ্ধের এমপ্লয়ারের পরিচয়। পণ্ডিচেরীর একটি আশ্রম ওঁকে এই চাকবিটি দিয়েছিলেন। পার্সেলে বই আসত। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে ওঁর মাহিনা আসত। রবি আর ইন্সপেক্টার বরাট ওঁব ঘরটা সার্চ করে। ওঁর ঘরের একটি আলমারিতে থরে থরে প্যাক করা বই ছিল।সবই ধর্ম বা ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্যপুস্তক। সর্বসমেত একশ তেরটি। তার ভিতর প্যাকেট না খোলা একটি বাণ্ডিলে পাওয়া গেছে একটি মারাত্মক এভিডেন্স।'সুকুমার সমগ্র' রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড। তার তিনশ-আশি নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ব্লেড দিয়ে নিপুণভাবে দুখানি ছবি কেটে বার করা। কী ছবি ছিল জানা গেছে। অন্য একটি কপি দেখে। উপরের ছবিটি 'ল্যাংড়াথেরিয়ামের' এবং নিচে 'ব্যাচারাথেরিয়াম' আর 'চিল্লানোসরাসের' ছবি। শেষের ছবি দুটি ব্লেড দিয়ে যেভাবে কাটা তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে দুটিই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে সরাসরি আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। তৃতীয় ছবিটি 'L'-অক্ষর দিয়ে। সেটা কেন কাটা হয়েছে বোঝা যায়নি। আরও একটি মারাত্মক এভিডেন্স। ওঁর টেবিলে ছিল দামী একটা টাইপ-রাইটার। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ যে, ঐ যন্ত্রটি দিয়েই তিনখানি চিঠি টাইপ করা।

সব কিছু এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করে ইন্সপেক্টর বরাট নিয়ে যান। রবি প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল পি. কে. বাসু সাহেবকে না জানিয়ে ঐ সব বই, টাইপ-রাইটার, ওঁর কাপড়-জামা ইত্যাদি সরানো-নড়ানো উচিত নয়, কারণ আই. জি. ক্রাইম সাহেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে দুটি টীম সমান্তরালে কাজ করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে।

তার জবাবে ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, এখন পরিস্থিতিটা নাকি পাল্‌টে গেছে! বাসু-সাহেব সবই দেখতে পাবেন আদালতে। যখন পিপল্‌স্ এক্সিবিট হিসাবে সেগুলি দাখিল করা হবে।

বাসু প্রশ্ন করেন, ঐ বুড়োটাকে এখনো ধরা যায়নি?

—না। আজই তার ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। আজ সন্ধ্যায় টিভিতেও দেখানো হবে। বিকৃতমস্তিষ্কের মানুষ। পকেটে টাকা-পয়সা বোধহয় সামান্যই আছে। আমার তো ধারণা ওকে ধরা এখন—

বাসু-সাহেব বলেন, 'ছেলেখেলা!'

রবি হাসল। বলল, অনেকটা তাই স্যার! আমরা তো তাই আশা করছি... দুই কি তিন দিন!
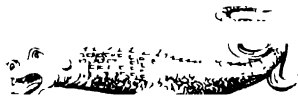
বাস্তবে ব্যাপারটা হল উল্টো। একটার পর একটা বিশ্রি ঘটনা! মারাত্মক ও বেদানাদায়ক। রবি বোসের ঘোষণা অনুসারে তিন দিনেব মধ্যে লোকটা আদৌ ধরা পড়ল না—কিন্তু সাতজন নিরীহ লোক গণধোলাইয়ের শিকার হল। তাদের অপরাধ—তাদের দেহাকৃতি এবং জীবিকা ঐ অজ্ঞাত আততায়ীর মতো। ঐ সাতজনের মধ্যে দুজন মারাই গেল। তাদের একজন ফিরি করত ধূপকাঠি, দ্বিতীয়জন বেচত না,, কিনত—পুরনো খবরের কাগজ!

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বেতারে বিবৃতি দিলেন। দূরদর্শনে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ঘোষণায় অতি-উৎসাহী জনগণকে অনুরোধ করলেন—যা করণীয় তা পুলিসকেই করতে দিন। সরকার জনগণের সহযোগিতা

চান—নিশ্চয়ই চান—তবে সীমিত ক্ষেত্রে। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়লে জনগণ যেন অনুগ্রহ করে থানায় খবর দেন। সরকার জনগণের কাছে আর কোন সক্রিয় সাহায্য কামনা করছেন না।

এতে লাভবান হল কিছু সাময়িক পত্রিকা—যারা মুখরোচক স্টান্ট নিউজ ছাপাতে ওস্তাদ। পত্রিকার চিঠিপত্র-বিভাগের বৃকোদর অংশ দখল করল 'এ. বি. সি...হত্যারহস্য'। কাগজ খুলে কেউ দেখতে চায় না জরুরী খবরগুলো: ভারত এশিয়াডে কত নিচে নামল, প্রধানমন্ত্রীকে কী জাতের সম্বর্ধনা করা হল অথবা পূর্তমন্ত্রী কোন মূর্তিকে কবে মাল্যভূষিত করলেন। সকলেই সর্বপ্রথমে জানতে চায় লোকটা ধরা পড়েছে কি না।

এই যখন সারা দেশের অবস্থা তখনই ডাকযোগে এসে পৌছলো সেই দুঃসাহসী হত্যাবিলাসীর চতুর্থ প্রেমপত্র। এবারও খামের উপর ভুল ঠিকানা। পোস্টাল জোনটায় একটিমাত্র ভ্রান্তি; প্রথম সংখ্যাটা 'সাত'-এর বদলে 'এক'। অর্থাৎ পোস্টাল জোন: 100053। চিঠিখানা চন্দননগরের ডাকঘরের ছাপ নিয়ে চলে গিয়েছিল শ্রীনগর। সেখান থেকে পুনর্নির্দেশিত হয়ে বাসু-সাহেবের হাতে এসে পৌছালো ষোলো তারিখে। একই রকম খাম, কাগজ, একপিঠে আঁক-কষা, অপর পিঠে—না, এবার দুটি ছবি। দুটিই একরঙা লাইন ব্লক। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা:

D-FOR DIPLODOCUSAIH NAMAH!

পি. কে. বাসু বাব-অ্যাট-ল্যাংডাথেরিয়ামেষু,

মহাশয়, কী মর্মবিদারক দৃশ্য! বিশালকায় ব্যারিস্টার ল্যাংডাথেরিয়ামকে একজন সামান্য মানুষ—যাহাকে কেহই চেনে না, যাহার ক্ষমতাকে কেহই স্বীকৃতি দেয় না—গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

অহেতুক জীবহত্যা করিতেছেন কেন? সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়া নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয় নহে কি? আপনার দম্ভ কি এতই আকাশচুম্বী? ঈশ্বর আপনাকে সুমতি দিন, এই কামনা।

D FOR DIGHA!

তাং ঃ পঁচিশে ডিসেম্বর।　　　　ইতি —D. E. F.

এগার

পরদিন সকালে রবি বোস এসে হাজির। বললে, এক এক সময় ইচ্ছে করে বিজ্রাইন দিয়ে ঐ নরক থেকে বেরিয়ে আসি। পুলিসের চাকরি তারাই করে যারা গতজন্মে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিল!

বাসু-সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, কেন হে! এমন ক্ষেপে গেলে কেন?

রবি বুঝিয়ে বলে তার অন্তর্দাহের ইতিকথা। গতকালই সন্ধ্যায় বাসু-সাহেবের ঐ চতুর্থ পত্রখানি তার হস্তগত হয়েছিল। এবার বাসু-সাহেব নিজে যাননি, রবিকে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা বিভাগে ররার্ট-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এবং অনুরোধ করে—ঐ দিনই আবার একটা কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে। ডক্টর বানার্জি, ডক্টর মিত্র এবং বাসু-সাহেবকে ঐ চতুর্থ পত্রটি বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে। ররার্ট সরাসরি অস্বীকার করেন। বলেন, ও সব থিওরিটিক্যাল বিশেষজ্ঞের পর্যায় পার হয়ে গেছে। এখন শুধু অ্যাকশন! সে কাজ গোয়েন্দা বিভাগ যথারীতি করছে। ঐ তিনজন বিশেষজ্ঞকে নাকি ইতিপূর্বেই ফর্মাল ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তারপর রবি স্বয়ং আই· জি· ক্রাইমের সঙ্গে লডন স্ট্রীটে গিয়ে দেখা করেছিল। তিনি বলেছেন, অফিশিয়ালি স্পিকিং—ররার্ট-এরই যা কিছু করণীয়। সে যেভাবে অগ্রসর হতে চায়, হোক। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাসু-সাহেবকে একটি ধন্যবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

বাসু-সাহেব পত্রখানি নিয়ে পড়লেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, মিস্টার ররার্টকে বলেছিলে যে, আমি ঐ সীজ করা জিনিসগুলো দেখতে চাই?

—বলেছিলাম। তাতে উনি বললেন, একটিমাত্র শর্তে উনি তা আপনাকে দেখতে দেবেন। যদি আপনি কথা দেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনি তার ডিফেন্স কাউন্সেল হবেন না।

—অল রাইট। তখনই না হয় দেখব।

—তখনই মানে? কখন?

—যখন ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে আদালতে দাঁড়াব। পিপল্‌স্ এক্সিবিট হিসাবে সবই ওরা আমাকে দেখাতে বাধ্য হবে।

—তার মানে আপনি ঐ লোকটার··

হ্যাঁ রবি। আমি চেষ্টা করব প্রমাণ করতে যে, সে সজ্ঞানে হত্যা করেনি! সে পাগল।

—আপনি তাই মনে করেন?

—আমি তাই মনে করি। মানসিক চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের রিপোর্টটা দেখনি? ও 'অস্মার' রোগে ভুগছিল। ওর স্মৃতি মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। তখন যদি সে কাউকে···আর তাছাড়া বনানীর 'লাভার' হিসাবে ঐ বুড়োটাকে তুমিই কি কল্পনা করতে পারছ?

—না। কিন্তু ওর ঘরে ঐ টাইপ-রাইটার? আর পাতা-কাটা ঐ 'সুকুমার রচনা সংগ্রহ'?

—ডাক্তার দাশরথী দের বয়স কত? তার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? তুমি কি খোঁজ নিয়ে জেনেছ, ঐ অঙ্কের মাস্টার প্রাইভেট ট্যুইশানি করতেন কি না? ওঁর ঘরে কোনও কলেজের অল্পবয়সী ছেলে সন্ধ্যার পর এসে ওঁর প্রাইভেট ট্যুইশানির ক্লাস করত কিনা? এলে, সে টাইপ-রাইটিং জানে কি না? টাইপরাইটারটা ব্যবহার করত কি না?

—মাই গড! এ সব কথা তো···

—গুডবাই মাই ফ্রেন্ড! আজ তোমার 'বস'-এর কাছে রিপোর্ট কর—আমার সহকারী হিসাবে আর তোমাকে কাজ করতে হবে না। আই ফায়ার যু! তার মানে এই নয় যে, আমি তোমার উপর রাগ করেছি। প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু এরপর থেকে তুমি আর আমি ভিন্ন ক্যাম্পে। তোমার চাকরির নিরাপত্তাটাও তো আমাকে দেখতে হবে।

রবি বোস এগিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ডাক্তার দাশরথী দে বাড়ি ছিলেন না। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। প্রমীলা ওদের সাদরে বসতে দিলেন। প্রমীলা এবং মৌ দুজনেই বাসু-সাহেবকে ভালভাবে চেনেন—মানে ব্যক্তিগতভাবে নয়, তাঁর কীর্তিকাহিনীর জন্য। প্রমীলা বললেন, উনি বাড়িতে নেই তাতে কী হয়েছে? আপনি ঘরটা যদি দেখতে চান··

—ঘরটা তো দেখবই। তার আগে বলুন, কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তার বাইরে ওঁর সম্বন্ধে কী জানেন?···আচ্ছা, আমি বরং একে একে প্রশ্ন করে যাই—উনি কবে প্রথম আসেন, কী ভাবে? তার আগে কোথায় ছিলেন?

—এ বাড়িতে উনি এসেছেন বছরখানেক আগে। ওঁর ডিসপেনসারিতে একদিন এসেছিলেন একটা চাকরির খোঁজে। উনি চিনতে পারেন। সে সময় মাস্টারমশাই ছিলেন বেকার। কোথায় থাকতেন জানি না। তবে উনি একাধিক ডিসপেনসারিতে কম্পাউন্ডারের কাজ করেছেন। যদিও পাস-করা কম্পাউন্ডার নন। মাঝে কিছুদিন নাকি কোন এক ছাপাখানায় প্রুফ-রিডারের কাজও করেছেন। তখন ঐ প্রেসেই থাকতেন। কোথাও বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। বারে-বারে চাকরি খুইয়েছেন। হাইকোর্টের কাছে পথের ধারে বসে টাইপিংও করেছিলেন কিছুদিন—কিন্তু তাতে পেট চলে না। মাথা গোঁজার আশ্রয়ও তখন ছিল না।

—উনি বারে-বারে চাকরি খুইয়েছেন কেন? ওঁর পাগলামীর জন্যে?

—হয়তো তাই।

মৌ উপরপড়া হয়ে বললে, গল্পচ্ছলে মাস্টারমশাই আমাকে দুটি কেস-হিস্ট্রি বলেছিলেন। সে দুবার কেন তাঁর চাকরি যায়। একবার একটি ডিসপেনসারিতে ক্যাশ থেকে কিছু টাকা চুরি যায়। দোকানের সবাই বলেছিল, তারা টাকা নেয়নি; আর মাস্টারমশায়ের বক্তব্য ছিল আমার মনে নেই। দ্বিতীয়বার প্রেস-এর চাকরি খোওয়া যায় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। একটি অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছিল। উনি প্রুফ-রিডার। ধূম তর্ক বাধিয়েছিলেন লেখকের সঙ্গে। ওঁর মতে লেখকটি অঙ্কের কিছুই বুঝতেন না। যেভাবে তিনি পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কগুলি কষেছিলেন তার চেয়ে সহজ পদ্ধতিতে সেগুলি নাকি কষা যায়। কষে নাকি দেখিয়েও দিয়েছিলেন। লেখক ছিলেন অঙ্কের একজন অধ্যাপক। তর্কাতর্কির সময় তিনি নাকি ঐ অধ্যাপকের গলা টিপে ধরেন। ফলে চাকরি খোয়ান।

—উনি কি টাইপ-রাইটিং জানতেন?

হ্যাঁ। বেশ ভালই। আমি ওঁর কাছেই শিখেছিলাম।

—শিশু সাহিত্য পড়তেন? পড়তে ভালবাসতেন?

—যথেষ্ট। বরং বড়দের চেয়ে শিশু ও কিশোর সাহিত্যই বেশি করে পড়তেন।

বাসু হঠাৎ মৌ-এর দিকে ফিরে বললেন, তুমি এদুটি শব্দ কখনো শুনেছ? 'ব্যাচারাথেরিয়াম্' আর 'চিল্লানোসরাস্'?

এমন অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে মৌ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। সুকুমার রায়ের একটা হাসির গল্পের দুটি নাম। বইটিতে ছবিও আছে ঐ জীবের। 'চিল্লানোসরাস্ ব্যাচারাথেরিয়ামকে কামড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামড়ালো না। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু বললেন, ঐ গল্পটা, বা ঐ জন্তু দুটোর নাম নিয়ে কখনো মাস্টারমশায়ের সঙ্গে তোমার কোন আলোচনা হয়েছে? তোমার মনে পড়ে?

মৌ একটু ভেবে নিয়ে বললে, মনে পড়ে না। হঠাৎ ঐ জন্তু দুটো···

বাসু-সাহেব প্রমীলা দেবীকে বললেন, এবার চিলে-কোঠা ঘরটা দেখি।

ঘরটা উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আলমারি হাট করে খোলা। বই বা টাইপ-রাইটার নেই। মাস্টারমশায়ের কাগজপত্র, জামাকাপড়, কলম-কলমদানি-পিনকুশান-পেপারওয়েট কিচ্ছু নেই। এ ঘরে এখন তল্লাসী করা নিরর্থক। ওঁরা নেমে আসছিলেন, হঠাৎ বাসু-সাহেব দেওয়ালের একটা অংশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐখানে দীর্ঘদিন একখানা ছবি টাঙানো ছিল, ফ্রেমে বাঁধানো। মাস্টারমশায়ের নিশ্চয়। সেটাই আপনারা খুলে পুলিসকে দিয়েছেন?

মা-মেয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। প্রমীলা জবাব দেবার আগেই মৌ বললে, না। আমাদের ফ্যামিলি-অ্যালবাম থেকে খুলে মাস্টারমশায়ের ছবিখানি দেওয়া হয়েছে।

—আই সী। তাহলে ওখানে যে ফটোটা ছিল, সেটা···কার ফটো ছিল ওখানে? ফটো না ছবি?

মৌ-ই জবাব দিল। ফটোটা কার তা শুনে বাসু বলেন, আই সী! কাগজে ওঁর নামে যেসব কথা বেরিয়েছে তারপর ছবিখানা নামিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সরিয়েছেন কে? আপনারা কেউ, না শিবাজীবাবু নিজেই?

—নামিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। সরিয়ে রেখেছেন মা।

আই সী!

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু ফিরে এসেছেন। দ্বিতলে কুস্‌মির মায়ের কাছে খবর পেয়ে উঠে এসেছেন চিলে-কোঠার ঘরে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বনানীর প্রেমিক হওয়ার সম্ভাবনা অল্প!

ওঁরা আবার ফিরে গিয়ে দ্বিতলের ঘরে বসলেন।

ডাক্তার-সাহেব আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হলেন। বিশেষ করে মাস্টারমশায়ের বর্তমান নিয়োগ-কর্তা সম্বন্ধে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্ডিচেরী থেকে একখানি চিঠি আসে 'মাতৃসদন' থেকে। কী এক মহারাজ শিবাজীবাবুকে পত্র লেখেন। পত্রটা, বস্তুত গোটা ফাইলটাই পুলিসে 'সীজ' করেছে। তবে প্রথম চিঠিখানির বয়ান ডাক্তারবাবুর স্পষ্ট মনে আছে। মহারাজ জানিয়েছিলেন, তাঁর এক ভক্ত—যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—কিন্তু শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র—মহারাজকে তাঁর মাস্টারমশায়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। 'মাতৃসদন' ওঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে শিবাজীবাবুকেও মাতৃসদনের সেবা করতে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মপুস্তক বিক্রয় করে আসতে হবে। সাড়ে চারশ টাকা মাস মাহিনায়। মাস্টারমশাই সাগ্রহে চাকরিটি গ্রহণ করেন। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে টাকা আসত...

—মনি-অর্ডারে? চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্-এ নয়?

—না। বরাবর মনি-অর্ডারে টাকা আসতে দেখেছি। আর মাঝে মাঝে পোস্টাল পার্সেলে বই।

—মাতৃসদনের ঠিকানাটা দিন দেখি?

দেখা গেল, ওঁদের কাছে তা নেই। ঐ ফাইলেই সব কিছু ছিল। ডাক্তারবাবু ওদের লেটার-হেড প্যাডের চিঠি বহুবার দেখেছেন। অপ্রয়োজনবোধে ঠিকানা টুকে রাখেননি।

ইতিমধ্যে চা-পানের পাট চুকেছে। বাসু-সাহেব গাত্রোত্থানের চেষ্টা করতেই ডাক্তারবাবু বললেন, একটা অনুরোধ করব স্যার?

—কী বলুন?

—মাস্টারমশাই দু-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়বেন। আপনি কি তাঁর ডিফেন্সটা নিতে পারেন না? ব্যারিস্টার দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি অবশ্য আমার নেই। কিন্তু ওঁর কয়েকজন ধনী ছাত্রকে আমি চিনি—মানে আমারই সব ক্লাস-ফ্রেন্ড। আমরা চাঁদা তুলে...

বাসু বললেন, দেখুন ডক্টর দে, টাকাব জন্য আটকাবে না, কিন্তু কেসটা আমি নেব কি না তা নির্ভব করছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর।

—জানি। শুনেছি আপনার কথা। আপনি নিজে যাকে মনে করেন 'নির্দোষ' তার কেসটি আপনি গ্রহণ করেন। যাকে মনে করেন দোষী, তাকে পরামর্শ দেন 'গিলটি প্লীড' করতে। কিন্তু এ কেসটা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, বাসু-সাহেব। মাস্টারমশাই তো নিজেই জানেন না—তিনি 'গিলটি' না 'নট গিলটি'।

বাসু বললেন, আগে তিনি ধরা পড়ুন। তবে আপনার অনুরোধটা আমাব মনে থাকবে।

পরদিন সকালে বাসু-সাহেব চন্দননগরে একটা ফোন কবে জানালেন যে, তিনি বিকেলে ওখানে আসবেন। টেলিফোন ধরেছিলেন বিকাশবাবু। তিনি আগ্রহ দেখালেন, বললেন, তাহলে মধ্যাহ্ন আহারটা ওখানেই করে যাবেন, স্যার। বিকালের বদলে এবেলাই—

—না। কারণ আমার একটি লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি গিয়ে পৌছাব বিকেল চারটে নাগাদ। মিস গাঙ্গুলীকে কি তখন পাওয়া যাবে?

—আমি খবর পাঠাচ্ছি।

—তোমার দিদি কেমন আছেন?

—দিন দিন খারাপের দিকে।

বাসু-সাহেব এবার রিভলভারটা সঙ্গে নিলেন কিনা সুজাতা জানে না; কিন্তু ওঁব ক্যামেরা, টেলি-ফটো লেন্স, বাইনোকুলার, কম্পাস ও মাপবার ফিতে যে নিয়েছেন তা টের পেল। এসব সরঞ্জামের কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হল না। ইতিমধ্যে কৌশিক আসানসোল থেকে যে ফটো তুলে এনেছে সেগুলোও সঙ্গে নিয়েছেন।

বিকাশ ওদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালো বৈঠকখানায়। অনিতা গাঙ্গুলীও ছিল। বাসু ওঁর সব সরঞ্জাম টেবিলে সাজিয়ে রেখে প্রথমেই স্টাডি-রুমটার মাপজোক নিলেন। কত লম্বা, কত চওড়া, জানলাগুলি মেঝে থেকে কত উপরে। ওঁর নির্দেশ মতো সুজাতা একটা খাতায় মাপগুলি লিখে নিল। গেট থেকে সদর দরজার দূরত্বটা মাপতে গিয়ে প্রাণান্ত হল কৌশিকের। দারোয়ান আর বলাই সাহায্য করল ওকে। বাড়িটার একগাদা ফটো নিলেন। যে বেঞ্চিটার নিচে মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তারও বেশ কয়েকটি ফটো! বালিয়াড়ির উপর থেকে টেলিফোটো লেন্স লাগিয়ে দূর থেকে অনেকগুলি ফটো।

কারও সাহস হল না প্রশ্ন করতে এসব কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে। বারে বারে বাইনোকুলার দিয়ে গঙ্গার ওপারে কিছু খুঁজলেন তিনি। কম্পাস বার করে নির্ধারণ করলেন বাড়িটি ঠিক পূর্বমুখী নয়—সাত ডিগ্রি দক্ষিণপূর্ব দিকে সরে আছে।

এরপর অনিতা এসে বলল, আপনারা ভিতরে এসে বসুন। আফটারনুন টি রেডি।

ওঁরা ঘরে এসে বসলেন। বাসু বললে, চা নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু এ যে হাই-টি!

এরপর কিছুক্ষণ শিবাজী চক্রবর্তীর বিষয়ে আলোচনা হল। কী অপরিসীম আশ্চর্য! লোকটা এখনো ধরা পড়লো না। পুলিস কোন কর্মের নয়। বাসু খবরটা প্রকাশ করলেন—ইতিমধ্যে উনি চতুর্থ পত্রটি পেয়েছেন—'D FOR DIGHA'!

বিকাশ এবং অনিতা দুজনেই আঁৎকে ওঠে। বিকাশ বলে, সর্বনাশ! তারিখটা?

—পঁচিশে ডিসেম্বর!

অনিতা বললে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবেন।

বিকাশ বলল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ইচ্ছা করেই দিয়েছে। জগদ্ধাত্রী পূজায় যেমন চন্দননগরে ভীড় হয়, ঠিক তেমনি বড়দিনে ভীড় হয় দীঘাতে। 'ডি' নাম বা উপাধির কে-কে আসবে পুলিস তা কেমন করে জানবে? আপনি কবে চিঠিটা পেলেন? কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন নিশ্চয়। কবে ছাপা হবে?

বাসু বলেন, এনি ডে। আজ বের হয়নি, কাল পরশু বের হবে। তোমার দিদিকে কি খবরটা জানানো হয়েছে?

—না। ডাক্তার বলেছে ম্যাক্সিমাম এক মাস। কী দরকার?

—অসুখটা কী?

—ক্যানসার। ওঁকে বলা হয়েছে জামাইবাবু হঠাৎ বিশেষ কাজে দিল্লী যেতে বাধ্য হয়েছেন। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ফিরবেন।

বাসু-সাহেব অনিতার দিকে ফিরে বলেন, সেদিন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চটা কী জাতের ছিল? তুমি বলেছিলে, তিনি একটি 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করছিলেন। তার মানেটা কী?

অনিতা ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। এটা শেষ পর্যন্ত একটি অভিধানের রূপ নিত। প্রতিটি শব্দ রবীন্দ্রনাথ কোথায়, কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তার খতিয়ান।

—সেটা কী কাজে লাগবে?

—অনেক কাজে লাগতে পারে। ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম, 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ'—এই পংক্তিটা রবীন্দ্রনাথ কবে, কোথায় এবং 'অপাবৃত' শব্দের কী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আপনি বলতে পারেন?

—না। কোথায়?

—আমার মুখস্ত নেই। কিন্তু অভিধান দেখে বলতে পারব। 'আলোক' 'সূর্য' কিম্বা 'অপাবৃত' এই তিনটে 'এন্ট্রির' যে কোন একটাতে পাওয়া যেতে পারে। এইটে 'অ'-ফাইল। এই দেখুন—

ফাইল থেকে দেখালো লেখা আছে ঃ "অপাবৃত—অনাবৃত। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। ঈশ ১৫॥ "করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ"। জন্মদিনে/ ১৩/ ১১ই মাঘ/ ১৩৪৭ উদয়ন/ সকাল"।

—তার অর্থটা কী দাঁড়ালো?

—'জন্মদিনে' কবিতাগ্রন্থের তের নম্বর কবিতা। ১১ই মাঘ, ১৩৪৭ তারিখের সকালে 'উদয়ন'-এ বসে কবি ঐ পংক্তিটি রচনা করেছিলেন। 'অপাবৃত' শব্দের অর্থ 'অনাবৃত করা'। কবির ঐ পংক্তিটির মূল ভাবের উৎস হচ্ছে ঈশোপনিষদের পঞ্চদশ মন্ত্রটি, 'তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।'

বাসু বললেন, দারুণ কাজ করেছিলেন তো ডক্টর চ্যাটার্জি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি ঐ 'অপাবৃত' শব্দটা অন্য কোথাও ব্যবহার করেননি?

—হয়তো করেছেন। সেটা বোঝা যেত গ্রন্থটা সম্পূর্ণ হলে। কারণ উনি প্রতিদিনই ছোট ছোট কাগজে এইসব নোট লিখে দিতেন, আর আমরা সেগুলি বিভিন্ন ফাইলে অভিধানের রীতিতে পর পর গেঁথে রাখতাম। কম্পাইলেশন শেষ হলে বোঝা যেত 'অপাবৃত' শব্দটা কবি কতবার, কোথায় কোথায় কী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

এই সময় একজন য়ুনিফর্মধারী নার্স এসে অনিতাকে জানালো, মিসেস চ্যাটার্জি তাকে ডাকছেন। 'এক্সকুজ মি' বলে অনিতা উঠে গেল দ্বিতলে। একটু পরেই ফিরে এসে বাসু-সাহেবকে বলল, দিদি টের পেয়েছেন যে, আপনি এসেছেন। শুক্লা ওঁকে জানিয়েছে।

—শুক্লা কে?

—এ।

মিসেস চ্যাটার্জির ডে-টাইম নার্স যুক্তকরে নমস্কার করল।

—উনি আপনার কীর্তি-কাহিনীর কথা জানেন। বস্তুত উনি আপনার একজন 'ফ্যান'। আমাকে দিয়ে অনুরোধ করেছেন, যাবার আগে যেন আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান।

—তা আমার এখানকার কাজ তো মিটেছে। মাপজোক সবই নেওয়া হয়েছে। চল যাই—

বিকাশ বলে, কিন্তু স্টাডিরুমের মাপটা কোন্ কাজে লাগবে?

বাসু হেসে বললেন, ট্রেড-সিক্রেট কি কেউ জানিয়ে দেয়? চল, দোতলায় যাই।

বারো

মিসেস চ্যাটার্জির বয়সটা আন্দাজের বাইরে। 'কর্কটিকা-ডাস্টার' ওঁর তনুদেহের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা কৈশোরের স্বপ্ন, তারুণ্যের উদ্দামতা, যৌবনের নিভৃতকূজনের সব ইতিকথা লেপে মুছে দিয়েছে! ব্ল্যাকবোর্ড ব্ল্যাঙ্ক! কঙ্কালসার দেহটি বিরাট ডবল-বেড শয্যায় অর্ধশায়িত। পিঠের দিকে একাধিক উপাধান। হাত দুটি সবল, কারণ যুক্তকরে নমস্কার করে অম্লান হেসে বললেন, 'ওয়েস্ট্-এর ওয়েস্ট' থেকে আজ প্রথম দেখলাম 'প্যাবী ম্যাসন্ অব দ্য ঈস্টকে।' বসুন।

প্রথম 'ওয়েস্ট'-এর স্বরান্ত এবং দ্বিতীয় 'ওয়েস্টে'র দীর্ঘায়ত উচ্চারণে বাসু-সাহেবের মনে হল—ঐ শয্যালীন মহিলাটি এক কালে বেণী দুলিয়ে স্কিপিং করতেন—কোনও কনভেন্ট স্কুলে। আর ওঁর অম্লান হাসিটি দেখে অনুভব করলেন—যন্ত্রণাদায়ক ক্যানসার রোগও পারেনি ওঁর সব কিছু মুছে দিতে। আরও মনে হল, ডক্টর চ্যাটার্জি 'প' অক্ষর পর্যন্তই লিখে গেছেন। 'ম' অক্ষরে উপনীত হয়ে তিনি লিখে যাবার সময় পাননি: 'আমি 'মৃত্যু' চেয়ে বড়, এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে!'

বাসু-সাহেব ওঁর শয্যাপার্শ্বে বসে পড়লেন। কঙ্কালসার হাত দুটি তুলে নিয়ে বললেন, 'ওয়েস্টের ওয়েস্ট' কেন বলছেন মিসেস চ্যাটার্জি? সূর্য তো প্রতিদিন অস্ত যায়, উদিত হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই তো কদিন আগে জগদ্ধাত্রীর বিসর্জন হল। কিন্তু 'বিসর্জন' তো 'নেমেসিস' নয়—'বি পূর্বক সৃজ্-ধাতুর অনট'—বিশেষ রূপে জন্ম নেওয়া। ধাতুটা 'সৃজ্'! বিসর্জনের মন্ত্র পুনরাগমনায় চ।

মনে হল, ভারী তৃপ্তি পেলেন ভদ্রমহিলা। মিনিটখানেক চোখ বুজে স্থির থেকে বললেন, আমার নাম রমলা। আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

বাসু বলেন, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, রমলা?

—এখন হচ্ছে না। যখন 'স্প্যাজম্' আসে, তখন হয়। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা গোপন কথা আছে, বাসু-সাহেব। ওদের যেতে বলুন।

বাসু এদিকে ফিরলেন। ঘর ছেড়ে একে একে সকলে বার হয়ে গেল। এমনকি শুক্লা, অনিতাও।

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বসুন।

বাসু ওঁর আদেশ তামিল করার পর রমলা দেবী বালিশের তলা থেকে একগোছা চাবি বের করে বললেন, ঐ গোদরেজ-এর আলমারিটা খুলুন। এইটা বাইরের চাবি, এইটা সিক্রেট-ড্রয়ারের।

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশমতো কাজ করার পর মহিলা বললেন, একটা চন্দন-কাঠের বাক্স আছে না? বাঁ দিকে। উপরে হাতির-দাঁতের কাজ-করা। পেয়েছেন? ওটা নিয়ে আসুন।

দেখা গেল তাতে খান কয়েক গিনি আছে। আর একটা ফর্দ। গহনার ফর্দ।

রমলা ওঁকে জানালেন—এই গহনাগুলি আছে ওঁর কলকাতার সেফ্-ডিপজিট ভল্টে। সব তাঁর স্ত্রীধন—বিবাহের যৌতুক, অথবা পরে উপহার পাওয়া, বা ক্রয় করা। বললেন, প্রতিটি গহনার পাশে তিনি এক-একজনের নাম লিখে সই করে দিতে চান, যাতে তাঁর অবর্তমানে...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, এতদিন এসব করে রাখেননি কেন?

তিনি যে মহিলাটির ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে নিজের অজান্তেই আবার 'আপনি'-তে ফিরে গেছেন, তা টের পাননি।

—উনি রাজী ছিলেন না। সুপারস্টিশান! ওটা লিখলেই নাকি আমি মরে যাব। ওটা লেখা হয়নি,

একথা যতদিন আমার মনে থাকবে ততদিন মনের জোরেই আমি নাকি বেঁচে থাকব! আচ্ছা বলুন তো। এসব নিছক পাগলামি নয়? তাছাড়া এই যন্ত্রণা নিয়ে পঙ্গু হয়ে আমি কি বেঁচে থাকতে চাই?

বাসু-সাহেবের মনে পড়ে গেল, —এ প্রশ্নটা তিনি জীবনে এই প্রথম শুনছেন না। সে প্রিয়জনটি কিন্তু ক্যান্সারে ভুগছিল না। উনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক কী করতে চাইছেন?

—ঐ লিস্ট-এ প্রতিটি গহনা কাকে দিচ্ছি তা লিখে আমি সই করে দেব। কাগজখানা আপনার কাছে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর আমার গহনার ভাগ কীভাবে হবে তার বিলিব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। আর একথা আপনি ওঁকে জানাবেন না। উনি দিল্লী থেকে ফিরে আসতে আসতেই আমার যদি কিছু হয়ে যায়...

বাসু অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়লেন, উনি কবে ফিরছেন? আপনাকে কিছু বলে গেছেন?

—না! সে সময় আমার একটা ক্রাইসিস্ চলছিল। যাবার সময় দেখা করেও যেতে পারেনি। তবে দিল্লীতে পৌঁছে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্ট থেকে ওর রবীন্দ্র অভিধান বাবদে একটা 'গ্র্যান্ট' না 'রিসার্চ-স্কলারশিপ' দেবার সম্ভাবনা আছে, ও তাই নিয়ে দরবার করতে গেছে। ফিরতে কিছু দিন দেরী হবে। তার আগেই যদি...

এ সংবাদটা চমকপ্রদ বৈকি। দিল্লী থেকে স্বর্গীয় চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রপ্রেরণ। কিন্তু কৌতূহল দেখানো চলে না। বাসু বলেন, সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্ট-এর কোন ডিপার্টমেন্ট? রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সেন্টারের এত দরদ...

—এই দেখুন না।—অম্লানবদনে বালিশের তলা থেকে একটি খাম বার করে দিলেন।

খামের উপর টাইপ করা মিসেস্ রমলা চট্টোপাধ্যায়ের নাম-ঠিকানা। পোস্টাল ছাপটা পরিষ্কার নয়াদিল্লীর। বাসু ইতস্তত করে বলেন, ওঁর আপনাকে লেখা চিঠি আমি পড়ব?

—এমন কিছু প্রেমপত্র নয়। আমাদের বিয়ে হয়েছে একুশ বছর আগে। পড়ুন।

খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করলেন। টাইপ করা চিঠি। আদ্যন্ত ফরাসী ভাষায়। সম্বোধনেই হোঁচট্ খাবার অভিনয় করে বললেন, 'মঞ্চেরি' মানে? আপনার আর এক নাম কি 'মঞ্চেরি'?

হাত বাড়িয়ে খামটা ফেরত নিলেন রমলা দেবী। হাসতে হাসতে বলেন, 'মঞ্চেরি' নয়, Mon Cheri—ফরাসী শব্দ একটা। আদরের ডাক: 'আমার প্রিয়!' আদ্যোপান্ত চিঠিটাই ফরাসী ভাষায় লেখা!

বাসু বলেন, আপনারা কি ফরাসী ভাষায় প্রেমপত্র আদান-প্রদান করতেন?

—উপায় কি? আমি স্কুল-কলেজে পড়েছি পারীতে। আমার বাবা ছিলেন পারীর ইন্ডিয়ান এম্ব্যাসীতে, ফরেন সার্ভিসে। ইংরাজীটা পরে শিখেছি। আর উনি যেটায় ডক্টরেট করেছেন সেই বাঙলা সামান্যই জানি। যাক্ কাজের কথায় আসুন। এ লিস্টটা বানিয়ে আপনি আমার এক্সিকিউটার হিসাবে কি...

—নিশ্চয়ই করব। বলুন আপনি একে একে।

লিস্টে পঁয়ত্রিশটা আইটেম! প্রত্যেকটি গহনার নিখুঁত বিবরণ ও ওজন উল্লিখিত। উনি একে একে বলে গেলেন—কে কোনটা পাবে। অনিতা পাবে হীরের নেকলেস্-ছড়া, আর মকরমুখী বালা। শুক্লা ছ-গাছা চুড়ি। উমা (বলাইয়ের স্ত্রী) মফচেনটা, বুধির-মা (ঝি) কানবালা, সীতা (দরোয়ানের ঘরওয়ালী) দুগাছা চুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশই বাসু-সাহেবের অপরিচিতা—তাদের বিশদ পরিচয়ও লিখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, বিকাশবাবুর ভাবী বধূকে কিছু দিচ্ছেন না?

—বাকি সম্পত্তিটাই তো তার। উনি যাবতীয় সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিয়েছেন। আমি আর কতদিন? আর আমার একমাত্র ওয়ারিশ তো খোকনই, আই মীন, বিকাশ! দিন এবার, সই করে দিই।

বাসু বলেন, না! এখনই নয়। অন্তত দুজন সাক্ষীর সামনে সইটা করবেন। আমি সুজাতা আর বিকাশবাবুকে ডাকি বরং।

—বিকাশের বদলে অনিতাকে ডাকলে হয় না?

—না। হয় না। অনিতা একজন 'বেনিফিশিয়ারি', মানে তাকেও আপনি কিছু দিচ্ছেন যে।

অগত্যা এরপর বিকাশ ও সুজাতাকে ডেকে উনি ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিলেন। সাক্ষী হিসাবে ওঁদের দুজনকে সই দিতে হবে। রমলা সই দিলেন। বাকি তিনজনও দিলেন। এরপর বাসু-সাহেব সুজাতাকে বলেন, ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডিরুমে একটা স্ট্যাম্প-প্যাড দেখছি। ওটা নিয়ে এস। চারজনের টিপছাপও নিতে হবে।

বিকাশ বললে, টিপছাপের কী দরকার? সই করেই দিলাম তো?

বাসু তার দিকে তাকিয়ে বলেন, এম.এ. পাস করার পর কিছুদিন 'ল' পড়েছিলে বুঝি?

—না তো! কেন?

—লাখ টাকার উপর যাব মূল্যমান তেমন দলিলে সইয়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, 1935, অ্যামেন্ডেড ইন্‌ 1955, ধারার নং 135(c).

বিকাশ আর উচ্চবাচ্য করল না। সুজাতা স্ট্যাম্প-প্যাডটা নিয়ে এল। সকলের টিপছাপ নিযে কাগজখানা পকেটস্থ করলেন বাসু! বমলা বললেন, খোকন, তোবা আবাব বাইবে যা। ওঁর সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে ।

দ্বিতীয়বার ঘর নির্জন হলে রমলা তাঁব চন্দনকাঠেব বাক্স থেকে তিনখানি গিনি তুলে নিয়ে বাসু-সাহেবকে দিলেন, বললেন, দুটো আপনার 'ফি' আর একটা সুজাতাকে আমার উপহার। এবার আলমারিটা বন্ধ করে চাবিটা আমাকে দিয়ে যান।

তেরো

ফেরার পথে বাসু-সাহেব বললেন, চল শেয়ালদার কাছে 'সুইট হোম'-এ একটা টুঁ মেবে যাই।

—'সুইট হোম'! কেন?

—বিকাশবাবুর অ্যালেবাইটা পাকা কিনা যাচাই করতে। অর্থাৎ ছ তারিখে সন্ধ্যায় ও ঐ হোটেলে চেক-ইন করেছিল কিনা।

কৌশিক বলে, কিছু মনে করবেন না মামু, আপনার সন্দেহের লিস্টে কি রানু মামীমাও আছেন? তাঁর অ্যালেবাইটাও যাচাই করবেন?

সুজাতা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

বাসু বলেন, এইমাত্র জেনে এলাম যে, লোকটা ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল! 'ভাল'র জন্য যে এমন কৌশল করতে পারে, প্রয়োজনে 'খারাপে'র জন্যও...

—কী জেনে এসেছেন?

বাসু গাড়ি চালাতে চালাতে বর্ণনা দিলেন—স্বর্গীয় চন্দ্রচূড়ের প্রেমপত্রখানির। বিকাশকে পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন—চিঠিখানির ইংরাজি বয়ান বিকাশের, অনুবাদ ডুপ্লে কলেজের এক অধ্যাপকের, যিনি ভাল ফ্রেঞ্চ জানেন। অনিতা সুযোগ মত আলমারি খুলে জেনে নিয়েছিল, চন্দ্রচূড় তাঁর ধর্মপত্নীকে প্রেমপত্রে কী জাতীয় মধুর সম্বোধন করতেন। চন্দ্রচূড়ের সইটা জাল করা হয়েছে। তারপর ঐ খামটা আর একটা বড় খামে ভরে বিকাশ তার দিল্লীবাসী এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয়, দিল্লীর ডাকঘরে 'পোস্টিত' হতে! আদ্যন্ত পাকা ক্রিমিনালের কাজ! রমলা কিছুমাত্র সন্দেহ করেননি।

সুজাতা বলল, কিন্তু বিকাশবাবুর স্বার্থটা কি? চন্দ্রচূড় খুন হন বা না হন—তিনি তো সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

—তা ঠিক। তবে এ পথ দিয়েই যখন যাচ্ছি তখন সুইটার হোমে পৌঁছনোর আগে সুইট-হোমটায় একটু টুঁ দিতে দোষ কী?

মনোহরবাবু অমায়িক লোক। হাত জোড় করে বললেন, ছরি ছার। আমার গোটা হোটেল অখন বুকট। একটা ঘরও খালি নাই।

বাসু-সাহেব আত্মপরিচয় দিলেন। তাতে মনোহর বিগলিত হলেন ঐ 'বার-অ্যাট-ল' অংশটায়। মনে হল না তিনি বাসু-সাহেবের নাম জীবনে কখনো শুনেছেন। বাসু বললেন, আমরা একটা 'ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন' করছি...

---কী করতাছেন? বাঙলায় কয়েন মোশাই। ইঞ্জিরি আমি ভাল বুঝি না—

---একজন অপরাধীকে খুঁজছি আর কি। আপনার হোটেল-রেজিস্টারটা যদি কাইন্ডলি একবার দেখতে দেন?

মনোহরবাবুর মূর্তি অন্যরকম হল। বললেন, আজ্ঞে না। চোর-ছ্যাঁচড় বদমাইশ আমার হোটেলে ওঠে না। সবই ভদ্দরলোকের পোলা।

বাসু বললেন, অ। তা তিন কাপ চা হবে? বসে খেতাম?

—তিন কাপ ছাড়্যা ছয় কাপ খান না—কিন্তু খাতা-পত্তর দ্যাখন চলব না।

—আর কাইন্ডলি যদি একটা টেলিফোন করতে দেন—

---ক্যান দিমু না? আঠানা লাগব কিন্তু।

--শ্যুয়র। ---হিপ পকেট থেকে একটা আধুলি বার করেন বাসু-সাহেব।

মনোহর তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ চোখ লাল। বললেন, আপনে আমারে গাইল দিলেন?

—গালি? ও আই সী। না না, শুয়োর কই নাই। SURE—যারে 'শিয়োর' কয় আর কি! আমার কিছুটা উচ্চারণের দোষ আছে।

মনোহর শান্ত হলেন! আধুলিটা পকেটস্থ করে ছোকরা চাকরটাকে বললেন, বাইরে তিনখাপ ছা।

কৌশিক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, কত নম্বর স্যার?

--45-7586, ওটা D I G/ C.I D.-র পার্সোনাল লাইন। সুকোমল যদি থাকে তবে আমার নাম করে বল সুইট-হোমের নামে একটা সার্চ-ওয়ারেন্ট পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। আমরা এখানেই বসে চা খাচ্ছি।

অতি ধীরে গাত্রোত্থান করে মনোহর বলেন, ব্যাপারডা কী? D.I.G./ C I.D. আবার কেডা?

--ডেপুটি আই জি., ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। সার্চ-ওয়ারেন্ট ছাড়া যখন খাতাপত্র দেখা যাবে না...

তিনটে ডিজিট ডায়াল করা হয়েছিল। বাকি কৌশিক করতে পারল না তার হাতটা মনোহরবাবু বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরায়।

একেবারে অন্যমূর্তি। সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।

হ্যাঁ... বিকাশবাবুকে উনি চেনেন... চন্দননগরের বিকাশ মুখুজ্জে।... ছয়ই নভেম্বর কইলেন না? হ্যাঁ, আইছিলেন। রাত্রে থাকছিলেন। খায়েন নাই। পরদিন তাঁর ফোন আইল... চন্দননগরে সেই চন্দ্রচূড়... নাম শুনছেন না? ঐ যে 'এবিছি' হত্যার কেস্! অরই তো বুনাই... সেই ফোন পাইয়াই ছুটল!.. তখন কয়ড়া? অ্যাই নয়ডা হইব মনে লাগে।

আরও অনেক তথ্য অযাচিতই বলে গেলেন। বিকাশ এসেছিল গাড়িতে। গাড়ি খারাপ হয়। সারাতে দেয়। প্রথমে মনোহরবাবু ওঁকে সীট দিতে রাজি হননি। কারণ দোতলার তিন-নম্বর ঘরে কলে কী গণ্ডগোল হয়েছিল। অ্যাক্কেরে পানি আসছিল না। আর সব সীট ভর্তি। তা বিকাশবাবু কইলেন, রাতটুকু তো থাকুম। পানি লয়্যা কী করুম? এক বাল্‌তি পানি বাথরুমে দিয়া দ্যান, তাতেই হইব।

বাসু প্রশ্ন করেন, তা কলটা রাত্রে সারানো গেল না?

—না, রাতে পেলামবাব পাইব কোই? পর্বদিন সাবাইলাম।

কৌশিক বুঝে উঠতে পাবে না এসব খেজুরে আলাপ করে কেন উনি সময় নষ্ট কবছেন।

সুজাতা ইতিমধ্যে বর্ধমান থেকে ঘুবে এসেছে মধুবাক্ষীব গোপন বার্তা নিয়ে। এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র। সর্বসমেত সতেব খানি। তাব ভিতব সাতখানি অমল দত্তেব। ছ খানি যিনি লিখেছেন—বাঙলায়, তাঁব নাম-ঠিকানা-পবিচয় নেই। প্রতিটি পত্র শেষে 'ইতি তোমাব মালাকাব'। এঁব প্রথম পত্রটিতেই এই নামেব গঙ্গোত্রী ইতিহাস আছে। প্রথম পত্রে প্রেমিক একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন· 'আমি তব মালঞ্চেব হব মালাকাব।' বাকি চারখানি ইংবেজিতে টাইপ করা।

ইনিও সাবধানী। ভাষা মার্জিত। পবিচয় গোপন বাখা হয়েছে। পত্রশেষে লেখা আছে—'Yours Ever Mugdha-Bhramar' এই 'মুগ্ধ ভ্রমব'-টির ইংরেজিতে বেশ মুন্সিয়ানা আছে। টাইপিং-এও ভুল কম। বেশ বোঝা যায়, এ লোকটা বনানীব খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না—ওবা শুধু প্রেম কবতে চেয়েছিল, অথবা ফুর্তি। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনেব সম্ভাব্য বিড়ম্বনা এড়াতে আত্মগোপন কবেছে।

কৌশিক বললে, আমাব ধাবণা—যে লোকটা বাসুমামুকে চিঠি লেখে সে প্রথম খুনটা কবেছে এবং শেষ খুনটা। কাবণ এ দুটিব কোন মোটিভ নেই। খুন করে কেউ লাভবান হয়নি। খুনেব জন্যই খুন। আব বনানীকে যে হত্যা কবেছে সে ওব কোন প্রেমিক। লোকটা হয স্যাডিস্ট, অথবা ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে...

সুজাতা বলে, কিন্তু 'নাম' আর 'স্থান'? নিতান্তই কাকতালীয?

—হতে পারে। অথবা বনানীর হত্যাকারী ঐ অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল সুযোগটা নিয়েছে' যাতে পুলিস মনে করে, এটা ঐ অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল হত্যাবিলাসীর কাণ্ড! এমনটা কি হতে পারে না? বাসুমামু কী বলেন?

বাসু বলেন, এখনো সিদ্ধান্তে আসার মতো 'ডাটা' পাইনি।

বানু বলেন, তুমি কি সেই বড়দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে চাও?

বাসু চটে ওঠেন, তা আমি কী করতে পাবি? পুলিস পর্যন্ত এখন আমার সঙ্গে সহযোগিতা কবছে না। সেই বুড়ো ইস্কুল-মাস্টারটা ধরা পড়লেও হয়তো কিছুটা ধাবণা কবতে পাবি। এখন তো ঘোর অন্ধকব। পণ্ডিচেরীব ফাইলটাও যে দেখতে পেলাম না! মহারাজজী একেবারে ধবাছোঁয়াব বাইবে।

কৌশিক বলে, আপনি কি তাঁকে সন্দেহ করেন?

—করব না? মাস-মাস সাড়ে চারশ টাকা মনি-অর্ডার করত। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ বা ক্রস-চেক-এ টাকা পাঠালে অনেক কম খরচ পড়ত। কিন্তু 'চেক' মানেই একটা ক্লু—ব্যাঙ্ক বেফাবেন্স' রহস্যটা পণ্ডিচেরীতে। কিন্তু পুলিস আমাকে সেসব কাগজ দেখতে দেবে না।

অবশেষে বুড়ো ইস্কুল-মাস্টারটা ধরা পড়ল।

চন্দননগরে। ষোল তারিখ সকালে।

বলাই বাজার করে ফিরছিল! হঠাৎ নজরে পড়ে একজন বুড়ো ভিখারী দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে ওভারকোট নয়—ছেঁড়া শার্ট। পায়ে ক্যাম্বিসেব জুতো—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে আছে। বলাই স্বপ্নেও ভাবেনি এই সেই লোক। খবরের কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে এই কঙ্কালসার ভিখারীর কোন সাদৃশ্যই নেই। বলাই বললে, এগিয়ে দেখ বাপু, এখানে ভিক্ষা হবে না। বাড়িতে অসুখ।

—না বাবা, ভিক্ষা চাইছি না। ...মানে এটাই কি ডক্টর চন্দ্রচূড় চাটুজ্জের বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে চাই? বিকাশবাবুকে?

—না বাবা, চাইছি না কাউকে। আচ্ছা ডক্টর চ্যাটার্জি যে বেঞ্চিটাব সামনে খুন হয়েছিলেন তুমি সেটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পাব?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা সম্ভাবনা বলাইয়ের মনে জাগল। একটা 'হিন্দি পিক্চারে' ডিটেকটিভ বলেছিল—খুনী প্রায়ই খুনের জায়গাটা দেখতে আসে।

বলাই ওখান থেকে চিৎকার করে ওঠে—দারোয়ানজী!

দারোয়ান তার গুমটিতে বসে আটা মাখছিল। বলাইয়ের চিৎকার শুনে সে বেরিয়ে আসে।

অনিতা আর বিকাশ বাগানে গল্প করছিল। তারাও দৌড়ে আসে।

বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! বিকাশ দরোয়ানকে প্রশ্ন করে, পহছন্তেহ?

বৃদ্ধ সে কথা শুনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না, না, আমি ...আমি ওঁকে খুন করিনি!

দরোয়ান লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে শুধু বললে, কিতাববাবু!

বিকাশ প্রচণ্ড জোরে বৃদ্ধের চোয়ালে একটা ঘুষি মারল।

যে ভঙ্গিতে চন্দ্রচূড় উবুড় হয়ে পড়েছিলেন ঠিক সে ভঙ্গিতেই হাত-পা ছড়িয়ে ছিট্‌কে পড়লেন হেমাঙ্গিনী স্কুলের থার্ড-মাস্টার।

অনিতার কী হল—সে লাফ দিয়ে পড়ল বৃদ্ধের উপর। তাঁকে আক্রমণ করতে নয়, রক্ষা করতে। চিৎকার করে বলে, কেউ ওঁর গায়ে হাত দিও না! মরে গেলে কিন্তু তোমরাও খুনের দায়ে পড়বে!

বিকাশের তখনও রাগ পড়েনি। সে দারোয়ানের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নেয়। কিন্তু আঘাত করা সম্ভব হয় না। অনিতা বৃদ্ধকে আঁকড়ে উবুড় হয়ে পড়েছে। তখনও সে বলছে, বিকাশদা! ঠাণ্ডা হও! য়ু কান্ট টেক ল ইন য়োর ঔন হ্যান্ডস্!

বিকাশ সম্বিৎ ফিরে পেল। তার ডান হাতটা ঝন্‌ঝন্ করছে। সে বাড়ির দিকে ফিরল থানায় ফোন করতে। অনিতা দেখল, বৃদ্ধ জ্ঞান হারিয়েছেন। নিজের দাঁত দিয়ে জিবটা বোধহয় কেটে গেছে। মুখ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বললে, দারোয়ান জল, জল নিয়ে এস। বলাই দৌড়ে যা! ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্ শিগ্‌গির!
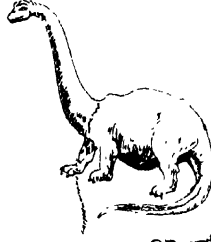
পরদিন সকালে চার-পাঁচখানি কাগজ নিয়ে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ওঁরা ভাগাভাগি করে পড়ছিলেন। সব কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা বেরিয়েছে। অনেক ছবিও। সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে দুটি পত্রিকায়। বিশু এসে খবর দিল—একজন বাবু আর একটি মেয়েছেলে দেখা করতে চাইছেন। সুজাতা উঠে দেখতে গেল এবং ফিরে এসে বললে, ডক্টর দাশরথী দে আর তাঁর মেয়ে।

বাসু বললেন, এখানেই ডেকে নিয়ে এস।

ডাক্তার দে বললেন, তিনি পুলিসে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে জানানো হয়েছে এ অবস্থায় বাইরে কোনও লোকের সঙ্গে আসামীকে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

—উনি আছেন কোথায়? হাসপাতালে না হাজতে?

—হাজতে। ফার্স্ট-এড দিয়ে ওঁকে হাজতেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাসু বললেন, একটা টাকা দিন তো?

—আজ্ঞে?

—একটা ভাঙতি টাকা, কয়েন বা নোট।

এবারও প্রশ্নটা বোধগম্য হল না তাঁর। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। মৌ তার ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে।

বাসু বলেন, টাকাটা তোমার বাবাকে দাও। ...ইয়েস্! দ্যাটস্ কারেক্ট। এবার আপনি আমাকে ঐ টাকাটা দিন? ...হ্যাঁ আমাকেই।

সুজাতা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে রসিদ বইটা। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, রসিদটা কার নাম হবে?

—ডাক্তার দাশরথী দে, ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অব্ শিবাজীপ্রতাপ বোস, লীগ্যালি ইনসেন্।

ডাক্তার দে বলেন, ওটা ...মানে ...ঐটুকুই আপনার রিটেইনার?

—হ্যাঁ! আপনার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হাজতের ভিতরে দেখা করার ছাড়পত্র। এখন আইনত আমি তাঁর লীগ্যাল কাউন্সেল। আপনাদের কিছুতেই হাজতে ঢুকতে দেবে না; কিন্তু আমাকেও কিছুতেই আটকাতে পারবে না।

চোদ্দ

হাজতের একান্তে একটি কোনায় বসেছিলেন বৃদ্ধ। কান-মাথা দিয়ে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। যেন কানকাটা ভিন্সেন্ট ভাঁ গখ্! বাসু-সাহেবকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে প্রহরী বাইরে গেল। শ্রুতিসীমার বাইরে, দৃষ্টিসীমার নয়। আসামী আগন্তুকের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে। পরক্ষণেই নত করে তার দৃষ্টি। তার মুখ ভাবলেশহীন।

—আপনি আমাকে চেনেন? —মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন বাসু।

কথা বলতে ওঁর বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয় জিবটা কেটে গেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে তবু বললেন, চিনি। উকিলবাবু।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার নামটা জানেন?

শিবাজীপ্রতাপ নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করলেন। মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি।

—আমার নাম: পি. কে. বাসু।

—ও।

—আমার নাম ইতিপূর্বে কখনো শুনেছেন?

আবার ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো মাথাটা নড়ল। নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি।

—প্রসন্নকুমার বাসু, 'পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল'-এর নাম কখনো শোনেননি?

এতক্ষণে উনি আগন্তুকের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি ছত্রপতি শিবাজীর নাম শুনেছেন? চিতোরের রাণা প্রতাপের?

—হ্যাঁ শুনেছি। নিশ্চয় শুনেছি।

—আপনি কি মনে করেন, আপনি ওঁদের মত একজন কেওকেটা?

—না, তা মনে করি না! কিন্তু তাহলে আপনি কেমন করে জানলেন যে, আমি উকিল!

—সহজেই। আমার মতো কপর্দকহীন আসামীর জন্য আদালত থেকে সরকারী খরচে উকিল দেওয়া হয় এটা জানি বলে।

—না। ওখানে ভুল হচ্ছে আপনার। আমি সরকার-নিযুক্ত নই। আমাকে নিযুক্ত করেছেন ডক্টর দাশরথী দে। তাঁকে চেনেন?

হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, বাঃ! দাশুকে চিনব না? কেমন আছে ওরা? দাশু, বৌমা, মৌ?

—ওরা সবাই ভাল আছে। শুনুন, আমি আপনার পক্ষের উকিল, মানে আপনার বিরুদ্ধে পুলিস যে অভিযোগ এনেছে আমি হচ্ছি তার...

—বুঝেছি, বুঝেছি! য়ু আর দ্য ডিফেন্স-কাউন্সেল!

—আমাকে সব কথা খুলে বলবেন তো? সব, স—ব কথা?

বৃদ্ধ ঊর্ধ্বমুখে অনেকক্ষণ কী-যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বলব, তবে এক শর্তে!

—শর্ত। কী শর্ত!

—আপনি কথা দিন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন যেন আমার ...আমার ফাঁসি হয়। যাবজ্জীবন নয়! কথা দিন!

বাসু একটু থমকে গেলেন। বৃদ্ধের কথাবার্তা, ব্যবহারে পাগলামির কোনও লক্ষণ তো নেই! বলেন, কেন? কেন নয় বেকসুর খালাস?

—সেটা অসম্ভব! আর তাছাড়া তাহলে তো আবার সেই রেকারিং ডেসিমেল?

—তার মানে?

—নিজেকে খুঁজে ফেরা। কিছুতেই নিজের নাগাল পাব না ...'খুড়োর কল'-এর মতো...

—অথবা সেই চিল্লানোসরাস্-এর মতো...

—এক্‌জ্যাক্টলি! যে কোনদিনই ব্যাচারাথেরিয়ামের নাগাল পাবে না।

—তাহলে ছবিটা কেটে ফেললেন কেন?

—কেটে তো ফেলিনি। ছুরি মেরে ছিলাম! ...ও ইয়েস্ অ্যাদ্দিনে ঠিক মনে পড়েছে। এই দেখুন দাগ!

ডান হাতের তালুটা মেলে ধরেন। সত্যিই তাতে একটা কাটা দাগ। বেশি পুরানো নয়।

বাসু প্রশ্ন করেন, কাকে ছুরি মেরেছিলেন? চিল্লানোসরাস্‌কে?

—দূর! তাকে মারব কেন? সে তো কামড়ায় না। শুধুমুধু হাঁ করে। ভয় দেখায়।

—তবে কাকে ছুরি দিয়ে মেরেছিলেন?

—ভুলে গেছি।

বাসু কোন নাগালই পাচ্ছেন না। সবই ধোঁয়াশা। আবার প্রশ্ন করেন, আপনার ঘরে একটা টাইপ-রাইটার দেখলাম। সেটা কত দিয়ে, কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন মনে আছে?

—কিনিনি তো। আমার এক ছাত্তর উপহার দিয়েছিল। তার নামটা ভুলে গেছি।

—নাম তো ভুলে গেছেন, চেহারাটা মনে আছে?

—ধূস্! কদ্দিন তাকে দেখি নাই।

—নাম তো মনে নেই, উপাধিটা মনে আছে। বামুন না কায়েত, হিন্দু না মুসলমান...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বলাতে মনে পড়ল, ছেলেটি মুসলমান। আর কিছু মনে নেই।

বাসু এবার অন্যদিক থেকে প্রশ্নবাণ নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। বলেন, এই নামগুলোর একজনকেও চেনেন? অধর, বনানী...

—বাঃ! ওদের খুন করলাম, আর নাম জানব না? আসানসোলের অধর আঢ্যি, উনিশে অক্টোবর; বর্ধমানের বনানী বনার্জী, সাতাশে অক্টোবর; নেক্সট চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চাটুজ্জে, সাতই নভেম্বর।

—আর পঁচিশে ডিসেম্বর?

—পঁচিশে ডিসেম্বর! সেটা তো লর্ড যীসাস-এর জন্মদিন: সেদিন আবার কাউকে খুন করতে যেতে হবে নাকি? আঃ—ছি-ছি-ছি! অমন পুণ্যদিনে! কই কোন নির্দেশ তো পাইনি?

বাসু হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, যাঃ! এটা কি ভোলা যায়? ঐ একই লোক তো ইনস্ট্রাকশান দিল?

—কোন লোক?

—সেটা তো আপনি বলবেন! কোন্ লোক?

বৃদ্ধ আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনে হল। অথবা অপরূপ অভিনয়। মনে হল, তিনি অন্ধকারের ভিতর হাৎড়াচ্ছেন—কে সেই লোকটা, যে বারে বারে ওঁকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, আসানসোলের অনাদি আঢ্যি, বর্ধমানের বনানী বনার্জি, চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি—

শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আয়াম সরি। একদম মনে পড়ছে না।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আমি আবার আসব। মনে করবার চেষ্টা করুন। কে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল ঃ 'এ' ফর আসানসোল, 'বি' ফর বার্ডওয়ান; 'সি' ফর চন্দননগর, অ্যান্ড 'ডি' ফর...

—কী? 'ডি' ফর কী?

—ভাবুন ভাবুন। 'ডি' ফর কী হতে পারে? ক্লু তো দিয়ে গেলাম। একই লোক নির্দেশ দিল। পঁচিশে ডিসেম্বর! এই নিন, এই নোট বই আর পেনসিলটা রাখুন। যখন যেটা মনে পড়বে চট করে লিখে ফেলবেন, 'ডি' ফর কী? কে আপনাকে টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছিল, কে আপনাকে এতগুলো নির্দেশ একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিল ...কেমন?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে।

বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন। বাসু-সাহেবের হাত দুটো ধরে বললেন, আমি আমার কথা রেখেছি। আপনিও আমার অনুরোধটা রাখবেন তো?

—কোন্‌টা?

—যাতে ওরা যাবজ্জীবন না দেয়! তিন তিন্‌টে খুন! ফাঁসী না দেবার কোন যুক্তি নেই। নয়?

—বাসু-সাহেব ফিরে আসতেই কৌশিক এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, শিবাজীবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

—হল! কিন্তু কিছুই ওঁর মনে পড়ছে না। তুমি ইতিমধ্যে কতদূর কী করলে বল?

কৌশিক তার রিপোর্ট দাখিল করল। খবরের কাগজে যে মেন্টাল হস্‌পিটালের উল্লেখ আছে সেখানে সে গিয়েছিল। মানসিক চিকিৎসালয়টি ভাল। ডাক্তারবাবুও বেশ সজ্জন। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর কেস্‌-হিস্ট্রিটা তিনি রেজিস্টার খুলে দেখিয়েছিলেন। কৌশিক সেটা আদ্যন্ত টুকে এনেছে। মাস্টারমশাই কবে ঐ মানসিক হাসপাতালে প্রথম আসেন, কতদিন ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা রোগীর অবচেতন মনের জট ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে যেসব প্রশ্নোত্তর করা হয়েছে তাও। তাতে ওঁর পূর্বকথা অনেক কিছু জানা গেল। বাসু-সাহেব অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন: এই তো! নামটা পাওয়া গেছে। হানিফ মহম্মদ!

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বলে, হ্যাঁ। পরীক্ষার হলে উনি যার গলা টিপে ধরেন তার নাম হানিফ মহম্মদ। এটাই প্রথম কেস। তারপর...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, হানিফ মহম্মদ! আশ্চর্য! তাহলে আমি যে পথে ভাবছি...

আবার চুপ করে যান উনি। বাসু-সাহেব কোন পথে কী ভাবছেন তা কৌশিকের জানা নেই কিন্তু এটুকু জানে যে, এখন নীরবতা ভঙ্গ করতে নেই।

বাসু হঠাৎ তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভারটা। একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

—হ্যালো, আমি পি. কে. বাসু. বলছি, তোমার বাবা কি বাড়ি আছেন? ...ও নেই বুঝি... হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। উনি ভালো আছেন, শারীরিক ও মানসিক। তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন ...হ্যাঁ আমাকে তাঁর ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আচ্ছা শোন, একটা কথা বলতে পার? ওঁর ডান হাতের তালুতে একটা কাটা দাগ দেখলাম—হাতটা কী ভাবে... ইয়েস, বল?

কৌশিক নীরবে অপেক্ষা করে। বুঝতে পারে ও প্রান্ত থেকে মৌ একটি দীর্ঘ ইতিহাস বলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ একটানা শুনে বাসু-সাহেব বললেন, তা সেদিন এসব বলনি কেন? ...আই সী! ঠিক কথা! সেদিন আমি ওঁর ডিফেন্স-কাউন্সেল ছিলাম না। তা সেদিন আর কিছু গোপন করেছিলে নাকি? ...বাঈ জোভ্‌! ডায়েরী! ওঁর নিজের হাতে লেখা! সেটা পুলিশে সীজ করেনি? ও! তুমি আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলে! শোন, কৌশিক, রিপ্রেজেন্টিং 'সুকৌশলী' আধঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে যাচ্ছে। তার আইডেন্টিটি চেক আপ্‌ করবে প্রথমে; তারপর আমার ভিজিটিং কার্ডের পিছনে তোমাকে লেখা একখানা চিঠি পেলে কৌশিকের হাতে ডায়েরিটা দিয়ে দিও। কেমন? ...কী? বাঃ! আমার লাইন কেউ ট্যাপ করছে কি না তার গ্যারান্টি কী? ঐ ডায়েরিটা ভাইটাল এভিডেন্স!

নিজের ভিজিটিং কার্ডের পিছনে মৌকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে কার্ডখানা কৌশিকের হাতে দিয়ে বললেন, কী করতে হবে বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়িটা নিয়ে ডক্টর দাশরথী...

—আজ্ঞে না! ট্যাক্সি নিয়ে যাও। গাড়ি নিয়ে আমি ঐ মেন্টাল হস্‌পিট্যালে যাব।

—কেন মামু?

—যে ভাইটাল ক্লুটা তুমি জেনে আসনি, সেটা জানতে! অফ্‌ যু গো!

দুজনে দুদিকে রওনা হয়ে গেলেন আবার।

বাসু-সাহেব যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখটা থম্‌থম্‌ করছে। ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সুজাতার সঙ্গে। বাসু প্রশ্ন করেন, কৌশিক ফিরেছে?

—হ্যাঁ! ডায়েরিটা আপনার স্টাডিরুমের টেবিলে...

—থ্যাঙ্কু! শোন! আমাকে কেউ যেন এখন ডিসটার্ব না করে! ও. কে.?

উনি সটান ঢুকে গেলেন ওঁর চেম্বারে।

ঘণ্টাখানেক পরে ইন্টারকমে উনি রানী দেবীকে খুঁজলেন, রানু, উড্‌ যু কাইন্ডলি হেল্‌প্‌ মি এ বিট? এ ঘরে চলে এস প্লীজ।

হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানু প্রবেশ করলেন ওঁর খাশ-কামরায়।

বাসু বলেন, ডায়েরিটা পড়া হয়ে গেছে। এখন আমার দুটো কাজ। এক নম্বর একটু নিরিবিলি চিন্তা করা; দুনম্বর—একগাদা টেলিফোন করা। তুমি দ্বিতীয় কাজের দায়িত্বটা নাও; একে একে ডায়াল করে লোকগুলোকে ধর। লাইন পেলেই আমাকে দিও। একটা কাগজে নামগুলো লিখে নাও। এই পর্যায়ে : রবি বোসকে তার অফিস নাম্বারে, চন্দননগরে বিকাশকে, 'কুশীলব'-এর দপ্তরে যাকে পাওয়া যাবে, আর স্যারকে।

রানী দেবী খুশি হলেন কিছু করতে পেয়ে। টেলিফোন গাইড আর নোটবই দেখে একে একে নম্বরগুলো ডায়াল করতে থাকেন। 'স্যার' বলতে কার কথা বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রানুর, অশীতিপর ব্যারিস্টার এ. কে. রে, যাঁর অধীনে প্রথম জীবনে জুনিয়ার হিসাবে বাসু-সাহেব ব্যারিস্টারি শুরু করেছিলেন।

প্রথমেই রবি বসু। লাইনটা পেতেই রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন রানী দেবী।

—শোন রবি। আমি বাসু বলছি। আমি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছেছি A. B. C.-র মধ্যে একটা অ্যালফাবেটের জন্য S. P. C. দায়ী নন! ...সরি, টেলিফোনে আর কিছু বলা যাবে না। তুমি কখন আসতে পারবে? ...না, না, অত তাড়াতাড়ি নয়। কারণ এখানে আসার আগে তোমাকে আর একটি কাজ করে আসতে হবে! তোমার সন্ধানে কোন 'এ-ওয়ান-গ্রেড'-এর পকেটমার আছে? ...হ্যাঁ গো! 'পকেটমার'! ...কী আশ্চর্য! পুলিসের লোক আর 'পিকপকেট' চেন না? ...হ্যাঁ! এক সন্ধ্যার জন্য তাকে নিযুক্ত করতে চাই! ...যাকে পাও ...মকবুল, ছোট খোকন, যোসেফ যাকে হয় ...তবে পাকা হাত হওয়া চাই ...ও.কে.! আমি অপেক্ষা করব। ...হ্যাঁ, ঐ 'কনৌসার অফ্ পিক-পকেট'কে সঙ্গে নিয়ে আসা চাই।

রিসিভারটা ফেরত দিয়ে উনি পাইপ ধরালেন। রানী দেবী জানতে চাইলেন না পকেটমারের কী প্রয়োজন হল। চন্দননগরে ডায়াল করতে থাকেন।

বিকাশ জানালো, তার মনে আছে। রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা। হ্যাঁ, অনিতাকে নিয়েই সে আসবে। তার দিদি একটু ভাল আছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে। বোধ করি, স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অপেক্ষায় তিনি এভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন। হ্যাঁ, উনি স্বামীকে চিঠি লিখেছেন। ইংরাজিতে। ডিক্টেশন দিয়েছেন। শুক্লা লিখে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, সে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি। বিকাশ আরও বলল, এখন কি আর রবিবারের মিটিংয়ের আদৌ কোন মানে হয়?

বাসু-সাহেব জবাবে বললেন, আসানসোল থেকে সুনীল, বর্ধমান থেকে অমল দত্ত, মনীশ সেনরায় আর ময়ূরাক্ষী আসছে। ওদের দুজনকে মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের দুটি ফটো আনতে বলা হয়েছে। বিকাশও যেন চন্দ্রচূড়ের একটি আলোকচিত্র নিয়ে আসে। ঘরোয়া পরিবেশে পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা জানানো আর স্বর্গতঃ আত্মার শান্তিকামনা। অপরাধী যখন ধৃত তখন আর তো কিছু করার নেই!

'কুশীলব'-এর দপ্তরেও একই বার্তা জানানো হল। আরও অনুরোধ করা হল, রবিবারের এই যৌথ শোকসভায় 'কুশীলব'-এর তরফে কেউ যেন বনানীর অভিনয়-প্রতিভার বিষয়ে কিছু বলেন, আর ঊষা বাগচী যেন অবশ্যই আসে। দুটি গান গাইতে। উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সঙ্গীত। বাসু-সাহেব জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ঊষার বাড়িতে টেলিফোন আছে। অতঃপর তাকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে ফোন করে অনুরোধ করলেন। জানতে চাইলেন, তোমাকে এ জন্য যে সম্মান-দক্ষিণা...

ঊষা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, কী বলছেন স্যার! বনানী আমার বন্ধু, সহকর্মী! তার স্মরণসভায় আমি পয়সা নিয়ে গান গাইব? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আসব, স-তবলচি।

রানী জিজ্ঞাসা করেন, তোমার লিস্ট খতম। আর কাউকে ফোন করতে হবে কি?

—হ্যাঁ, ডক্টর মিত্র, ডক্টর ব্যানার্জি আর টেম্পল চেম্বারে নিবিকে।

—'নিবি' কে?

—ভাল নামটা মনে নেই, 'মজুমদার নিবি'তে এন্ট্রি আছে আমার 'ফোন-বুকে।'

ক্রিমিনোলজি এক্সপার্ট ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতটিকে একই আমন্ত্রণ জানানো হল।

নিবি মজুমদার ব্যক্তিটিকে রানী চিনতে পারলেন না। কিন্তু বাসু-সাহেবের একতরফা আলাপচারী শুনে ওঁর মনে হল তিনি কোনও প্রখ্যাত সলিসিটার ফার্ম-এর পার্টনার।

—কে নিবি? হ্যাঁ, আমি বাসুই বলছি। আমার মনে হয় সময় হয়েছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি দলিলটা নিয়ে রবিবার বিশ তারিখ সন্ধ্যা ছটার সময় আমার বাড়িতে চলে এস। ...হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি উত্তরপ্রান্তে থাক। বাড়ি ফিরতে রাত হবে। তা হোক না একদিন। গিন্নিকে বলে এস যে, আমার বাড়িতে আসছ! না হয় বল আমিই আরতিকে ফোন করে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি তার কর্তাকে আটকে রাখার জন্য!

ও প্রান্তবাসী কী বললেন তা শুনতে পেলেন না রানী। তবে হাসির কথা নিশ্চয়ই। কারণ হেসে উঠলেন বাসু-সাহেব। বললেন, সেম টু য়ু!

রানী দেবীর ডিডাক্‌শান—ঐ অজ্ঞাত নিবি মজুমদারের শেষ শব্দটা ছিল 'গুড্-ল্যাক স্যর!'

বাসু-সাহেব হেসেছেন। 'পর্বতো খোশমেজাজ হাস্যাৎ।' তাই রানী এতক্ষণে সাহস করে বললেন, তিনটে খুনের অন্তত একটা মাস্টারমশাই করেননি, নয়?

বাসু পাইপে একটা টান দিয়ে বললেন। কারেক্ট! আর কোন ডিডাক্‌শান?

—এবং সেই খুনের নায়ক রবিবার সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হলেন? ঠিক বলেছি?

—সুপার্ব! এ না হলে পি. কে. বাসুর বউ!

—এবং সেই একমাত্র খুনটা হচ্ছে ঃ বনানী?

—পার্টলি কারেক্ট!

—'পার্টলি কারেক্ট' মানে? হয় 'কারেক্ট' নয় 'ইন্‌কারেক্ট'। তিনটে খুনের একটা...

—এ ধাঁধার সমস্যা পি. কে. বাসুর বউয়ের স্বামী ছাড়া কেউ সমাধান করতে পারবে না!

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। রানী দেবী তুললেন, শুনে নিয়ে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, লডন স্ট্রীট থেকে আই. জি. ক্রাইম তোমাকে খুঁজছেন।

বাসু রিসিভারটা গ্রহণ করে তার 'কথা-মুখে' বলেন, শুভ সন্ধ্যা ঘোষাল সাহেব! বলুন?

—আজ সন্ধ্যায় আপনার প্রোগ্রাম কী?

—নিত্যকর্মপদ্ধতি-অনুসারে গৃহাবরোধে মদ্যপান।

—একটু পরিবর্তন করা যায় না? না, না, প্রোগ্রামটা বদলাতে বলছি না, 'ভেনু'টা—অর্থাৎ নিত্যকর্মপদ্ধতিটা যদি আমার গৃহাবরোধে সারতে আসেন? অ্যারাউন্ড সাড়ে আটটায়?

—ম্যাগনিফিক! কিন্তু হেতুটা?

—কাল হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, আমার 'সেলারে' একটা 'রয়্যাল-স্যালুট' বন্দিনী অবস্থায় প্রতীক্ষারতা। ও বস্তুটা একা একা উপভোগ করা যায় না, আবার উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়াও শক্ত। আপনি কি আমাকে সঙ্গ দিয়ে কৃতার্থ করতে পারেন না?

—আসাতে! আমি রাজী। কিন্তু একটি শর্ত আছে ঘোষাল-সাহেব!

—হুকুম করুন।

—'রয়্যাল-স্যালুট'-এর সঙ্গে আপনি প্যারীচরণ সরকারকে পাঞ্চ করবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—প্যারীচরণ সরকার? অস্যার্থ?

—প্যারীচরণ ছিলেন 'The Arnold of the East!' তাঁর করুণাতেই প্রথম A.B.C.D. শিখেছিলাম।

টেলিফোন রিসিভারে ভেসে এল ঘোষাল-সাহেবের অট্টহাসি। বললেন, কিন্তু 'প্যারীচরণ'কে 'রয়্যাল স্যালুট'-এর সঙ্গে কেন পাঞ্চ করা যাবে না, তার কারণ তো একটা দেখাবেন?

—শ্যাওব! প্যারীচরণ সরকার শুধু 'ফার্স্টবুক' লিখেই ক্ষান্ত হননি—তিনি আরও একটি পাপ কাজ করেছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণ সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা!

আবার অট্টহাস্য। ঘোষাল বললেন, চটজলদি জবাব সব সময়ে আপনার ঠোঁটের আগায়। অলরাইট! আমরা বরং 'এ.বি.সি.ডি.'র বদলে 'অ-আ-ক-খ' পাঠ করব। ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়। বিদ্যাসাগর মশাইও জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছেন. কিন্তু মদ্যপদেব সহ্য করতেন—না হলে মাইকেল তাঁর Vid-এর করুণালাভ করতেন না।

রাত পৌনে নটা। ঘোষাল-সাহেবের ড্রইংরুম। স্তিমিত আলোক। টিপয়ের উপর সদ্য-বন্ধনমুক্ত রয়্যাল স্যালুটের বোতল, দুটি গ্লাস, বরফের কিউব, স্ন্যাকস—আর দু-প্রান্তে দুই প্রৌঢ়।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, আপনি হয় তো ররাটের উপর রাগ করছেন বাসু-সাহেব, কিন্তু ..

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা ঘোষাল-সাহেব। ররাটের উপর আদৌ আমি রাগ করিনি। সে আমাকে 'ফেয়ার অফার' দিয়েছিল। আমি যদি ঐ পাগলটার ডিফেন্স দেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই তাহলেই সে পুলিসের 'সীজ' করা জিনিসগুলো আমাকে দেখতে দেবে। ন্যায্য কথা। পুলিস এখন চার্জ-ফ্রেম করতে ব্যস্ত। প্রতিবাদী পক্ষের ররাট তার হাতের তাস আগে-ভাগেই দেখিয়ে দিতে পারে না। অধিকার-বহির্ভূত সে কিছু করেনি।

—তার মানে আপনি শিবাজীপ্রতাপের ডিফেন্স দিতে মনস্থ করেছেন?

—ইয়েস! আমি ইতিমধ্যে তার কেসটা নিয়েছি। হাজতে তার সঙ্গে দেখাও করে এসেছি।

—আপনার কি ধারণা লোকটা সত্যিই পাগল? সে স্বজ্ঞানে খুনগুলো করেনি? ওর পিছনে আর কোনও ক্রিমিনাল লুকিয়ে রয়েছে?

বাসু স্মিত হাসলেন। জবাব দিলেন না।

—অলরাইট! অলরাইট! আই অ্যাডমিট! আপনিও আপনার হাতের তাস আগে-ভাগে দেখাতে পারেন না। ঠিক আছে। আমিই খুলে বলি। বুঝতেই পাচ্ছেন, একটা বিশেষ বার্তা আপনাকে জানাতে চাই বলেই এই নিভৃত সাক্ষাতের আয়োজন। আমি মন খুলে আমার বক্তব্য রাখি। আপনি আপনার হাত এক্সপোজ না করে যতটুকু সম্ভব আপনার মতামত জানান। প্রথম কথা: আমার বিশ্বাস—তিনটে খুনই শিবাজীপ্রতাপ করেনি। লোকটার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো নিশ্ছিদ্র—ওর টাইপ-রাইটার, ওর আলমারিতে সাজানো ধর্মপুস্তক এবং সবার উপরে না-খোলা প্যাকেটে ঐ সুকুমার রায়-এর বইটা, যা থেকে তিন-তিনটে ছবি কেটে তিনটি চিঠিতে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। ডক্টর মিত্র অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীর বিষয়ে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সবগুলোই মিলে গেছে। এক নম্বর, লোকটা অঙ্কের মাস্টার; দু নম্বর সে শিশুসাহিত্য পড়তে ভালবাসে; তিন নম্বর, ভাল টাইপিং জানে; চার নম্বর সে 'মেগ্যালোম্যানিয়াক'; পাঁচ নম্বর সে হত্যাবিলাসী! কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ঐ লোকটা দ্বিতীয় খুনের জন্য দায়ী। আই মীন, বনানী ব্যানার্জি। মনীশ সেনরায় যাকে ঐ ফার্স্টক্লাস কামরায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখেছিল সে লোকটা ঐ ষাট বছরের আধা-পাগলা বুড়ো হতে পারে না। শুধু এই কারণেই শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে চার্জটা ফ্রেম করা যাচ্ছে না। ররাটও ওটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। খুব সম্ভবত পুলিস শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে দুটো খুনের চার্জই আনবে। বনানী-মার্ডার নিয়ে আমরা এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

ঘোষাল-সাহেব থামলেন। বাসু নিঃশব্দে এক চুমুক পান করে নিরুত্তরই রইলেন।

আই. জি. ক্রাইম আবার শুরু করেন, আপনি কি বনানী হত্যার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত? যেহেতু আপনার ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে ও চার্জটা নেই?

বাসু বললেন, আমি গোটা কেসটাকে এ-ভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে প্রস্তুত নই। আমার মতে তিনটি হত্যা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। তাদের পৃথক করা সম্ভবপর নয়।

—কেন নয়? ধরা যাক, দ্বিতীয়টা অন্য লোকের হাতের কাজ। সে নাম-উপাধির সুযোগ নিয়ে বর্ধমানের কেসটাকে অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের একটা সেকেন্ড টার্ম হিসাবে চালিয়ে দিতে চাইল?

—কিন্তু বনানী যখন খুন হয় তখনো তো আমরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিইনি? বনানীর হত্যাকারী তো জানে না যে, আমরা ঐ জাতের চিঠি পাচ্ছি?

—ধরুন কোন সূত্রে সে তা জেনেছে। আমরা সাত-আটজনে বসে কনফারেন্স করেছি। ঘরে স্টেনো ছিল। এঁরা সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, কিন্তু বাড়ি ফিরে এমন মুখরোচক গল্পটা নিজ-নিজ ধর্মপত্নীকে যে গল্প করে শোনাননি তার গ্যারান্টি নেই। আর মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না এটা তো প্রবাদবাক্য!

বাসু বলেন, তা সত্ত্বেও আমি যা বলেছি সে অসুবিধেটা থেকেই যাচ্ছে। তিনটি কেসকে পৃথক করা যাচ্ছে না। একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন আমি জেনেছি, এ টাইপ-রাইটারটা শিবাজীবাবুকে যে উপহার দিয়েছিল তার নাম হানিফ মহম্মদ। কিন্তু লোকটা কে, কোথায় আছে তা জানি না। আমি জেনেছি, পণ্ডিচেরীর এক অজ্ঞাত মহারাজ শিবাজীবাবুকে মাস মাস টাকা পাঠাতেন এবং পার্সেলে বই পাঠাতেন; অথচ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আমি কোনও অনুসন্ধান করতে পারিনি। আমি জানি না, এগুলো আপনারা জানেন কিনা, পুলিস কোনও তদন্ত করেছে কিনা। করে থাকলেও পুলিস তা আমাকে জানাতে পারে না; কারণ আমি শিবাজীবাবুর ডিফেন্স-কাউন্সেল। এক্ষেত্রে আমি কেমন করে...

বাধা দিয়ে ঘোষাল-সাহেব বলেন, জাস্ট এ মিনিট। আমি জবাব দিচ্ছি। পুলিস এ সব তদন্ত শেষ করেছে। তার ফলাফল আমিই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। শুনুন মিস্টার বাসু। লোকটা যদি সত্যই নিরপরাধ হয় তাহলে তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেবার ইচ্ছা আমাদের কারও নেই। ...হ্যাঁ, ওকে যে লোকটা টাইপ-রাইটার উপহার দিয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে তার নাম হানিফ মহম্মদ। হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলে তার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পুলিসে জোগাড় করেছে। লোকটা মারা গেছে। বছর দশেক আগে। আপনি তো জানেনই যে, প্রতিটি ঘড়ির পিছনে যেমন ম্যানুফ্যাকচারার-এর দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা থাকে, তেমনি প্রতিটি টাইপ-রাইটার যন্ত্রেরও তাই থাকে। সেই সূত্র থেকে আমরা একথাও জেনেছি যে, ঐ যন্ত্রটা রেমিংটন কোম্পানীর ডালহৌসি-স্কোয়ার কাউন্টার থেকে দেড় বছর আগে বিক্রয় হয়—হানিফের মৃত্যুর বহু বছর পরে। যে লোকটা কিনেছিল সে নগদ মূল্যে খরিদ করেছিল। ক্রেতার হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে শিবাজীপ্রতাপের ও কথাটা ভুল—উপহারটা হানিফ পাঠায়নি।...তিন-নম্বর: পণ্ডিচেরীতে তল্লাসী চালিয়ে একথাও জানা গেছে যে, 'মাতৃসদন' এবং তার 'মহারাজ' সবই অলীক। সুতরাং একটি সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে নেওয়া চলে : 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'টাকে দিয়ে একের পর একটি খুন করালেও সমস্ত পরিকল্পনার পিছনে আর একটি ব্রেন কাজ করে চলেছে। কে, কেন, কীভাবে তা আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। এবার বলুন বাসু-সাহেব? আপনি কি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত?

—বাসু বলেন, আপনার ও কথার জবাব দেবার আগে আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে। পুলিসের মতে এক নম্বর: শিবাজীপ্রতাপ প্রথম ও তৃতীয় খুনটা স্বহস্তে করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় খুনটা করেননি। দু নম্বর: সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে একটি অজ্ঞাত অতি-ধূর্ত পাকা ক্রিমিনালের হাত আছে—যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে (i) টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছে (ii) মাস-মাস মহিনা দিয়েছে (iii) তাঁর 'হোমিসাইডাল' মনোবৃত্তিকে উসকিয়ে এক ও তিন নম্বর খুন দুটি করিয়েছে। এবং তিন নম্বর : সেই পাকা-ক্রিমিনালটির পাত্তা আপনারা পাচ্ছেন না। কেমন তো? এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন: সেই পাকা ক্রিমিনালের মূল উদ্দেশ্যটা কী? কোনটা তার টার্গেট? কী কারণে দেড় বছর ধরে সে এই বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে?

—এর একটাই জবাব হতে পারে, বাসু-সাহেব! সেই অজ্ঞাত লোকটাই আসলে হচ্ছে 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক!' মানুষ খুনকরাতেই তার তৃপ্তি। এবং সেই পাকা ক্রিমিনালটি কোন কারণে

আপনাকে শত্রুপক্ষ মনে করে। হয়তো আপনার হাতে তার কোনও হেনস্থা হয়েছে; তাই আকাশচুম্বী আত্মম্ভরিতা নিয়ে আপনাকে ডিফেম করে কুখ্যাত হতে চাইছে। শিবাজীপ্রতাপকে সে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করেছে শুধু। নিজে হাতে সে একটি মাত্র খুন করেছে—ঐ দু'নম্বর হত্যাটা : বনানী ব্যানার্জি। বাকি দু'টি শিবাজীকে প্ররোচিত করে তার হত্যাবিলাস চরিতার্থ করেছে। এই আমার থিয়োরি। আপনি কী বলেন?

বাসু-সাহেব আর এক চুমুক পান করে বললেন, মিস্টার ঘোষাল! আপনি আপনার সবকটি হাতের তাস টেবিলে বিছিয়ে দিয়েছেন। আয়াম এক্সট্রিমলি সরি—আমি এখন, এই মুহূর্তেই আমার সবগুলো তাস মেলে ধরতে পারছি না। কিন্তু অধিকাংশ তাসই আমি বিছিয়ে ধরছি। দেখুন, তাতে যদি কোনও সুরাহা হয়। প্রথম কথা: সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমানে আমার কাছে স্ফটিক স্বচ্ছ—কোথাও কোনও আবিলতা নেই!

—মানে?

—মানে, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী নেপথ্যচারী হত্যাবিলাসীব পরিচয় আমি জানি।

—জানেন! আপনি জানেন লোকটা কে?

—জানি। তাকে আপনিও চেনেন। আপনারা অনেকেই চেনেন। সে আমাদের অতি নিকটেই রয়েছে। লোকটা আদৌ 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' নয়। তা সত্ত্বেও সে যে কেন পরপর তিনটি খুনের পরিকল্পনা করেছে তাও আমার জানা—

ঘোষাল-সাহেব উৎসাহে বাসুর হাতটা চেপে ধরে বলেন, আপনি জানেন? কে? কেন?

—জানি। কে এবং কেন।

—তাহলে কেন আমাদের বলতে পারছেন না?

—একটিমাত্র কারণে। আপনাকে যদি এখনই নামটা বলে দিই, তাহলে কোনদিন তার 'কন্‌ভিক্‌শন' হবে না!

—কেন? কেন?

—কারণ যে-যে ক্লুর সাহায্যে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করেছি তা জানালে আপনি বাধ্য হবেন এখনি তাকে গ্রেপ্তার করতে। আর এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার হলে তাকে আদালতে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণ করা যাবে না। আমি তাকে আর একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে চাই। তার কন্‌ভিকশান হবার মতো আর একটি প্রমাণ আমি হাতে পেতে চাই...

—আমরা কি যৌথভাবে সে-কাজে এগিয়ে যেতে পারি না? পুলিসের সহায়তায় কি আপনি সেই নিশ্ছিদ্র প্রমাণটি সংগ্রহ করতে পারেন না?

—নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটিকে চিহ্নিত না করে!

—কেন?

—এখনি তা আমি বলেছি—সে ক্ষেত্রে আপনি তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবেন। আমার ফাঁদে পা দেবার দুর্যোগ থেকে সে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। আমি সুযোগ হারাব!

ঘোষাল-সাহেব আর এক চুমুক পান করলেন।

বাসু বললেন, এবার আমার প্রস্তাবটা শুনুন ঘোষাল-সাহেব। রবিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে একটি শোকসভার আয়োজন করেছি। তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রতি আমরা পর্যায়ক্রমে সম্মান জানাবো—প্রত্যেকটি মৃতব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে কেউ না কেউ আসবেন। পরস্পরকে সান্ত্বনা দেবেন। এটাই হচ্ছে বাহ্যিক আয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই পরিকল্পনার মূল নায়কও ঐ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং আমার আশা—সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে ঐ সভাতেই আমি তাকে চিহ্নিত করে ফেলব। 'কন্‌ভিক্‌শন' হবার উপযুক্ত এভিডেন্স ঐ সভাতেই আমাদের হস্তগত হবে। আপনি আসুন, রবি বোসকেও আমি ডেকেছি—ইন অ্যান্টিসিপেশন্ অব্ য়োর এনডোর্সমেন্ট—বলেছি,

হ্যান্ডকাফ নিয়ে সে যেন সশস্ত্র আসে। কিছু প্লেন-ড্রেস সশস্ত্র পুলিসও থাকবে সভায়। যদি ঐ দিন সর্বসমক্ষে শয়তানটাকে আমি হাতে-নাতে ধরতে না পারি তাহলে—কথা দিচ্ছি—আমি আমার হাতের সব কয়খানা তাসই আপনার সামনে বিছিয়ে দেব। ডাজ দ্যাট স্যাটিসফাই য়ু?

—পার্ফেক্টলি! আই উইশ য়ু অল সাকসেস্!

'ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল'টাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। খাবার টেবিলটি অপসৃত। অন্যান্য ঘর থেকে চেয়ার এনে ঘরটা পৃথকভাবে সাজানো হয়েছে। একপ্রান্তে একটি টেবিলে পাশাপাশি তিনখানি মাল্যভূষিত আলোকচিত্র। ববি বসু বাদে নিমন্ত্রিতরা সবাই এসে পৌচেছেন। শোকসভাটি পরিচালনা করছেন বাসু-সাহেবের গুরু—অতিবৃদ্ধ এ. কে. রে।

ঊষা বাগচী উদ্বোধনী-সঙ্গীতটি গাইল দরদভরা গলায়ঃ

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারাই তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।"

অনেকের চোখই অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সুনীল দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। তার পিঠটা মাঝে মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ময়ূরাক্ষীও বারে বারে চোখ মুছছিল। আর মৌ, মৃত ব্যক্তিত্রয়ের একজনকেও যে দেখেনি, সেও বারে বারে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

অনিতা তার মাস্টারমশায়ের অর্থাৎ ডক্টর চ্যাটার্জির কথা কিছু বলল।

ময়ূরাক্ষী মাথা নেড়ে অস্বীকার করায় 'কুশীলব'-সংস্থার তরফে অন্য একজন বনানীর অভিনয়-প্রতিভা ও অমায়িক স্বভাবের সম্বন্ধে কিছু শোনালেন। সুনীল আঢ্য কিছু বলার অবস্থায় নেই তাই বাসু-সাহেব নিজেই স্বর্গত আঢ্যমশায়ের বিষয়ে যেটুকু জানেন তা জানালেন—সৎ, সজ্জন ধর্মভীরু, মানুষটির পরিচয়।

প্রয়াত ব্যক্তিত্রয়ের আত্মার শান্তি কামনায় সকলে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। ঊষা আবার হারমনিয়ামটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বাসু বলেন, না, না, সভার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আরও একজনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। দৈহিক বিচারে তিনি জীবিত, মস্তিষ্কের পরিমণ্ডলে মৃত। আমি হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকটির কথা বলছি। আমরা সবাই জানি—তিনি এক বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগ্য। সজ্ঞানে তিনি হত্যা করেননি কাউকে। দু-চার মাসের মধ্যেই অনিবার্যভাবে তাঁর ফাঁসি হবে। আত্মিকভাবে মৃত মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে আমি ডক্টর দাশরথী দেবে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

বিকাশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে, এ সভায় কি সেটা প্রাসঙ্গিক? শোকসভায় একজন ক্রিমিনাল..

এ. কে. রে. বলে ওঠেন, না! তিনি ক্রিমিনাল না, বর্তমানে তিনি অভিযুক্ত মাত্র।

আই. জি. সি. ঘোষাল-সাহেব সংক্ষেপে শুধু বলেন, কারেক্ট!

অনিতাও বলে ওঠে, আমি বরং শুনতেই চাই। দুদিন পরে তো তাঁকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়েই দেওয়া হবে। আমরা জানতেও পারব না, কী-জন্য কী করে তিনি পর পর তিনজনকে...

দেখা গেল, সভায় অনেকেই শিবাজীপ্রতাপের পশ্চাৎপট বিষয়ে আগ্রহান্বিত।

অতঃপর ডক্টর দে তাঁর মাস্টারমশায়ের বিষয়ে অনেক কথা বলে গেলেন। যতটুকু তাঁর জানা ইতিপূর্বে তিনি কতবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন, তাঁর কম্পাউন্ডারির চাকরি, প্রুফরিডারি হাইকোর্টের রেলিং ঘেঁষে টাইপ-রাইটিং করে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রচেষ্টা এবং 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা বিষয়ে তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থের কথা।

উনি থামতেই বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর গোটা ইতিহাসটাই আপনারা শুনলেন। তিনি জীবনে ব্যর্থ, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে মানুষের গলা টিপে ধরতেন। তাঁর নামের

ভিতরেও পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত একটা 'মেগালোম্যানিয়াক' ইঙ্গিত। তিন তিনটি হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁকে অকুস্থলের কাছাকাছি দেখা গেছে! কাকতালীয় ঘটনা তিন-তিনবার ঘটে না। তাছাড়া তাঁর ঘরে যে টাইপ-রাইটার আর সুকুমার রচনা-সমগ্র সেগুলিও তাঁর বিরুদ্ধে মোক্ষম প্রমাণ। কিন্তু একটা কথা—আমি যখন হাজতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন বেশ বুঝতে পারি 'পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল' এই নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত। এক্ষেত্রে তিনি কেমন করে আমার নামে তিন-তিনখানি চিঠি. .

ডক্টর ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বলেন, সেটা ওঁর নিখুঁত অভিনয় হতে পারে। আপনি ধরতে পারেননি।

—দ্বিতীয় কথা: পুলিস আবিষ্কার করেছে—ঐ টাইপ-রাইটারটি রেমিংটন কোম্পানির ডালহৌসী-স্কোয়ারের দোকান থেকে দেড় বছর আগে নগদ মূল্যে কেউ খরিদ করেছে। সে সময় দেখছি শিবাজীপ্রতাপ কপর্দকহীন। তিনি কেমন করে ওটা ঐ সময় নগদ দামে কিনলেন?

ডক্টর ব্যানার্জিই পুনরায় প্রশ্ন করেন, এ বিষয়ে তিনি নিজে কী বলেন? যন্ত্রটা কী সূত্রে তাঁর হেপাজতে এল, এ কথা কি তাঁর মনে পড়ে না?

—পড়ে, তিনি বলেন—এটি ওঁকে উপহার দিয়েছিল ওঁর এক ছাত্র: হানিফ মহম্মদ।

বিকাশ বলে, তবে তো ল্যাটা চুকেই গেল। কীভাবে কপর্দকহীন মাস্টারমশাই...

—না, চুকলো না। তথ্য বলছে যে, হানিফ মহম্মদ দশ বছর আগে মারা গেছে।

সকলে নীরব। বাসু-সাহেব আবার শুরু করেন! সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেউ নাম ভাঁড়িয়ে যন্ত্রটা ওঁকে উপহার দিয়েছিল। যাতে ঐ এভিডেন্সটা ওঁর হেপাজতে থাকে। বাড়ি সার্চ করার সময় যেন টাইপ-রাইটারটা পুলিসে উদ্ধার করে।

অ্যান্ড্রুইয়ুলের মনীশ সেন রায় জানতে চায়, তিনটি চিঠিই যে ঐ টাইপ-রাইটারে ছাপা এটা কি প্রমাণিত হয়েছে?

—হ্যাঁ, তিনটিই। কিন্তু আদ্যন্ত নয়। প্রতিটি চিঠির শেষের দিকে ঐ স্থান আর তারিখের অংশটুকু বাদে।

—তার মানে?

—তার মানে, হানিফ মহম্মদের নাম করে যে ওঁকে যন্ত্রটা উপহার দেয় সে নিজেই চিঠিগুলি টাইপ করেছে, কিন্তু স্থান ও তারিখটা তখন বসায়নি। সে লোকটা দেড় বছর আগে জানতো না—কোন তারিখে, কোথায় কোন খুনটা হবে!

অমল দত্ত বলে বসে, স্ট্রেঞ্জ!

—হ্যাঁ! শুধু ঐটুকুই নয়! পণ্ডিচেরীর যে মহারাজ ওঁকে মাস-মাস মনি-অর্ডার করতেন, আর বইয়ের পার্সেল পাঠাতেন তিনিও অলীক! তাঁর পাত্তা পুলিসে পায়নি!

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন, এ থেকে কী প্রমাণ হয়?

—আমি জানি না। আপনার বিবেচনা করে বলুন।

—আপনি কি বলতে চাইছেন যে, শিবাজীপ্রতাপকে শিখণ্ডী খাড়া করে আর কোনও 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক্' এ কাজগুলো করছিল?

বাসু বলেন, সেটা আপনাদের বিবেচ্য। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, তিনটি খুনের একটি যে শিবাজীপ্রতাপ করেননি এটুকু আমি জানতে পেরেছি।

এ. কে. রে. বলেন, তোমার কাছে কোনও এভিডেন্স আছে?

—আছে স্যার! অকাট্য প্রমাণ!

—কোন কেসটা?

—বলছি স্যার। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই—আপনাকেই আমি বিশেষভাবে প্রশ্ন করছি ডক্টর ব্যানার্জি। কারণ অপরাধ-বিজ্ঞানে আপনি পণ্ডিত। এমন কি হতে পারে না যে, নাম ও

স্থানের কোয়েন্সিডেন্স-এর সুযোগ নিয়ে একজন খুনী তার পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলল—এই স্থির বিশ্বাসে যে, পুলিস কেসটাকে ঐ 'অ্যালফাবেটিকাল সিরিজে'র একটা 'টার্ম' বলে ধরে নেবে?

—এমনটা হতেই পারে। আপনি কোনও সূত্র পেয়েছেন?

—পেয়েছি। যাঁকে সন্দেহ করেছি তিনি এ ঘরেই বর্তমানে উপস্থিত। আমার প্রস্তাব—এ ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আমি এক-একটি প্রশ্ন করব। জবাবে তাঁরা নিছক সত্য কথা বলবেন, অথবা বলবেন, 'আমি জবাব দেব না।' তাহলেই সেই আততায়ীকে আমি চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করতে পারব। আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি?

প্রায় বিশ সেকেন্ড ঘর নিস্তব্ধ।

ডক্টর মিত্র বললেন, এতে আমাদের আপত্তি করার উপায় নেই। প্রতিবাদ যে করতে যাবে, সে নিজেই তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত হয়ে যাবে। আপনি শুরু করুন।

—আমি আপনাকেই প্রথম প্রশ্নটা করছি: আপনাকে আই. জি. ক্রিমিন্যাল-সাহেব কয়েকবার এক্সপার্ট হিসাবে কনফারেন্সে ডেকেছিলেন। সেজন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু আপনার মনে হয়েছিল, এজন্য আপনার একটা 'প্রফেশনাল ফি' প্রাপ্য ছিল। —ইয়েস অর নো?

ডক্টর মিত্র গম্ভীরস্বরে বললেন, আমি জবাব দেব না।

—নেক্সট সুনীল! তুমি একদিন লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলে; হঠাৎ বাবার সামনে পড়ে গিয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেল। বাবা দেখতে পাননি। —ইয়েস অর নো?

সুনীল মাথা নিচু করে বললে, ইয়েস।

—থার্ড! মিস্টার অমল দত্ত! আপনি এজাহারে বলেছিলেন—বনানী যে ট্রেনে আসছিল তার আগের লোকালে আপনি বর্ধমান আসেন। অথচ বর্ধমানের একজন রিক্‌শাওয়ালা—যে আপনাকে চেনে, যাকে আপনি চেনেন না—বলছে যে, ঐ শেষ লোকালেই আপনি এসেছিলেন। রিকশাওয়ালাটা কি মিথ্যা কথা বলেছে?

অমল দত্তের মুখটা শাদা হয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, ইয়ে ...মানে, এক কথায় এর জবাব হয় না। আমি বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।

গর্জে ওঠেন বাসু-সাহেব ঃ কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ নেই। —ইয়েস অর নো?

অমল দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে, আমি জবাব দেব না।

—ফোর্থ! মনীশবাবু! বনানীর বাক্সে কিছু প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। তার একটা সিরিজ টাইপ-রাইটারে ছাপা। আমার বিশ্বাস সেই চিঠিগুলি অ্যান্ড্রুইয়ুল কোম্পানির কোন টাইপ-রাইটারে ছাপা। পুলিস-তদন্ত হলে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। —ইয়েস অর নো?

মনীশ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ইয়েস... বাট্...

—নো 'বাট্' প্লীজ। পঞ্চম সাক্ষী ময়ূরাক্ষী। তুমি 'বাট্-ফাট্' বলবে না। 'হ্যাঁ, না,' অথবা 'বলব না'-র মধ্যে তোমার জবাব সীমাবদ্ধ করবে। প্রশ্নটা এই—সুজাতা ফিরে এসে আমাকে বলেছিল যে, অমল দত্ত তোমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিল এবং তুমি তা প্রত্যাখ্যান কর—

—ইয়েস!

বাসু হেসে বলেন, প্রশ্নটা আগে আমাকে শেষ করতে দাও। ওটা তো ফ্যাক্ট। প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমার প্রশ্নটা এই ঃ তুমি ওর কাছে আর্থিক সাহায্য নাওনি এই কারণে যে, অমল তোমার দিদিকে ভালোবাসত, এ কথা জেনেও যে বনানী তাকে ভালবাসত না; অথচ তুমি অমল দত্তকে ভালবাসতে এবং ভালোবাস।...

ময়ূরাক্ষী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। যেন সর্বসমক্ষে বাসু-সাহেব তার ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তার ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে থাকে। বলে, এসব... আপনি... কী বলছেন?

—'ইয়েস, নো' অথবা 'বলব না' প্লীজ।

দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ময়ূরাক্ষী। তিনটে জবাবের একটাও যোগালো না তার মুখে।

সুজাতা নিঃশব্দে তার বাহুমূলটা ধরে বললে—বাথরুমটা ঐ দিকে।

হাত ধরে সে সভাস্থল থেকে ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে আল্‌পিন-পতন নিঃস্তব্ধতা।

—সিক্সথ্—অনিতা! তোমাকে যে প্রশ্নটা করছি তা এই: যদিও বিশ বছরের বয়সের ফারাক এবং যদিও তুমি মিসেস্ চক্রবর্তীকে নিজের দিদির মত ভালোবাস, তবু মিসেস্ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর যদি ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তোমাকে বিবাহ-প্রস্তাব দিতেন তাহলে তুমি সম্মত হতে! —ইয়েস অর নো?

অনিতাও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন ময়ূরাক্ষীর পর এবার তার বস্ত্রহরণ পালা শুরু হল! তারও ঠোঁটদুটি নড়ে উঠল—বাক্যস্ফূর্তি হল না।

ঠিক তখনই কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে এ. কে. রে. বলে ওঠেন, অবজেক্‌শান সাস্‌টেইন্ড! ইর্‌রেলিভেন্ট অ্যান্ড আর্গুমেন্টেটিভ! কী হলে কী হত, তা সাক্ষী বলতে বাধ্য নয়, এমনকি 'আমি বলব না'—তাও নয়। তুমি বসে পড় অনিতা।

কাঁপতে কাঁপতে অনিতা বসে পড়ে।

—সেভেন্থ, মিস্টার নিবি মজুমদার! তোমাকে দীর্ঘদিন পূর্বে ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তাঁর উইলটা সেফ্-কাস্টডিতে রাখতে দিয়েছিলেন। তাতে স্ত্রী, শ্যালক, অনিতা এবং অন্যান্যদের জন্য যথাযোগ্য মাসোহারার ব্যবস্থা করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট বোর্ডকে দিয়ে গিয়েছিলেন—কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার দায়িত্ব দিয়ে। —ইয়েস অর নো?

নিবি মজুমদার উঠে দাঁড়ালো। থ্রি-পীস স্যুট পরা একটি সুদর্শন যুবক। তার বয়স যে চল্লিশের কোঠায় তা বোঝা যায় না। ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম পি. কে. বাসু! তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র!

নিবি হেসে বললে, ইয়েস! ওঁর উইল আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

বাসু বললেন, অষ্টম সাক্ষীকে প্রশ্ন করার আগে আমি একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। ধরুন আমি যদি বলি, 'এখানে একটা আলপিন রয়েছে' অমনি আপনাদের দৃষ্টি যাবে মেঝের দিকে। মনে হবে কারো পায়ে না ফোটে, তারপর সোফা বা সেটিগুলোর দিকে তাকাবেন। তারপর টেবিলের উপর দৃষ্টি বুলিয়েও যখন আলপিনটা নজরে পড়বে না. তখন হয়তো বলবেন, 'কই?' টেবিলের উপব পেন-কুশানে গাঁথা আমার সেই বিশেষ আলপিনটা দেখেও নজর করবেন না। এটা হিউম্যান-সাইকলজি'। আমরা কি এখানে ঐ জাতের ভুল করছি? মনে করুন, একজন লোক দীঘার ধীরেন্দ্র ধরকে কোন কারণে খুন করতে চায়। কিন্তু সে জানে—পুলিস এসেই খোঁজ করবে ধীরেনবাবুর মৃত্যুতে কে সবচেয়ে লাভবান হল? কে সম্ভাব্য খুনী হতে পারে? এই জন্যে সে 'ধীরেন ধর-নামক' আল্‌পিনটাকে পিন্ কুশানে গেঁথে ফেলতে চাইল। সে যদি পর পর চারটি খুন করে—প্রথমে আলমবাজার, আলিপুর বা আগরতলার অসীম আচার্য, অনিমা আগরওয়াল ইত্যাদি নামের যে-কোন একজনকে; এবং তারপর বাটাগনর, ব্যারাকপুর, বেহালার 'বি' নাম-উপাধির কাউকে, এবং তারপর 'সি'-য়ের ঘাট পার হয়ে দীঘার ধীরেনবাবুকে খুন করে? আর ঐ সঙ্গে যদি হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াকের ছদ্মবেশে পি. কে. বাসুকে ক্রমাগত পত্রাঘাত করতে থাকে তাহলে...

বাধা দিয়ে ডক্টর ব্যানার্জি বলে ওঠেন, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে 'পি. কে. বাসু'কে কেন? সে তো সরাসরি ঘোষাল-সাহেবকেই চ্যালেঞ্জ থ্রো করবে। 'পি. কে. বাসু' বিখ্যাত ডিফেন্স কাউন্সেল—অপরাধী ধরে বেড়ানো তাঁর পেশা নয়?

—তার হেতুটা যদি এই হয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিকানায় ভুল-জোনাল নম্বর দিয়ে কোন একটি বিশেষ চিঠি ডেলিভারি হতে দেরি করাতে চায়? 'আই. জি. ক্রিমিনাল, কলকাতা' লেখা খাম পরদিনই

এগারো-র এ লন্ডন স্ট্রীটের ঠিকানায় পৌছে যাবার সম্ভাবনা—জোনাল নাম্বারে অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও!

সকলেই একমনে চিন্তা করছেন—এটা একটা নতুন ধরনের যুক্তি।

বাসু বলেন, সে-ক্ষেত্রে ঐ আততায়ীকে এ. বি. সি. নামের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত লোকের নাম এবং কে কখন—কোথায় ভাল্‌নারেব্‌ল্‌ সে খবরগুলো জানতে হবে। এটা তার পক্ষেই সম্ভব যাকে চাকরির প্রয়োজনে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে হয়। যেমন ধরুন একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। যার এলাকা, বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর।

এবার বিকাশ হেসে ওঠে। বলে, আপনার যুক্তিটা যেন আর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে চাইছে না বাসু-সাহেব! সূচীমুখ হতে চাইছে যেন? তাই নয়?

—ইয়েস! যেমন কথার-কথা হিসেবে ধরুন আপনার চাকরি। আপনাকে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। আপনার পক্ষে আরও একটা সুবিধা আছে। আপনি ক্রমাগত ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টদের সঙ্গেও। ফলে 'অস্মার' রোগে ভুগছে—অর্থাৎ মাঝে-মাঝে যার স্মৃতি হারিয়ে যায় এমন রুগীর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা সহজ। কারণ শেষ পর্যন্ত একটা 'ফল গাঈ', মানে 'রাঙা-মূলো' তো পুলিসের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। যে লোকটা আপনার বদলে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলবে! তার নাম যদি 'শিবাজীপ্রতাপ রাজ চক্রবর্তী' হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। স্বতই মনে হবে, পৈত্রিক সূত্রে সে মনে করে যে, সে একজন মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি! লোকটাব যদি পূর্ব-ইতিহাসে বাবে-বারে মানুষের গলা টিপে ধরার তথ্যটা থাকে তাহলে আরও ভালো। ধরুন আপনি ঘটনাচক্রে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা জেনে ফেললেন—তাহলে কিছু ফিনিশিং টাচ দেওয়া দরকার। লোকটা শিশু সাহিত্য পড়তে ভালবাসে, ফলে সুকুমার গ্রন্থাবলী থেকে কেটে নিয়ে আর একটা এভিডেন্সও যোগ করা যেতে পারে। লোকটা অঙ্কের মাস্টার? তাহলে একপিঠে অঙ্ককষা-কাগজে চিঠিগুলো টাইপ করলে...

বিকাশ অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, বাসু-সাহেব! আপনার বিশ্লেষণটি প্রাঞ্জল! প্রাণ জল হয়ে গেল সকলের! তা আমি সে-ক্ষেত্রে তিনটির ভিতর কোন্ খুনটা করব বলে দেড়-দু-বছর ধরে এতবড় পরিকল্পনাটা ফেঁদেছি?

—সেটা তো আপনিই আমাদের বলবেন বিকাশবাবু! কারণ আপনিই আমার অষ্টম সাক্ষী। আপনাকে আমার প্রশ্ন: ফিল্‌ম্‌-প্রডিউসার-এর ভেক ধরে আপনি কি বনানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি? নির্জন ফার্স্টক্লাস কামরায় আপনি ওকে গলা টিপে মেরে রাত বারোটা পাঁচে চন্দননগরে ট্রেন থেকে নেমে যাননি? —ইয়েস্ অর নো? নাকি 'বলব না?'

—আজ্ঞে না মহাশয়! আমি বলব: বনানী ব্যানার্জিকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি!

—তার মানে: নো?

—আজ্ঞে না, তার মানে 'অ্যান এম্ফাটিক্ নো'!

—থ্যাঙ্কু!

বাসু-সাহেব থামলেন। ঘরের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এখন বিকাশের দিকে। সে নড়েচড়ে বসল। বাসু-সাহেব বলেন, আমার নবম সাক্ষী উষা বাগচী। যার গান আপনারা শুনলেন। উষা, তোমাকে আমার প্রশ্ন: তুমি সুজাতাকে বলেছিলে—বনানীর অনেক বয়ফ্রেন্ডকে চিনতে। তুমি কি কখনো ঐ বিকাশ মুখুজ্জে-মশাইকে দেখেছ বনানীর সঙ্গে?

উষা বললে, ওঁর নাম বিকাশ মুখার্জী কি না তা আমি জানি না। কিন্তু সেদিনই তো ফটো দেখে বলেছিলাম—ঐ ভদ্রলোক একজন ফিল্ম প্রডিউসার। বনানীকে ফিল্‌মে নামার সুযোগ দিতে চাইছিলেন।

বিকাশ রুখে ওঠে, ফটো দেখে? কোন ফটো? কার ফটো?

বাসু তাঁর পকেট থেকে একটি ফটো বার করে দেখান: এইখানা। তোমারই! এই ফটোটা তোমাকে লুকিয়ে তুলতে হবে বলে সেদিন কম্পাস-টেলিফটো-লেন্স ইত্যাদি নিয়ে আমি চন্দননগরে গিয়ে একটা হচ্‌পচ্‌ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম।

বিকাশ দৃঢ়স্বরে বলে, রঙ আইডেন্টিফিকেশন! এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না! আমি কেন তাকে খুন করব? কী স্বার্থ আমার যে, বনানীকে খুন করব বলে দেড়-বছর ধরে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কিন্তু বনানী যদি পিন-কুশানের একটা ছোট্ট পিন্‌ হয়?

—তার মানে? তাহলে কে আমার মেন টার্গেট? ধরণীধর অব দীঘা?

—না! ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব চন্দননগর!

—জামাইবাবু! আপনি বদ্ধ উন্মাদ! যাঁর সম্পত্তির আমি একমাত্র ওয়ারিশ?

—তা যে তুমি নও সে-কথা তো আমরা সবাই জেনেছি বিকাশবাবু! এটাই ডক্টর চ্যাটার্জির জীবনের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি—মন্ত্রগুপ্তি! সমস্ত সম্পত্তিটা যে তিনি উইল করে একটা ট্রাস্ট-বোর্ডকে দিয়ে গেলেন সেটা তোমাকে না জানানো! তাহলে তাঁকে এভাবে বেঘোরে মরতে হত না!

বিকাশ রুখে ওঠে, মিস্টার বাসু! আপনার যুক্তির আর পারম্পর্য থাকছে না কিন্তু! মক্কেলের মতো আপনিও এবার পাগ্‌লামি শুরু করেছেন! হয় আমি জানতাম ঐ উইলের কথা, অথবা জানতাম না। যদি সেটা আমার জানা থাকত তাহলে এই বীভৎস হত্যার কোনও মোটিভ থাকে না! আর যদি সেটা আমার না-জানা থাকত তাহলেও কোনও মোটিভ থাকে না, যেহেতু আমার বিশ্বাস অনুযায়ী—আমিই তাঁর ওয়ারিশ!

পিছন থেকে কে যেন বলে ওঠেন, কারেক্ট!

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, না! তৃতীয় একটি বিকল্পও যে রয়ে গেল...

—তৃতীয় বিকল্প? আমার জানা এবং না-জানার মাঝামাঝি? —জানতে চায় বিকাশ।

—হ্যাঁ তাই! তুমি জানতে যে, ঐ রিসার্চের ব্যাপারে চন্দ্রচূড় আর অনিতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছিলেন; জানতে যে, তোমার দিদির প্রয়াণের পর চন্দ্রচূড়ের সংসারের দায়িত্ব বর্তাতো অনিতা দেবীর উপর! তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতেন। ক্রমে তাঁদের সন্তানাদি হত। ডক্টর চ্যাটার্জির প্রথমপক্ষের শ্যালকের তখন মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান অনিবার্য হয়ে পড়তো! রে-সাহেব বাধা দেওয়ায় অনিতা যে প্রশ্নটার জবাব দিল না সেই জবাবটা অনেকদিন আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে, বিকাশবাবু! তাই নয়?

বিকাশ জ্বলন্ত একজোড়া চোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাসু-সাহেব—হত্যা যখন সংঘটিত হয় তখন আমি ঘটনাস্থল থেকে অনেক-অনেক দূরে। শেয়ালদহ-র কাছাকাছি সুইট-হোমে!

—আহ্‌! দ্যাটস্‌ য়োর ডিফেন্স! বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ! তাই নয়? বিকাশবাবু! তুমি দু-বছর ধরে এতসব কিছু করলে অথচ ঐ সামান্য ব্যাপারটার কথা ভুলে গেলে? বেসিনের কলটার দিকে নজর গেল না তোমার?

—মানে?

—হোটেলে চেক-ইন করে রুদ্ধদ্বারকক্ষে তুমি মেক-আপ নিলে, যাতে পথে-ঘাটে বা চন্দননগরে কেউ হঠাৎ দেখলে চিনতে না পারে। তারপর রাত দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলে হাওড়া-স্টেশন। রাত এগারোটা সাতের লোকাল ধরে পৌছালে চন্দননগর। তুমি জানতে তোমার ভগ্নিপতি ঠিক কয়টার সময় মর্নিংওয়াকে বার হন, কতদূর যান এবং কোন্‌ বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করেন। জানতে যে, খবরের কাগজটা তিনি দেখেননি, কারণ আগেই সেটা সরিয়ে ফেলেছিলে তুমি! প্রত্যাশিতভাবে ডুপ্লিকেট-চাবি দিয়ে গেট খুলে তিনি যে ওখানে ভোররাত্রে উপস্থিত থাকবেন এটা তোমার জানা ছিল। তাই কাজ

হাঁসিল করে ভোর পাঁচটা সাতান্নর লোকাল ধরে ফিরে আসাটা কোনও অসুবিধাজনক হয়নি। তাই নয়? নাকি ছয়টা এগারোর লোকালটা ধরতে হয়েছিল?

বিকাশ উঠে দাঁড়ায়। অনিতার হাতটা বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে বলে, চলে এস অনিতা! এইসব পাগলের বক্‌বকানি শুনতে হবে জানলে আমি এ শোকসভায় আদৌ আসতাম না।

অনিতা জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, না! আমাকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দাও বিকাশদা। বাসু-সাহেব, আপনি বলুন, এসব আন্দাজ আপনি করছেন কী সূত্রে?

বাসু বলেন, আন্দাজ নয় অনিতা, ফ্যাক্ট! ঐ যে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিল তোমার বিকাশদা! ক্রিমিনোলজি বলে—'পার্ফেক্ট-ক্রাইম বলে কিছু হতে পারে না।' বিকাশবাবু সব কিছু ঠিক ঠিক করল, কিন্তু হোটেল ছেড়ে যাবার সময় বেসিনের কলটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেল। সে সময় কলে জল আসছিল না! জল আসতে শুরু করে রাত দুটোয়। শুধু ঐ ঘব নয়, করিডরটাও জলে থৈ থৈ। নাইট-ওয়াচম্যান বাধ্য হয়ে ম্যানেজারকে ডেকে তোলে। ডাকাডাকি করে বোর্ডারের সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে কলটা বন্ধ করা হয়। সে-রাত্রে বিকাশবাবু যে ঐ ঘরে ছিল না তার তিনটি সাক্ষী আছে! ম্যানেজার মনোহরবাবু, দরোয়ান রঘুবীর আর হোটেলবয় মদ্‌না!

বিকাশ যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে সে অনিতাকেই বলে ওঠে, তুমি না যাও তো এইসব আষাঢ়ে গল্প শুনতে থাক। আমি চললাম।

বাধা দিলেন আই. জি. ক্রাইম, জাস্ট এ মিনিট বিকাশবাবু! আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যেখানে ইচ্ছে যাবার স্বাধীনতা আপনার এই মুহূর্তে আছে। কিন্তু আমার একটি পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গেলে আপনার সেই স্বাধীনতাটুকু আর থাকবে না। বলুন: সে-রাত্রে কি আপনি ঐ হোটেলে রাত্রিবাস কবেছিলেন?

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথাটা নিচু হয়ে যায় তার। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, না স্যার! রাতটা আমি প্রস্টিটুট-কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছি!

ঘরে পুনরায় নিস্তব্ধতা ফিরে আসে।

বাসুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠেন, সে সম্ভাবনার কথাও আমি ভেবেছি। ব্যাচিলার মানুষ! এমনটা তো হতেই পারে। সেজন্য আমি বিকল্প আর একটি প্রমাণ নিয়ে এসেছি। একজোড়া ফিঙ্গার-প্রিন্ট। ডক্টর ব্যানার্জি, আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এক্সপার্ট! অনুগ্রহ করে দেখুন তো, এই দুটি টিপছাপ কি একই ব্যক্তির?

দুখানি পোস্টকার্ড-সাইজ ফটোগ্রাফ তিনি বাড়িয়ে ধরেন ডক্টর ব্যানার্জির দিকে। তারপর এদিকে ফিরে বললেন, উনি ততক্ষণ পরীক্ষা করুন, আমি ইতিমধ্যে আপনাদের শোনাই—কীভাবে ঐ ফিঙ্গার-প্রিন্ট দুটি সংগ্রহ করেছি। একটি পাওয়া গেছে শিবাজীপ্রতাপের আলমারিতে রাখা বইয়ের বান্ডিল থেকে। যে প্যাকেটে সুকুমার রায়ের বইটি ছিল, সেই না-খোলা প্যাকেটের উপর। প্যাকেটটা পণ্ডিচেরী থেকে পোস্টাল পার্সেলে এসেছে। যে পিয়ন বিলি করেছে, যে-সব পোস্টাল কর্মচারী হ্যান্ডল্‌ করেছে তাদের কারও আঙুলের ছাপ নয়, কারণ কালিটা হচ্ছে সেই কালি যাতে ঠিকানাটা লেখা। অর্থাৎ যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে পার্সেলে বইটা পাঠিয়েছিল।

বাসু-সাহেব থামলেন।

ডক্টর ব্যানার্জি সেই অবকাশে বলেন, পয়েন্টস্‌ অব সিমিলারিটি ষোলো, না, সতের... না, না আরও নজরে পড়ছে...

—আপনি দেখতে থাকুন ডক্টর ব্যানার্জি...

—না, না আর দেখার দরকার নেই। দুটি আঙুলের ছাপ একই ব্যক্তির।

বোধ করি কথাটা কানে গেল না বাসু-সাহেবের। তিনি একই ভঙ্গিতে বলে চলেন, আর দ্বিতীয়খানি

আমি সংগ্রহ করেছি নিতান্ত ঘটনাচক্রে। চন্দননগরে। যেহেতু ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, 1935,অ্যামেন্ডেড ইন্ 1955, ধারা নং 153(c)-তে বলা হয়েছে যে, লাখ টাকার উপর যাব মূল্যমান তেমন দলিলে সইয়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়...

—নেভার হার্ড অব্ ইট! ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্টের কত ধাবা বললে যেন? জানতে চাইলেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে।

বাসু হাসলেন, আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছি না স্যার; কিন্তু ঐ ধারাটা আউড়ে সন্দেহভাজন একটি ব্যক্তিকে সেদিন ধাপ্পা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। না হলে তাব নিখুঁত ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা আমাব পক্ষে...

কথাটা শেষ হল না। হঠাৎ বিকাশ লাফ দিযে ঘবেব ও-প্রান্তে সবে গেল।

ঘরসুদ্ধ সকলের দৃষ্টি গেল তাব দিকে।

বিকাশের হাতে একটি উদ্যত রিভলভার!

প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, ছযটা চেম্বারে ছযটা বুলেট! আই কনগ্র্যাচুলেট য়ু মিস্টাব পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল! দুঃখ এটুকুই যে, ফাঁসিব দড়িটা আমাব গলায পরানো গেল না; আব কী অপরিসীম দুঃখ! আমাব সঙ্গে তোমার খেলাও শেষ হয়ে গেল। ছয়-নম্বর বুলেটটা আমার।পঞ্চমটা তোমার! বাকি চারজন কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে তুমিই নির্বাচন করে দাও বাসু-সাহেব।

প্রত্যেকটি মানুষ যে যাব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িযেছে।

ঘরে সূচীপতন নিস্তব্ধতা।

পরিস্থিতি যে একমুহূর্তে এভাবে বদলে যেতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাসু-সাহেব দু-হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িযে আছেন। নির্বাক। নিস্পন্দ। ভয় কতটা পেযেছেন বোঝা গেল না। অসীম আত্মসংযম তাঁব। কিন্তু কথা যখন বললেন তখন তাঁর গলাটাও কেঁপে গেল। বললেন, আমিই তোমার একমাত্র রাইভাল বিকাশ! বাকি কজন নিরীহ প্রাণীকে...

—সে কী! সে কী! তুমিই না প্রমাণ করেছ আমি 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'! ...ডোন্ট মুভ! আই ওয়ার্ন য়ু!

শেষ সাবধানবাণীটা ঘোষাল-সাহেবকে। তিনি তিলমাত্র নড়েছিলেন।

বিকাশ আরও এক পা পিছিয়ে গেল। যাতে এক লাফে কেউ তার নাগাল না পেতে পারে। সেখান থেকে বলল, না, বাসু-সাহেব তোমার জন্য পঞ্চম বুলেটটা জমিয়ে রাখলাম। প্রথম বুলেটটা তোমার ঐ পঙ্গু স্ত্রীকে উপহার দিই বরং...

কিন্তু ট্রিগার টানবার অবকাশ সে পেল না। চকিতে ক্ষিপ্ত শার্দুল-শাবকের মতো তাব দিকে লাফ দিল সুনীল। ষোল বছরের তারুণ্যে ভরপুর কিশোর! এক লাফে বিকাশেব কাছে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব! কারণ দূরত্ব যথেষ্ট! বিকাশ বিদ্যুদ্‌গতিতে পাশ ফিরে সুনীলকে লক্ষ্য করে ফায়ার করল। আশ্চর্য! তবু শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে সুনীল উল্‌টে পড়ল না। তার বজ্রমুষ্টির আঘাতটা গিয়ে লাগল বিকাশের নাকে। নাকটা থেঁৎলে গেল। দরদর ধারে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকাশ ভূপতিত হয়নি। টাল সামলে নিয়ে সে পর পর তিনটি ফায়ার করল সুনীলকে লক্ষ্য করে; পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে!

চার-চারবার ট্রিগার টানা সত্ত্বেও ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল না একবারও।

এতক্ষণে পিছনের পর্দা সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে রবি বোস, তার সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত। রবি বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেলেছে বিকাশের দুই বাহুমূল। পিছন থেকে। বিকাশ আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে ছাড়িয়ে, বাসু-সাহেবকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে চাইছে।

বাসুর হাতদুটি তখনো মাথার উপর তোলা। ঐ অবস্থাতেই বললেন, ওর চেম্বারে আরও দুটি বুলেট

বাকি আছে, রবি। ওকে বাধা দিও না। ওকে আশ্ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিতে দাও!

রবির হাত ছাড়িয়ে বিকাশ আবার ফায়ার করল। এবারও শব্দ হল না কিছু।

পিছনের পর্দা সরিয়ে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছে মকবুল। সে বলে ওঠে, ব্রেথাই হাঁকপাক করতিছ্যান কর্তা। নাই। অ্যাড্ডাও গুলি নাই। ছয়টা বুলেটই আমার জেব্-এ। দু-দুবার পাকিট মারছি! পেত্যয় না হয়, অ্যাই দ্যাহেন!

তার প্রসারিত তালুতে ছয়টি তাজা বুলেট।

বাসু এতক্ষণে ঊর্ধ্ববাহুমুদ্রায় ক্ষান্ত দিলেন। বললেন, আয়াম সরি ফর য়ু মিস্টার এ. বি. সি. ডি.! ফাঁসির দড়ি ছাড়া তোমার আর বিকল্প রইল না কিছু!

সকলের দিকে ফিরে বলেন, রবি তার ডিউটি করুক। আপনারা বসুন। ঊষার সমাপ্তিসঙ্গীতটা বাকি আছে!

রানী দেবী বলেন, শোকসভা। তাই সামান্য একটু মিষ্টিমুখের আয়োজন করেছি। বেশি কিছু নয়।

মনীশ বলল, এ-ছাড়া আমাদের মনে এখন যে প্রশ্নের পাহাড় জমে আছে! আপনি কী করে বুঝলেন?

রবি দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশের হাতে হ্যান্ডকাফ্ পরিয়ে বললে, বাঃ! আমি একাই ডিউটি করব? শুনতে পাব না?

—কেন পাববে না? ওর মাজার দড়িটা ঐ স্টীল আলমারির পায়ার সঙ্গে বেঁধে দাও! শুধু তুমি কেন, বিকাশবাবুরও ব্যাপারটা জেনে যাবার অধিকার আছে। আফটার অল, সেই তো নিয়োগ করেছিল আমাকে। পুলিসের উপর আস্থা না থাকায়।

কৌশিক জানতে চায়, ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে আপনি নিঃসন্দেহ হলেন?

—যে মুহূর্তটিতে সেই মেন্টাল অ্যাসাইলামের ডাক্তারবাবু বললেন, চন্দননগরের মেডিক্যাল-রিপ্রেজেন্টেটিভ্ বিকাশ মুখার্জীকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। বছর-দুই আগে একদিন তিনি বিকাশবাবুর সঙ্গে ঐ কেস্‌টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। শিবাজীপ্রতাপের গোটা কেস হিস্ট্রি—হানিফ মহম্মদের গলা টিপে ধরা থেকে সব কিছু।

সুজাতা বলে, কিন্তু আপনি সুইট-হোমের ঐ জলপ্লাবনের কথাটা কখন শুনলেন?

—শুনিনি তো! কিন্তু এটুকু জানতাম যে, মনোহর ঐ ঘরটা বিকাশবাবুকে সেরাত্রে ভাড়া দিতে চায়নি—কলে জল নেই বলে! অর্থাৎ বিকাশ জানত, কলে জল আসছিল না। ঘটনাটা সে রাত্রে ঘটেনি কিন্তু আমার বর্ণনা শুনে বিকাশের ধারণায় ওটা ঘটেছিল! সুইট-হোমের তিন-তিনটি প্রত্যক্ষদর্শীকে রুখতে সে প্রস্ কোয়ার্টাসে যাওয়ার আষাঢ়ে গল্পটা ফেঁদে ফেলল। একবারও মনে হল না—প্রস কোয়ার্টাসে রাত কাটাতে হলে হোটেলে আশ্রয় খোঁজা তার পক্ষে অযৌক্তিক!

—আর ফিঙ্গার-প্রিন্ট? পুলিসের 'সীল' করা প্যাকেটটাও তো আপনি দেখেননি।

—না, আমি দেখিনি। কিন্তু বিকাশও জানে না যে, আমি দেখিনি। ইনফ্যাক্ট—দুটো ফিঙ্গার-প্রিন্টই মিসেস্ চ্যাটার্জির সেই লিস্ট থেকে ফটো নেওয়া। ওটা ছিল আমার শেষ অস্ত্র! ততক্ষণে বিকাশবাবু মরিয়া হয়ে উঠেছে।. পাঁচ-পা পিছিয়ে গেছে। তোমরা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু তখন ওর ডান-হাত ছিল পকেটে। বেচারি তো জানে না, ইতিমধ্যে মক্‌বুল্ দুবার তার পকেটে মেরেছে! একবার বুলেটগুলো বার করে নিতে, একবার ফাঁকা অস্ত্রটা ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিতে!

এবার প্রশ্ন করে রবি, আপনি কী করে আন্দাজ করলেন যে, শোকসভায় ও রিভলভার নিয়ে আসবে?

—চন্দননগরে ইচ্ছাকৃতভাবেই ওর সঙ্গে আমার একবার ধাক্কা লাগে। ওর ধারণা অনিচ্ছাকৃতভাবে। আমি অনুভব করেছিলাম—তার ডান পকেটে সব সময়েই একটি রিভলভার থাকে। তাই এই

সমাজসেবীটির সাহায্য নিয়েছিলাম। মক্‌বুল নাকি শহর-কলকাতাব চ্যাম্পিয়ান—'ইয়ে'।

মক্‌বুল ঘোষাল-সাহেবের দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলে, আব লজ্জা দিয়েন না ছার!

সুনীল জানতে চায়, আমার সিগারেট খাওয়ার কথা?

—স্রেফ আন্দাজ! ও বয়সে আমার জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আন্দাজটা ভ্রান্ত হলে তোমার জবাব হত—'নো'। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হত না কিছু। কিন্তু সুনীল, তুমি ওর হাতে উদ্যত রিভালভার দেখেও কী ভাবে অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

সুনীল লজ্জা পেল। বললে, বাবার সেই উবুড় হয়ে পড়ে থাকা চেহারাটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, স্যার! নিজের মৃত্যুর কথাটা তখন আর আমার খেয়াল ছিল না। মনে হল, মবাব আগে ওর নাকটা অন্তত থেঁৎলে দিয়ে যাব আমি!

ঘোষাল-সাহেব বলেন, কাজটা তোমার হঠকারিতা হয়েছিল সুনীল। যাহোক, রবি ওব নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিও তো।

অমল দত্ত বলে, আমার একটা প্রশ্ন আছে। মনু সেদিন আমার কাছে কেন টাকা নেয়নি—

—আহ্! অমলদা! কী পাগ্‌লামো করছ!—চাপাকণ্ঠে ময়ূরাক্ষী প্রতিবাদ করে।

বাসু বলেন, হ্যাঁ। ওসব অবান্তর আলোচনা না করাই ভালো। অনেকেব অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, কাউকে বেইজ্জত করা বা অপমান করার উদ্দেশ্য আমার একতিলও ছিল না। আমি শুধু 'টেম্পো'-টা তুলতে চাইছিলাম। উত্তেজনা আব কনফেশনের টেম্পোটা। জাল গুটিয়ে তোলার আগে এমনভাবে একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করাব প্রয়োজন হয়। যাতে প্রকৃত অপরাধী ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ে; ডানে-বাঁয়ে ক্রমাগত সকলের গোপন-কথা ফাঁস হয়ে যেতে দেখে! না হলে বিকাশ আমার শেষ ধাপ্পাটা ধরে ফেলতো। ঐ ফিঙ্গার-প্রিন্টের ব্যাপারটা। কিন্তু ততক্ষণে তার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেছে। ওর বুদ্ধি আব কাজ করছে না। ও নিজেও ওর শেষ অস্ত্রটার উপর নির্ভব করতে শুরু করল। তাই বারে বারে পিছু হঠে যাচ্ছিল—সকলের নাগালের বাইরে। ডান হাতটা ওর অনেক আগেই পকেটে ঢুকেছে। কিন্তু এসব বিশ্লেষণ এখানেই বন্ধ থাক। আবার বলি, যদি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি অসৌজন্যমূলক প্রশ্ন করে, তবে আমি ক্ষমা চাইছি!

মূল কাহিনী শেষ হয়েছে। উপসংহারে বছর-দুয়েক পরেকার কয়েকটি তথ্য পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একনম্বর ঃ শিবাজীপ্রতাপ এখন ঐ চিলে-কোঠার ঘরে থাকেন। ডক্টর পলাশ মিত্রের চিকিৎসায় তিনি দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠছেন। অন্য কোন চাকরি করেন না। দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। চন্দননগরে একটি ট্রাস্ট-বোর্ড তাঁকে নাকি রিসার্চ স্কলারশিপ দিয়েছেন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য ঃ 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা।'

ঐ ট্রাস্ট-বোর্ডে যে মহিলা সেক্রেটারী মোটা মহিনায় নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর নাম ঃ অনিতা সেনরায়। শোনা যায়, তিনি ছিলেন ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চ-অ্যাসিস্টেন্ট। তখন উপাধি ছিল গাঙ্গুলী। জনৈক 'মুগ্ধভ্রমরের' কৃতিত্বে বর্তমান উপাধি—সেনরায়।

স্বর্গত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী মিসেস্ রমলা চট্টোপাধ্যায়ের সধবা অবস্থায় দেহান্ত ঘটেছে।

সুনীল আঢ্য এখন তার বাবার দোকানে বসে। সেকেন্ড ডিভিশনে সে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পড়াশুনাটা আর চালায়নি।

গতবছর সাহসিকতার জন্য সে একটি পুলিস-মেডেল পেয়েছে।

একটা দুঃখের খবর ঃ ময়ূরাক্ষীর এবছর বি.এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অর্থাভাবে নয়। হেতুটা এই ঃ পরীক্ষাব সময় মিসেস্ ময়ূরাক্ষী দত্ত ছিলেন আসন্ন সন্তানসম্ভবা!

সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা

রচনাকাল : এপ্রিল 1988
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা 1989
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীধীরেন শাসমল
উৎসর্গ : ঁপ্রবোধচন্দ্র বসু

চিঠিখানা যেদিন আমাদেব এই নিউ আলিপুবেব বাড়িতে এসে পৌছালো তখন বাড়ি ফাঁকা। রানীমামীমাকে নিয়ে আমাব স্ত্রী সুজাতা গেছে গোপালপুরে। সমুদ্রের ধাবে একটা হোটেলে পাশাপাশি দু'খানি ঘব 'বুক' করেছি। একটা মামা-মামীব, আব একটা আমাদের দুজনের। কিন্তু বাসুমামার কী-একটা কেস-এর শুনানির দিন বেমক্কা এসে পডল মাঝখানে। উপায় কী? বাধ্য হয়ে ওঁদের দুজনকে পৌছে দিয়ে আমাকে ফিবে আসতে হয়েছে। আগামীকাল, ত্রিশে জুন মামুর হিয়ারিং। সে বখেড়া মিটলে আমরা দুজন ফিরে যাব গোপালপুর-অন-সিতে। কাল বাদে পবশু। এমনই এক ব্রাহ্মমুহূর্তে ঐ অলুক্ষুণে চিঠিখানা এসে পৌছাল এ বাড়িতে।

জুন মাসেব শেষাশেষি। বেশ গবম পড়ে গেছে। মন উড়ু-উড়ু, মানে গোপালপুব-মুখো। বিশুকে বলে রেখেছি, কোনো লোক টেলিফোন করলে বা দেখা করতে এলে যেন স্রেফ হাঁকিয়ে দেয়। না হলে আবার কোনও 'কেস'-এ ফেঁসে যাবেন উনি। ভালোয় ভালোয় এ দুটো দিন কাটলে বাঁচি।

সকালবেলা প্রাতরাশেব টেবিলে এসে দেখি বাসুমামা অনুপস্থিত। এমনটা কখনো হয় না। উনি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জীবনের ছককে বেঁধে ফেলেছেন। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে কম্বাইন্ড-হ্যান্ড-বিশু জানালো, বড়-সাহেব এখনো বাইরেব ঘবে।

উঠে ডাকতে যাব, তখনই এসে গেলেন উনি: সরি! আয়াম লেট বাই সেভেনটীন মিনিটস।

বাসু-সাহেবকে যাঁরা চেনেন না, তাঁদের মনে হতে পারে এটা বাড়াবাড়ি। উনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তাছাড়া আমি কিছু এ বাড়ির অতিথি নই। পি.কে.বাসু, বার-অ্যাট-ল হচ্ছেন প্রখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। সন্তানাদি নেই। প্রৌঢ় মানুষটি সস্ত্রীক বাস করেন এই বাড়িতে। আমরা দুজন ওঁরই আশ্রয়ে 'সুকৌশলী' নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস খুলে বসেছি। ফলে, সতের মিনিট দেরী হওয়ার জন্য ওঁর মার্জনা ভিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এসব বিলাতি-কেতা ওঁর মজ্জায় মজ্জায়।

প্রাতবাশের টেবিলে বসে জোড়া-পোচের প্লেটটা উনি টেনে নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ভাবছো?

সত্যি কথাই বলি, ভাবছি কাল বাদে পরশু আমাদেব গোপালপুর যাওয়াটা না ভেস্তে যায়!

—ভেস্তে যাবে! কেন? এ কথা মনে হল কেন তোমার? কালকেই তো কেসটার ফাইনাল হিয়ারিং?

—সেটা নয়। আপনাব সতের মিনিটি দেরি হওয়ার সূত্র ধরে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—হয়তো আজকেব ডাকে আপনি এমন কোন চিঠি পেয়েছেন—

উনি প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, কারেক্ট! দারুণ ডিডাক্ট করেছ! 'বাসুমামু লেট—পত্রাৎ!' হেত্বর্থে পঞ্চমী! আজকের ডাকে তেমনই একটা বিচিত্র চিঠি পেয়েছি বটে।

—মার্ডার কেস?

—আবে না, না। সেসব কিছু নয়। পড়েই দেখ না—

পকেট থেকে বাব করে খামখানা বাড়িয়ে ধরেন আমার দিকে। নিতে হল। বলি, পড়ার কী আছে? আপনি মুখে-মুখে বলুন না—ব্যাপারটা কী?

—না, তা হয় না কৌশিক। তোমার সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে। নাও, পড়—

অগত্যা। দামী লেফাফা। মোটা লেটার-হেডের বন্ড কাগজ। হস্তাক্ষর অতি বিচিত্র—গোটা গোটা, ঝরঝবে। দেখলে মনে হয়, পত্রলেখক দেড়-দু'শ বছর আগে তালপাতার পুঁথিতে মক্সো করে হাত পাকিয়েছেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

অনেক সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার বাধা অতিক্রমণান্তে আপনাকে এই পত্রটি লিখিতে বাধ্য হইতেছি শুধুমাত্র এই আশায় যে, আপনি আপনার ভূয়োদর্শনের প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই একান্ত গোপনীয় বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হইবেন। স্বীকার্য, যদিচ আপনার সহিত কখনো আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি আপনি আমার সুপরিচিত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নিবাসী ৺জগদানন্দ সেন মহোদয়ের নিকট আপনাব সংবাদ প্রাপ্ত হই। আপনার সুপবিকল্পিত প্রচেষ্টায় তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন। অপিচ তাঁহার পারিবারিক মর্য্যাদাটুকু আপনি কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। আমি অবশ্য জানি না, সেন মহাশয়ের সমস্যাটি কী জাতের ছিল। কৌতূহলী হওয়াও কুরুচির পরিচায়ক। পবন্তু এটুকু অনুধাবন করিয়াছি যে তাহা ছিল গোপন ও বেদনাদায়ক....

মাকড়সার জালের মতো—পত্রলেখকের ভাষায় 'লূতাতন্তুসদৃশ' ঐ হাতের লেখার ব্যূহ ভেদ করে আর অগ্রসর হতে পারছিলাম না আমি। বলি, এ ভদ্রলোক তাঁর মূল বক্তব্যটা কোন প্যারাগ্রাফে বলেছেন সেটুকু যদি দেখিয়ে দেন—

বাসুমামা কফির পটটা টেনে নিতে নিতে বলেন, লিঙ্গে ভুল হল। ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা। চিঠির পাদদেশে নজর গেল আমার ঃ 'বিনতা পামেলা জনসন'।

—আর 'মূল বক্তব্য'টা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। চোখ থাকলে দেখতে পাবে। পড়ে যাও। অগত্যা তাই। রীতিমত বানান করে করে এগিয়ে যেতে থাকি ঃ

আমার আন্তরিক বিশ্বাস: বক্ষ্যমাণ সমস্যায় আপনি আমাকে অনুরূপভাবে সাহায্য করিতে সক্ষম। যদ্যপি অনুসন্ধান সমাপনান্তে আপনি এই সিদ্ধান্তে আইসেন যে, আমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতৃপ্ত হইব। বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করিতে আমার মন সরিতেছে না। পরন্তু দ্বিতীয় কোনও ব্যাখ্যাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সারমেয়-গেণ্ডুকের বিষয়টি এমনই জটিল, এমনই সঙ্গোপন যে, মেরীনগরে কাহাকেও কিছু বলা যায় না।

এবার চিঠির উপর দিকে নজব পড়ল আমাব। ছাপা হরফে লেখা আছে ঠিকানা: 'মবকতকুঞ্জ, মেরীনগর' এবং পোস্টাল জোন নাম্বার। তার নিচে চিঠি লেখার তারিখটা। 17.4.70.

আপনি নিশ্চয় অনুমান কবিতেছেন যে, আমি নিবতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্তা, বস্তুত আতঙ্কাগ্রস্তা। বিগত দুই দিবস আমি মনকে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিতেছি যে, আমাব আশঙ্কা অমূলক, কিন্তু কার্যাকাবণ সম্পর্কেব কোনও সূত্র দিয়া এই দুর্ঘটনাব কোন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইতেছি না। চিকিৎসক বলিয়াছেন মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত বাখিতে। বর্তমান অবস্থায় তাহাও অসম্ভব। অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত করিবেন—এ বিষয়ে গোপন তদন্ত কবিয়া আমাব সংশয় নিবাকরণের জন্য আপনাকে কী সম্মানমূল্য প্রদান কবিতে হইবে। বলা-বাহুলা, এখানে কেহই কিছু জানে না, জানিবে না। পত্রোত্তবেব প্রতীক্ষাবতা

বিনতা পামেলা জনসন।

আদ্যোপান্ত পড়ে বলি, ব্যাপাবটা কী? কী চাইছেন ভদ্রমহিলা? আব মিস বা মিসেস জনসন এবম্বিধ দুষ্পাচ্য বঙ্গভাষায় পত্রাঘাত কবিলেন' কোন হেতুতে?

বাসুমামু শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

—এ তো আদ্যন্ত পাগলের প্রলাপ।

—হুঁ! তুমি হলে কী করতে? পত্রপাঠ ছেঁড়া কাগজেব ঝুলি?

—তাছাড়া কী?

—তার হেতু, ঐ চিঠিতে যেটি সব চেযে বহস্যময দিক সেটা তোমাব নজরেই পড়েনি।

—সবটাই তো রহস্যময। তার ভিতর 'সবচেযে' বড কোনটা?

—চিঠির তারিখটা। যা এখনো খেয়াল করে দেখনি তুমি।

তারিখ? তা বটে! চিঠির মাথায় তারিখ দেওযা আছে:

আর আজ হচ্ছে জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ। দু'মাসেব বেশি।।

আমি লজ্জা পাই। এ দিকটা নজরে পড়েনি। সামলে নিযে বলি, তার অনেক ব্যাখ্যা হতে পাবে। ভদ্রমহিলার মাথায় দু-একটি স্ক্রুপ যে ঢিলে সেটা চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়। হয়তো '17.6' লিখতে '17.4' লিখে বসে আছেন।

—কাঁচড়াপাড়া থেকে নিউ আলিপুরে চিঠি আসতে দিন-দশ বারো লাগে না।

—ডাক বিভাগের দয়ায় তাও হয়, বাসুমামু। কেউ নিজের কাজ করে না—

—বটেই তো! কেউ নিজের কাজ করে না! পোস্ট-অফিসকে দোষ দেওয়ার আগে পোস্টাল ছাপটুকুও নজর করে দেখে না কেউ!

এবার নিরতিশয় লজ্জায় পড়ি। নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমার। দুটো ছাপই স্পষ্ট। প্রেরক ও প্রাপক পোস্ট-অফিসের।

আমি সলজ্জে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই উনি বলে ওঠেন, বাট হোয়াই? অমন আতঙ্কগ্রস্তা এক বৃদ্ধা এমন একটা জরুরী চিঠি কেন দু-মাস পরে ডাকে দিলেন?

আমি বলি, বৃদ্ধা?

—নয়? হাতের লেখায় বুঝছো না!

এবার বলি, ঠিকানা তো রয়েইছে। একটা চিঠি লিখে সেটা জানতে চাইলেই—

—নো! দু'মাস আগে পেলে চিঠিতেই জবাব দিতাম। বাট ইটস টু লেট নাউ!

—তাহলে? মানে, কী করতে চান আপনি?

—আমার মামলা তো কালকে। চল ঘুরে আসি। আজ তো আমি ফ্রি!

—ঘুরে আসবেন? মেরীনগর? জায়গাটা চেনেন?

—না। তবে পোস্টাল-জোন নাম্বার যখন আছে, খুঁজে পাবই। তৈরী হয়ে নাও।

আমি গ্রীষ্মের এই খরতাপের প্রসঙ্গটা তোলার আগেই উনি বিশুকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, এ বেলা আমরা বাইরে খাবো। তুই আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামায় যাস না। এই টাকা ক'টা রাখ। হোটেলে খেয়ে আসবি!
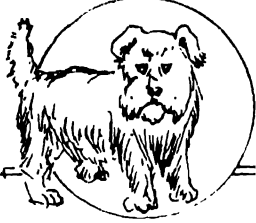
আমি একটা গোড়ায় গলদ করে বসে আছি। উনত্রিশে জুন নয়, আমার গল্পটা শুরু হওয়া উচিত ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি—বস্তুত গুড ফ্রাইডের আগের শুক্রবার থেকে। কিংবা মে মাস থেকে। পটভূমি হওয়া উচিত ছিল মেরীনগর।

মুশকিল কী জানেন? আমি পেশাগতভাবে সিভিল এঞ্জিনিয়াব। বর্তমানে সস্ত্রীক গোয়েন্দাগিরি করি। এককালে কবিতা-টবিতা লিখতুম। গল্প-উপন্যাস কদাচ নয়। পি.কে.বাসুর কাহিনীগুলি মুখে মুখে জানিয়ে দিতুম আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে। সেই সাজিয়ে-গুছিয়ে 'কাঁটাসিরিজ'-এর গোয়েন্দা গল্প লিখে ছাপতে দিতো। এবার সে বলেছে তার সময় নেই। সে নাকি কীটপতঙ্গ, কেঁচো-বিছের জগতে ব্যস্ত—অর্থাৎ 'না-মানুষ' নিয়ে। 'মানুষ' জন্তুটার সম্বন্ধে আপাতত তার কোনও কৌতূহল নেই। তাই এ গল্পটা উত্তমপুরুষে লিখতে বাধ্য হয়েছি। আর তাতেই এই বিপত্তি।

যাক, যা বলছিলাম—আমরা মেরীনগরে তদন্তে যাবার আগে সেখানে যা ঘটেছিল তার পূর্বকথন একটু শোনাই। এসব ঘটনার কথা অনেক পরে আমরা জানতে পারি—নানান সূত্র থেকে। ধরে নিন—এটাই আমার কাহিনীর এক নম্বর পরিচ্ছেদ ঃ

* * * *

মিস্ পামেলা জনসন দেহ রাখলেন পয়লা মে তারিখে। দীর্ঘ বাহাত্তরটা বছর পাড়ি দিয়ে। শেষবার বিশেষ ভোগেননি। মাত্র দিন-চারেকের রোগ-ভোগ। জনডিস্। শেষ ক'বছর ঐ পীতরোগেই ভুগছিলেন। মিস্ পামেলা জনসনের মৃত্যুসংবাদে মেরীনগরে কেউ মর্মাহত হয়নি একথা স্বীকার্য। এমনটা যে-কোন দিনই ঘটতে পারত। তবে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল অনেকেরই। সেবার গীর্জা-প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড শিশুগাছটা কালবৈশাখীর দাপট সহ্য করতে না পারায় যেমন বেদনাবোধ জেগেছিল সকলের। গাছটা ফল দিতো না, ফুল ফোটাতো না, তবু সেই আকাশস্পর্শী মহীরূহের ভূশয্যাগ্রহণে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা জাগেই। পামেলা মেরীনগরে একান্তচারিণীর জীবন যাপন করে গেছেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, মহিলামহলের ডামাডোলে সামিল হতেন না—তবু মেরীনগরে বুড়ো-বাচ্চা সবাই তাঁকে একটা সম্মানের আসনে বসিয়েছিল। ঐ শিশুগাছটার মগডাল দেখতে যেমন ঊর্ধ্বমুখ হতে হতো।

মিস্ পামেলা জনসন এই মেরীনগরের এক অতি প্রাচীন বাসিন্দা। প্রাচীনতমা হয়তো ছিলেন না—ডক্টর পিটার দত্ত অথবা উষা বিশ্বাস সম্ভবত ওঁর চেয়ে বয়সে বড়; কিন্তু পামেলাই এখানকার একমাত্র বাসিন্দা যিনি সেই বেণী-দোলানো কৈশোরকাল থেকে এখানে আছেন। জীবনের একটা সপ্তাহও এ গাঁয়ের বাইরে কাটাননি।

মৃত্যু সময়ে ওঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ছিল শুধু বেতনভুক গৃহকর্মীর দল—সহচরী, রাঁধুনি, ঝি, ড্রাইভার আর বাগানের মালি। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর দিন দশ-বারো আগে ইস্টারের ছুটিতে সবাই জড়ো হয়েছিল। আর আত্মীয়-স্বজন বলতে আছেই বা কে? বাহাত্তর বছর

মেসেব বুড়িব বাপ-মা-মাসি-পিসি থাকাব কথা নয়। বিয়ে কবেননি যে, সন্তানাদি থাকবে। ওঁব অবশ্য তিন বোন আর এক ভাই ছিল—তাবা একে একে দুনিযাব মাযা কাটিযেছে ওঁব আগেই। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে উনিই বয়সে সবাব বড—ওঁবই সবাব আগে বিদায় নেবাব কথা, কিন্তু মা-মেবীব বিধানে উনি টিকে ছিলেন দীর্ঘদিন ঐ মরকতকুঞ্জে, ভূষণ্ডীকাকেব মতো। তিন কুলে থাকাব মধ্যে কুলো টিকে আছে তিনটি প্রাণী—টুকু, সুরেশ আর হেনা। তারা সবাই এসেছিল ইস্টারের ছুটিতে। মায হেনাব স্বামী সর্দার প্রীতম ঠাকুব। মৃত্যুর পক্ষকাল আগে।

বছব-দেড়েক আগে আবও একবাব যমে-মানুষে টানাটানি গেছে। ডাক্তাব পিটাব দত্তেব চিকিৎসাতেই শুধু নয়, নিজের মনের জোরে সেবাব মবকতকুঞ্জেব সিং দবোজার বাইবে থেকে ফিবিয়ে দিতে পেরেছিলেন যমবাজকে। এবাব পাবলেন না।

মেবীনগর একটি খ্রীস্টানপ্রধান গ্রাম। বোমান ক্যাথলিক। কাঁচড়াপাড়া বেল স্টেশন থেকে যে পাকা সড়কটা পাক খেতে খেতে জাগুলিয়াব মোড়ে এসে মিশেছে এন.এইচ.থাট্টিফোবে, তাবই মাঝামাঝি একটা ফ্যাকড়া-সড়কে গড়ে উঠেছে এই গ্রামটা। 'গ্রাম' শব্দটা অবশ্য এখন আব সুপ্রযুক্ত নয়, ছোটখাটো শহবই বলা যায়। এসেছে বিজলিবাতি এবং দূবভাষণেব লাইন। গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আব সেকেন্ডাবি স্কুল। কিন্তু পামেলা জনসনেব পিতৃদেব যোসেফ হালদাব যখন ওখানে এসে বসবাস শুরু করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, তখন ওটা ছিল বীতিমতো জঙ্গল। হবিণ না থাকলেও হবিণ লুকিয়ে থাকাব মতো বড বড বেনাঘাস ছিল আ-হবিণঘাটাতক্ ডাঙা জমিটায়। যোসেফ হালদাবেব যৌবন কেটেছে বিদেশে—বিলাতে না মার্কিন মুলুকে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায সেটা জানা যায না। কী কাবণে তিনি প্রৌঢ় বযসে সে দেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন সেটাও ইতিহাসের এক অনুদ্ঘাটিত অধ্যায। তবে তিনি যে প্রচুব ধনসম্পত্তির মালিক হিসাবেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কাবণ ঐ নির্জন আবণ্যক পরিবেশে বিরাট এক জমিদাবি কিনে তিনি একটি গ্রামেব পত্তন করেছিলেন—মেবীনগর। বানিযে ফেললেন একটি গির্জা। খুলে বসলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নলকূপেব সাহায্যে বাবস্থা করলেন জল সরববাহের—অনাবাদী ঊষব জমি পরিণত হল কৃষিক্ষেত্রে। মার্কিন মুলুক থেকে আসুন না আসুন—তাঁব পরিকল্পনা মার্কিনী বাঞ্চ-এব।

বছর কযেকেব মধ্যেই কিন্তু সব ওলটপালট হযে গেল। একটি দুর্ঘটনায়। একটিমাত্র কন্যা সন্তানকে বেখে স্বর্গলাভ কবলেন যোসেফ হালদারের সহধর্মিণী—মেবী জনসন। বাঙালিব ছেলেকে বিবাহ করলেও তিনি তাঁর পদবিটা বদলাননি। যোসেফ দ্বিতীযবার দাব পরিগ্রহ করেন—এবাব একটি বাঙালী মেয়েকে। তিনিও বেশিদিন বাঁচেননি। তবে যোসেফ হালদারকে ছেড়ে যাবাব আগে তাঁর সংসারকে ভবভরন্ত কবে গিয়েছিলেন—তিন কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান।

বড় মেয়ে পামেলার নামের সঙ্গে মিল বেখে যোসেফ মেযেদেব ভাবতীয় নাম দিয়েছিলেন—সবলা, কমলা আর বিমলা। শেষ সন্তানের নাম আবার বিলাতি কেতাব ঃ ববার্ট। বিমাতা যখন বিদায নিলেন ততদিনে পামেলা কিশোরী; ফলে যোসেফকে তৃতীয়বার দাব-পরিগ্রহ করতে হয়নি। পামেলাই তাদেব মায়ের স্থান অধিকার করেন।

তাঁরা সবাই একে একে বিদায় নিয়েছেন মবকতকুঞ্জ থেকে। শুযে আছেন পাশাপাশি গীর্জা প্রাঙ্গণে। পামেলা প্রতিটি মৃত্যুতিথিতে এসে কবরে সাজিয়ে দিয়ে যান ফুলের 'ব্যকে'। নিজস্ব মালিকে পাঠিয়ে সিমেটরির আগাছা নিড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, মরশুমি ফুলেব 'বেড' বানিয়ে দেন। ঝক্‌ঝক তক্‌তক্ করে এলাকাটা।

মরকতকুঞ্জের প্রকাণ্ড বাড়িটায় পরিচারক-বেষ্টিত একান্তবাসিনীর জীবনেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন। বৎসরান্তে ইস্টারের ছুটিতে—ঘটনাচক্রে সাতই এপ্রিল ওঁর জন্মদিন—সেটা ইস্টারের ছুটিব কাছাকাছি পড়ে—আসে এই একান্তচারী বৃদ্ধাব স্বজনেরা—ভাইঝি স্মৃতিটুকু, ভাইপো সুরেশ আর বোনঝি হেনা।

পামেলা মর্মে মর্মে জানেন তাদের এই বৎসরান্তিক 'আদিখ্যেতার' হেতুটা!

মুখে স্বীকার করেন না— সেটা তাঁর ধাতে নেই!

তিনি জানতেন, ওবা জানে—সাত বিঘে বাগান-ওয়ালা এই প্রকাণ্ড প্রাসাদটার বর্তমান বাজারদর কত। আর জানতেন, ওরা জানে না, আন্দাজ করে, বুড়ির কোম্পানির কাগজের পরিমাণটা!

ওরা সবাই হালদার, কেউই 'জনসন' নয়। পামেলাই একমাত্র জনসন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বাপের অনুমতি নিয়ে এফিডেবিট কবে নামটা পরিবর্তন করেছিলেন—পামেলা হালদার হয়েছিলেন 'পামেলা জনসন'। মায়ের উপাধিটাই পছন্দ হয়েছিল তাঁর। তা হোক, তবু রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করবার মতো মানুষ ছিলেন না মিস্ পামেলা জনসন। ওঁর বাপের সলিসিটার ছিলেন 'চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স'। 'অ্যান্ড সন্স'দের মধ্যে বর্তমানে যিনি সিনিয়ার পার্টনার সেই প্রবীর চক্রবর্তীকে ডেকে উইল করে ওঁর যাবতীয় সম্পত্তি ঐ তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। সে আজ বছব-পাঁচেক আগেকার কথা।

পামেলার স্বাভাবিক মৃত্যুতে কেউই বিস্মিত হযনি। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল ওরা—টুকু, সুরেশ, হেনা আব তার স্বামী। বুড়িকে সাড়ম্ববে শুইয়ে দেওযা হল চার্চের প্রাঙ্গণে।

আব তার পরেই নাটকেব চরম ক্লাইম্যাক্স! বোমাটা ফাটলো!

আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করে পামেলার সলিসিটার প্রবীব চক্রবর্তী সদ্যস্বর্গগতার শেষ উইলখানি পড়ে শোনালেন।

বজ্রাহত হয়ে গেল সবাই।

মৃত্যুব মাত্র দশ দিন আগে মিস্ পামেলা জনসন তাঁব পূর্বকৃত উইলখানি নাকচ করে একটি নতুন উইল করে গেছেন। পাচিকা, পবিচারিকা, বাগানের মালিকে কিছু অর্থদান করে, স্থানীর চার্চ ফান্ডে এবং পিতৃদেবেব নামাঙ্কিত স্কুল ফান্ডে কিছু অর্থদান করে বাদবাকি স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু—মায় এই মরকতকুঞ্জটি—তিনি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দান কবে গেছেন এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে!!

শেষ উইলে তিনি তাঁব নিকটতম আত্মীয়দের কাউকে কপর্দকমাত্র দিয়ে যাননি!

এমনটা যে ঘটতে পারে তা ছিল সকলেরই দুঃস্বপ্নের অগোচব! সকলেরই আশা ছিল, বুড়ি মাটি নিলে সম্পত্তি তিন ভাগ হবে: টুকু, সুরেশ আর হেনা। পামেলার পাঁচ ভাইবোনের ঐ তিনটি শেষ খুদকুঁড়ো! আশ্চর্য! তিনি ওদেব তিনজনকেই সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন! কেন? মৃত্যুর মাত্র দশদিন আগে?

গোটা মে মাসটায় মেরীনগরে ঐ একটাই ছিল আলোচ্য বিষয় : কেন? কেন? কেন?

কেউ কোন সম্ভাব্য হেতুর ইঙ্গিত দিতে পারেনি।

এ-কথা স্বীকার্য যে, বুড়ির সঙ্গে ওদের কারও নাড়ির টান ছিল না। বৎসরান্তে ওরা ইস্টারের ছুটিতে এসে জমায়েত হত মরকতকুঞ্জে। সাড়ম্বরে বুড়ির জন্মদিন পালন করত : 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়্যু!' কিন্তু পামেলার মতো মেরী নগরের সবাই বুঝতে পারতো এই বৎসরান্তিক আনন্দোচ্ছ্বাসের অন্তর্নিহিত হেতুটা! 'ল্যাকল্যাকানি'র কারণটা!

সে-কথা যেমন সত্য, তেমনি এটাই বা অস্বীকার করা যায় কী করে যে, পামেলা জনসন ছিলেন বিচক্ষণ জাত্যভিমানী এবং স্বজনপোষক। তাঁর পূর্বকৃত উইলের কথা তিনি কোনদিনই গোপন করেননি। বলেছেন ডাক্তার পিটার দত্তকে, ঊষা বিশ্বাসকে, নিজমুখে। তাহলে?

আর সবচেয়ে বড় বিস্ময়—যাকে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এককথায় দান করে গেলেন তাকে তিনি কতটুকু চিনতেন? মাত্র তিন বছর আগে সে বহাল হয়েছিল। নামটা গালভারী—'কম্পানিয়ান' বা 'সহচরী'। আসলে তো সে বেতনভুক পরিচারিকামাত্র! তিন কুলে তারও কেউ নেই। লেখাপড়া শেখেনি বিশেষ। দেখতে ভাল নয়, বিয়ে-থা হয়নি। পামেলার জীবনের শেষ তিন বছর সে ছিল তাঁর 'সহচরী'!

রীতিমতো বোকা-সোকা, মোটা-সোটা, গাবলু-গুবলু চেহারা। লোকে বলে মাথায় শুধু চুলই নয়,

গ্রে-ম্যাটারও' কম। তার পক্ষে গৃহস্বামিনীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এমন একটা উইল বানিয়ে নেওয়ার কথা যে ভাবাই যায় না!

উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন মিনতি মাইতিও উপস্থিত ছিল সেখানে। বোধ করি তার আশা ছিল গৃহস্বামিনী তাঁর সহচরীকেও দিয়ে গেছেন দু-পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। যখন শুনলো সে নিজেই একমাত্র ওয়ারিশ, তখন সে বজ্রাহত হয়ে যায়। হাসবে না কাঁদবে স্থির করে ওঠার আগেই প্রবীর চক্রবর্তীমশাই উচ্চারণ করে বসলেন আর্থিক অঙ্কটা। হাসি-কান্নার বাজা পেরিয়ে মিনতি অজ্ঞান হয়ে গেল।

মিস পামেলা জনসনের অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান সাড়ে সাত লক্ষ টাকা! এ যেন সেই রূপকথার গপ্পো! ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে রাতারাতি হয়ে গেল রাজকন্যে!

গুড ফ্রাইডের আগের বুধবার সকাল। মিস্ পামেলা জনসন দাঁড়িয়েছিলেন মরকতকুঞ্জের পোর্টিকোর সামনে। যৌবনকালে নিশ্চয় তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। সোনালী চুল, ঘন নীল চোখ আর টকটকে রঙ।

এখনো এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুন্দরী—সৌন্দর্যের পরিণত সংজ্ঞায়। এখনো তিনি সোজা হয়ে হাঁটেন। লাঠি ব্যবহার করেন না। মেদ নেই দেহের কোনও প্রত্যন্তদেশে। শুধু টকটকে রঙে একটা হলুদের আভাস। দীর্ঘদিন তিনি ভুগেছেন জনডিস রোগে। এখনও তেল-মশলা বা ভাজা খাবার তাঁর বরদাস্ত হয় না।

মিনতিকে দেখতে পেয়েই গৃহস্বামিনী বলেন, ঘরগুলো সব ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে? পর্দা-টর্দা লাগানো হয়েছে ঠিকমতো?

প্রকাণ্ড প্রাসাদের অধিকাংশ ঘরই অব্যবহৃত পড়ে থাকে তালাবন্ধ হয়ে। বৎসরান্তিক এই অতিথি সমাগমের আগে তা ঝাড়পোঁছ করা হয়। সেসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে জেনে নিয়ে পামেলা বলেন, কোন্ ঘরে কাকে থাকতে দিচ্ছ?

—ডক্টর ঠাকুর আর হেনাদিকে 'ওক-রুমে', স্মৃতিটুকুদিকে দক্ষিণ-পূবের 'দোলনা-ঘরে' আর সুরেশবাবুকে পশ্চিমের ঘরখানায়—

পামেলা কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করেন, না! সুরেশ থাকবে 'দোলনা-ঘরে'; আর টুকু ওই পশ্চিমের ঘরে—

মিনতি আমতা আমতা করে, ঠিক আছে, তাই হবে। আমি ভাবছিলুম দোলনা-ঘরটায় টুকুদির বেশি আরাম হবে, মানে....

—বেশি আরামের দরকার নেই তার!

পামেলার কালে পুরুষদের আরামে রাখার ব্যবস্থা হতো। 'দোলনা ঘর'-এ প্রসাদের সব সেরা গেস্ট রুম। সুরেশ অবিশ্যি নিতান্তই বখে গেছে, তা হোক, পুরুষ-প্রাধান্যের চিন্তাটা ওঁর মজ্জায় মজ্জায়। সব-সেরা ঘরখানা বংশের পুরুষেরাই ভোগ করবে, যতদিন তিনি জীবিতা।

মিনতি বলে, কী দুঃখের কথা, হেনার বাচ্চা দুটো আসছে না—

আরও কঠিন শোনালো গৃহস্বামিনীর কণ্ঠস্বর, চারজন অতিথিই যথেষ্ট। হেনা তো আদর দিয়ে বাচ্চা দুটোকে মাথায় তুলেছে। ওরা না আসায় বেঁচেছি।

মিনতি অবিবাহিতা, মাতৃস্নেহ তার অতৃপ্ত। সে বোধ করি মনে মনে মর্মাহত হলো। মুখে কিছু বলার সাহস হলো না। পামেলা বলেন, আমি একবার কাঁচড়াপাড়া যাবো। মোহনকে গাড়ি বার করতে বল। বাজারটা সেরে আসবো।

—কী দরকার মা? আমিই তো যেতে পারি। কী কী লাগবে লিস্ট করে দিন—

—তোমাকে দিয়ে যদি হতো তাহলে আমি যেতে চাইতাম না। যা বলছি করো। কই ফ্রিসি কোথায়? ফ্রি—সি!

পরমুহূর্তেই দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে নেমে এল একটি স্পিৎজ। ধবধবে সাদা। লোমে ভর্তি তার সারা দেহ। পামেলা ওর কলারে চেনটা গলিয়ে নিলেন। একটু পরেই মোহন একখানা প্রাচীন মডেলের হুড-খোলা মরিস মাইনর নিয়ে এসে হাজির। আউট-হাউসে দুটি কামরা। একটায় থাকে ড্রাইভার মোহন একাই। দ্বিতীয়টায় মালি ছেদিলাল। মোহনের পাশের ঘরখানায় থাকে সস্ত্রীক। ওর জেনানা সবযুবাঙ্গি হচ্ছে ঝি। বাসন মাজা, কাপড় কাচা এবং যে কয়খানি ঘর নিত্য ব্যবহার হয় তা মোছার কাজ সবযুব। ওদের আদি নিবাস ছাপরা জিলা।

বাজারে দেখা হয়ে গেল ঊষা বিশ্বাসের সঙ্গে।

—গুডমর্নিং, পামেলা। নাইস টু মীট য়ু হিয়ার!

—মর্নিং ঊষা! কিসে এসেছো? রিকসায়? ফিরবে কিন্তু আমার সঙ্গে।

—থ্যাঙ্কস। অনেক বাজার করেছো দেখছি। ওরা আসছে তাহলে? কে-কে?

—সবাই। টুকু, সুরেশ, হেনা—

—হেনা তাহলে কলকাতায় এসেছে? তার কর্তাটিও আসছে তো?

—হ্যাঁ।

—বাচ্চা দুটো?

—না।

ঊষা বিশ্বাস পামেলার বাল্য বান্ধবী। প্রায় ষাট বছরের সম্পর্ক। বেঁটেখাটো মানুষ। কথা বলতে ভালবাসেন, কিন্তু ইদানীং কথা বলার মানুষ পান না।

দুজনেই জানেন দু'জনের জীবনের ইতিহাস। ঊষা বিশ্বাস চিরকুমারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পামেলার মতই। ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এখন অবসর নিয়ে পেনশন-নির্ভর। মেরীনগরের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসা করেন, হেনারা কোথায় থাকে যেন? পাটনায়?

—না। মজঃফরপুরে। প্রীতমের সেখানে প্র্যাকটিস্ জমছে না, কলকাতায় এসে নতুন করে শুরু করবে বলছে।

—মজঃফরপুরের মতো জায়গায় যার প্র্যাকটিক্ জমলো না, সে কি কলকাতার এই কম্পিটিশনে...

তাঁকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে পামেলা বলেন, সে চিন্তা তাদের। ওরা প্রাপ্তবয়স্ক।

—তা তো বটেই। —ঊষা বিশ্বাস গুটিয়ে নেন নিজেকে। তিনি জানতেন, হেনা যে একটি সর্দারজীকে বিয়ে করে বসেছে এটা পামেলা ভাল চোখে দেখেননি। প্রসঙ্গটা বদলে নিতে ঊষা বলেন, টুকুর সঙ্গে ঐ ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্তের এনগেজমেন্টটা কি পাকা খবর?

—হ্যাঁ, পাকা বইকি। তবে বিয়েটা পাকতে বেশ দেরি হবে মনে হয়। নির্মলের অবস্থাও অদ্যভক্ষ্যাধনুর্গুণ! প্রীতমের মতো!

ঊষা প্রতিবাদ করেন, কেন? টুকুর তো আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট!

পামেলা আড়চোখে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, য়ু থিংক সো?

হেসে ফেলেন ঊষা বিশ্বাস। তিনি জানতেন ভিতরের ব্যাপারটা! পামেলার ছোট ভাই ববের, মানে রবার্টের মৃত্যুর পর স্মৃতিটুকু আর সুরেশ বেশ কিছু নগদ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। সে আজ দশ বছর আগে। এই দশ বছরে ভাই-বোন দুজনেই তা উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে! সুরেশের অংশটা গেছে

ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে, আর স্মৃতিটুকুর মাত্রাতিবিক্ত বিলাসিতায়। পামেলা বলেন, টুকুর পাশ বইয়ে কত 'রেস্ত' আছে জানি না—কিন্তু সেইটের ভরসায় কি নির্মল বিয়ে করতে পারে এখনই?

উষা বলেন, আজকালকার ছেলেরা স্ত্রী-ধনে ভাগ বসাতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

তা হবে! ফেরার পথে উষা বিশ্বাস সবিস্তারে আজকালকার ছেলেমেয়েদের মুণ্ডপাত করতে থাকেন।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা! কথাটা ওঁর মস্তিষ্কেব একটা অংশ কুরে-কুরে খেতে থাকে। বাড়ি ফিরে এসেও চিন্তাটা গেল না। উষা বিশ্বাসের ঐ কথাটা। জেনারেশন-গ্যাপ! একালের ছেলেমেয়েদের সত্যিই বোঝা মুশকিল!

টুকুর কথাই ধর। পামেলার হাতের বাইরে সে। মরকতকুঞ্জে থাকতে সে রাজি হয়নি। বব্ অনেক আগেই মরকতকুঞ্জ ত্যাগ করে চলে যায়। সে ছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েব গার্ড। থাকতো খড়গপুরে। বব্ এ সংসার যখন ত্যাগ করে যায় তখনো পামেলার তিন বোন বেঁচে। যোসেফ অবশ্য আগেই মাটি নিয়েছেন। বব্ মরকতকুঞ্জের অংশ আর্থিক মূল্যে গ্রহণ কবেছিল বোনেদের কাছ থেকে। কারণ তার বিবাহটা ঐরা কেউই মেনে নিতে পারেননি। সে বিধবা-বিবাহ করেছিল বলে নয়, বিধবাটিকেই বরদাস্ত করতে পারেননি ওঁবা। টুকু আর সুরেশের মা হয়ে পড়েছিলেন ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জের আসামী! প্রথম স্বামীকে নাকি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন—এই ছিল তাঁব বিরুদ্ধে অভিযোগ। আজব কাণ্ড! রবার্ট, মানে বব্ তাব হদিস পায় খবরের কাগজে! কাগজের কাটিং-এ তার ছবি দেখে নাকি মোহিত হযে যায়! দীর্ঘদিন দর্শকের আসনে বসে সে ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিল কাঠগড়ার আসামীরূপে। বিচাবে সে বেকসুর খালাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বব তাকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি রাজি হয়েছিল, কিন্তু রাজি হতে পারেননি পামেলা, সরলা, কমলার দল!

বব্ আলাদা সংসার পাতে!

প্রথম স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করেছিল কিনা যীসাস জানেন, দ্বিতীয় স্বামীকে করেনি। ববের আগেই সে মারা যায় দুটি সন্তান রেখে—সুরেশ আর স্মৃতিটুকু। ববের মৃত্যুর পর পামেলা চেয়েছিলেন ওবা দুজনে মরকতকুঞ্জে এসে থাকুক। দুজনের কেউই রাজি হয়নি। তাদেব হাতে তখন কাঁচা টাকা! ঐ জঙ্গলে এসে পড়ে থাকতে তাদেব বয়েই গেছে!

স্মৃতিটুকু হয়ে উঠল গ্ল্যামার-গার্ল। সুরেশ কাপ্তেনবাবু!

হেনার ইতিহাসটা অবশ্য বেদনাদায়ক। বিমলা হালদারের একমাত্র সন্তান। সরলা যৌবনে পদার্পণের আগেই মারা গিয়েছিলেন, কমলা মারা যান বত্রিশ বছর বয়সে—অবিবাহিতা ছিলেন তখনও। কিন্তু ছোট বোন বিমলা বিবাহ করেছিলেন একজন রসায়নের অধ্যাপককে। ওঁরা থাকতেন পাটনায়। হেনা সুন্দরী নয়, লেখাপড়াতে মাঝামাঝি। বাপের ইচ্ছায় রসায়নে অনার্স নিতে হয়েছিল। বেচারি গ্র্যাজুয়েট হতে পারেনি—পর পর দু'বছর পরীক্ষা দিয়েও। অথচ পাস-কোর্সে নিশ্চয় সে উৎরে যেতো!

পামেলার কেমন যেন মনে হয়—হেনা প্রীতমকে ভালবেসে বিয়ে করেনি। করেছে কিছুটা বাধ্য হয়ে। যৌবনের দিনগুলি থুবড়ি থাকার পর তার অবস্থা তখন 'এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্ম'! বাপ-মা-হারা মেয়েটা কিছুতেই মরকতকুঞ্জে এসে থাকতে রাজি হয়নি। পাটনাতেই একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেয়। পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র প্রীতমের সঙ্গে হেনার কীভাবে আলাপ হয় সেটা পামেলা জানেন না; কিন্তু পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় প্রণয়ে, পরিণাম পরিণয়ে।

ইদানীং পামেলার কী জানি কেন মনে হয়েছে—হেনা প্রীতমকে ভালবাসে না। ভয় করে।

অথচ ঘটনাটা উল্টো খাতে বইবার কথা।কারণ বিমলার মৃত্যুর পর হেনা যে স্ত্রী-ধন পায় সেটাও যথেষ্ট। আর তা শেয়ার বাজারের দুঃসাহসিক ফাটকা বাজিতে উড়িয়ে দিয়েছে ঐ পাঞ্জাবী ছেলেটি; ডাক্তার প্রীতম সিং ঠাকুর। পদবিটা রাজপুতের, আসলে সে খালসা শিখ।

গির্জা প্রাঙ্গণের ঋজু শিশু গাছটার মতো স্থির-স্থবির পামেলা জনসন দেখে গেছেন দুনিয়াদারীর এই

বিচিত্র উত্থানপতন। মরকতকুঞ্জের দ্বার ওদের জন্য বরাবরই অবারিত ছিল। কেউ ফিরে আসেনি—প্রডিগাল সানস্ অ্যান্ড ডটার্স! অথচ তিনি নিজের, সরলার এবং কমলার অংশগুলি সুবিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রমাগত বর্ধিত করে গেছেন। এই যখের ধন তিনি কাকে দিয়ে যাবেন?

—মাঝে মাঝে সিমেটেরিতে যান। পাশাপাশি শুয়ে আছেন যোসেফ হালদার, মেরী জনসন, সরলা আর কমলা। তাঁদের সঙ্গেই পরামর্শ কবেন। ওঁদের কথা শুনতে পান তিনি। ওঁদের আশ্বস্ত করেন: আই নো! আই নো! ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার! ওরা আমাদের পথে—তোমাদের পথে চলে না—জেনারেশন গ্যাপ—তা হোক! যক্ষের ধন আমি ওদেরই দিয়ে যাব! তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো! তবে হ্যাঁ, হেনাব অংশটা যাতে তাব সেই দাড়িওয়ালা, পগগ-স্যাঁটা বিদেশী লোকটা না আবার উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, এ ব্যবস্থাটা কবতে হবে। একবাব জিজ্ঞাসা করতে হবে প্রবীর চক্রবর্তীকে।
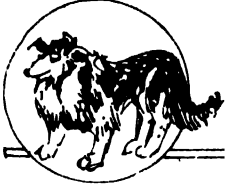
পাঁচই এপ্রিল সকাল।

সুরেশ আর স্মৃতিটুকু হালদাব এল গাড়িতে—কলকাতা থেকে টানা ট্যাক্সিতে। হেনা আর তার স্বামীও এল ট্যাক্সিতে, তবে কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে। সুরেশ আব টুকুরাই এল প্রথমে। সুরেশ ছয় ফুটের মত লম্বা, পেশীবহুল সুঠাম দেহ। সুশ্রী, সুন্দর। দেড় কুড়ি বছর যে পাড়ি দিয়েছে তা দেখলে বোঝা যায় না। ট্যাক্সি থেকে নেমে তিন লাফে উঠে এল বারান্দায় ঃ হ্যালো, আন্টি! হাউজ দ্য গ্যের্ল! য়ু লুক ফাইন!

তাব পিছনে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে এসে গেল টুকু। বযসে সুরেশের চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট। পামেলার মনে হল নিখুঁত মেক-আপেব নিচে স্মৃতিটুকুর মুখখানায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া! তার চোখের কোলে যেন কালিমার আলিম্পন-রেখা!

ড্রইংরুমে ওরা এসে জমিয়ে বসল। আধ ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এসে গেল ঠাকুর দম্পতি। হেনা বয়সে টুকুর চেয়ে এক বছরের ছোট; কিন্তু দেখলে তাকেই দিদি বলে মনে হয়। একটু মোটাসোটা ঢিলে-ঢালা; কিন্তু উগ্রসাজের ঘটা। বাস্তবে সে টুকুর পোশাক ও প্রসাধন অবিকল নকল করতে চায়, বোঝে না—দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, মধ্যক্ষামা, নিম্ননাভির পক্ষে যে পরিচ্ছদ বা প্রসাধন সৌন্দর্যবর্ধক, শ্রোণীভারাদলসগমনা স্থূলাঙ্গীর কাছে সেটা পরিহাস! প্রীতম ঠাকুর তার দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং দীর্ঘতর উষ্ণীষ সত্ত্বেও সুপুরুষ, সুগৌর, চিত্তাকর্ষক।

ইতিমধ্যে মিনতি আর বামুনদি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট, 'কফি-কোজি' দিয়ে ঢাকা কফি আর চায়ের পট। মিনতি রীতিমতো ব্যস্ত, বারেবারেই এটা ধরে নাড়ছে, সেটা ধরে টানছে—কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষমেশ ফুলে ভর্তি ফুলদানি দুটো সে টেবিলের তলায় পাচার করতেই চাইছিল। পামেলার ধমক খেয়ে আবার সে দুটো তুলে আনলো টেবিলে। সুরেশ দু'একবার মহিলাটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল—বেশ বোঝা গেল, সেটা আবার মিনতির পছন্দ নয়। ধন্যবাদ দিল না সে।

চা-পানান্তে সবাই নেমে এলেন বাগানে। সুরেশ তখন জনান্তিকে টুকুকে বললে, মিনতি আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না! লক্ষ্য করেছ?

স্মৃতিটুকু হাস্য গোপন করে বললে, দুনিয়ায় তাহলে অন্তত একটি কুমারী আছে যাকে তুই সম্মোহিত করতে পারিসনি, সুরেশ!

সুরেশকে কোনদিনই টুকু 'দাদা' ডাকে না। তুই-তোকারি করে।

সুরেশ অফেন্স নিল না। সহাস্যেই ফিরিয়ে দিল জবাব, আমার সৌভাগ্য, দুনিয়ার সেই একমেবাদ্বিতীয়মটি শ্রীমতী মিনতি মাইতি!

বাগানে মিনতি মাইতি হেনাকে গাছ-গাছড়া চিনিয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরেই এসে উপস্থিত হলো ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত। কাঁচড়াপাড়া থেকে সাইকেলে চেপে এসেছে। সেখানে সে ডক্টর পিটার দত্তের ক্লিনিকে কাজ করে। তাকে দেখে স্মৃতিটুকু এগিয়ে এলো। নির্মল পামেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন করলো সৌজন্যবশত। তারপর টুকুর হাত ধরে বাগানের নির্জন একটা অংশে মিলিয়ে গেল।

পামেলা বেশিক্ষণ বাগানে থাকলেন না। ফিরে এসে ড্রইংরুমে ঢুকতেই তাঁর নজরে পড়ল সুরেশ ফ্লিসির সঙ্গে খেলায় মেতেছে। ফ্লিসি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়, মুখে বল, আর সুরেশ একতলায়।

—কাম অন, ওল্ড ম্যান!

ফ্লিসির ধবধবে লেজটি তুরতুর করে নড়ছে। অতি সন্তর্পণে রবারের বলটা সে নামিয়ে রাখলো সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ। তারপর নাক দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই—থপ্-থপ্-থপ্। বলটা নিচে এসে পৌঁছতেই সুরেশ সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়লো ওপর দিকে। ফ্লিসি নির্ভুল টিপে লুফে নিল বলটাকে। আবার সযত্নে নামিয়ে রাখলো সিঁড়ির মাথায়।

এই খেলা ফ্লিসির দারুণ প্রিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

পিসিকে ফিরে আসতে দেখে সুরেশ খেলায় ক্ষান্ত দিল। ফ্লিসি মর্মাহত।

পামেলা একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। সুরেশও ঘনিয়ে এল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—দূরে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে টুকু আর নির্মল বাগানে পায়চারি করছে। হাত ধরাধরি করে। পামেলা সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। সুরেশ বললে, ওরা দুজন যেন দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। অথচ...

পামেলা একটু অপেক্ষা করলেন। দেখলেন, সুরেশ বাক্যটা অসমাপ্তই রাখলো।...বললেন, তোর কী মনে হয়? টুকু কি সত্যিই সিরিয়াস?

—প্রেমের দুনিয়াটা বড় আজব, বড়পিসি—চৌম্বকশক্তির মতো। এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। ঋণাত্মক আর ধনাত্মক শক্তির পারস্পরিক আকর্ষণ: নির্মল নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছেলে, আর টুকু ধনীর দুলালী। বেহিসাবী খরচের ওস্তাদ! বিয়ে করলে ওরা সংসার চালাবে কী করে?

পামেলা গম্ভীর হয়ে বললেন, টুকুর সামনে দুটোই অবারিতদ্বার। নির্মলকে বিয়ে করে মিতব্যয়ী হওয়া, অথবা নির্মলকে ত্যাগ করে ববের দেওয়া শেষ ক'খানা কোম্পানির কাগজ উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া—

একগাল হাসলো সুরেশ। বললে, তোমার বুঝি ধারণা শেষ ক'খানা কাগজ ফুলঝুরি হয়ে ফুল কেটে শেষ হয়ে যায়নি আজও।

—সেটা টুকুর জানার কথা।

রাত্রে ডিনার টেবিলে সবাই এসে বসেছেন। ওঁরা ক'জন তো বটেই, মায় ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্তও। তাঁকেও নৈশাহার সেরে যেতে বলেছিলেন পামেলা। নির্মল মেসে থাকে। সে রাজি হয়ে যায়। সকলে গুছিয়ে বসলো। একমাত্র সুরেশই অনুপস্থিত। মিনতি তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছিলো; ঠিক তখনই ভিতর থেকে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলো সুরেশ। বললে, সরি, আন্টি, আমার বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেছে। তোমার কুকুরটা আমাকে জানে মেরে দিয়েছিল আর একটু হলে—সিঁড়ির মাথায় তার বলটায় পা পড়ে একেবারে উল্টে যাচ্ছিলাম।

পামেলা বললেন, জানি! ভারি বিপজ্জনক খেলা। মিন্টি, বলটা খুঁজে বার কর। ড্রয়ারে সরিয়ে রাখ। মিনতি মাইতি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলো আদেশ তামিল করতে।

সায়মাশের আসরটা প্রীতম একাই জমিয়ে রাখল নানারকম 'জোকস্' শুনিয়ে। তার অধিকাংশই যে

গোষ্ঠীকে নিয়ে তাতে সে নিজেও সামিল। প্রতিবাদ করলেন পামেলা, জানি না কে বা কারা এসব গল্প সৃষ্টি করে। আমি তো মনে করি, শিখ হিসাবে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত। ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতি একশ জন ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র একজন শিখ, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়; ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে শিখ! যে কোন অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের আধাআধি ছিল শিখ। এভারেস্টের চূড়ায় এ পর্যন্ত যে চারজন ভারতীয় উঠতে পেরেছে তার তিনজন হচ্ছে শিখ!

প্রীতম স্তম্ভিত হয়ে গেল বৃদ্ধার এ কথায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে, সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, জোকস্ আব জোকস মাদাম! কিন্তু আপনি আজ আমাকে যে কথা বললেন, তা আমি সারা জীবনে ভুলবো না।

সুরেশেব স্বভাবের একটা প্রবণতা হচ্ছে লেগ-পুলিং। ঠ্যাঙ টানার সুযোগ পেলে সে তাকিয়ে দেখে না, কাব ঠ্যাঙ ধরে টানছে। ফস্ করে বলে বসে, বড়পিসি দেখছি প্রীতমকে কম্‌প্লিমেন্টস দেবে বলে তৈরি হয়ে আছো! বুক-অব-রেকর্ডস্ দেখে মুখস্থ করে রেখেছো সব কিছু।

পামেলার মুখমণ্ডল রক্তবরণ হয়ে উঠলো। তবে ভিক্টোরিয়ান যুগের শালীনতাবোধ তাঁর মজ্জায়-মজ্জায়। সংযত হলেন নিমেষেই। হাসতে হাসতেই বললেন, তোর মতো শুধু এক জাতের বইই তো আমি পড়ি না। 'বুক' বলতে তুই তো শুধু বুঝিস অশ্বমেধ যজ্ঞের বংশতালিকা!

সুরেশেব মুখখানা কালো হয়ে গেল!

বুঝলো, সাপেব লেজে পা দেওয়াটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয়নি!

নৈশাহারের পর যে যার ঘরে চলে গেলেন।

রাত দশটা নাগাদ গৃহকর্ত্রীর দ্বারের সামনে শোনা গেল, বড় পিসি, ভিতরে আসবো?

পামেলা দৈনিক হিসাব লেখেন। এইটা তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর পেন-আলটিমেট কাজ। শেষ দৈনন্দিন কাজটি হচ্ছে শয্যার শীর্ষদেশে কুলুঙ্গিতে রাখা মা-মেরীর মূর্তির সামনে দিবসান্তের প্রার্থনা। হিসাবের খাতাটা সরিয়ে বেখে বললেন, আয়।

পর্দা সরিয়ে সসঙ্কোচে প্রবেশ করলো সুরেশ। রঙের টেক্কাটা নামিয়ে দিল প্রথমেই ঃ বড়পিসি, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে রসিকতা করা আমার উচিত হয়নি।

পামেলা মিষ্টি হেসে বললেন, আমাবও ওভাবে আঘাত করাটা উচিত হয়নি রে। যাক্, দু'পক্ষেরই যখন অনুশোচনা জেগেছে তখন সব শোধবোধ হয়ে গেছে। বোস, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—না পিসি। তোমার শুতে যাবার সময় হয়েছে। বসবো না আর। কথাটা না বলে গেলে আমার ঘুম আসতো না। সারাবাত মন খুঁতখুঁত করতো।

পামেলার কী যেন বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে গেল। বললেন, ঠিক বাপের মতো!

—বাপের মতো! মানে?

—বব্-এর সঙ্গে ঝগড়া হলে সেও রাগ পুষে রাখতে পারতো না।

পামেলার মুখের উপর একটা স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটে উঠলো যেন। সুরেশ এ সুযোগ ছাড়লো না। এই খণ্ড-মুহূর্তটির সুযোগ। বললে, তাহলে একটা কথা বলবো বড়পিসি?

—বল না? অমন আমতা-আমতা করছিস কেন?

—ইয়ে হয়েছে...আমি, মানে...আয়াম ইন দ্য ডেভিল অব্ আ হোল। তুমি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারো? বেশি নয়, এই ধরো...হাজার দুই...

পামেলাব বলিরেখাঙ্কিত মুখখানা থেকে সেই স্বর্গীয় জ্যোতিটা মিলিয়ে গেল। যেমনভাবে মিলিয়ে যায় ধূপের ধোঁয়া। না, উপমাটা ঠিক হলো না। ধূপের ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার পরেও বাতাসে ভাসতে থাকে সৌরভের একটা রেশ। এক্ষেত্রে তা হলো না। নস্টালজিক অন্তরনুরাগে পামেলার স্নেহমমতাবঞ্চিত অন্তরে যে অগুরুচন্দনের সৌগন্ধ্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল তা যেন দপ কর শেষ হয়ে গেল। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঋজু ভঙ্গিমায় তিনি সোজা হয়ে বসেই রইলেন। সুরেশ

ভাবান্তরটা লক্ষ্য করলো। বুঝলো, চিঁড়ে ভিজবে না, ভেজেনি। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে কোনক্রমে বললে, কই, কিছু তো বললে না, বড়পিসি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো পামেলার। বললেন, রাত হয়েছে সুরেশ। শুতে যাও।

তবু স্থান ত্যাগ করতে পারলো না সুরেশ। টাকা ক'টার সত্যিই ওর জরুরি দরকার। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বললো, যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলে যাওয়া দরকার, বড়পিসি। শুধু আমার স্বার্থে নয়, তোমার স্বার্থেও।

পামেলা ওর চোখের দিকে তাকালেন না। বললেন বলো?—'বল' নয়, বলো।

—কথাটা অপ্রিয়। তবু এটা তোমাকে জানিয়ে দেওয়াই মঙ্গল...

পামেলার কোন ভাবান্তর হলো না। না কৌতূহল, না অনাসক্তি।

—তোমার বয়স হয়েছে, তোমার শরীর দুর্বল। একা-একা থাকো। তুমি জানো, আমরাও জানি, তোমার অবর্তমানে আমরাই সব কিছু পাবো। আমরা তিনজন। তুমি এ-কথাও জানো যে, আমাদের তিন জনের অবস্থাই খুব সসেমিরা। ছ-মাস বা এক বছর পরে যে আশীর্বাদ তুমি আমাদের দেবে, তা থেকে এখনই...

পামেলা একই সুরে বললেন, হয় বাক্যটা শেষ করো, নয় শুতে যাও সুরেশ।

এখনো তিনি সুরেশের দিকে তাকাননি। তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে শয্যার মাথার দিকের একটি কুলুঙ্গিতে। সুরেশ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। বললে, বুঝছো না কেন বড়পিসি? মরিয়া হয়ে গেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। শেষে তোমার একটা 'ভালমন্দ' কিছু না হয়ে যায়। লোভে পাপ, পাপে ...

পামেলা এবার ভাইপোর দিকে ফিরলেন। চোখে-চোখ রেখে। বোধ করি এবার সুরেশ তার বাক্যটা যে অসমাপ্ত রাখেনি তা প্রণিধান করলেন বলেই। অতি পরিচিত প্রবাদবাক্যটি সমাপ্ত হবার অপেক্ষা রাখে না। পামেলা বললেন, তোমার সৎ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, সুরেশ। ঠিক কথা, আমার বয়স হয়েছে, আমার শরীর দুর্বল! কিন্তু আমি সেকালের মানুষ। নিজেকে রক্ষা করতে জানি। এবার যাও তুমি, গুড নাইট।

সুরেশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। নিঃশব্দে তিনি দক্ষিণ হস্তটা প্রসারিত করে দিলেন। তর্জনী নির্দেশ করছে খোলা দরজাটা।

সুরেশ তার বড়পিসিকে চেনে। নিঃশব্দেই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।
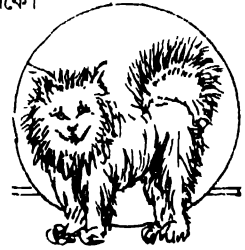
পরদিন এপ্রিলের ছয় তারিখ সকালে সুরেশ যখন দ্বিতলে উঠে এসে টুকুর ঘরে ঢোকা দিল তার আগেই স্মৃতিটুকুর ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু তখনও সে শয্যাত্যাগ করেনি। টুকুর 'কাম ইন' শুনে সুরেশ ঘরে ঢুকল, বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

টুকুর পরনে একটা নীলরঙের ঢিলে-ঢালা সিল্কের নাইটি। শুয়েই ছিল। চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে বললে, কী ব্যাপার? সাত সকালে?

—তোকে একটা কথা বলতে এলাম। কাল রাত্রেই এক দফা হয়ে গেল। চিঁড়ে ভিজলো না। বড়পিসি সোজা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিল।

—তুই বড তাড়াহুড়া করিস সব কিছুতে।

—আমাব উপায ছিল না রে। ভেবেছিলাম, তোদের ওপর টেক্কা দেব। তুই বা হেনা মুখ খোলার আগেই। কেমন যেন মনে হল, প্রথম আবেদনটা বুড়ি শুনবে, তারপর ও সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু বড়পিসি তৈরি হয়েই ছিল। ও জানে, কেন বছর বছর আমাদের দরদ উথলে ওঠে।

টুকু খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—তুই হাসছিস যে, হেসে নে। তোকে যখন দবজা দেখিয়ে দেবে তখন হাসির পালা আসবে আমাব। বুড়ি টাকাব পাহাড জমিয়েছে এর মধ্যে। পাঁচ-সাত লাখ হবেই। অথচ কী কঞ্জুস! মান্ধাতার আমলেব মরিস মাইনর গাডিখানা বেচে একটা ভাল গাড়িও কিনবে না।

টুকু বললে, ওবা বোঝে না রে সুরেশ। জীবনকে উপভোগ করতে ওবা জানে না। জানে না—একটাই জীবন, একটাই যৌবন! যে দিনটা গেল তা আর ফিরে আসবে না। পিসি যেন আশা করে বসে আছে, টাকাব পুঁটলিটা নিয়েই ও স্বর্গেব পথে হাঁটা ধরবে।

—বুড়ির ভয়ডরও নেই রে। আমি কাল রাতে ওকে রীতিমতো শাসিয়েছিলাম...

—শাসিয়েছিলিস্! মানে? বড়পিসিকে? কী বলে?

—বলেছিলাম, "তুমি দুর্বল মানুষ, একা-একা থাকো। তোমার কোন একটা 'ভালমন্দ' হয়ে গেলে..."

—ডাকাতি? তুই কি ভেবেছিস বড়পিসি তাব টাকাকড়ি এখানে নগদে রেখেছে?

—না, তা নয়। আমি বলেছিলাম, "যারা তোমার ওয়ারিশ তাদেব সকলেরই অবস্থা সঙ্গীন। মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে খুব বিপজ্জনক। তার চেয়ে আমাদের তিনজনকেই দু-দশ হাজার এখনি যদি দিয়ে দাও..."

টুকু উঠে বসে খাটের ওপর। বলে, মাই গড! এই কথা তুই বলতে পারলি বড়পিসিকে?

—কথাটা তো মিথ্যে নয়, টুকু!

টুকু আবার শুয়ে পড়ে। সুরেশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলি, তৈরি হয়ে নে। আমার তো হল না, তুই দ্যাখ চেষ্টা করে। উইশ য়ু অল সাক্‌সেস!

টুকু বললে, আমি অন্য দিক দিয়ে চেষ্টা করব। আমাকে বড়পিসি এক কানাকড়িও ঠেকাবে না, মানে বেঁচে থাকতে; কিন্তু নির্মলকে বুড়ি সাহায্য করলেও করতে পারে। নির্মল কী একটা আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছে। হাজার বিশেক টাকা হলেই ও সেই আবিষ্কারটা শেষ করতে পারে। পেটেন্ট নিতে পারে। বড়পিসি সেকেলে মানুষ—জীবনকে উপভোগ করতে জানে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করা ওদের পক্ষে সম্ভব।

সুরেশ বলে, হেনার কোন আশা নেই, কী বলিস?

—আমার তো বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া হেনা টাকা নিয়ে কী করবে। ও জানে না জীবনকে উপভোগ করতে। ও শুধু আমাকে নকল করে যায়—আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও সিকি দামে কিনে অনুকরণ করতে চায় শুধু।

সুরেশ বোনের কাছে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এল।

ফ্লিসি বসেছিল সিঁড়ির নিচে। সুরেশকে নেমে আসতে দেখেই ডেকে উঠল, ঘৌ!

—কী ব্যাপার? তোমার আবার কী চাই?

ফ্লিসি তৎক্ষণাৎ চলে গেল হলঘরের ও প্রান্তে। সেখানে একটা চেস্ট-অব-ড্রয়ার্স। তার সামনে উবু হয়ে বসল। সুরেশ বুঝতে পারে—ঐ টেবিলের টানা-ড্রয়ারের ভিতর রাখা আছে রবারের বলটা। ফ্লিসি খেলতে চায়। সুরেশ এগিয়ে এসে উপরের ড্রয়ারটা টেনে খুললো।

চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো তার। উপরের ড্রয়ারে থাক দেওয়া একটা একশ টাকার নোটের বান্ডিল।

সুরেশ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। না, কেউ নেই কাছে-পিঠে। কেউ ওকে নজর করছে না। নোটের বান্ডিলটার পাশে পড়ে আছে ফ্লিসির বর্ধাবের বলটা। সুরেশ বলটাকে তুলে নিল। নিপুণ আঙুলে ঐ সঙ্গে তুলে নিল এক কেতা নোট। খান চার-পাঁচ। বান্ডিলের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কারও খেয়াল হবে না এত কম নিলে। নোটগুলো পকেটে রেখে বলটা ছুঁড়ে দিল ফ্লিসির দিকে। বেরিয়ে এল বাগানে।

সূর্যোদয় হয়েছে একটু আগে। তেরচা হয়ে শেষ বসন্তের রোদ এসে পড়েছে গাছ-গাছালিতে। প্রভাত পাখির কলরব এখনো থামেনি। বাতাসে কী-যেন একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ। সামনের লনে দু'খানি বেতের চেয়ারে বসেছিলেন পামেলা আর ডক্টর ঠাকুর। ওদের কথোপকথন কানে আসছে। প্রীতম বলছিল, না না, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন। মজঃফরপুরে প্র্যাকটিস গুটিয়ে নিয়ে কলকাতায় এসে বসবার কোন পরিকল্পনা নেই আমার। আমি শুধু মীনাকে কলকাতার কোনও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেবার কথা ভাবছি। ভাল হস্টেলে রেখে পড়াতে।

পামেলা বললেন, ভাল স্কুলে অ্যাডমিশন পাওয়া খুবই কঠিন। তাছাড়া হস্টেল...

—তা তো বটেই। তবে ঘটনাচক্রে একটা চান্স পাওয়া গেছে। আমার এক রিস্তাদার একটি ভাল গার্লস স্কুলের গভর্নিং বডিতে আছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ইনফ্লুয়েন্সে মীনাকে ভর্তি করে নিতে পারবেন। হস্টেলেও সিট আছে—

—তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। তাই কর তোমরা। আমার এখানে তো ভাল স্কুল...

প্রীতম ওঁর বাক্যটা শেষ করতে দিল না। বললে, মুশকিল কি বাৎ হচ্ছে এই যে, আমার রিস্তাদার বলছেন, এজন্য একটা হেভি ডোনেশন দিতে হবে। আই মিন...

সুরেশ এগিয়ে এলো। পামেলা চোখ তুলে চাইলেন। সুরেশ আলোচনাটার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বলে বসলো, বড়পিসি, তোমাদের ব্রেকফাস্ট ক'টার সময়? আমার পেটে কিন্তু ইঁদুরে ডন দিতে শুরু করেছে!

পামেলা হেসে ফেলেন। বলেন, 'ফাস্ট' করলি কোথায় যে, 'ব্রেকফাস্ট' করবি? কাল রাত্রে ত গণ্ডেপিণ্ডে গিলেছিস। এই তো ঘুম থেকে উঠলি। আচ্ছা, দেখছি আমি—

প্রীতমের দিকে ফিরে বললেন, এক্সকিউজ মি—

পামেলা উঠে গেলেন ভিতর দিকে। প্রীতম আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে দেখলো সুরেশের দিকে। সুরেশ খুশিয়াল—পিসিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। বড়পিসি হেসেছে! হয়তো কালকের সেই অপ্রিয় কথাগুলো মনে করে রাখেনি।

দ্বিতলের 'ওক-রুম'টি আকারে বড়। নাম শুনলে মনে হয় এটি বুঝি ওক কাঠের লগ-কেবিন। বাস্তবে ওক-কাঠের চিহ্নমাত্র নেই। তবে পশ্চিমের দিকে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটা আরণ্যকদৃশ্য। খোদায় মালুম, তার ভিতর ওক গাছ আছে কিনা। সম্ভবত এ ঘরের ঐরকম বিচিত্র নামকরণ হয়েছে ভিন্ন কারণে। প্রাসাদটি যখন নির্মিত হয় তখন যোসেফ হালদার আর মেরী জনসন তাঁদের যৌবনকালের কোন একটি 'ওক-রুমে'র স্মৃতিতে বিভোর ছিলেন। তাতেই এই নাম।

সে যাই হোক, এই ঘরখানাতে আশ্রয় পেয়েছিল প্রীতম আর হেনা। দ্বিতলের পশ্চিমপ্রান্তের ঘর একটা। পূর্বপ্রান্তে গৃহস্বামিনীর কামরা। মাঝখানে সুরেশের 'দোলনা-ঘর', তারপর টুকুর ঘর আর পশ্চিমপ্রান্তে এই ওক রুম।

সেদিন রাত্রের কথা। হেনা ড্রেসিং টেবিলে নৈশ প্রসাধন সারছে। প্রীতম তার প্যান্ট বদলে পায়জামা পরতে পরতে বললে, আমি মোটামুটি জমিটা তৈরী করে রেখেছি। এখন শেষ কিস্তি তুমি দেবে হনি।

হেনাকে প্রীতম জনান্তিকে 'হনি' বলে ডাকে।

হেনা ব্লাউজটা খুলে রেখেছে। তার ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু ব্রা। রাত্রে ও মাথায় কিছু বিচিত্র ক্লিপ লাগিয়ে শোয়—চুলটা তাতে স্মৃতিটুকুর চুলের মতো কোঁকড়ানো হয়ে যাবে। আয়নায় দেখে দেখে ক্লিপ

সাটছিল হেনা। একটু ইতস্তত করে বললে, প্লীজ, আমাকে বোলো না। আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বড়মাসিকে টাকার কথা বলতে পারবো না।

প্রীতম সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে, কিন্তু তুমি তো নিজের জন্য চাইবে না, চাইবে মীনার জন্যে, রাকেশের জন্যে। তুমি তো জানই নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত শেয়ার বাজারে...

হেনা ঘুরে বসলো। প্রীতম তার চোখে-চোখে তাকাতে পারলো না। মাথার বিরাট পাগড়িটা খুলে চুলটা আঁচড়াতে থাকে। হেনা মিনতির সুরে বলে, বুঝছো না কেন? বড়মাসিকে বোঝা বড় শক্ত। সে কঞ্জুষ নয়, মাঝে মাঝে উপহারও দেয়, তা তুমি জানো; কিন্তু কেউ তার কাছে হাত পাতলে—

—ভিক্ষা তো নয়, ধার। আমরা ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

হেনা এ প্রসঙ্গ তুললো না যে, মজঃফরপুরের সংসারে তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বরং বললে, শোন; তুমি অন্য কোথা থেকে বরং টাকাটা ধার করার চেষ্টা কর। বড়মাসি দু'চোখ বুজলেই তো আমরা শোধ করে দিতে পারবো; সে আর কতদিন?

প্রীতমের কণ্ঠে এবার স্পষ্টই বিরক্তি, তুমি মাঝে মাঝে বড় অবুঝ হয়ে পড়, হেনা! মুখ ফুটে চাইতেই যদি না পারবে তাহলে এত খরচপাতি করে বিহার থেকে আমরা এলাম কেন? তোমার মাসির জন্মদিনে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু যু' গাইতে?

প্রীতম যে 'হেনার' বদলে ওকে 'হনি' ডাকছে না এটা খেয়াল করেছে সে। কিন্তু তবু সে জেদি মেয়ের মত বললে, আমি টাকা ধার চাইতে বাপের বাড়ি আসিনি।

—সে কথা আমিও বলছি না; কিন্তু এ কথা কি বলনি যে, আমাদের এই বিপদে তোমার আন্টিই শুধু আমাদের বাঁচাতে পারে? আর আমরা কিছু লাখ-বেলাখ টাকা ধার চাইছি না। সে টেন থাউজেন্ড। তোমার বড়মাসির কারেন্ট অ্যাকাউন্টেই হয়তো সে টাকা পড়ে আছে। বিনা সুদে!

হেনার ক্লিপ আঁটা শেষ হয়েছিল। হাত-ব্যাগ খুলে সে বার করলো একটা হাল্‌কা রঙের সিল্কের নাইটি। ঢিলে-ঢালা নয়, আঁটোসাঁটো। পাশের ঘরে যে নাইটি পরে অঘোর ঘুমে ঘুমোচ্ছে স্মৃতিটুকু হুবহু সেই রঙ; সেই মাপ। নাইটিটা মাথা দিয়ে গলিয়ে বললে, দেখাই যাক না। বড়মাসি হয়তো নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা তুলবে—মীনাকে ভর্তি করার কথাটা—

—আমার মনে হয় তার সম্ভাবনা খুবই অল্প।

—রাকেশকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ভাল হত। চোখে দেখলে,...কী ফুটফুটে হয়েছে ছেলেটা—

—তাতে লাভ হত থোড়াই! তোমার আন্টি বাঁজাখাজা মানুষ। ছেলেপুলে একদম দেখতে পারে না।

হেনা একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে, প্লীজ প্রীতম!

স্বামীকে নাম ধরেই ডাকে সে। এটাই ফ্যাশন। টুকু বিয়ে করলে নির্মলকে নিশ্চয়ই নাম ধরেই ডাকবে।

প্রীতম বলে, জানি হেনা, কথাটা তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু এটাই সত্যি কথা। তোমার মাসির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। টাকার কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। খরচ করছেন না, করতে জানেনও না। তবু যখের ধন আগলে বসে আছেন অনন্ত পরমায়ু নিয়ে! তিনি জানেন, তুমিও জানো আমিও জানি—বুড়ি চোখ বুজলেই এই মরকতকুঞ্জ সমেত সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হবে তুমি। তাহলে আজই বা বুড়ি তা থেকে দশ-বিশ হাজার আমাদের ধার দেবে না কেন? না হয় তার উইল থেকে সে ক'হাজার কমিয়ে দিক...

হেনা সাশ্রুলোচনে বলে ওঠে, প্লীজ প্রীতম! ওভাবে বল না! এবার আমি কিছুতেই টাকা ধার করার কথা ওঁকে বলতে পারবো না!

প্রীতম এক পা এগিয়ে আসে। হেনার কাঁধে একখানা হাত রাখে। বাঘের থাবা যেন। দৃঢ়স্বরে বলে, তুমি জান, শেষ পর্যন্ত আমার মতটাই তোমাকে চিরকাল মেনে নিতে হয়েছে। এবারও তাই হবে। হ্যাঁ, এবারও তাই করতে হবে তোমাকে। যা আদেশ করেছি আমি...

হেনা একেবারে কুঁকড়ে গেল।

সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা

ঐ ছয় তারিখেরই ঘটনা। সোমবার, রাত দশটা।

কাল পামেলার জন্মদিন, সাতই এপ্রিল। অতিথিরা যে যার ঘরে চলে গেছে। পামেলা তাঁর দ্বিতলের ঘরে বসে নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে হিসাবের খাতায় সব কিছু লিখে নিচ্ছিলেন। সামনে একটা টুলে বসে আছে মিনতি। তার হাতে একটা নোট বই। কী কী খরচ হয়েছে তার হিসাব লেখা। গৃহস্বামিনী যোগটা শেষ করে বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকাটা তুলেছি সে টাকা কোথায় রেখেছ?

—নিচে হলঘরের ড্রয়ারে। যেখানে থাকে।

—না। টাকা-কড়ি অমন ছড়িয়ে রেখো না। হয় তোমার আলমারিতে রেখো, না হলে আমাকে রোজ দিয়ে যেও। বুঝলে?

মিনতি আদেশটা বুঝতে পারে, তার অন্তর্নিহিত বার্তাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তবে আদেশ তামিল করাতে সে অভ্যস্ত। বললে, আচ্ছা মা।

এবার গৃহস্বামিনী যা বললেন তাতে আদ্যোপান্ত গুলিয়ে গেল ওর। 'আচ্ছা মা'-ও জোগালো না তার মুখে। এমন বিচিত্র কথা সে তার তিন বছরের চাকরি জীবনে কোনদিন শোনেনি। পামেলা বলছিলেন, কাল আমার জন্মদিন, মনে আছে নিশ্চয়। কাল সকালে বুড়ো শিবতলায় আমার নামে বিশ টাকার পূজো দিয়ে আসবে। তোমরা সবাই বাবার প্রসাদ পেও—তুমি, মোহন, শান্তি, ছেদিলাল, সবয়ু, সবাই—

মিনতিকে নিরুত্তর দেখে আবার বললেন, কী বললাম বুঝতে পেরেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। না, মানে...আপনি তাহলে...ইয়ে, ঠাকুর-দেবতা মানেন?

—আমি যে মানি না, তা তুমি জান মিন্টি। কিন্তু এটা করলে তোমরা সবাই তৃপ্তি পাবে এটাও আমি জানি। এ বুড়ি পটল তুললে তোমাদের কিছু লাভ নেই, বরং চাকরি খোয়াবে। তাই তোমাদের আন্তরিক কামনাটা জোরদার করা আমার কর্তব্য!

কী নিদারুণ অভিমানে উনি কথাক'টা বললেন তা বুঝবার মতো মিনতির না ছিল বুদ্ধি না শিক্ষা। সে খুশিয়াল হয়ে ওঠে। কর্ত্রী খেস্টান, তাঁর পরিচারকবৃন্দ অধিকাংশই হিন্দু। আগেকার দিন হলে খেস্টান-বাড়িতে অন্নগ্রহণ করায় ওদের সবার জাত যেতো। এখন দিন-কাল পালটেছে। জাত অত সহজে যায় না—এরকম আলোকপ্রাপ্ত শহরে।

মিনতি বললে, আপনার পেত্যয় হয় না, কিন্তু ঠাকুরমশাই সত্যিই পিচাশসিদ্ধ।

—কথাটা 'পিচাশ' নয়, 'পিশাচ'। তা তুমি কেমন করে জানলে?

—দেখেছি কিনা। প্ল্যানচেটে তিনি ভূত-প্রেত নামাতে পারেন। মানে ভূত ঠিক নয়, অশরীরী আত্মা সব। যাঁরা একদিন এই আপনার-আমার মতো জীবিত ছিলেন।

প্ল্যানচেট ব্যাপারটা জানা ছিল পামেলার। প্রিয়জনেরা একে একে বিদায় নেবার পর নিঃসঙ্গ পামেলা জনসন এককালে সেদিকে ঝুঁকেছিলেন। সরলা, কমলা, বিমলা অথবা বব-এর আত্মাকে নামিয়ে এনে এই মরকতকুঞ্জের নিভৃত কক্ষে দু-চারটে ভালবাসার কথা বলার প্রচেষ্টা। ইংরেজি বই এনে চেষ্টা করে দেখেছেন। কেউ কোনদিন আসেনি। বুঝেছিলেন—এসব নেহাৎই বুজরুকি। বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ধান্দায় একজাতের সুযোগ-সন্ধানী এসব কথা প্রচার করে। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, আত্মীয়-স্বজনের নির্লজ্জ লোলুপতা দেখে তিনি হয়তো মনে মনে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েই ছিলেন। প্রশ্ন করেন, তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

—দেখেছি মা। অনেক-অনেক বার।

—কী দেখেছ?

—ঠাকুরমশাই আর সতী-মা ঘর অন্ধকার করে প্ল্যানচেট করেন। স্বর্গ থেকে এক এক দিন নেমে আসেন এক-একজন। ঠাকুরমশাই তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি জবাব দেন—

—মৌখিক জবাব?

—না। লিখে লিখে। আমি মিলিয়ে দেখেছি—সেসব কথা নিয্যস সত্যি!

পামেলা যেন কী ভাবছেন। তাঁর দৃষ্টি একটি কুলুঙ্গিতে নিবদ্ধ। মিনতি সাহস পেয়ে বললো, গত মঙ্গলবারেই এসেছিলেন একজন। বিরাট পুরুষ। নামের আদ্য অক্ষরটুকু জানালেন তিনি—'য'! ঠাকুরমশাই বলে না দিলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি কে—তিনি অনেক কথা বললেন, মেরীনগরের সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। আর একটা কথা বললেন যার মানে আমি তো ছার, ঠাকুরমশাই, নিজেও বুঝতে পারেননি। মনে হল উনি বললেন, 'এক ঘরে বাবার ব্রহ্মতালুতে উকিলটা লুকিয়ে আছে!'

পামেলার কী যেন হলো। চট করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, রাত অনেক হল মিন্টি। এবার আমি শোব। যাও, ঘরে যাও।

মিনতি শশব্যস্তে প্রস্থান করলো।

পামেলা প্রার্থনান্তে শয়ন করলেন তাঁর শয্যায়। ঘুম এলো না কিছুতেই। এমন নিদ্রাহীন রাত্রি মাসে পাঁচ-সাতটা আসে। এতে উনি অভ্যস্ত। কিছুতেই স্লিপিং পিল খাবেন না। বলেন, দুর্বল মানুষেরা ওসব খায়। দু'রাত্রি ঘুম না হলে মানুষ মরে যায় না। শরীরের নাম মহাশয়—বাকি দু'দিন বেশি ঘুমিয়ে শরীর তার পাওনাগণ্ডা ঠিক পুষিয়ে নেবেই। এমন নিদ্রাহীন রাত্রে তিনি ঘাসের চটি পায়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। এটা ঠিক করেন, ওটা সরিয়ে নাড়িয়ে দেন। পায়চারি করেন ক্রমাগত। তারপর ক্লান্ত শরীরে শেষ রাতের দিকে আপনিই ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ ঘুম না আসার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। আগামীকাল সেই তাঁর ক্লান্তিকর জন্মদিন। 'বাহাত্তুরে' হবার শুভলগ্ন। তাঁর মৃত্যুকামী একদল 'ওয়ারিশ'-এর সেই বীভৎস গান—'হ্যাপী বার্থ ডে টু য়ু!' উপায় নেই, ভদ্রতার মুখোস এঁটে এ অত্যাচার প্রতি বছর সয়েছেন, এবারও সইবেন।

কিন্তু মিন্টি ওটা কী বলল?

'এক-ঘরে-বাবার ব্রহ্মতালুতে—ওটা কি 'একঘরের' বদলে 'ওক ঘরে'? 'উকিল'টা কি 'উইল'টা?

অনেক-অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল পামেলার। যোসেফের মৃত্যুর পর তাঁর কোনও উইল খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ তাঁর অ্যাটর্নি বলেছিলেন, যোসেফ একটি উইল করে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও ওঁরা ক-ভাইবোন সেই কাগজখানি উদ্ধার করতে পারেননি। তাতে অবশ্য প্রবেট পেতে অসুবিধা হয়নি কিছু। ওঁরা কয়জনই ছিলেন আইনানুগ ওয়ারিশ। আর কোনও দাবিদার এসে উপস্থিত হয়নি মৃত যোসেফ হালদারের সম্পত্তি দাবি করে।

তার প্রায় দশ বছর পরে পামেলা উইলখানি খুঁজে পান। সন্তানদেরই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যোসেফ হালদার। ততদিনে সরলাও গত। কিন্তু সেই উইলখানি খুঁজে পেয়েছিলেন এক বিচিত্র স্থান থেকে। ওক-রুমে ঠাকুরদার ছবিখানি পেড়ে নামিয়ে ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে দেখলেন অয়েল-পেন্টিঙের পিছনে একটা গুপ্ত বোতাম্। সেটা টিপতেই একটা ছোট্ট কুলঙ্গির পাল্লা খুলে গেল। আশ্চর্য! তার ভিতর যোসেফের একটি ডায়েরি, কিছু গিনি আর তাঁর স্বহস্তে লেখা উইল!

এই বিচিত্র ঘটনার কথা বুড়ো শিবতলার পূজারী ঠাকুরমশায়ের জানার কথা নয়। তাহলে কী ভাবে ঐ কথাটা লেখা হল প্ল্যানচেট কাগজে 'এক ঘরে বাবার ব্রহ্মতালুতে...'

উঠে পড়লেন উনি। গায়ে একটা গাউন জড়িয়ে নিলেন—যদিও গরম পড়তে শুরু করেছে। পায়ে গলিয়ে নিলেন ঘাসের চটি-জোড়া। ওঁর হঠাৎ ইচ্ছা হল নিচের ঘরে বাবার অয়েল পেন্টিংটার সামনে

গিয়ে দাঁড়াবেন। নিঃশব্দে দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। স্তিমিত একটা বাল্ব জ্বলছে। এটা সারারাতই জ্বলে। নিচেও একটা লাইট জ্বলছে। মিনতি এ দুটো রাতে নেবায় না। সে জানে, মাসের মধ্যে পাঁচ-সাতদিন ঐ বৃদ্ধা নিদ্রাহীন অবসর যাপন করেন অশান্ত পদচারণে।

উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন রেলিংটা ধরবেন বলে, আর ঠিক তখনি...কার্যকারণসূত্র বোঝা গেল না, মনে হল তিনি শূন্যে ভাসছেন! দু-হাত বাড়িয়ে রেলিঙটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন...পারলেন না...উল্টে পড়লেন সিঁড়ির ধাপে...গড়গড়িয়ে নিচের দিকে।

তাঁর চিৎকারে এবং পতনজনিত শব্দে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। হয়তো অনেকে জেগেই ছিল—রাত সাড়ে দশটাও হয়নি। মুহূর্তমধ্যে সবাই ছুটে এল অকুস্থলে।

পামেলা জ্ঞান হারাননি। কিন্তু সর্বাঙ্গে তীব্র বেদনা। সিঁড়ির শেষ ধাপে পড়ে আছেন তিনি। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মুখ। মিনতি দু-হাত উৎক্ষিপ্ত করে মড়াকান্না শুরু করেছে—তার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না।...টুকুর পরনে একটা নীল সিল্কের কী যেন...হেনার মাথায় একগাদা কী যেন...। চৈতন্যের শেষ প্রান্ত থেকে বৃদ্ধা শুনতে পেলেন সুরেশের কণ্ঠস্বর। সে একটা লাল বল উঁচু করে সবাইকে দেখাচ্ছে। বলছে, ফ্লিসি হতভাগার কাণ্ড! এই দেখ বলটা! সিঁড়ির মাথায় পড়েছিল সেটা...বড়পিসি তাতে পা দিয়েই...

না, তখনও জ্ঞান হারাননি উনি। এবার শুনতে পেলেন একটি আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর---তোমরা সবাই সরে দাঁড়াও। আমাকে দেখতে দাও।

ডক্টর প্রীতম ঠাকুর!

পামেলা আশ্বস্ত হলেন সেই কণ্ঠস্বরে। প্রীতম পরীক্ষা করে বলল, মনে হয় হাড়টাড় ভাঙেনি। জ্ঞান আছে এখনো।

দু-হাতে পাঁজাকোলা করে বৃদ্ধাকে তুলে নিল সে।
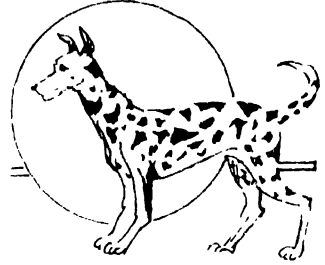
ওরা কোনও ঘুমের ঔষুধ ওঁকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছিল কিনা জানেন না। টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা উনি অঘোরে ঘুমিয়েছেন। তারপর আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল একটা পরিচিত শব্দে:

ঘৌ-ঘৌ নয়, কুঁই-কুঁই।

চোখ দুটি খুলে গেল বৃদ্ধার। লক্ষ্য হল পাশেই বসে আছে মিনতি। বসে বসেই ঘুমাচ্ছিল সে ঘাড় গুঁজে। ফ্লিসির কুঁই-কুঁইটা তারও কানে গেছে। চট করে উঠে দাঁড়ালো সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই সদর-দরজা খোলার শব্দ। তারপর মিনতির চাপা কণ্ঠস্বর ঃ হতভাগা! বাঁদর। কর্ত্রীর এখন-তখন, আর তুই সারারাত পাড়া বেড়াচ্ছিস্!

পামেলার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা; কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। ওঁর মনে পড়ে গেল—মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত দিন তিনি নিজে যেমন নৈশবিহার করে থাকেন, তেমনি ফ্লিসিও করে। তফাৎ এই, উনি নৈশবিহার সারেন মরকতকুঞ্জের ভিতরে, ফ্লিসি বাইরে। তফাৎ এই, গৃহকর্ত্রী সে জন্য আদৌ লজ্জিতা নন, ফ্লিসি সলজ্জ!

এতক্ষণে বৃদ্ধার মনে পড়লো—দুর্ঘটনার পর থেকে কিসের যেন একটা অভাব বোধ করছিলেন তিনি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাড়িশুদ্ধ সবাই জড়ো হয়েছিল, কিন্তু একটা অতি পরিচিত সারমেয় গর্জন তিনি শুনতে পাননি। তার মানে ফ্লিসি বাড়িতে ছিল না। থাকলে, সবার আগে সেই পাড়া মাথায় তুলতো!

কিন্তু! তা কেমন করে হয়? বলটা তাহলে কেমন করে...

মনে পড়ে গেল সুরেশের কথাটা। উনি সিঁড়ির নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন আর সুরেশ রবারের বলটা উঁচু করে দেখিয়ে বলছে, এইটার জন্যেই বড়পিসির পা হড়কেছিল।

তাই কী?

সেই খণ্ডমুহূর্তের কথাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন পামেলা। পতনের পূর্বমুহূর্তটা। না, পায়ের তলায় নরম রবারের বলটার কোন স্পর্শের স্মৃতি তাঁর নেই। তাহলে হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন কী করে? কেন? না, পিছন থেকে কেউ তাঁকে ঠেলা দেয়নি। ত্রিসীমানায় তখন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। না, পায়ের তলায় রবারের বলটাও ছিল না। তাহলে?

ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য!

ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, রাত্রে সায়মাশের পর, সবাই যে যার ঘরে চলে যাবার পর তিনি আর মিনতি দোতলায় উঠে আসেন। সরযূ এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে টেবিলটা যখন সাফা করছে তখনো তিনি নিচে হলঘরে। ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, সরযূ চলে যাবার পর মিনতি সদর বন্ধ করলো। ওঁরা দুজনে দোতলায় উঠে এলেন। তখন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওঁর নজরে পড়েছিল রবারের বলটা সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে। নিচে অর্থাৎ দোতলায় নয়। ঠিক মনে পড়ছে না, উনি কি মিন্টিকে বললেন বলটা সরিয়ে রাখতে? নাকি বলবেন ভেবেছিলেন? বলেননি? সে যাই হোক, বলটা উপরে উঠে এল কীকরে? ফ্লিসি মুখে করে আনতে পারে না; কারণ তার আগেই রাতের মতো সদর দরজা বন্ধ হয়েছে। ফ্লিসি নিশ্চয়ই তার আগেই বেরিয়ে গেছে। এই শেষ রাত্রে ফিরলো! তাহলে কে বলটাকে উপরে নিয়ে এসেছিল। আদৌ এসেছিল কি?

না আসেনি। সুরেশের ডিডাক্‌শানটা ভুল। পতনজনিত দুর্ঘটনার হেতু ঐ রবারের বলটা নয়। বল নয়, কলার খোসা নয়, পিছন থেকে ঠেলাও কেউ দেয়নি, তাঁর মাথাও ঘুরে ওঠেনি—তাহলে তিনি পড়ে গেছেন কী করে? কেন?

হঠাৎ একটা নিরতিশয় আতঙ্কের আভাস পেলেন যেন। আতঙ্কেরই শুধু নয়, নিরতিশয় গ্লানির, লজ্জার।

তাই কি?

না, এখন নয়। এখন তাঁর স্নায়ু দুর্বল। শরীর অবশ। কিন্তু কথাটা ভুললেও চলবে না। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে তাঁকে। সুসময়ে। একটু সামলে উঠেই!
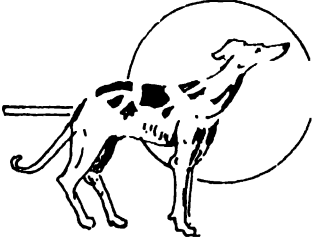
সতেরই এপ্রিল। দশটা দিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

বাড়ি ফাঁকা। সবাই চলে গেছে যে যার পরিচিত গণ্ডিতে।

এবার এই বাহাত্তরের ঘাটে এসে ওঁকে আর সেই ক্লান্তিকর ঘ্যানঘ্যানটা শুনতে হয়নি: হ্যাপি বার্থডে টু য়ু! অনিমন্ত্রিত এসেছিলেন দু'জন। শুভেচ্ছা জানাতে। পিটার দত্ত আর ঊষা বিশ্বাস। জন্মদিনের সন্ধ্যায় তিনি শয্যাশায়ী।

ওরা চারজনই—সুরেশ, টুকু, হেনা আর প্রীতম মরকতকুঞ্জে থেকে যেতে চেয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষা করতে। গৃহকর্ত্রী সম্মত হননি। সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বুড়িব যেন ভদ্রলোকের এককথা: চিরটা কাল একলা-একলা কাটিয়েছি। ফাঁকা বাড়ি না হলে আমি শান্তি পাব না। আসিস, তোরা আবাব আসিস, কিন্তু তার আগে আমাকে একটু সামলে নিতে দে।

অতিথিরা বিদায় হবার পর প্রথম কয়েকটা দিন পামেলা শুধু চিন্তা করেছেন। ডক্টর পিটাব দত্ত ওঁকে বারণ করেছেন চিন্তা করতে, বলেছেন, মনটা প্রফুল্ল রাখতে। কাবণ ইতিমধ্যে ওঁর বক্তচাপটা—যেটা এতদিন কোনও বেয়াড়াপানা করেনি—নানাবকম অবাধ্যতা শুরু করেছিল। ডাক্তাব দত্তেব সঙ্গে ওঁব সম্পর্কটা একটু অন্য ধরনের। দু'জনেরই সত্তবেব ওপরে, দু'জনে দু'জনকে চেনেন পঞ্চাশ-ষাট বছব। ডাক্তার দত্তের চোখে যুবতী পামেলাব সেই মোহিনী মূর্তিটা আজও মুছে যাযনি। তিনি বাল্যবান্ধবীকে নাম ধরেই ডাকতেন। বলেছিলেন, এগাবোটা সিঁড়ির ধাপ গড়িযে পড়লে আব একখানাও হাড় ভাঙতে পাবলে না পামেলা, ইটস শিযার ডিসগ্রেস! আশ্বাস দিতেন, কিচ্ছু হযনি তোমার। পরেব সপ্তাহেই আবার নিচে নামবে তুমি, আগেকাব মতো আমাকে নেমন্তন্ন কবে নিজে হাতে বানানো পাম-কেক খাওয়াবে!

ওঁর অসুখটা এবার সারছে না শুধু ঐ দুশ্চিন্তায়। ঘটনার পারম্পর্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিদিনই ঊষা বিশ্বাস এসে দেখা করে গেছেন, ফুলের তোড়া হাতে। তাঁকেও কিছু মন খুলে বলতে পারেননি। এ-কথা কি মন খুলে বলার? তবে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজ সকালেই। কলকাতায় ওঁর অ্যাটর্নি প্রবীর চক্রবর্তীকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা কবছেন, দু-চারদিনেব মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। কিন্তু তাতে ভবিষ্যৎকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অতীতটা উদ্ঘাটিত হবে না। অথচ বিগত ঘটনার রহস্যজালটা ভেদ করতে না পারলে তিনি যে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পাবছেন না। কেমন করে এমনটা হল? একতলা থেকে কী ভাবে রবারের বলটা দোতলায় উঠে গেল? যদি না গিয়ে থাকে—যায়নি বলেই তাঁর ধারণা, কারণ সেই বিশেষ খণ্ড-মুহূর্তে পায়ের তলায় একটা নরম রবারের বলের টাকে কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছিলেন না তিনি। তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত..

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টেব মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। অসতর্ক মুহূর্তে বলে উঠলেন: জগদানন্দ সেন।

মিনতি শুয়ে ছিল মাটিতে মাদুব পেতে। উঠে বসে বললে, কিছু বললেন মা?

—হ্যাঁ, আমার চিঠি লেখার সরঞ্জামটা নিয়ো এসো তো মিন্টি। আর ঐ সঙ্গে টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা।

একটু পরেই ফিরে এল মিনতি হুকুম তামিল করে।

হাত বাড়িয়ে সব কিছু নিলেন। কিন্তু আবার নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন যেন। ওঁর মনে পড়ে গেছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের জগদানন্দ সেন পরলোকগমন করেছেন। জগদানন্দই ওঁকে বলেছিলেন সেই বিচিত্র বিচক্ষণ ব্যারিস্টারটির কথা। ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল। যিনি জগদানন্দের কেসটা জিতিয়ে দিয়েছিলেন, ফাঁসীর আসামী জগদানন্দকে মুক্ত করেছিলেন এবং কে তাঁর ভাইপো যোগানন্দকে হত্যা করেছিল তা খুঁজে বার করেছিলেন! তার চেয়েও বড় কথা, জগদানন্দের কী একটা পারিবারিক অত্যন্ত গোপন সমস্যা এমনভাবে সমাধান করেছিলেন যাতে কেউ কিছু জানতে পারেনি। কী যেন নাম ব্যারিস্টারটির? কিছুতেই মনে পড়ল না। জগদানন্দের বাড়িতে টেলিফোন আছে, হয়তো জগদানন্দের নাতনিকে টেলিফোনে পাওয়া যায় কিন্তু মরকতকুঞ্জে টেলিফোন রাখা আছে একতলার হল-ঘরে। উনি প্রায় উত্থানশক্তি-রহিতা। মিনতির দ্বারা একাজ হবে না। নাঃ! নামটা ওঁকে মনে

করতে হবেই। আপাতত মিনতিকে বললেন, থাক, এখন চিঠি লিখবো না। এগুলো রেখে এসো।

মিনতি হুকুমের চাকর। আবার সেসব সরঞ্জাম রেখে এল নিচের ঘরে। হয়তো এখনি কর্ত্রী আবার চিঠি লিখতে চাইবেন, তাহলেও জায়গার জিনিস জায়গায় থাকবে, এই হচ্ছে মরকতকুঞ্জের আইন।

চিঠির সরঞ্জাম যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে মিনতি বললে, বই-টই পড়বেন? কোনও গল্পের বই এনে দেবো?

—লাইব্রেরি থেকে কিছু বই এনেছো? কই দেখি?

—হ্যাঁ, মা, এনেছি। আপনি যেগুলোর নাম লিখে দিয়েছিলেন তার একখানাও পাইনি। দাশুবাবু নিজে থেকেই এই গোয়েন্দা গল্পের বইটা দিল। বললে, খুব জমাটি বই।

—দাশু তো বলবেই। ও শুধু গোয়েন্দা গল্পের বইই পড়ে। কী নাম বইটার?

—দাঁড়ান, এনে দেখাই। আমার ঘরে আছে। 'কিসের কাঁটা' যেন— পি.কে.বাসু গোয়েন্দা সিরিজের...

—দ্যাটস্ ইট! —প্রায় লাফিয়ে উঠে বসেন পামেলা জনসন।

মিনতি চমকে ওঠে। সে নিজে গোয়েন্দা বইয়ের পোকা। কিন্তু কর্ত্রী ডিটেকটিভ বই কদাচিৎ পড়েন: লাইব্রেরীয়ান দাশুবাবু প্রায় জোর করেই এ বইখানা গছিয়ে দিয়েছে। বলেছে, নিয়ে যান, আপনার তো ভাল লাগবেই, ম্যাডামেরও দারুণ লাগবে।

মেরীনগরে অনেকে পামেলা জনসনকে 'ম্যাডাম' বলে।

মিনতি বলে, নিয়ে আসি তাহলে?

—শ্যিওর! শুভস্য শীঘ্রং! এখনই বখেড়া চুকিয়ে দিতে চাই।

মিনিট পাঁচেক পরে মিনতি নিজের ঘর থেকে লাইব্রেরির বইটা নিয়ে এল। তার মাঝামাঝি পড়া শেষ হয়েছিল। কিন্তু কর্ত্রী যখন 'দ্যাটস্ ইট' বলে অমন লাফিয়ে উঠেছেন, তখন তিনিই আগে পড়ুন।

বইখানা নিয়ে সে ফিরে এলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন পামেলা।

—এ কী ? ইডিয়ট্! বইটা নিয়ে আসতে কে বললো তোমাকে? আমার চিঠি লেখার প্যাডটা চাইলাম না আমি? প্যাড, কলম, কুইক্!

মিনতি কোনক্রমে সামলে নেয় নিজেকে। আবার নিচে যেতে হয় তাকে। নিয়ে আসতে হয় লেখার সরঞ্জাম। হাত বাড়িয়ে সেগুলি গ্রহণ করে পামেলা বলেন, তোমার ঐ গোয়েন্দা গল্পের বইটার মাঝখানে একটা 'চুলের-কাঁটা' গোঁজা আছে। তার মানে তুমি ওটা আধাআধি পড়েছো! কারেক্ট?

মিনতি স্বীকার করে।

—দ্যাটস্ অল রাইট। বইটা নিয়ে যাও। ঘণ্টাখানেক পরে আমার হরলিক্সটা নিয়ে এস। আর শোন, এই এক ঘণ্টার মধ্যে কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে। বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মিনতি চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন আবার ঃ শোন।

মিনতি আবার এসে নতনেত্রে দাঁড়ায়, আদেশের অপেক্ষায়।

—এখনি তোমাকে গালমন্দ করেছি বলে রাগ করনি তো?

মিনতি লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে জানায়—সে কিছু মনে করেনি।

—দ্যাটস্ আ গুড গ্যের্ল! বকে কে? বকে মা! কারণ মা ভালবাসে। নয় কি? যাও।

নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় মিনতি মাইতি। পামেলার কথাটা তার মনে লাগে। কর্ত্রী মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে ওঠেন বটে; কিন্তু মনটা তাঁর সাদা। মিনতিকে ভালও বাসেন। ভালবাসা জিনিসটা মিনতি বড় একটা পায়নি। তিন কুলে তার কেউ নেই। শৈশবেই বাপ-মাকে হারিয়েছে। থাকার মধ্যে আছে এক খুড়তুতো দাদা—সে তো খোঁজ খবরই নেয় না। সৌভাগ্যই বলতে হবে—ঝি-গিরি করতে হচ্ছে না তাকে! ভদ্রঘরের মেয়েটিকে কর্ত্রী একটা সম্মানজনক উপাধি পর্যন্ত দিয়েছেন: মিস্টি ওঁর 'সহচরী'।

লেটার-প্যাডটা টেনে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানি লিখতে বসেন এবার। নামটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে মনে

পড়ে গেছে ওঁর: বাসু, প্রসন্নকুমার, বার-অ্যাট-ল। টেলিফোন গাইড খুলে তাঁব নিউ আলিপুবের ঠিকানাটাও পেয়ে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল ড্রাফ্‌টটা ছকতে। অনেক কাটাকুটির পর মনে হল বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে। এবার ধরে ধরে ফেয়ার কপি তৈরি করলেন। চিঠির মাথায় তারিখ বসালেন: 17.4.70। প্রথম ড্রাফ্‌টটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন এবাব। একটি খাম বেব করে চিঠিখানা ভরলেন, নাম ঠিকানা লিখে টিকিট সাঁটলেন। খামটা বন্ধ করে ঘড়িটা একবার দেখলেন। মিনতির হরলিক্স নিয়ে আসার সময় হয়েছে। না, মিনতি মাইতির হাতে চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলতে পাঠানো যাবে না। মিনতি গোয়েন্দা গল্পের পোকা। তাকে জানানো চলবে না—ব্যারিস্টার পি.কে.বাসুকে তিনি একটি চিঠি লিখছেন। বিকালে সরযূ যখন ঘব মুছতে আসবে তখন তাব হাতে চিঠিখানা ডাকে পাঠাবেন বরং। আপাতত ওটা তোশকেব নিচে লুকানো থাক।

এতক্ষণে আমরা আবার সেই উনত্রিশে জুন তাবিখে ফিবে যেতে পাবি। অর্থাৎ সেই যেদিন বাসু-সাহেব মিস্ পামেলা জনসনেব চিঠিখানি পেলেন।

জাগুলিয়ার মোড় পার হয়ে আমাদের গাড়িটা যখন মেরীনগরের খোয়া-বাঁধানো সড়কে এসে পড়ল তখন বেলা এগারোটা। পাকা রাস্তা থেকে এই খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় মাইল-খানের ভিতরে মেরীনগরের বসতি। বাসু-সাহেব পথ-চলতি একজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন 'মরকতকুঞ্জ'টা কোন দিকে।

গায়ে ফতুয়া, চোখে নিকেলের চশমা, লোকটা সোজা কথায় জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলো: আপনারা?

এটাই রেওয়াজ। সর্বকালে। সে আমলে এর জবাবে বহিরাগতবা গ্রামবাসীকে জানাতো ঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা...অর্থাৎ, নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রসঙ্গ পরে আসতো। এ যুগে ঐ প্রশ্নটির জবাবে বহিরাগতকে বলতে হয়: কংগ্রেস, সি.পি.এম. অর্থাৎ, ...নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রসঙ্গ পরে আসবে।

বাসু-সাহেব কোন জবাব দেবার বদলে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন।

বস্তুত 'মরকতকুঞ্জ'টা খুঁজে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। মেরীনগরে সেটা আগ্রার তাজমহল।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে দূর থেকে নজর হল---দ্বিতলের জানালাগুলি বন্ধ। লাল ইটের টাক্-পয়েন্টিং করা প্রকাণ্ড প্রাসাদ—দুর্গ যেন। বাগানটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। গেট তালাবন্ধ। সেখানে একটি নোটিস বোর্ড—বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে: এই বাড়ি বিক্রয় করা হইবে।

নোটিসে কলকাতার একটি নামকরা রিয়াল এস্টেট এজেন্টের নাম লেখা আছে এবং তারপরের লাইনে ঃ 'স্থানীয় ক্রেতারা মেরীনগরের অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরসের শ্রীভবানন্দ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন।'

সেই স্থানীয় দালালটির টেলিফোন নাম্বারও লেখা আছে।

তখনই অন্তরীক্ষ থেকে শ্রুত হল এক সারমেয় গর্জন। অচিরেই আবির্ভাব ঘটল তার—কাঁটাতারের ওপারে। সাদা ধবধবে একটা স্পিৎজ। তবে অনেকদিন তাকে স্নান করানো হয়নি বলে গায়ের রঙটা ধূসর হয়ে গেছে। কাঁটাতারের এপারে আমরা, ওপারে সে। আমাদের কথা সে কানেই তুললো না। এক নাগাড়ে বলে গেল, কে বট তোমরা? কী চাও? এগিয়ে এসো না কাছে?

ত্রিসীমানায় লোকজন নজরে পড়ল না। মনে হলো বাড়িতে কেউ নেই।

বললুম, এবার কী করবেন? কিছুই তো নজরে পড়ছে না।

—একেবারে কিছুই পাইনি বল'না কৌশিক। অন্তত 'সারমেয়'কে পেয়েছি, তার 'গেণ্ডুক'-এর দেখা না পেলেও। চল, দেখা যাক অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরস্‌টা কোথায়।

গির্জাটা গণ্ডগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরে কিছু দোকানপাট। অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরস্‌ও খুঁজে পেতে খুব কিছু অসুবিধা হল না। মনিহাবি দোকান। বোধ করি মালিক জমি-বাড়ির দালালিও করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত মালিক অনুপস্থিত। দোকানে বসেছিল সতের-আঠারো বছরের একটি ছোকরা। স্পোর্টস গেঞ্জি, চোঙা প্যান্ট। খদ্দেরপাতি ত্রিসীমানায় নেই। বুঁদ হয়ে সে একখানা সিনেমা পত্রিকা পড়ছিল।

বাসু-সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন, ভবানন্দবাবু আছেন?

ছেলেটি মুখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। বললে, না।

—কোথায় গেছেন তিনি? কখন ফিরবেন?

—জান্নে।

—ভবানন্দ দত্ত তোমার কে হন?

এতক্ষণে ছেলেটি মুখ তুলে তাকায়। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো? সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বইটা উবুড় করে কাউন্টারের উপর রেখে ও এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, "হ্যালো!..না নেই...জান্নে, আই মীন, কখন ফিরবেন বলতে পারছি না...কী বললেন?...সেসব বাবা জানে...হ্যাঁ বলবো, ফিরে এলে আপনাকে ফোন করতে বলবো? কী? কে.পি.চ্যাটার্জী? হ্যাঁ! কে.পি.চ্যাটার্জী, শুনেছি। কত নম্বর?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, 46-5126! অ্যাঁ? 47? ও, আচ্ছা 47-2156! ফাইভ-সিক্স নয়, সিক্স-ফাইভ? অল রাইট? 47-2165! ...না, না লিখে নেবার দরকার নেই, আমার মনে থাকবে। থ্যাঙ্কু। বলবো।"

টেলিফোনটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললো, কী বলছিলেন যেন?

—মরকতকুঞ্জে একটা নোটিসে বলা হয়েছে যে, ভবানন্দ দত্ত মশাই...

—ও! মরকতকুঞ্জ! কিন্তু বাবা তো নেই। আপনারা ওবেলা আসবেন।

বাসু-সাহেব জানালেন যে, ঐ বাড়িটা কিনবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এখানে থাকি না যে, ও-বেলায় আবার আসতে পারবো। জানতে চাইলেন, তুমি বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?

—আমি? মরকতকুঞ্জ? হ্যাঁ, শুনেছি ওটা বিক্রি হবে। তা সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা ওবেলা আসবেন।

—তুমি কখনও ঐ বাড়িটার ভিতরে গিয়েছো? মালিকের নামটা জানো?

—আমি? মরকতকুঞ্জে? হ্যাঁ গিয়েছি—কতবার! কিন্তু সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা বিকালবেলা আসবেন...

নিতান্ত সৌভাগ্য আমাদের, তখনই একটি সাইকেল চেপে এসে হাজির হলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সাইকেলটা লক করে এগিয়ে এসে বললেন, কী চাই স্যার?

—আমরা ভবানন্দ দত্ত মশায়ের খোঁজে...

—আমিই। বলুন স্যার?

—মরকতকুঞ্জের সামনে একটা নোটিস বোর্ড দেখলাম...

—হ্যাঁ, আসুন। ভিতরে আসুন। মাঝ-সড়কে দাঁড়িয়ে ওসব কথা আলোচনা করা যায় না।

দোকানের পিছনে আর একখানি ঘর আছে। ভদ্রলোক পথ দেখিয়ে সেখানে আমাদের বসালেন। গুদাম ঘরই। তবে খানতিনেক চেয়ার আছে, একটা চৌকিও। তিনি নিজে চৌকিতে উঠে বসলেন। বললেন, কলকাতা থেকে আসছেন নিশ্চয়? ঐ গাড়িতে?

—হ্যাঁ। আমরা শুনেছি, এই মেরীনগরে একটা বেশ বড় বাড়ি বিক্রি হবার সম্ভাবনা আছে। মরকতকুঞ্জ। আপনি নাকি তার হক-হদিস সব জানেন...

—ঠিক কথা! শুধু 'মরকতকুঞ্জ' নয়, অনেকগুলি বাড়ির সন্ধান জানি আমি। কাঁচড়াপাড়ায়, হরিণঘাটায়, কল্যাণীতে। বিভিন্ন দামের, বিভিন্ন মাপের—

বাসু পাইপটা ধরালেন। বললেন, আমরা একটু নির্জনতা খুঁজছি। কাঁচড়াপাড়া বা কল্যাণীতেই যদি হবে, তবে খাশ কলকাতা কী দোষ করল?

—ঠিক কথা, ঠিক কথা। সে হিসাবে 'মরকতকুঞ্জ' আইডিয়াল প্রপার্টি। তবে প্রকাণ্ড বাড়ি, সংলগ্ন জমিও অনেক। দামটা ন্যাচারলি বেশিই হবে—

—পছন্দ হলে দামে হয়তো আটকাবে না। 'প্রকাণ্ড' মানে কত বড়? ক-তলা বাড়ি? ক-খানা ঘর?

ভদ্রলোক সে-কথার জবাব না দিয়ে হাঁকাড় পাড়লেন, খোকা, মরকতকুঞ্জের ফাইলটা নিয়ে আয় তো।

দোকান থেকে সেই ছোকরা একটা ফাইল এনে বাবাকে দিলো। একটা কাগজের টুকরো দেখে দেখে বলল, ইযে হয়েছে...একটু আগে কলকাতা থেকে সাম পি.কে.ব্যানার্জি তোমাকে ফোন করেছিলেন। কী একটা বায়নানামার ব্যাপারে।

ভবানন্দের ভ্রূ যুগল কুঁচকে গেল। বললেন, পি.কে.ব্যানার্জি? ঠিক চিনতে পারছি না তো! কোন জমির বায়নানামার?

—জানে। উনি ওঁর টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে রিং-ব্যাক করতে: 45-6521.

ভবানন্দ একটা কাগজে নম্বরটা টুকে নিয়ে ফাইলটা খুলতে থাকেন।

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কলকাতার সাম মিস্টার কে.পি.চ্যাটার্জির একটা টেলিফোন আসার কথা ছিল কি?

অবাক হয়ে ভবানন্দ বলেন, হ্যাঁ, একটা বায়নানামার ব্যাপারে। আপনি কী করে জানলেন?

—সে কথা থাক। ফোনটা তাঁকেই করবেন। তাঁর নাম্বার বোধহয় 47-2165!

ভবানন্দ তাঁর 'খোকা'র দিকে তাকাতেই ছেলেটি সুট করে আড়ালে সরে গেল।

মরকতকুঞ্জের যাবতীয় তত্ত্ব-তালাশ লেখা আছে ফাইলে। দ্বিতল বাড়ি। কোন তলায় ক'খানা ঘর, কত কত মাপের, সব খবর। আউট-হাউসের বিবরণ ও প্ল্যান। সংলগ্ন জমি—কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। তার পরিমাণ, মায় বড় জাতের গাছের লিস্ট।

বাসু-সাহেব পাকা হিসাবীর মতো সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন, গৃহকর্তা কি বাড়িটা আপাতত ভাড়া দিতে রাজি হবেন, মাস ছয়েকের জন্য? তাহলে এখানে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা বোঝা যেত।

—আজ্ঞে না। ভাড়া দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। স্রেফ বিক্রি।

—বাড়িটা কি বারে বারে হাতবদল হয়েছে?

—আদৌ না। একহাতেই বরাবর আছে। তৈরী করেছিলেন একজন বিলাতী কেতার বাঙালী ক্রিশ্চিয়ান—যোসেফ হালদার—বস্তুত এই মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে-মেয়েরাই থাকতো এখানে। চারটি মেয়ে, একটি ছেলে। একে একে সকলেই স্বর্গত হয়েছে। শেষ মালিক ছিলেন মিস্ পামেলা জনসন। তিনি গত হয়েছেন মাস দুয়েক আগে—

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন, ব্যাপারটা তো ঠিক বোধগম্য হল না দত্ত মশাই। যোসেফ হালদারের অবিবাহিতা মেয়ের নাম—মিস্ পামেলা জনসন?

দত্ত মশাই হাসলেন, বললেন, আপনি যে উকিল-ব্যারিস্টারের মত সওয়াল-জবাব শুরু করলেন মশাই। তবে হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। মিস্ পামেলা জনসনের মায়ের নাম ছিল মেরী জনসন। মায়ের উপাধিটাই গ্রহণ করেছিলেন ম্যাডাম পামেলা।

—বুঝলাম। তা মিস্ পামেলা জনসনও তো গত হয়েছেন বলছেন। সেক্ষেত্রে বর্তমান মালিক কে?

—মিস মিনতি মাইতি।

—আই সি। তিনি পামেলার বোনঝি না ভাইঝি? না, ভাইঝি হলে মাইতি হত না।

—দুটোর একটাও নয়। তিনি ছিলেন পামেলার 'সহচরী'—ইংরেজি কেতায় যাকে বলে 'কম্পানিয়ান'। তাঁকেই বাড়িটা দিয়ে গেছেন ম্যাডাম। এখন সেই মিনতি মাইতিই ঐ প্রপার্টির মালিক। সমস্ত সম্পত্তি ঐ সহচরীকেই দিয়ে গেছেন মিস্ পামেলা জনসন।

—বুঝেছি। পামেলার কোন ভাইপো-ভাইঝি অথবা বোনপো-বোনঝি ছিল না।

—না, তা নয়, ছিল। কিন্তু তাদের কাউকেই উনি প্রপার্টিটা দিয়ে যাননি। উইল করে সব কিছুই দিয়ে গেছেন ঐ সহচরীকে।

বাসু বেঁকে বসলেন এবার। আমরা যদি প্রপার্টিটা কিনি সেই আত্মীয়-স্বজনেরা আবার মামলা-মোকদ্দমা করবে না তো?

—মাপ করবেন স্যার। এবার কিন্তু আপনার এ-কথাটা উকিলের মতো হল না। মিনতি মাইতি প্রবেট নিয়েছে। মালিক বনেছে। এখন যদি সে সম্পত্তিটা রেজিস্ট্রি করে বিক্রয় করে তাহলে কে বাধা দিতে আসবে?

—আমরা বাড়িটা একবার দেখতে যেতে পারি?

—পারেন। অবশ্যই পারেন। এখনই দেখতে যাবেন, না লাঞ্চের পরে?

—বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। দু'টি খেয়ে নিই কোথাও। ধরুন আমরা যদি আড়াইটে নাগাদ দেখতে যাই?

—তাই যাবেন। ও বাড়িতে টেলিফোন আছে। আমি খবর দিয়ে রাখছি। মিনতি মাইতি অব[illegible] কলকাতায়, কিন্তু চাকর-বাকরেরা আছে। তারাই ঘুরিয়ে দেখাবে। আপনারা কোথায় লাঞ্চ সারবেন?

—আপনি স্থানীয় লোক। সাজেস্ট করুন।

—মেরীনগরে সবচেয়ে ভাল হোটেল: 'সুতৃপ্তি'—ঐ সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলি কি, কাঁচড়াপাড়ায় চলে যান। এটুকু পেট্রল পোড়ানো সার্থক হবে। 'সুতৃপ্তি'তে আর যাই পান, তৃপ্তি পাবেন না।

বাসু জানতে চাইলেন, মরকতকুঞ্জের দামটা কত হতে পারে আন্দাজ দিতে পারেন?

—ভবানন্দ প্রায় কানে কানে বললেন, দু-দুটি পার্টি ইতিমধ্যেই বাড়িটা দেখে গেছেন—একজন রিটায়ার্ড বিগ্রেডিয়ার, একজন রিটায়ার্ড জজ। দুজনেরই পছন্দ হয়েছে। যে কোন একজন দর দিলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাবে কিন্তু। গোপনে বলি, মিনতি মাইতি বাড়িটা ঝেড়ে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। বেশি দরদাম করবে বলে মনে হয় না। তাই আমার পরামর্শ, পছন্দ হলে একটা 'অফার' দিয়ে যান। মিনিমাম 'অফার'ই দেবেন, একটু দরদাম করে—সেই যাকে বলে 'আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক' গোছের একটা রফা করে দেওয়া যাবে। আমাকে কোনও কমিশন দিতে হবে না। আমি ও তরফ থেকে তা পাবো।

বাসু একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। বললেন, সেই 'সহচরী' ভদ্রমহিলা এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন, বলুন তো মশাই। ভুতুড়ে বাড়ি-টাড়ি নয় তো?

—আরে না, না। সেসব কিছু নয়। মিনতি মাইতি অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবে? চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, তিন কুলে কেউ নেই—বাড়িটা বিক্রি করে সে ঝাড়া হাত-পা হতে চায় আর কি।

বাসু আবার বলেন, শুনুন দত্তমশাই! বাড়িটা কিনলে আমিও কমিশন দেব আপনাকে। খোলাখুলি বলুন তো—ও বাড়িতে কোনও খুন-জখম, আত্মহত্যা-ফত্যা হয়েছে কখনও!

ভবানন্দ আবার ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, আমি চল্লিশ বছর এই মেরী নগরের বাসিন্দা। মা-কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, আমার জ্ঞানত সেরকম কোনও দুর্ঘটনা ওখানে ঘটেনি।

—পামেলা জনসন কীভাবে মারা যান? স্বাভাবিক মৃত্যু?

—বিলকুল। বাহাত্তর বছর বয়স হয়েছিল ম্যাডামের। শেষ তিন-চার বছর ভুগছিলেন জনডিস্-এ। তাতেই মারা যান মাসদুয়েক আগে।

—ঠিক আছে। আগে বাড়িটা তো দেখি। তারপর আপনার সঙ্গে কথা হবে।

—একটু চা-টা খাবেন না?

—থ্যাঙ্কু। না। লাঞ্চের আগে চা খেলে খিদেটা নষ্ট হবে।

বাসু-সাহেব গাত্রোত্থান করতেই ভবানন্দ বললেন, আপনার নামটাই জানা হয়নি স্যার, যোগাযোগের একটা ঠিকানা—

—আমার নাম কে.পি.ঘোষ। ইন্ডিয়ান নেভিতে ছিলাম। রিটায়ার করেছি। আগে বাড়িটা দেখি। মোটামুটি পছন্দ হলে আবার আসব। ঠিকানা, ফোন নম্বর আর আমার 'অফার' দিয়ে যাব।

—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।
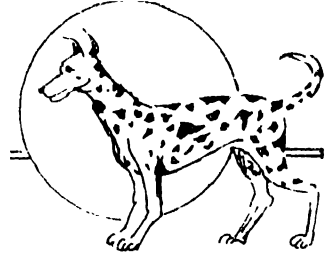
অনন্ত স্টোরস্ থেকে বেরিয়ে এসে আমি প্রশ্ন করি, এবার কোথায়? ব্যাক টু ক্যালকাটা?

—সে কি! আড়াইটেয় 'মবকতকুঞ্জ' দেখতে যাবার কথা বললাম না?

—সে তো রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার কে.পি.ঘোষ বলেছেন আপনার তাতে কী?

—কিন্তু যে জন্যে আসা, তা তো এখনো সুসম্পন্ন হয়নি কৌশিক।

—আবার কী? শুনলেন না—আপনার ক্লায়েন্ট মিস্ পামেলা জনসন মারা গেছেন?

—একজ্যাক্টলি!

যে ভঙ্গিতে উনি ঐ একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, তাতে একটু ঘাবড়ে যাই। গুছিয়ে নিয়ে বলি, মানে...আমি বলতে চাইছি—মিস্ পামেলা জনসন যে-কথা আপনাকে জানাতে চাইছিলেন তা আর জানা যাবে না। কী তাঁর সমস্যা ছিল তা যখন জানা যাবে না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে!

—কী সহজে তুমি বলতে পারলে কথাটা! শুনে রাখো কৌশিক! পি. কে. বাসু যতক্ষণ না কোন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ তা শেষ হয়ে যায় না—

ওঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবু অন্তিম যুক্তিটা আবার দাখিল করি, কিন্তু যেহেতু আপনার ক্লায়েন্ট মৃতা—

—একজ্যাক্টলি! কৌশিক—একজ্যাক্টলি! সবচেয়ে দামী কথাটাই তুমি বারে বারে বলছ, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থটা প্রণিধান না করে!

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। রুখে উঠি, কী বলতে চান আপনি? পামেলার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়? শুনলেন না ভবানন্দ দত্তের কথা—জনডিসে ভুগে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন, নিতান্ত পরিণত বয়সে?

—ভবানন্দ তো একথাও বলেছিল যে, একজন বিগ্রেডিয়ার আর একজন হাইকোর্টের জজ বাড়িটা কিনবার জন্য মুখিয়ে আছে। সেকথা বিশ্বাস করেছিলে তুমি? ভবানন্দ যুধিষ্ঠির?

এ কথার কী জবাব? বলি, তাহলে কি কাঁচড়াপাড়ার কোন রেস্তোরাঁয়...

—না। আমরা ঐ 'সুতৃপ্তি'তেই মধ্যাহ্ন আহার সারবো। ভবানন্দের ও-কথাটা অবশ্য মানি যে, সেখানে 'তৃপ্তি' পাব না; কিন্তু এই সুবাদে মরকতকুঞ্জ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ হয়ত সংগ্রহ করা যাবে। এসো।

অগত্যা।

'সুতৃপ্তি' একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁ। এত বেলাতেও কেউ কেউ খাচ্ছে। আমরা দূরতম একটা পর্দা-ঘেরা কেবিনে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই একজন মাঝবয়সী 'বয়' এসে জিজ্ঞাসা করলো, কী খাবেন স্যার? ভাত?

বাসু বলেন, না। কী কী পাওয়া যাবে বল তো ঠিক। মুরগি হবে?

—হবে, কিন্তু একটু দেরী হবে স্যার। আধঘণ্টা লাগবে।

—তা হোক। আমাদের তাড়া নেই। টোস্ট নিয়ে এসো, আর স্যালাড। মুরগির রোস্ট বানাও। নাও, তোমার টিপস্‌টা আগাম নাও দিকিন—বাসি মাল চালিও না।

লোকটা পাঁচ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বললে, সুতৃপ্তিতে বাসি মাল পাবেন না, স্যার। অন্তত আপনাকে সব টাটকা জিনিসই সার্ভ করবো। কলকাতা থেকে আসচেন বুঝি?

—হ্যাঁ। অর্ডারটা দিয়ে ঘুরে এসো দিকিন। কথা আছে।

লোকটা গেল আর এলো। বললে, বলুন স্যার?

—তোমাকে বেশ চালাক-চতুর লাগছে। শোন, আমরা ঐ মরকতকুঞ্জটা কিনতে এসেছি, মানে যদি পছন্দ হয়—

—জানি, আন্দাজ করেছি। এখনই অনন্ত স্টোরস্ থেকে বার হলেন, না?

—হ্যাঁ। ও বেলায় বাড়িটা দেখবো। পছন্দ হলে মেরীনগরেরই বাসিন্দা হয়ে যাব। এখন দু'চারটে খবর বল দেখি। এখানে ভাল ডাক্তার আছে?

—আছেন স্যার। ডাক্তার পিটার দত্ত। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। সত্তরের ওপর বয়স। অতি বিচক্ষণ।

—মরকতকুঞ্জ বাড়িটার মালিক কে এক মিস্ মাইতি, নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্তমানে সেই হচ্ছে ছপ্পড়ফোঁড় মালকিন!

—'ছপ্পড়ফোঁড় মালকিন' মানে?

লোকটা একই কথা আবার জানালো। প্রাক্তন মালকিন মিস্ পামেলা জনসন তাঁর নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করে একেবারে শেষ সময়ে বাড়িটা দিয়ে যান তাঁর সহচরীকে। রীতিমত উইল করে।

—মিনতি মাইতি বোধ হয় দীর্ঘদিন ওঁর সেবাযত্ন করেছে?

—মোটেই নয়। মাত্র তিনবছর সে এই চাকরিতে বহাল ছিল।

—মাত্র তিন বছর! শুধু বাড়িটাই দিয়ে গেছেন, নগদ-টগদ দেননি নিশ্চয়—

আমি লক্ষ্য করেছি, কারও পেট থেকে খবর বার করতে হলে তাকে প্রতিবাদ করার সুযোগ দিতে হয়। ভবানন্দের কাছ থেকেই আমরা জেনেছি যে, পামেলা তাঁর সবকিছুই নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দান করে গেছেন তাঁর সহচরীকে। বাসুমামু সেটাই করোবরেট করাতে চান; কিন্তু তিনি এমনভাবে প্রশ্ন রাখছেন যাতে বক্তা একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। লোকটা সোৎসাহে বলল, আপনার ভুল ধারণা, স্যার! উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন নাকি সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুড়ি থাকত খুব সাধাসিধে—কিন্তু তার কোম্পানির কাগজই নাকি ছিল সাত লক্ষ টাকার।

—বল কী হে! এ যে রূপকথার গল্প! বুড়িব আত্মীয-স্বজন কেউ ছিল না বুঝি?

আবার প্রতিবাদের সুযোগ ঃ এখানেও ভুল হল আপনার। ছিল, ভাইপো, ভাইঝি আর বোনঝি। বোনঝি হেনা অবশ্য একজন সর্দারজীকে বিয়ে করেছে—বুড়ির রাগ হতেই পারে; কিন্তু ভাইপো সুরেশ, আর ভাইঝি স্মৃতিটুকুকে কেন যে উনি এভাবে বঞ্চিত কবে গেলেন তার কোন হদিসই কেউ বাতলাতে পারল না আজও।

বুড়ি মারা গেল কিসে?

—ঐ যে, ন্যাবারোগে। দু'তিন বছ্ব ধবেই ভুগছিলেন। ডাক্তাব দত্ত চেষ্টাব ত্রুটি কবেননি। বুড়ি শুধু সেদ্ধ খেত—ভাজা-টাজা একদম নয়।

* * * *

সুতৃপ্তিতে মধ্যাহ্ন আহার সেরে মামু বললে, চল চার্চটা দেখে আসি। এখনও দুটো বাজেনি। অগত্যা চার্চ দেখতে যেতে হল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ। গথিক শৈলীর সঙ্গে ইন্ডো-স্যাবানেসিক শৈলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বাসুমামু সেসব নজর করলেন বলে মনে হয় না। উনি প্রবেশ কবলেন সংলগ্ন সিমেটারিতে। পকেট থেকে নোটবই বার করে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। দু-একটা টুম্ব-স্টোনের তারিখ লিখে নিলেন খাতায়—যোসেফ হালদার, মেরী জনসন, সবলা এবং শেষমেশ মিস্ পামেলা জনসন ঃ

SACRED
TO THE MEMORY OF
PAMELA HARRIET JOHNSON
DIED MAY 1. 1970
"THY WILL BE DONE"

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, পয়লা মে! চিঠিটা লিখেছিলেন সতেরই এপ্রিল। আব আজ উনত্রিশে জুন আমি তাঁর চিঠিখানা পেলাম। বুঝলে? সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

আমি বুঝলাম—সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার!

অর্থাৎ বাসুমামু যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখে শান্ত হচ্ছেন ততক্ষণ আমাকে তার লগে-লগে থাকতে হবে। এই জুন মাসের খর-রৌদ্রতাপ অগ্রাহ্য করে!

মরকতকুঞ্জের বাগানের গেটে-এ এবার আব তালা ঝুলছে না। গাড়ি থামিযে আমরা এগিয়ে যেতেই একটি হিন্দুস্থানী লোক ওপাশ থেকে এগিয়ে এল। আউট-হাউস থেকে। গেট খুলে সসম্ভ্রমে বললে, আইয়ে সা'ব।

—তোম কৌন?

—ম্যায় ছেদিলাল সা'ব। বাগিচাকে দেখ্‌ভাল করতে থে।

আউট-হাউসের জানলা থেকে একটি অবগুণ্ঠনবতীকে দেখা গেল, ঘোমটা তুলে দুটি কাজলকালো কৌতূহলী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত ছেদিলালের ঘরওয়ালী।

গেট থেকে আমরা তিনজনে প্রাসাদটির দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভেতর থেকে শোনা গেল পরিচিত সারমেয় গর্জন: কে বট তোমরা? ভেবেছ, আমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে বলে যা ইচ্ছে নিয়ে পালাবে। সেটি হচ্ছে না...

ছেদিলাল বললে, ডরিয়ে মৎ সা'ব, ফিসি কিছু বোল্‌বে না। বহুৎ আচ্ছা কুত্তা।

সদর দরজা খুলে একটি প্রৌঢ় বিধবা এগিয়ে এসে যুক্তকরে নমস্কার করে বললেন, আসুন। ভবানন্দবাবু টেলিফোনে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, আপনারা আড়াইটের সময় আসবেন।

বাসুমামুর সেই একই ট্যাকটিক্স। 'আপনি ব্যক্তিটি কে?'—এই সিধাসাদা প্রশ্নটা না করে এমনভাবে সাজালেন যাতে বক্তা একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়, আপনিই বুঝি মিস্ মিনতি মাইতি?

—আজ্ঞে না। আমি শান্তি, মিস জনসনের পাচিকা ছিলাম। মিস্ মাইতি কলকাতায় থাকে। আসুন, ভিতরে আসুন। আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

এবার সব জানলা খোলা। প্রচুর আলো-হাওয়া। ঘরদোর ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। বাড়ির দেখ্‌ভাল যারা করে তারা কাজে ফাঁকি দেয় না, এটা বোঝা যায়।

—এটা বৈঠকখানা, ড্রইংরুম আর কি।

প্রাচীনযুগের আসবাবপত্র। ভাবি পর্দা। কাঁচেব আলমারিতে শৌখিন পোর্সেলিনের পুতুল। প্রকাণ্ড ফুলদানি, ফুল নেই অবশ্য। বাসু-সাহেব প্রশংসা করলেন গৃহসজ্জার। বললেন, খুব ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে করে সাজিযে রেখেছ তো?

—আমি নয়। ঘর-দোর ঝাড়-পোঁছ করে সরযূ—ঐ ছেদিলালের বউ।

—আমি যদি বাড়িটা কিনি, তোমরা তিনজনে এখানে থেকে যাবে তো?

শান্তি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। একটু ভেবে নিয়ে বলে, ছেদিলালেরা কী করবে তা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি আর চাকরি করব না। ম্যাডাম আমাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন, তারই সুদে আমার দিব্যি চলে যাবে। তবে লোকজন আপনি পেয়ে যাবেন। আমি বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করে দেব।

—তা তোমার ম্যাডাম তো দু-মাস হল গত হয়েছেন, তুমি যদি আর চাকরি নাই করবে তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন?

—মিস্ মাইতির অনুরোধে। ও বলল, গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, এবার বাড়িটা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তা তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই, আমি রাজি হয়ে গেছি।

একটা জিনিস বাসুমামু খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমার নজরে পড়ছিল। মিনতি মাইতি আজ লক্ষপতি। কিন্তু মেবীনগরে কেউ তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দিচ্ছে না। ভবানন্দ, সুতৃপ্তির বয এবং এখন এই শান্তি—কেউই মিনতির প্রসঙ্গে 'আপনি' বলছে না। বোধ করি সেজন্যই মিনতি এই প্রাসাদটা জলের দামে বিক্রি করে কলকাতায় চলে যেতে চায়। কলকাতায় একটা মানুষের মর্যাদা তার আর্থিক সঙ্গতিতে।

কুকুরের গর্জনটা তীব্রতর হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বাসুমামু আমাকে বললেন, কৌশিক, তুমি বসে পড় তো ঐ চেয়ারটায়। নিজেও বসলেন তিনি। শান্তিকে বললেন, এবার খুলে দাও কুকুরটাকে। ও আসুক। আমাদের শুঁকে দেখে শান্ত হোক।

শান্তি বলল, ঠিক বলেছেন। বাইরের লোক বসে থাকলে ও কখনও তেড়ে যায় না।

শান্তি কুকুরটাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতেই সে তীরবেগে ছুটে এল। এখন আর সে ডাকছে না। আমাদের জুতো আর প্যান্ট ভাল করে শুঁকে দেখল। বাসুমামু একটা হাত বার করে বললেন, শুঁকে দ্যাখ্! এখনও চিকেন রোস্টের গন্ধ লেগে আছে।

কুকুরটা সত্যিই ওঁর হাতটা ভাল করে শুঁকে দেখল।

—কী নাম ওর? কত বয়স?

—ওর নাম ফ্লিসি। মাসছয়েক বয়স। ভারি বুদ্ধিমান। কাউকে কখনও কামড়ায়নি। ওর একমাত্র রাগ শুধু পোস্টম্যানের উপর। কেন যে পোস্টম্যানকে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে, জানি না।

বাসুমামু বলেন, হেতুটা কিন্তু সহজবোধ্য। শোন, বুঝিয়ে বলি। তোমাকে বিচার করতে হবে কুকুরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে দেখেছে বাড়িতে দু'জাতের লোক আসে। একদল চোর-ডাকাত। তাদের ও কিছুতেই ঢুকতে দেবে না বাড়িতে। চোর-ডাকাত ও চেনে না, দেখেনি—কিন্তু ওর 'জিন'-এ আছে বংশানুক্রমিক নির্দেশ! স্পিৎজ হচ্ছে জার্মান শিকারী কুকুর। শত্রুকে মোকাবিলা করার নির্দেশ ওর রক্তে মজ্জাজাত। দ্বিতীয় আর এক জাতের মানুষ বাড়িতে আসে—যাকে সাদরে আহ্বান করা হয়। বসতে দেওয়া হয়। তারা গৃহস্বামীর বরণীয় ব্যক্তি। তাদের তেড়ে যেতে নেই। ওর সারমেয় দৃষ্টিতে পোস্টম্যান এমন একটা লোক যে, প্রায় প্রতিদিনই এসে বেল বাজায়—কিন্তু যাকে কোনদিনই ভিতরে ঢুকতে

দেওয়া হয় না। বসতে বলা হয় না। দোর থেকে তাকে বিদায় করা হয়। ফলে পোস্টম্যান হচ্ছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি!

শুধু শান্তি নয়, আমার কাছেও ব্যাখ্যাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হল। বেশ বোঝা গেল কুকুরটা শান্তির প্রিয়। আমরা যে তাকে ভালবেসেছি এতে শান্তি খুশি হয়ে ওঠে। বলে, ওর দারুণ বুদ্ধি। বল নিয়ে এমন খেলে—

—গেণ্ডুক?

শান্তি বোধহয় 'গেণ্ডুক' শব্দটার অর্থ জানে না। বললে, না স্যার, গেণ্ডুক নয়, রবারের বল।

—কই দেখি! বলটা দেখি। ফ্লিসির কেরামতিটা দেখা যাক।

শান্তি একটু অবাক হল। তবু বৃদ্ধ খরিদ্দারের এই অহৈতুকী কৌতূহল চরিতার্থ করল সে। টানা ড্রয়ার থেকে রবারের বলটা বার করতেই সচকিত হয়ে উঠল ফ্লিসি। লাফাতে লাফাতে উঠে গেল সিঁড়ির মাথায়। শান্তি বলটাকে উপর দিকে ছুঁড়তেই লাফ দিয়ে লুফে নিল ফ্লিসি। বার তিনচার খেলাটা দেখিয়ে বলটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

ফ্লিসি শান্ত হয়ে সোফার নিচে শুয়ে পড়ল। শান্তি বললে, এ খেলাটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক।

—বিপজ্জনক! কেন? বিপদ কিসের?

—একবার সিঁড়ির মাথায় বলটাকে রেখে দিয়েছিল ফ্লিসি। তখন গভীর রাত। ম্যাডাম কী কারণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। ঐ বলে পা পড়তে একেবারে নিচে গড়িয়ে পড়েন! ডাক্তার দত্ত বলেন, তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারতো।

—সর্বনাশ! হাড়গোড় ভেঙেছিল নাকি?

—না! নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে। দিন সাতেকের মধ্যেই সামলে নিয়েছিলেন।

—অনেকদিন আগের কথা নিশ্চয়?

সেই একই ট্যাকটিক্স। শান্তি প্রতিবাদ করে, না, স্যার! অতি সম্প্রতি। তারিখটা পর্যন্ত আমার মনে আছে। এ বছরের ছয়ই এপ্রিল। কারণ তার পরদিনই ছিল ওঁর বাহাত্তরতম জন্মদিন। আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই হাজির—তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। জন্মদিন তো মাথায় উঠলো।

—ভগবান রক্ষা করেছেন! বেচারি ফ্লিসি জানেও না কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। তা অত রাত্রে বৃদ্ধা নিচেই বা আসছিলেন কেন? একা-একা নিশ্চয়?

—হ্যাঁ একা-একাই! ব্যাপার কি জানেন, ম্যাডামের ঘুম না হওয়ার রোগ ছিল—ঐ যে ইনসমিয়া না কি—যেন বলে। মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত রাত তিনি ঐভাবে সারা বাড়ি পায়চারি করতেন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো শেষ রাতে ঘুমোতে যেতেন। কিছুতেই ঘুমের ওষুধ খেতে চাইতেন না। সে যা হোক, আপনাদের আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আসুন ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।

নিচেকার ঘরগুলো দেখা শেষ হলো। তারপর উপরের ঘরগুলি। নিচে ড্রইং, ডাইনিং, স্টোর, কিচেন, প্যান্ট্রি, বাড়তি গেস্টরুম। শয়নকক্ষগুলি সবই দ্বিতলে—তাদের সব গালভারি নাম। মাস্টার্স বেড রুম, ওক-রুম, দোলনা ঘর ইত্যাদি।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা দ্বিতলে উঠে আসি। ফ্লিসি কোন আগ্রহ দেখালো না। একতলায় সোফার তলায় সে নিদ্রা দিচ্ছে। ধাপে ধাপে আমরা উপরে এসে পৌঁছাই। শেষ ধাপে পা দিয়ে বাসু-সাহেবের হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন সেই জিনিসটা। কিছুই নয়, ওঁর গাড়ির চাবিটা। একে একে ঘরগুলি দেখলাম। বাসু-মামুর কী খেয়াল হলো, বললেন, এই ওক-রুমটার মাপ নিয়ে দেখতো কৌশিক। আমার বুককেসগুলো সব আঁটবে কিনা পরখ করে দেখতে চাই।

পকেট থেকে তিনি বার করলেন একটা গোটানো স্টীল-টেপ, নোটবই আর কলম। আমি আর শান্তি দেবী ঘরটার মাপ নিলাম, উনি নোটবইতে লিখে নিলেন। মাপ নেওয়া শেষ হলে নোটবইটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, দেখ তো, মাপ ঠিক লেখা হয়েছে?

তাকিয়ে দেখি, নোটবইতে মাপ লেখা নেই আদৌ। বরং লেখা আছে 'কোন ছুতোয় শান্তিকে একতলায় নিয়ে যাও। আমি মিনিট-পাঁচেক একা একা এখানে থাকতে চাই। শোন, ফোনটা নিচে আছে। সেই অজুহাতে শান্তিকে সরিয়ে নাও।'

নোটবইটা ফেরত দিয়ে বলি, মাপ ঠিকই আছে। দুটো বুককেসই ধরে যাবে।

তারপর শান্তির দিকে ফিরে বলি, এখান থেকে অনন্ত স্টোর্সে একটা ফোন করা যাবে? আমরা ফিরবার পথে ভবনান্দবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কেন যাবে না। আমি ফোন করে বলে দেব? কটার সময়?

—না চলুন, আমিই যাই। দু-একটা কথা জানাবার আছে। আমাদের অ্যাড্রেসটাও দেওয়া হয়নি।

—বেশ তো, আসুন।

শান্তিদেবীর পিছন-পিছন আমি নিচে নেমে এলাম। টেলিফোনে কী বলবো, মনে মনে ছক্‌তে ছক্‌তে। সৌভাগ্য আমাব, ভবানন্দ দোকানে নেই। তাঁর পুত্রটি ফোন ধরলো, বাবা কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্নের জবাবেই তার ভদ্রলোকের-এক-কথা: জান্নে।

টেলিফোন নামিয়ে 'হলে' ফিরে এসে দেখি বাসুমামু নিচে নেমে এসেছেন। হল-কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আত্মসমাহিত ভাবে।

আমাদের দেখে হঠাৎ শান্তিকে বলে ওঠেন, সিঁড়ির মাথা থেকে উল্টে পড়ে গিয়ে মিস্ জনসন নিশ্চয়ই একটা মানসিক আঘাত পান, শারীরিক তো বটেই। তিনি কি তখন ঐ ফ্লিসি আর তার বল-এর কথা কিছু বলেছিলেন?

শান্তি বীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যাঁ, বিকারের ঘোরে প্রায়ই বলতেন ফ্লিসি আর তাব বলের কথা। এমনকি মৃত্যুর আগে, মানে ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর শেষ কথাটিও ছিল ঐ। তখন অবশ্য তিনি ঘোর বিকারে আবোল-তাবোল বকছিলেন। তাঁর শেষ কথা: 'ফ্লিসি... তার বল... চীনের মাটিতে ফুল দামি...'

—'চীনের মাটিতে ফুল দামি!' —তার মানে কী?

—কোন মানে নেই! ও তো ঘোর বিকারের মধ্যে বলা কথা!

বাসু-সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাইপটা ধরিয়ে বললেন, আর একবার উপরে যেতে পারি কি? আমি ঐ মাস্টার্স বেডরুমটা আর একবার দেখতে চাই।

—আসুন না। দেখুন—

শান্তিদেবী পথ দেখিয়ে আবার দ্বিতলে আমাদের নিয়ে এলেন। গৃহকর্ত্রীর শয়নকক্ষে। বাসু-সাহেব দেওয়ালেব গায়ে লাগানো একটা কাচের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে কিছু শৌখিন পোর্সেলিনের খেলনা সাজানো। তার মাঝখানে একটি কাচকড়ার ফুলদানি। তাতে একটা বিচিত্র ছবি। রুদ্ধদ্বারের সামনে বসে আছে একটি কুকুর—নিচে লেখা : 'Out all night and no key!'

বাসু-সাহেব বললেন, বিকারের ঘোরে তোমার কর্ত্রী 'চীনের মাটিতে ফুল দামি' বলেননি। হয়তো বলেছিলেন, 'চীনেমাটির ফুলদানি...'

শুধু শান্তি নয়, আমিও অবাক হয়ে যাই। বলি, একথা কেন বলছেন?

—মিস জনসন এ ঘরে থাকতেন। ঐ ফুলদানির ছবিটার কথা তাঁর মনে পড়েছিল। ওতে একটা ভিক্টোরিয়ান রসিকতার আভাস আছে। পোষা কুকুরটা বাড়ির বাইরে অভিসারে গেছিল আর তারপর সারা রাত বাড়ি ঢুকতে পারেনি। হয়তো ফ্লিসির ঐ জাতের বদভ্যাস আছে, তাই নয়?

শেষ প্রশ্নটা শান্তি দেবীকে। সে স্বীকার করলো, হ্যাঁ, মাসের মধ্যে দু-এক রাত সে পালিয়ে যেতো, সারা রাত বাইরে কাটাতো। ভোর রাতে ফিরে এসে বাড়ির সামনে কুঁইকুঁই করত! এটা শেষবার হয়েছিল যেদিন ম্যাডাম পড়ে যান। সে রাত্রে ফ্লিসি বাড়ি ছিল না। ভোর রাতে ফিরে এসে কুঁইকুঁই করছিল। মিস্ মাইতি চুপিসাড়ে নেমে এসে সদর-দরজা খুলে ওকে ভিতরে আনে—

—চুপিসাড়ে? কেন? চুপিসাড়ে কেন?

—হ্যাঁ। পাছে কর্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। ফ্লিসির এই বাইরে যাওয়াটা ম্যাডাম একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই মিস্ মাইতি আমাদের বারণ করে দিয়েছিল—আমরা যেন ওঁকে না জানাই যে, দুর্ঘটনার রাত্রে ফ্লিসি সারারাত বাড়িতে ছিল না।

—আই সি! উনি খুব হিসাবী ছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ, রোজ হিসাব রাখতেন। প্রতিদিন রাতে শোবার আগে দিনের খরচ লিখে রাখতেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে খুব ভুলো মানুষ ছিলেন তিনি। চিঠিপত্র লিখে পোস্ট করতে ভুলে যেতেন। এই তো দিন তিন-চার আগে আমি ওঁর তোশকের নিচে থেকে একটা চিঠি উদ্ধার করি। চিঠি লিখে, খাম বন্ধ করে, ঠিকানা লিখে তোশকের নিচে গুঁজে রেখেছিলেন।

ম্যাজিশিয়ান যে কায়দায় পকেট থেকে খরগোশ বার করে দেখায় প্রায় সেই ক্ষিপ্রতায় বাসু-সাহেব তাঁর পকেট থেকে একটি খাম বার করে বললেন, এই চিঠিখানা কি?

শান্তিদেবী বজ্রাহত হয়ে গেলেন।

—আপনি, আপনিই সেই পি.কে.বাসু?

—হ্যাঁ, তুমি আমার নাম শুনেছো?

—শুনেছি। কাঁটা-সিরিজের অনেক গল্পে—

—শোনো শান্তি। এই চিঠিতে মিস্ পামেলা জনসন আমাকে একটি গোপন তদন্ত করতে বলেছিলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য, চিঠিখানা তিনি সময়ে ডাকে দিতে ভুলে যান। তুমি এটা শুক্রবারে পোস্ট করেছো, আর আজ সোমবার আমি তা পেয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ইতিমধ্যে মিস্ জনসন মারা গেছেন। আমি বুঝে উঠতে পারছি না, এক্ষেত্রে তদন্তটা আমার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য কি না।

শান্তি একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি জানি স্যার, ব্যাপারটা কী! মানে কী বিষয়ে তিনি আপনাকে তদন্ত করতে বলতেন। কিন্তু সেসব তো চুকেবুকেই গেছে—

—কী বিষয়ে তদন্ত? তুমি কতটা কী জান?

—সামান্য ব্যাপার। পাঁচখানা একশ টাকার নোট চুরি যায়। কে নিয়েছে তা আমরাও আন্দাজ করেছিলাম, ম্যাডামও করেছিলেন, কিন্তু সে সময় আত্মীয়-স্বজনে ভরা বাড়িতে—

—কী ব্যাপার খুলে বল দিকিন?

শান্তি জানালো কীভাবে নোটগুলো খোয়া যায়। কাকে যে সন্দেহ করা হয়েছিল সে-কথা সে স্বীকার করল না কিছুতেই। বারে বারে একই কথা বলল—এ তদন্তের এখন আর কোন মানে হয় না।

মরকতকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বলি, মামু! এতক্ষণে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, কৌশিক। আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি।

—বাঁচা গেল। তাহলে কাল বাদে পরশু আমরা গোপালপুর যাচ্ছি? সব সমস্যা মিটে গেছে। 'সারমেয় এবং তার গেণ্ডুক'—কেন চিঠিখানি ডেলিভারি হতে দু-মাস লাগল, কী তদন্ত তিনি আপনাকে করতে দিতেন, ইত্যাদি, প্রভৃতি! এবার কী? সোজা কলকাতা?

—না! তদন্ত আমার শেষ হয়নি এখনো।

মাঝ-সড়কেই দাঁড়িয়ে পড়ি, মানে! এই যে বললেন, আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন?

—তাই বলেছি। আমার স্থির সিদ্ধান্ত: মিস্ পামেলা জনসনের দুর্ঘটনার মূলে আর যাই থাক—'ফ্লিসি নামক সারমেয় এবং তার রক্তবর্ণের গেণ্ডুক' নেই।

—তার মানে?

—তার মানে, আমি এমন একটি তথ্য জানি, যা তুমি জানো না এখনো।

—হুঁ! সেটা কী?

—মরকতকুঞ্জে কাঠের সিঁড়িতে, দোতলার ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপের কাছাকাছি স্কার্টিং-এ একটা পেরেক পোঁতা আছে। ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উঁচুতে!

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুই বোঝা গেল না। উনি অত্যন্ত গম্ভীর! বলি, বেশ তো! না হয় তাই আছে। তাতে কী হল?

—প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে একটা পেরেক পোঁতার কী হেতু থাকতে পারে?

—হাজারটা হেতু থাকতে পারে।

—তার একটা অন্তত আমাকে শোনাও। ল্যান্ডিং-এর কাছাকাছি, শেষ ধাপের সই-সই, দেওয়ালের দিকে, ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উঁচুতে পেরেক পোঁতার একটি সম্ভাব্য হেতু। শুধু তাই নয়, পেরেকের মাথাটা ভার্নিশ-করা, যাতে সহজে নজরে না পড়ে।

—আপনি কী বলতে চান? কে, কেন পুঁতেছে আপনি জানেন?

—'কে' পুঁতেছে জানি না। 'কেন' পুঁতেছে জানি।

—কেন?

—সে রাত্রে ও বাড়িতে একাধিক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন যাঁরা বুড়ির মৃত্যু কামনা করছিলেন। কারণ বুড়ি তখনো দ্বিতীয় উইলটা করেনি। সকলেই তাঁর ওয়ারিশ। তারা জানতো, বুড়ি সারারাত পায়চারি করে। দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসে। বুড়িকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার সবচেয়ে সহজ পন্থা বাড়িশুদ্ধ সবাই শুয়ে পড়ার পর সিঁড়ির শেষ ধাপে আড়াআড়িভাবে একটা টোন সুতো বা তার বেঁধে দেওয়া। রেলিং-এর দিকে বাঁধাটা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের দিকে সেটাকে শক্ত করে বাঁধতে হলে ওয়াল-বোর্ড-এর গায়ে একটা পেরেক পুঁতে দিতে হবে। সহজে সেটা যাতে নজরে না পড়ে তাই তার মাথাটা ভার্নিশ করে দিতে হবে। আর 'সারমেয় গেণ্ডুক'টিকে সিঁড়ির শেষ ধাপে রেখে দিতে হবে।

—মাই গড! কী বলছেন আপনি?

—ইয়েস। এছাড়া ওখানে ঐ পেরেকের অস্তিত্বের আর কোন ব্যাখ্যা নেই। মিস্ পামেলা জনসন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী! পতনজনিত মৃত্যু হলে যা ঘটতো না, তাই ঘটলো। উনি ভাবতে বসলেন। দুর্ঘটনা ঘটে ছয় তারিখে, উনি চিঠি লেখেন সতেরো তারিখ। পাক্কা দশটা দিন তিনি শুধু ভেবেছেন, আর ভেবেছেন। হয়তো স্মরণে আনবার চেষ্টা করেছেন পতনের পূর্বমুহূর্তে পায়ের তলায় রবারের বলের স্পর্শের স্মৃতিটা। মনে পড়েনি—এ আমার আন্দাজ—শুতে যাবার আগে 'সারমেয় গেণ্ডুক'টি তিনি ড্রয়ারে তুলে রেখেছিলেন। সেটা কেমনভাবে সিঁড়ির মাথায় এল—মাথায় না হলেও পাদদেশেই, এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফ্লিসি আনেনি—কারণ ফ্লিসি সেরাত্রে বাইরে ছিল। বোধ করি শেষ রাত্রে তার কুঁইকুঁই উনি স্বকর্ণে শুনেছেন—এটাও আমার আন্দাজ—আর তাতেই মৃত্যু সময়ে ওঁর মনে পড়েছে চীনে মাটির টবের ঐ ছবিটার কথা!

—হতে পারে, হতে পারে! কিন্তু—

—ভেবে দেখো কৌশিক, চিঠিতে ভদ্রমহিলা বারে বারে বলেছেন গোপনতার কথা, বলেছেন, 'বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করিতে আমার মন সরিতেছে না'— নিজের পরিবারে এই রকম একটা ডেলিবারেট মার্ডারার আছে একথা মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। অথচ আর কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাচ্ছিলেন না ঐ 'সারমেয়-গেণ্ডুক' সমস্যার। হয়তো বাকি যে-কটা দিন বেঁচে ছিলেন তার ভিতর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সেই বিশেষ শয়তানটিকে তিনি চিহ্নিত করে যেতে পারেননি—কিন্তু সে যে ঐ দলে আছে, এটা স্থির নিশ্চয় বুঝেছিলেন। তাই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে।

আমি বলি, হয়তো তাই! কিন্তু এখন আর কী-করার আছে মামু?

—অনেক-অনেক কিছু! গোটা রহস্যটা উদ্ঘাটিত করতে হবে আমাকে। জানতে হবে—প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হত্যাকারী কি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করেনি?

আমি বাধা দিয়ে উঠি, নিশ্চয় নয়। উনি মারা গেছেন জন্ডিসে।

উনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন, জানতে হবে, মিস্ মাইতি কেন 'চুপিসাড়ে' ফ্লিসিকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিল, কেন সবাইকে বারণ করেছিল—কর্ত্রী যেন না জানতে পারেন, ফ্লিসি সে-রাত্রে বাড়িতে ছিল না।

—তার মানে আপনি কি বলতে চান...

—আমি কিছুই বলতে চাই না কৌশিক—এই স্টেজে—আমি শুধু শুনতে চাই, কিন্তু এ-কথাও তো ভুললে চলে না যে, সম্পত্তিটা লাভ করেছে মিস মিনতি মাইতি। যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল ফ্লিসির অভিসার-বার্তা গোপন রাখতে! নয় কি?

আবার সব গুলিয়ে গেল আমার।
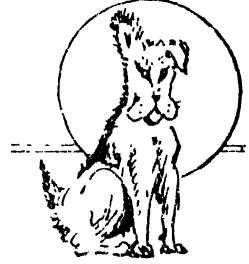
নাটকের পরবর্তী দৃশ্য ডাক্তার পিটার দত্তের ডেরা।

—চল, দেখি তিনি কী বলেন। কী রোগে মিস জনসন ফৌত হলেন।

একাধিক ব্যক্তি বলেছে রোগটা 'জনডিস'— এই রোগে জীবনের শেষ তিনবছর কাবু ছিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু সেকথা বাসুমামুকে বলতে যাওয়া বৃথা, কারণ আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, বক্তারা ধর্মপুত্র নয়! ডক্টর দত্ত থাকেন মেরী নগরে, কিন্তু তাঁর ক্লিনিকটি কাঁচড়াপাড়ায়। একটি পুরোনো আমলের ফোর্ড গাড়ি আছে; তাই চেপে তাঁতের মাকুর মতো তিনি এই পাঁচ-সাত মাইল পথ পাড়ি দেন নিত্যি ত্রিশদিন। নিজেই ড্রাইভ করেন। এখন বেলা চারটে, গেছো-দাদা কোথায় আছেন তা জানা নেই। মামু বললেন, টি-টাইম হয়ে গেছে; চল, সুতৃপ্তিতে গিয়ে এক-এক কাপ চা সেবন করা যাক। আর সেখান থেকে টেলিফোনে ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে। ডাক্তার মানুষ—চেম্বারে এবং বাড়িতে টেলিফোন থাকবেই।

ফিরে এলাম সুতৃপ্তিতে। হ্যাঁ, মামুর ডিডাকশান নির্ভুল—ডক্টর দত্তের চেম্বারে এবং বাড়িতে টেলিফোনের কানেকশন আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুতৃপ্তিতে তা নেই। তা হোক, আমাদের সেই চালাক-চতুর বয়টি জানালো ডাক্তার-সাহেব চেম্বারে যান সন্ধ্যা ছ'টায়। অর্থাৎ এখন তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। ওঁর বাড়ির পথ নির্দেশ দিয়ে দিল এবং ঐ সঙ্গে আরও কিছু সংবাদ পরিবেশন করলো।

ডাক্তার পিটার দত্ত সত্তরের উপর। কাঁচড়াপাড়ায় ওঁর ডাক্তারখানাটি বাস্তবে ক্লিনিক, প্যাথলজিক্যাল ইনভেস্টিগেটিং সেন্টার। রক্ত ও মলমূত্রাদির পরীক্ষা করা হয়, এক্স-রের ব্যবস্থাও আছে। দত্ত-সাহেব নিজে হাতে সব কিছু করেন না, বেতনভুক কর্মচারী আছে। উনি প্র্যাকটিসই করেন, শুধু সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা-দুয়েক চেম্বারে গিয়ে বসেন। এই প্রসঙ্গে উঠে পড়লো ডাক্তারবাবুর দক্ষিণ হস্তের কথা—ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত। অল্প বয়স, মেধাবী। ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে। তবে রোগীপত্র দেখে না—সে নাকি ডাক্তারসাহেবের পরীক্ষাগারে কী-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। বাসু মামু আকৃষ্ট হলেন যখন লোকটা বললো, ঐ নির্মল ডাক্তারের সঙ্গেই স্মৃতিটুকুর বিবাহ পাকা হয়ে আছে।

—তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?

—একথা কে না জানে? অ্যাত্তটুকুন শহর—সবাই সবার নাড়ির খবর রাখে।

—তাই বুঝি? তা মিস্ জনসনের চিকিৎসা ঠিক কে করতেন? ডাক্তার দত্ত, না কি নির্মল দত্তগুপ্ত?

—না স্যাব। বুড়ি সেদিকে ট্যাটন। পিটার দত্তের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ ছাড়া আর কিছু খেতো না।

—তার মানে?

লোকটা সামলে নিল নিজেকে। বললে. মানে ঐ আর কি!

সবাই সবার নাড়িব খবব রাখে! তাব মানে কি ঐ লোকটাও আন্দাজ করেছিল, মিস্ জনসন শেষ জীবনে আতঙ্কগ্রস্তা হয়ে পড়েছিলেন? স্বীকাব করলো না সে কথা।

ডাক্তার দত্ত বাড়িতেই ছিলেন। কলবেল বাজাতে তিনি নিজেই দ্বার খুলে আমাদের বললেন, ইয়েস? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়্যু?

বাসু-সাহেব হাত তুলে নমস্কাব করলেন। বললেন, প্রথমেই বলে রাখি ডক্টর দত্ত, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সাক্ষাৎ করতে এসেছি কোনও প্রফেশনাল কারণে নয়।

—শুনে সুখী হলাম। হ্যাঁ, আপনাদেব দুজনের স্বাস্থ্যই ভাল। অসুখের লক্ষণ কিছু দেখছি না।

—আপনার সঙ্গে দু'চাবটে কথা বলার আছে। যদি সময় না থাকে...

—বিলক্ষণ! আমার যথেষ্ট সময় আছে। আসুন, ভিতরে এসে বসুন। কলকাতা থেকে আসছেন? সোজা গাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে দেখা কবতে?

—আজ্ঞে না। আপনাব কথা জেনেছি মেবীনগরে পৌছে।

আমবা ওঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। গৃহস্বামী ফ্যানটা খুলে দিয়ে বসলেন। বলেন, এবার বলুন?

—আমার নাম টি. পি. সেন। আমি একজন সাংবাদিক—ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট আর কি। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমি যোসেফ হালদাবের একটি জীবনী লিখছি। তাই এসেছিলাম এখানে। মরকতকুঞ্জে গেছিলাম—কী আপসোসের কথা! কেউ কিছু বলতে পারছে না। আপনি মেরীনগরের একজন প্রাচীন সম্মানীয় সিটিজেন, তাই...

ডাক্তার দত্ত আকাশ থেকে পড়লেন। আমিও। মুহূর্তকাল পূর্বেও আমি অনুমান করতে পারিনি যে, রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার কে.পি. ঘোষ ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন টি.পি. সেন-এ! ডাক্তার দত্তের বিস্ময় অন্য জাতের। কোনক্রমে বলেন, এ তো আজব কথা শোনালেন মশাই! অফ্ অল পার্সেন্স আপনি এতদিন পরে যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে বসেছেন কেন? ব্যাপারটা কী?

—উনি বিদেশ থেকে বিদেশী স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন একথা নিশ্চয় জানেন; কিন্তু তাঁর পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে আপনার?

—আদৌ না। উনি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন তাই তো জানে না কেউ?

—না! কেউ জানে না। উনি বোধ হয় 1914-এ ভারতে ফিরে আসেন? নয়?

তা হবে। হ্যাঁ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, এটুকুই শুনেছি।

—আপনি 'কোমাগাতামারু' নামটা শুনেছেন?

—'কোমাগাতামারু'? হ্যাঁ, মনে পড়ছে—একটি জাপানী জাহাজের নাম। কী যেন হয়েছিল?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। জাহাজটিতে চেপে অনেক পাঞ্জাবী শিখ আমেরিকা আর কানাডা থেকে ভারতে ফিরে আসে। 'এমিগ্রেশন' আইন পাশ করে ঐ শিখ শ্রমজীবীদের ধনেপ্রাণে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাহাজটা যখন বজবজে এসে নোঙর করল তখন বৃটিশ পুলিস চাইলো সবাইকে বন্দী করতে। স্পেশাল ট্রেনে করে বন্দীদের পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সর্দার গুরুজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে রওনা দেয়। বাধা দিল পুলিস। শুরু হয়ে গেল

লডাই। গদর-বিপ্লবীবা ঐ শিখ যাত্রীদের কিছু পিস্তল সববরাহ কবেছিল—কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে পিস্তলের লডাই চলে না। বহু শিখযাত্রী হতাহত হল। পুলিসের পক্ষেও দু'জন বৃটিশ অফিসাব এবং তিনজন পুলিশ মাবা যায়। যাত্রীদেব ষাটজনকে গ্রেপ্তাব করে পাঞ্জাবে পাঠানো হয়, কিন্তু গুরুজিৎ সিং পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে পালিয়ে যান। যাব মধ্যে একজনেব নাম যোসেফ হালদার।

—মাই গড! কিন্তু আপনিই তো বললেন যে, ঐ জাহাজেব যাত্রীবা ছিল নিঃস্ব। সেক্ষেত্রে যোসেফ হালদাব অত সম্পদ পেলেন কী করে?

—ডক্টব দত্ত! সেটাই আমাব গবেষণাব কেন্দ্রবিন্দু! কিন্তু ব্যাপারটা মোস্ট কনফিডেনশিয়াল!

—সেটা সহজেই বোঝা যায়: তা বেশ, আপনি কী জানতে চান বলুন? আমি যোসেফ হালদাবকে ছেলেবেলায় দেখেছি! তিনিই এই মেবীনগবেব প্রতিষ্ঠাতা। আমাব বাবাব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মেরীনগবেব আদি বাসিন্দাদেব মধ্যে একজন। যোসেফ হালদারের বড মেয়ে পামেলা আমাব চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। আমবা একসঙ্গেই পড়াশুনা করেছি মিশনারি স্কুলে। সে আমাব বাল্যবান্ধবী।

—যোসেফের সন্তানাদি কী?

ডক্টর দত্ত হালদার-পরিবারেব নানান তথ্য পরিবেশন কবতে থাকেন। আমাব পক্ষে সেসব কথা দ্বিতীয়বার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কাবণ পাঠককে আমি তা ইতিপূর্বেই জানিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে ডক্টব দত্ত বললেন, মরকতকুঞ্জে পুরোনো কাগজপত্র আপনি কিছুই খুঁজে পাবেন না। পামেলাব মৃত্যুব পব মিন্টি সব বাজে কাগজপত্র ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।

বাসু-মামু ন্যাকা সাজলেন, মিন্টি কে?

ফলে আবার শুনতে হল একই ক্লান্তিকব ইতিহাস। সেই সূত্র থেকে মামু প্রশ্ন কববার সুযোগ পেলেন; সুতৃপ্তিতে একটা গুজব শুনলাম, অবশ্য গুজবে কান না দেওয়াই উচিত—ওঁর শেষ জন্মদিনে নাকি আত্মীয়স্বজনেরা সবাই জড়ো হয়েছিল, তখনই হয়তো কোন ঝগড়াঝাটি হয়ে থাকবে যেজন্য দ্বিতীয় উইল না করে—

—না না! অপ্রীতিকর ঝগড়াঝাটি কিছু হয়নি। পামেলা সে রকম মেয়ে ছিল না। হলে, আমি খবর পেতাম—মেরীনগর ছোট্ট জায়গা। ওর বাড়ির ঝি-চাকরেরা সেকথা রটিয়ে বেড়াত। তাছাড়া পামেলার মৃত্যুর দিন-সাতেক আগে আমি একটি ট্রেইনড নার্সকে বহাল করেছিলাম। মৃত্যু সময়েও সে ছিল। তেমন কিছু ঘটে থাকলে আমি আশাব কাছে খবর পেতাম।

—আই সি! তাহলে সেই সহচবী—কী যেন নাম—হ্যাঁ মিনতি মাইতি—সেই হয়তো সুযোগ বুঝে কর্ত্রীকে দিয়ে নতুন একখানা উইল বানিয়ে নিয়েছে! বাহাত্তর বছরের একটি মৃত্যুপথযাত্রীণীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে—

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ডক্টর দত্ত। মাঝপথেই বলে ওঠেন, আপনি ওদের দুজনের একজনকেও চেনেন না, তাই একথা ভাবতে পারছেন। পামেলা জনসনকে আমি ষাট বছর ধরে চিনতাম। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সই করানোর ক্ষমতা দুনিয়ায় কারো নেই। দ্বিতীয়ত মিন্টি মাইতি একটা নিটোল গবেট—নিনকম্‌পুপ! বুঝেছেন? তার মাথায় নিরেট গোবর। এমন একটা পরিকল্পনার কথা তার মাথাতেই আসবে না।

বাসু বললেন, দুনিয়ায় কত রকম রহস্যই তো অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যাচ্ছে। আর তা নিয়ে আমাদের কেন মাথা-ব্যথা বলুন?

—বটেই তো, বটেই তো!

—আপনি ঐ তিনজনের ঠিকানা আমাকে দিতে পারবেন? সুরেশ, স্মৃতিটুকু আর হেনার?

—বৃথা চেষ্টা! ওরা পুরোনো কথা কিছুই জানে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামায় না। আপনি বরং আর এক কাজ করতে পারেন। উষা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সে এখানেই থাকে। পামেলার বান্ধবী। পারলে সে হয়তো কিছু বলতে পারবে।

ঊষা বিশ্বাসের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বাসু বললেন, হয়তো তাঁর কাছে সুরেশ বা হেনার ঠিকানাটা পেয়ে যাব।

—সুরেশ বা হেনার ঠিকানা না দিতে পারলেও টুকুর ঠিকানাটা বোধ হয় আপনাকে দিতে পারবো। নির্মল জানে।

—নির্মল কে?

সুভৃপ্তিতে শ্রুত সন্দেশটি করবরেটেড হল। ডাক্তার দত্ত তাঁর চেম্বারে ফোন করলেন, কিন্তু নির্মল দত্তগুপ্তকে পাওয়া গেল না। ও-প্রান্ত থেকে ওঁকে জানালো—কী একটা জরুরি প্রয়োজনে নির্মল সাইকেলে চেপে ওঁর কাছেই আসছে।

ডক্টর দত্ত বললেন, মিনিট পাঁচ-দশেকের মধ্যেই নির্মল এসে যাবে! একটু বসে যান।

তাই এল নির্মল দত্তগুপ্ত। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স। স্মার্ট, সুদর্শন। পিটার দত্ত তার সঙ্গে সাংবাদিক টি. পি. সেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেন-মহাশয় যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে ইচ্ছুক একথা শুনে তার চোখ কপালে উঠলো। 'কোমাগাতামারু'র প্রসঙ্গটা উল্লেখিত না হওয়ায় ব্যাপারটা হয়তো তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। আমাদের দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, সুরেশের ঠিকানা আমি জানি না। তবে টুকুর ঠিকানা জানি, সে নিশ্চয় তার দাদার পাত্তা জানে।

নির্মল একটি কাগজে স্মৃতিটুকুর ঠিকানা লিখে বাড়িয়ে ধরল। মামু তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাত্রোত্থান করলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বললুম, মামু, 'কোমাগাতামারু' সম্বন্ধে আপনি যেসব ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্স বললেন, তা সত্যি?

—শিওর! ডক্টর দত্ত দু-চারদিনের ভিতরেই লাইব্রেরি থেকে বই এনে ভেরিফাই করবে। আমাকে সন্দেহ করেছে বলে নয়, মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতার কোন হক-হদিস পাওয়া যায় কিনা যাচাই করতে। আমি যা বলেছি তা ঐতিহাসিক সত্য। তবে ঐ—ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন সামান্য একটু ভেজাল থাকে, এখানে তেমনি আছে যোসেফ হালদারের নামটা।

—হঠাৎ দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে ফেললেন কী করে?

—যেহেতু যোসেফ হালদার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে ভারতে ফিরে এসেছিলেন, এ খবরটা শুনলাম।

—ডক্টর দত্ত আপনাকে সন্দেহ করবে না কেন বললেন?

—সন্দেহ করার কী আছে? এমনটা তো নিত্যি ঘটছে। একদল গণ্ডমূর্খ আর একদল গণ্ডমূর্খের জীবনী ক্রমাগত লিখছে।

আমি হেসে ফেলি। বলি, মামু! কথাটা কিন্তু আপনার নিজের তরফে 'কমপ্লিমেন্টস্' হলো না।

বাসু-মামু চকিতে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, উল্টোটাও হলো না। আমি যোসেফ হালদারের জীবনী আদৌ লিখছি না। সেটা লিখছে টি. পি. সেন।

আমি বলি, কিন্তু ডাক্তার দত্তগুপ্তের চোখে আমি যে দৃষ্টি দেখেছি তাতে আশঙ্কা হয়, সে আপনাকেই সন্দেহ করছে, টি. পি. সেনকে নয়!

—ও ছোকরা স্বভাবগতভাবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।

—তা যেন হলো। অতঃ কিম্?

—আর অবিশ্বাসীদের কাছে নয়। এবার আমাদের লক্ষ্যস্থল ঃ ঊষা বিশ্বাস।
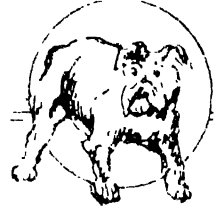
ছোট্ট একটা টালির শেড। সামনে এক-চিলতে বাগান। মরসুমি ফুল ফুটেছিল বিগত বসন্তে। তাদের শুকনো ডালপালা পড়ে আছে। গাদা অবশ্য এখনো ফুটছে। কলবেল ছিল না. কড়া নাড়তে পাল্লাটা ইঞ্চি-দুয়েক ফাঁক হল। দেখা গেল, মোটা চশমা-পরা একজোড়া কৌতূহলী কুৎকুতে চোখ। মানুষটির সামান্য আভাস। উচ্চতা বোধ হয় পাঁচ ফুটের সামান্য কম—মাথার চুল ধবধবে সাদা। পরিধানেও একটা ধবধবে সাদা শাড়ি, নীলপাড়। বাঁ-কাঁধে প্রকাণ্ড একটা ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ব্রোচ—তাতে ইংরেজি দুটি অক্ষর ইউ এবং বি।

সেই দু-আঙুল ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, কী নাম?

বাসু-মামুকে এগিয়ে দিয়ে আমি পিছনে দাঁড়িয়েছি। বাসু মামু হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, টি.পি.সেন।

বৃদ্ধা প্রতিনমস্কারের ধার দিয়েও গেলেন না। বলেন, কী বেচতে এসেছেন?

—বেচতে! না, বেচতে আসিনি তো কিছু!

—শ্যাম্পু, পাউডার, হেয়ার লোশন,...মুখে মাথার হাবিজাবি।

—আজ্ঞে না। আমি সেলস-রিপ্রেসেন্টেটিভ নই।

—অ! মার্কেট সার্ভেইং? আমার কত আয়, সংসারে ক-জন মানুষ, কী দিয়ে ভাত খাই, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি কিনা?

—নো।মাডাম! আমি মার্কেট সার্ভে করতেও আসিনি।

—তবে আসুন, বসুন।

ফ্যানটা খুলে দিলেন। আমরা দুজনে দুটি বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসি। বৃদ্ধাও বসলেন। বললেন, একা মানুষ, সাবধান হতে হয়। বেগানা মানুষজন আসে, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো চেহারা, সুটেড-বুটেড, মুখে পাইপ, দ্যাখ-না-দ্যাখ, একগাদা হাবিজাবি গছিয়ে দেয়। ব্যাপার বুঝে নেবার আগেই দশ-বিশ টাকা হাওয়া।

—আজ্ঞে না, কিছুই বেচতে আসিনি আমরা।

—শুধু কি বেচা? আজকাল আবার হুজুগ হয়েছে 'মার্কেট সার্ভেইং'। আপনার আয় কত? ঝি-চাকর ক'জন? হপ্তায় ক'দিন মাছ খান? —কেন রে বাপু?

—আজ্ঞে সেসব কিছু নয়, আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য জাতের। ডক্টর পিটার দত্তের কাছে আপনার নাম শুনে এসেছি।

—অ! দত্তটা তো একটা ক্যাবলা, তাকে কী গছালে?

বাসুমামু শ্রাগ করলেন। তাঁর হাতে যে পাইপটা ছিল তা ইতিপূর্বেই পকেটজাত করে ফেলেছেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী চাও বল?

বাসু-মামু নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন—অর্থাৎ টি.পি.সেন, সাংবাদিকের। উদ্দেশ্যটাও বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। 'কোমাগাতামারু'র প্রসঙ্গ তুলতেই বৃদ্ধা বললেন, ওটা জানি। তার সঙ্গে যোসেফ হালদারের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি চল্লিশ বছর ইস্কুলে ইতিহাস আর বাংলা পড়িয়েছি—ইদানীং আবার স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ানো ফ্যাশন হয়েছে। আমাকে 'কোমাগাতামারু'র গপ্পো শোনাতে এস না। যোসেফের সঙ্গে গুরুজিৎ সিং-এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

—আপনি নিশ্চত জানেন?

—তুমি 'চার্চ-ম্যাউস' কাকে বলে জানো?

—আজ্ঞে?

—জানো না। 'কোমাগাতামারু' জাহাজে চেপে যারা ভারতে এসেছিল তাদের আর্থিক সঙ্গতি ঐ চার্চ-মাউসের মতো! যোসেফ কোন মুলুক থেকে উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসেছিল জানি না, তবে তাব এক্তিয়াবে ছিল আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা। আলাদীনকে চেন?

বাসুমামুকে ববাবব সওয়াল কবতে দেখেছি। আজ তাঁর জবাব দেওযার পালা। তিনি বেশ থতমত খেয়ে গেছেন মনে হল। বুড়ি বললো, যাগগে মরুকগে, সে তোমাব সমস্যা। তা বইটা লিখবে কি ইংরেজিতে না বাংলায়?

—আজ্ঞে বাংলায়।

—অ। 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' বানান করতে পারবে? 'আনুষঙ্গিক'-এ কোন 'ষ'? 'বিদ্যুদালোক' আর 'বিদ্যুতালোক'-এর মধ্যে কোন শব্দটা শুদ্ধ?

বাসুমামু নক-আউট!

বৃদ্ধা বললেন, তুমি বলবে, সেটা যে প্রুফ-রিডিং করবে তার বিবেচ্য। তা তো বটেই! লেখক তো আর বাংলার পরীক্ষা দিতে বসেনি যে, বানান মুখস্ত করতে বসবে। তবু বলি ভাই, কিছু মনে কোরো না—ছোটভাই মনে কবে বলছি—তোমার পোশাক-আশাক, চলন-বলন সবই ইংরেজি কেতায়। বইটা ইংবেজিতে লিখলেই ভাল কবতে। যাক. আমাব কাছে কী চাও?

—যোসেফ হালদারের পরিবাব সম্বন্ধে যে-কোন তথ্য, সংবাদ। শুনেছি, মিস্ পামেলা জনসন আপনার বান্ধবী?

—ঐ দ্যাখো! শুদ্ধ বাংলায় বাক্যটা শেষ করতে পারলে না। একটা ক্রিয়াপদ থাকা উচিত ছিল, যাতে পাঠক বুঝতে পারে ব্যাপারটা অতীতকালের। লাইনটা হওয়া উচিত ছিল—'বান্ধবী ছিলেন?' তা ছিল। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। 'স্টে-ব্রাইট-স্টীল'-এর বাংলা কী হবে? সে তাই ছিল। মরচে লাগেনি কখনও তার গায়ে। নিখাদ সোনা। তেমনি দামী, তেমনি উজ্জ্বল।

বাসুমামু ফস করে বলে বসেন, মায় তাঁর শেষ উইলটাও?

—ওটা নেহৎ ইতি গজ।

—ইতি গজ! মানে?

—যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র, স্বযং ধর্ম নয়, মহাকাব্যের একটি নররূপধারী চরিত্র। তাই অলঙ্করণের প্রয়োজনে পাকা সোনায ওটুকু খাদ মেশাতে বাধ্য হয়েছিলেন বেদব্যাস। চাঁদে যেমন কলঙ্ক, সূর্যে যেমন...

—সূর্যে যেমন?

দমলেন না বৃদ্ধা। তৎক্ষণাৎ বললেন, রাহুগ্রাস। প্রাকৃতিক নিয়ম! পামেলাও শেষমেশ রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। রাহুটি কে জানো? বুড়ো শিবতলার ঠাকুরমশাই। একটা ফেরেববাজ বদমায়েশ, পরের মাথায় জ্যাকফ্রুট ভেঙে খাওয়া যার পেশা। পামেলা অবশ্য পড়েছিল—রাহু নয়, কেতুর পাল্লায়। কেতুটি কে জানো? ঐ ঠাকুরমশায়ের একশ' আশি ডিগ্রি তফাতের অন্তরঙ্গ ধর্মপত্নী—সতী মা!

বেশ বোঝা যায়, বুড়ি কথা বলার লোক পায় না। একা-একা থাকে, তাতেই সে অভ্যস্তা; কিন্তু স্কুলে চাকরি করতো—ক্লাস নিতে হত, কথা বলতে ভালবাসে। একালে কারও সময় নেই যে, বুড়ির বকবকানি শোনে। যদি বা কেউ আসে সে সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ। আজ তাই সে প্রাণ খুলে বকবক করে গেল। তার 'সতী-মা'-এর কেচ্ছাটা সংক্ষেপ করলে এ রকম দাঁড়ায়:

মৃত্যুর মা' চারদিন আগে পামেলার নিমন্ত্রণ পেয়ে ঊষা বিশ্বাস এক মঙ্গলবার রাত্রে মরকতকুঞ্জে যান। গিয়ে দেখেন, সেখানে একটি প্ল্যানচেটের আসর বসেছে। ঠাকুরমশায়ের ধর্মপত্নী 'সতী-মা'

মিনতি মাইতি আর পামেলা বসেছিলেন প্ল্যানচেট করতে। উষাকে দর্শক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস্ জনসন। জনান্তিকে মিস্ বিশ্বাসকে বলেছিলেন, আমি এটা বিশ্বাস করি না উষা, তবু খোলা মনে ব্যাপারটা যাচাই করতে চাই—তোমাকে ডেকেছি একটা বিশেষ কারণে। আমি জানি যে, এসবে তুমি আদৌ বিশ্বাস কর না। তুমি শুধু লক্ষ্য করবে, ঐ সতী-মা নামের মেয়েটি আমাকে হিপ্নোটাইজ করছে কিনা। প্ল্যানচেট বুজরুকি হতে পারে, 'হিপ্নটিজম' পরীক্ষিত সত্য! তাই আমি তোমার চোখ দিয়ে এই অপ্রাকৃত অপরাবিদ্যাটির পরীক্ষা করতে চাই।

উষা প্রতিবাদ করেছিলেন, কী দরকার এসব রিসক্ নেবার। তোমার শরীর দুর্বল...

—সেজন্যই তোমাকে ডাকা। শরীরটা যদি দুর্বল না থাকতো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারতাম যে, ঐ অর্ধশিক্ষিত মেয়েটা আমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। বুঝলে?

উষা তা সত্ত্বেও আপত্তি করেছিলেন, বুঝেছি। কিন্তু তবু এটা আমার ভাল লাগছে না, পামেলা।

—জানি, তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান আমি করতে চাই। কিছুতেই সমস্যাটার সমাধান করতে পারছি না—যা যা করণীয় করেছি, কিন্তু... না, আমি দেখতে চাই পরলোক আছে কি না, তা থাকলে আমরা যা জানতে পারি না, বুঝতে পারি না, তার সমাধান তাঁরা করতে পারেন কি না।

বাধ্য হয়ে উষা বিশ্বাসকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা তিনজনে যোসেফ্ হালদারের কথা চিন্তা করতে থাকেন। তিনজনের মধ্যে একমাত্র পামেলাই তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছেন, তাই বাকি দুজনের সুবিধার জন্য স্বর্গত যোসেফ হালদারের একটি ছবি টেব্‌ল্-এ সাজানো ছিল।

ভূতের গল্প বলার ঢঙে মিস্ বিশ্বাস একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন! ফিস্‌ফিস করে বললেন, তারপর যা ঘটলো, তা তোমরা বিশ্বাস করবে না ভাই। কিন্তু এ-কথা আদ্যন্ত সত্যি। আমি এক চুলও বাড়িয়ে বলছি না। আমি অবিশ্বাসী, এসব বুজরুকি বিশ্বাস করি না। করতাম না, এখনো করি না—কিন্তু এ এমন একটা অভিজ্ঞতা যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না!

—*ঠিক কী দেখলেন আপনি?*

—ঘরটা আধা-অন্ধকার। কিছু ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি একবারও ঐ সতী মায়ের চোখে-চোখে তাকাইনি, যাতে সে আমাকেও হিপ্নোটাইজ করতে না পারে। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম পামেলার দিকে। হঠাৎ দেখি পামেলার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে—মনে হল নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার—মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। আর ঠিক তখনই আমার মনে হল ওর মুখ থেকে একটা, না একটা নয়, দু-দুটো সাপের মত কী যেন বার হয়ে এল।ধূপের ধোঁয়ার মতো সে-দুটি ফিতা এঁকে বেঁকে ওর মাথার উপর উঠে যেন মিশে গেল। আমি প্রথমটা ভেবেছিলাম, ধূপেরই ধোঁয়া, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো তা নয়। প্রথমত,সেই রিবন দুটি স্পষ্টতই ওর মুখ থেকে বার হয়েছে, দ্বিতীয়ত, ধূপের ধোঁয়া হয় নীল্‌চে-সাদা রঙের,—এ-দুটি হলুদ রঙের; তৃতীয়ত,রিবন দুটি 'লুমিনাস'—আই মীন প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিযুক্ত,— ঝলমলে বা চক্‌চকে নয়, স্নিগ্ধ দ্যুতিমান, প্রভাময়—জোনাকির আলো হলুদ রঙের হলে যেমনটা দেখাবে! 'এক্টোপ্লাজম' বলে বোধহয় ওরা—অতীন্দ্রিয় লোক থেকে কোন বিদেহী আত্মা নাকি এভাবে কায়াময় হতে পারে। আমি নাস্তিক, অবিশ্বাসী, কিন্তু স্বীকার করব, ঐ খণ্ডমুহূর্তে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চীৎকার করে উঠতে যাব, তার আগেই চেয়ার থেকে লুটিয়ে পড়ল পামেলা! ...আমি বাতি জ্বেলে দিলুম। টেলিফোনে পিটারকে তৎক্ষণাৎ খবর দিলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে এসে পড়লো। এসব প্ল্যানচেটের আসর বসানোর জন্য আমাকেই খামোখা গালমন্দ করলো। শুরু হল তার শেষ চিকিৎসা। এরপর মাত্র তিনটে দিন বেঁচেছিল সে!

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, মোস্ট অ্যামেজিং! উনি কি সেদিন নিষিদ্ধ কিছু খেয়েছিলেন?

—ইম্পসিব্‌ল্। তার আগেই আশা বহাল হয়েছে। আশা পুরকায়স্থ, মানে ডক্টর দত্তের নার্স। তার নির্দেশে ওর খাবার এবং ওষুধ দেওয়া হতো। বস্তুত সে নিজেই হাতে করে খাওয়াতো।

—ডক্টর দত্ত কী বললেন?

—হঠাৎ 'জনডিস'-এরই একটা অ্যাকিউট অ্যাটাক।

—আত্মীয়স্বজনকে খবর পাঠানো হল নিশ্চয়?

—তা হল। তবে ওরা তো আগের-আগের সপ্তাহে বারে বারে এসেছে। একবার হেনা-প্রীতম যুগলে, একবার টুকু-সুরেশ একত্রে। এছাড়া প্রীতম একাও একবার এসেছিল। আমি শেষ দিন পনেরো রোজই সন্ধ্যায় ওর কাছে যেতাম। কে-কবে এসেছে জানতে পারতাম। যা হোক, খবর পেয়ে সবাই যখন এলো তার আগেই পামেলা দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে।

বৃদ্ধার কাছ থেকে আর কিছু খবর পাওয়া গেল না।

আমরা যখন বিদায় নিয়ে চলে আসছি তখন বৃদ্ধা বললেন, চা-টা কিছুই তো খেলে না তোমরা! চা খাবে? জল বসিয়ে দেব? আমার নিজে হাতে বানানো কেকও আছে।

বাসুমামু হাত দুটি জোড় করে বললেন, আজ থাক দিদি! এইমাত্র সুতৃপ্তিতে চা-টা খেয়ে আসছি।

—থাক তবে। মনে হচ্ছে তোমাকে বারে বারেই আসতে হবে। বিপ্লবী যোসেফ হালদার সম্বন্ধে আজ তো আমরা প্রাথমিক আলোচনা করলাম শুধু। আবার এসো। খুব ভাল লাগল তোমাদের সঙ্গে গল্প করে।

পথে নেমে এসে বলি, বুড়ি কিন্তু আপনাকে বাংলা বানান নিয়ে নাজেহাল করে ফেলেছিল। 'আনুষঙ্গিক'-এ সত্যিই কোন 'ষ'?

—'ষ'। দিদিমণির ঐ রুডমেন্টারি তিনটি প্রশ্নেরই জবাব জানা ছিল আমার। তবে আমি না-জানার ভান করায় তিনি খুশি হলেন। সেটা দরকার ছিল। ওঁকে খুশি রাখা। না হলে সব কথা জানা যেতো না।

—কিন্তু বুড়ি ও-কথা বললো কেন মামু? ও কি আন্দাজ করেছে যে, আপনি যোসেফের জীবনী লিখতে বসেননি আদৌ। বিপ্লবী যোসেফ হালদারের কথা তো...

অনেকক্ষণ পাইপ খাননি। এবার পকেট থেকে পাইপটা বার করতে করতে বাসুমামু বললেন, বুড়ি একটি বাস্তুঘুঘু!

—সে যা হোক, এবার আমবা কোথায় যাচ্ছি?

—ব্যাক টু ক্যালকাটা। কাল আমি 'কেস' নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তোমার দুটো কাজ, এখনি বলে রাখি, পরে হয়তো ভুলে যাবো। কাল সকালে গিয়ে আমাদের টিকিট দুটো ক্যানসেল করাতে হবে, আর তোমার মামীকে একটা টেলিগ্রাফ করে জানাতে হবে যে, আমাদের যেতে দু'চারদিন দেরী হবে।

তখনি আমি কিছু বলিনি। ওঁকে তো জানি, রইয়ে-সইয়ে কথাটা পাড়তে হবে। এ একটা অহৈতুকী অ্যাডভেঞ্চার—যার কোনো মানে হয় না। ফেরার পথে প্রসঙ্গটা আবার উনিই তুললেন, গোপালপুর যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ায় তুমি খুব মর্মাহত হয়েছো মনে হচ্ছে!

আমার আর সহ্য হল না। বলি, দারুণ ডিডাকশান করেছেন এবার। কারেক্ট!!

—বুড়ি যদি রোগে ভুগে মারা না যেতো, যদি তাকে কেউ খুন করতো, তাহলে নিশ্চয় তুমি এত উদাসীন থাকতে পারতে না, নয়?

—নিশ্চয় নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো মৃত ব্যক্তির কোনও উপকারই করতে পারবো না আমরা।

—কোন্ ক্ষেত্রে মৃত্যু-তদন্ত করে গোয়েন্দা সেই মৃত ব্যক্তির উপকার করে?

—না, তা বলছি না। কিন্তু এখানে মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক।

—কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনোর চেষ্টা এখানে কেউ একজন করেছে। সেটা মানো?

—কিন্তু সে সফলকাম হয়নি। ফলে...

—কে ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল জানবার কৌতূহল নেই তোমার?

—আপনার ঐ ডিডাকশানের তো একটাই সূত্র—সেই পেরেকটা। হয়তো সেটা আবহমান কাল থেকেই ওখানে পোঁতা আছে।

—না নেই। ভার্নিশটা টাটকা। আমি নিচু হয়ে শুঁকে দেখেছি। এখনো গন্ধ পাওয়া যায়।

—কিন্তু তার তো হাজারটা ব্যাখ্যা হতে পারে।

—একথা তুমি আগেও বলেছ কৌশিক, ন-শো' নিরানব্বইটাকে বাদ দিয়ে তার একটা আমি তোমাকে দাখিল করতে বলেছিলাম। তখন তুমি তা বলতে পারোনি। এখন পারো?

এর কী জবাব?

উনি এক নাগাড়ে বলেই চলেন, আমাদের গণ্ডিটা ছোট। সবাই শুতে যাবার পরে সুতোটাকে খাটানো হয়েছিল। ফলে, বাড়ির ভিতরে যে-কয়টি প্রাণী, তাদের মধ্যে একজন। তার মানে আমাদের সন্দেহজনক ব্যক্তিটিকে বেছে নিতে হবে ছয়জনের প্যানেল থেকে : প্রীতম ঠাকুর, হেনা ঠাকুর, স্মৃতিটুকু, সুরেশ, মিনতি মাইতি আর শান্তি। মালি, ছেদিলাল, ড্রাইভার মোহন আর সরযূ বাড়ির বাইরে শোয়।

—শান্তি দেবীকে আপনি বাদ দিতে পারেন মামু।

—পারি কি? সেও 'লিগাসি' পেয়েছে। যার জন্যে সে আর নতুন চাকরি করতে অনিচ্ছুক। কত টাকা পেয়েছে জানি না, কিন্তু তার সুদ থেকে একটা লোকের খরচ মেটানো যায়।

—কিন্তু তার জন্যে শান্তি দেবী এ খুনটা করবে এটা মেনে নিতে মন সরছে না।

—কারেক্ট। সম্ভাবনা কম। সে দীর্ঘদিন বহাল আছে। কিন্তু আমাদের সবরকম সম্ভাবনাকেই বিচার করতে হবে।

—তাহলে আমি বলবো আপনার হিসাবে সাতজন হওয়া উচিত। কেন ধরে নিচ্ছেন যে, মিস্ পামেলা জনসন নিজেই ঐ তারটা খাটাননি অন্য কাউকে হত্যা করতে?

—একটি মাত্র হেতুতে। সেক্ষেত্রে তিনি ওটাতে পা জড়িয়ে উল্টে পড়তেন না। তিনি সাবধানে তারটা ডিঙিয়ে যেতেন।

অপ্রস্তুত হতে হলো আমাকে। বলি, সবাই কিন্তু বলেছে উইলটা পড়ার সময় মিনতি মাইতি একেবারে বজ্রাহত হয়ে যায়। সে নাকি জ্ঞান হারায়।

—বলেছে। সবাই না হলেও অনেকে। তা ছাড়া ডক্টর দত্তের মতে সে গবেট, নিন্‌কমপুপ্। এসবই অবশ্য শোনা কথা। আমি ভেরিফাই করে দেখিনি। আপাতত আমাদের শুধু তথ্য-নির্ভর হতে হবে। ওনলি ফ্যাক্টস্।

—অবিসংবাদিত তথ্য কী কী?

—এক, মিস্ জনসনের পতন, সেটা অনেকে নয়, সবাই বলেছে। দুই, পতনের হেতু একটি মৃত্যুফাঁদ, যা কেউ খাটিয়েছে—

—সেটা সবাই তো নয়ই, অনেকেও নয়, একজনমাত্র বলেছেন।

—না কৌশিক! তার 'এভিডেন্স' রয়েছে। প্রমাণ! পেরেকটা এখনো আছে, তার মাথায় ভার্নিশের গন্ধটা এখনো আছে, মিস্ জনসনের চিঠির ভাষাতে তার ইঙ্গিত, কুকুরটা সে রাত্রে বাড়িতে ছিল না, বলটা সে স্থানচ্যুত করতে পারে না—যে-কথা মৃত্যুপথযাত্রী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। অল দিজ থিংস আর ফ্যাক্টস্।

—সুতরাং?

—সুতরাং আমাদের খুঁজে দেখতে হবে—কে ঐ তারটা খাটিয়েছিলো। এরপর প্রচলিত পথ-পরিক্রমা! বৃদ্ধার মৃত্যুতে কে উপকৃত হলো?

—মিনতি মাইতি! অথচ যদি আপনার অনুমান সত্য হয়—অর্থাৎ সে রাত্রে কেউ সিঁড়ির মাথায় সুতো বেঁধে ওঁকে হত্যা করতে চেয়ে থাকে তাহলে মিনতি মাইতির কোনও উপকার হত না।

—ঠিক তাই! তাই ঐ ছয়জনই আমাদের সন্দেহের পাত্র-পাত্রী। এ কথা ভুললে চলবে না যে,

সম্ভবত ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনা থেকেই মিস্ জনসন তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর উইলটা বদলে ফেলেন। নয় কি?

—তার মানে এ রহস্যজাল ভেদ না করে আপনি গোপালপুর যাচ্ছেন না।

—দারুণ ডিডাক্ট করেছ এবার কৌশিক। দ্যাটস্ অলসো এ ফ্যাক্ট! কারেক্ট!!
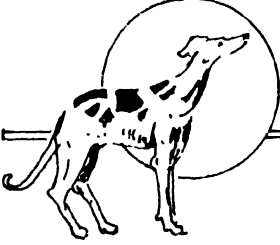
স্মৃতিটুকুর অ্যাপার্টমেন্ট সাদার্ন অ্যাভিন্যুর উপরে—প্রকাণ্ড এক প্রাসাদের সপ্তম ফ্লোরে। দক্ষিণ-খোলা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, দারুণ পশ! লিফটে করে উঠে কল বেল দিতে একটি মেড-সার্ভেন্ট পিপ-হোল খুলে উঁকি দিল। বললে, কী চাই?

বাসু-মামু সেই গর্ত দিয়ে একটি ভিজিটিং কার্ড গলিয়ে দিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর উনি নিশ্চয় সাংবাদিক বা রিটায়ার্ড নেভাল অফিসারের জাল-কার্ড বানাননি। আন্দাজ হল এবার সঠিক পরিচয়ই দিয়েছেন। একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। মেড-সার্ভেন্টটিকে এবার দেখা গেল—প্রৌঢ়া, পরিচ্ছন্ন। বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে বললো, বসুন। উনি আসছেন এখনই, ফ্যানটা খুলে দেব?

এয়ার-কন্ডিশন করা ঘর। বেশ ঠাণ্ডা। আমি বললাম, দরকার হবে না।

গতকাল মামলায় জিতেছেন বাসু-মামু। তাঁর মেজাজ শরিফ। আমি সাজেস্ট করেছিলুম, সবার আগে সেই অ্যাটর্নি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে—প্রবীর চক্রবর্তী। মামু রাজী হননি। বলেছিলেন, সে আইনজ্ঞ মানুষ। তার কাছে 'কোমাগাতামারু'র গল্প শোনানো চলবে না। সে রাজ্যে যেতে হলে পাসপোর্ট চাই। আই মীন 'ভিসা'।

বোধগম্য হয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর রাজ্যে ঢোকার ভিসা কোথায় পাবেন?

—সেই 'ভিসা' যোগাড় করতেই তো এসেছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গৃহস্বামিনী আবির্ভূতা হলেন। বয়স আঠাশ-উনত্রিশ, যদিও সাজসজ্জার বাহারে আরও কম দেখায়, তবু চোখের কোলে আসল বয়সটা ধরা পড়ে ঠিকই। সুন্দরী খুব কিছু নয়, তবে সুতনুকা। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, এক মাথা শ্যাম্পু-করা চুল, সিল্কের মতো নরম। পরনে একটা ঢিলেঢালা কিমোনো জাতীয় পোশাক। পায়ে হাভানা ঘাসের চটি। এই সাত-সকালেই নিখুঁত প্রসাধন সেরে রেখেছে। যে ভঙ্গিতে সে ভিতর থেকে সাবলীলভাবে এগিয়ে এল তাতে মনে হল, ও বিউটি কম্‌পিটিশনে এবার বুঝি ডায়াসে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার হাতে বাসু-মামুর ভিজিটিং কার্ডখানা। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে নিল তার লক্ষ্য। ওঁর দিকে ফিরে বললে, আপনিই নিশ্চয়?

বাসু-মামু উঠে দাঁড়িয়ে ফরাসী কায়দায় 'বাও' করে বললেন, অ্যাট য়োর সার্ভিস মাদমোয়াজেল। আপনার প্রভাতী অবসর বিনোদনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি বলে দুঃখিত।

মেয়েটিও একই কায়দায় 'প্রতি-বাও' করে বললে, আঁসাতে, মসিয়ো বাসু! বসুন। তারপর আমাকে দেখে নিয়ে মামুকেই প্রশ্ন করে: ডক্টর ওয়াটসন?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব দিলেন তির্যকভাবে, আমার পরিচয় জানেন দেখছি।

—আমাকে 'তুমিই' বলবেন। আপনাকে কে না জানে? খুনী আসামীকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনাই আপনার স্পেশালিটি!

—ভুল হল তোমার। 'খুনী-আসামী' নয়, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দোষ আসামীদের!

—সেটা হেয়ার-সে। 'কাঁটা-সিরিজে' বেছে বেছে সেই গল্পগুলিই ছাপা হয়, এইমাত্র! কী দুঃখের কথা—আমার অটোগ্রাফ খাতাখানা হারিয়ে ফেলেছি! যা হোক, আপনার এই প্রভাতী-হানার উদ্দেশ্যটা যদি ব্যক্ত করেন—

—পরশু দিন আমি তোমার পিসির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি।

স্মৃতিটুকুর ম্যাসকারা-করা আঁখিপল্লব কিছু বিস্ফারিত হল; বললে, আমার পিসি?

—তাই বলেছি আমি। তোমার পিতৃস্বসা, পিসি।

—আপনার কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে মিস্টার বাসু। আমার পিসিরা সবাই স্বর্গগতা। শেষ পিতৃস্বসা নিষ্কৃতি পেয়েছেন মাস দুয়েক আগে।

—তাঁর কথাই বলেছি আমি, মিস্ পামেলা জনসন।

—ওসব ভূতের গল্প পত্র-পত্রিকাতেই মানায় বাসু-সাহেব। স্বর্গীয় পোস্ট-অফিসের কাহিনী এমন প্রকাশ্য দিবালোকে বেমানান।

—জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন সতেরই এপ্রিল আমি তা পেয়েছি পরশু, উনত্রিশে জুন।

স্মৃতিটুকু একটু নড়েচড়ে বসলো। সামনের টি-পয়ের উপর থেকে টেনে নিল একটি সুদৃশ্য সিগারেট-কেস। বাড়িয়ে ধরল আমাদের দিকে। আমরা প্রত্যাখ্যান করায় সে নিজেই একটি ধরালো। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তা আমার পূজ্যপাদ পিতৃস্বসা কী লিখেছিলেন?

—সেটা এখনই বলতে পারছি না, মিস্ হালদার। ব্যাপারটা নিতান্ত গোপন!

স্মৃতিটুকু নীরবে বার-দুই-তিন ধোঁয়া গিলল। তারপর বললে, তা আমার কাছে কী চাইতে এসেছেন?

—কয়েকটি তথ্য। তুমি অনুমতি করলে দু-একটি প্রশ্ন করতে চাই।

—কী জাতীয় প্রশ্ন?

—তোমাদের পারিবারিক বিষয়ে।

আবার মেয়েটি দু-চারবার ধোঁয়া টানলো। তারপর বলে, একটা নমুনা শোনাতে পারেন?

—নিশ্চয়। যেমন, তোমার দাদার বর্তমান ঠিকানাটা আমি জানতে চাই—সুরেশ হালদারের।

স্মৃতিটুকু তার সিগারেটের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, আয়াম সরি। তার বর্তমান ঠিকানা ঠিক জানি না। সে পশ্চিম ভারতে গেছে, বোম্বাই। কোন হোটেলে উঠেছে তা আমার জানা নেই?

—কবে বোম্বাই গেছে?

—গতকাল। এটাই কি জানতে এসেছিলেন আমার কাছে?

—না। আরও অনেকগুলি প্রশ্ন ছিল আমার। যেমন ধর, আমি জানতে চাই ঃ তোমার বড়পিসি যেভাবে তাঁর সম্পত্তি এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে দান করে গেলেন তাতে কি তোমরা ক্ষুব্ধ নও? দ্বিতীয়ত: ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্তের সঙ্গে তোমার এনগেজমেন্ট কতদিন আগে হয়েছে?

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মেয়েটি। যেন মনস্থির করলো। দৃঢ়স্বরে বললো, দুটো প্রশ্নের একটাই জবাব: আমার ব্যক্তিগত জীবনে অপরের নাক গলানো আমি পছন্দ করি না, বিশেষ করে সে নাকটা যদি হয় কোন গোয়েন্দার !

বাসু-সাহেব হাসলেন। বললেন, আমি গোয়েন্দা নই। যা হোক, আমি তোমার মনোভাব বুঝেছি। আবার বলি, তোমার প্রভাতী অবসর-বিনোদনে ব্যাঘাত করে গেলাম বলে দুঃখিত। এস কৌশিক।

দুজনেই উঠে পড়ি। দ্বারের কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই শোনা গেল: শুনুন?

বাসু-সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন, নির্বাক।

—বসুন।

পায়ে পায়ে ফিরে এসে একই আসনে বসলাম দুজনে। মেয়েটি বললে, দু-তরফাই খোলাখুলি হলে ভাল হয়। হয়তো আপনার মতো একটি মানুষেরই দরকার ছিল আমার। আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো অযাচিত এসেছেন। ফিরিয়ে দেওয়াটা হয়তো বোকামি হবে। বলুন, ঐ শেষ উইলটা বরবাদ করার কোন ব্যবস্থা করা যায়?

—উকিলের পরামর্শ নিয়েছো?

—একাধিক। তারা একবাক্যে বলেছে, বুড়ি বজ্র আঁটুনি দিয়েছে, কোনও ফস্‌কা গেরোর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

—কিন্তু সেটা তুমি বিশ্বাস কর না?

—না, করি না। আমার ধারণা—এ দুনিয়ায় সব কিছুই সম্ভব যদি যথেষ্ট খরচ করতে কেউ রাজী থাকে, আর এমন সহকারী বেছে নেয় যার বিবেক পাণ্ডবাগ্রজের মতো সজারুর কাঁটা নয়।

—অর্থাৎ তুমি যথেষ্ট খরচ করতে রাজী এবং তোমার অনুমান যে, আমার বিবেক সজারুর কাঁটার মতো নয়?

—তেমন-তেমন অবস্থায় পড়লে স্বয়ং ধর্মপুত্রও 'ইতি গজ'র আড়ালে নিজের বিবেককে টেম্পরারিলি আড়াল করে রাখেন! নয় কি?

—কারেক্ট! কিন্তু কী জাতীয় সমাধান সেই সহকারী দাখিল করবে?

—সেটা তার বিবেচ্য। মূল উইলটা চুরি যেতে পারে, তার পরিবর্তে একটা জাল উইল আবিষ্কৃত হতে পারে; কিংবা মিনতি মাইতিকে কেউ অপহরণ করতে পারে, হয়তো ভয়ে সে স্বীকার করবে যে, বুড়িকে ভয় দেখিয়ে সে দ্বিতীয় একখানি উইল বানিয়ে নিয়েছিল—

—তোমার মস্তিষ্ক খুবই উর্বর দেখছি!

—আপনার কী জবাব, তাই বলুন? আমি খোলাখুলি আমার তাস বিছিয়ে দিয়েছি। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করতে চান, তবে উঠে পড়ুন, দরজাটা খোলাই আছে।

আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না বাসু-মামুর জবাবে—আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছি না।

টুকু খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় বললে, আপনার চ্যালা, ডক্টর ওয়াটসন বোধহয় মর্মাহত। কোন ছুতোনাতায় ওঁকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

বাসু-মামু তার জবাবে ইংরাজিতে বললেন, ডক্টর ওয়াটসনকে আমি সামলাচ্ছি। ওর বিবেক মাঝে মাঝে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার প্রতি ওর আনুগত্য অপরিবর্তনীয়। তুমি বরং তোমার মেড-সার্ভেন্টকে কোন ছুতোনাতায় বাইরে পাঠিয়ে দাও। মনে হচ্ছে, পাশের ঘরে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

টুকু সামলে নিল। উঠে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল সে। লক্ষ্য করে দেখলাম, সেই প্রৌঢ়া মেড-সার্ভেন্টটি সদর-দরজা খুলে কী কিনতে বাইরে গেল। দরজাটা খোলাই রইল। হাট করে খোলা নয়। কিন্তু লক করাও নয়।

মামু আমার দিকে ফিরে বললেন, নিজেকে সংযত কর কৌশিক। আমরা বে-আইনি কিছু করছি না। কিন্তু আইনের ভিতরে থেকেও অনেক কিছু করা যায়।

টুকু বললে, টার্মসটা এই পর্যায়ে ঠিক করে নিলে ভাল হয় নাকি? অর্থাৎ আপনি যদি উইলখানা নাকচ করাতে পারেন তাহলে আমাদের তিনজনের যৌথ শেয়ারের কত পার্সেন্টি দিতে হবে?

—তিনজনের তরফেই তুমি কথা বলবে?

—কেন নয়? তিনজনের একই অবস্থা—আমি, সুরেশ আর হেনা। উইলটা নাকচ হলে তিনজনের একই লাভ। তবে হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনার প্রস্তাবটা শুনলে আমি আলোচনা করে দেখতে পারি।

—বিটুইন ফাইভ টু ফিফটিন পার্সেন্ট। পার্সেন্টেজটা নির্ভর করবে আমার কাজের ওপর। আই মিন, আইনকে কতখানি নিজেদের স্বপক্ষে টেনে আনতে হবে, তার উপর।

—এগ্রীড!

—এবার মন দিয়ে শোন। সচরাচর—ধর শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে আমি আইনের অন্ধ সেবক। কিন্তু শততম ক্ষেত্রে—আমি চক্ষুষ্মান! প্রথম কথা, তাতে অর্থের পরিমাণটা যথেষ্ট হওয়া দরকার—এবার যেমন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমার সুনামে যেন কোনভাবেই আঘাত না লাগে—ব্যাপারটা বুঝলে?

—জলের মতো। এখন আপনি খোলাখুলি সব কথা জানতে চাইতে পারেন।

—ঠিক আছে। প্রথমত বল, কত তারিখে এই শেষ উইলটা হয়েছিল? কে-কে সাক্ষী?

—একুশে এপ্রিল। প্রবীর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। সাক্ষী হিসাবে আছে দুজন—তাদের সঙ্গে করেই এনেছিলেন প্রবীরবাবু, ল-ক্লার্ক। স্থানীয় লোক নয়।

—আর আগের উইলখানা? কবে হয়? কী তার প্রভিশন্স?

—প্রায় বছর পাঁচেক আগে সেখানি তৈরি করেন বড়পিসি—ঐ প্রবীরবাবুকে দিয়েই। কে-কে সেবার সাক্ষী ছিল জানি না। তাতে বলা হয়েছিল, শান্তি আর সে-আমলের সহচরীকে দু-দশ হাজার দিয়ে ওঁর সমস্ত সম্পত্তি তিন ভাগ হবে। পাব আমরা তিনজন—আমি, সুরেশ আর হেনা।

—কোনও 'ট্রাস্ট'-এর মাধ্যমে?

—না, সরাসরি আমরা তিনজনই।

—এবার সাবধানে জবাব দিও—তোমরা সকলেই কি জানতে সেই উইলের কথা?

—নিশ্চয়ই। মেরীনগরের অনেকেই জানতো। পিসিই গল্প করেছিল পীটার কাকার কাছে, উষা পিসির কাছে। বড়পিসি আমাদের বলে রেখেছিল। তার কাছে ধার চাইলেই সে বলতো, আমি দু-চোখ বুজলে তো তোরাই সব পাবি বাপু—এখন কিছু চাস না।

—তোমার কি মনে হয়—তোমাদের যদি নিতান্ত প্রয়োজন হত, ধর কোনও কঠিন অসুখ-বিসুখ, তাহলেও কি মিস জনসন তোমাদের ধার দিতেন না?

—দিত, তবে প্রয়োজনের সত্যতা যাচাই করে। মুখের কথায় নয়! খোঁজখবর নিয়ে যদি দেখত যে, সত্যিই আমাদের টাকার প্রয়োজন, তবেই সে সাহায্য করত। নচেৎ নয়।

—তার মানে ওঁর ধারণা ছিল তোমাদের আর্থিক সঙ্গতি এখন যা, তাতে তোমাদের টাকা ধার দেওয়ার কোন মানে হয় না?

—ঠিক তাই।

—অথচ তোমার নিজস্ব ধারণা যে, তোমার আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট নয়?

আবার সোজা হয়ে বসল টুকু। বললে, খুলেই বলি শুনুন। আমার বাবা বব্ হালদার আমাদের দু-ভাইবোনের জন্য যথেষ্টই রেখে গেছিলেন। মা আগেই মারা যায়। আমরা এক-এক জনে পাই দেড় লাখ করে। হয়তো তার সুদ থেকেই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন মিটত; কিন্তু তা হ'ল না। সুরেশ রেস খেলে টাকাটা ওড়ালো, আর আমি—

দক্ষিণের বড় জানালা দিয়ে টুকু লেক-এর গাছ-গাছালির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

—আর তুমি?

—লুক হিয়ার স্যার! আমি মনে করি ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সুইসাইড করা সহজ! একটাই জীবন, ক্ষণস্থায়ী যৌবন—আমি তার প্রতিটি মুহূর্তকে ভোগ করতে চাই। 'ভোগ' শব্দটা সবরকম অর্থে। তাই আমি করে এসেছি, তাই করে যাবো—

বাসু-মামু অকপটে প্রশ্ন করলেন, সেই দেড় লাখের মধ্যে তোমার অংশে কতটা বাকি আছে?

—সতেবশ' তেব টাকা আশি নয়া পযসা—ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে, লাস্ট উইথড্রয়ালের পর। এছাড়া হযতো কিছু আছে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে।

—এক্ষেত্রে তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হয়।

হঠাৎ খিলখিলিযে হেসে উঠল দুঃসাহসী মেযেটা। বললে, শুধু আমার জন্য নয় বাসু-সাহেব। আপনাব জন্যও—কারণ ব্যর্থ হলে আপনার খরচাপাতি মেটাবার ক্ষমতাও আমার নেই!

—তাইতো দেখছি। এখন বল তো, সিগ্রেট খাও, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। মদ খাও?

—খাই। দিশি নয, খাটি বিলাতী হলে। প্রায়ই খাই। প্রায প্রতিদিন সন্ধ্যায।

—ড্রাগস্?

—কখনো নয।

—প্রেম-ট্রেমেব ইতিহাস?

—প্রচুব। সবক'টা ছেলের নামও মনে নেই। তবে এখন শুধু একজনই বয়ফ্রেন্ড: নির্মল।

—কিন্তু আমাব কেমন যেন মনে হল সে তোমার ভিন্ন-মেরুর বাসিন্দা। তাই নয়?

—ঠিকই! আমাদেব জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু একমাত্র তাকেই আজ ভালবাসি।

—তাব আর্থিক সঙ্গতি বোধহয় সামান্যই, নয়?

—দুর্ভাগ্যবশত তাই। টাকার কথা বিবেচনা কবে আমরা কেউই পরস্পরকে ভালবাসিনি। ও জানে আমি প্রায-নিঃস্ব। কিন্তু ও একজন জিনিয়াস! কী একটা আবিষ্কার প্রায করে ফেলেছে। সাফল্যমণ্ডিত যদি হয়, পেটেন্ট যদি নিতে পারে—

—ও নিশ্চয জানত যে, মিস জনসন মারা গেলে তুমি প্রচুর সম্পত্তি লাভ করবে?

—হ্যাঁ তাই। কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরেও আমাদেব এনগেজমেন্টটা ভেঙে যায়নি। আপনি নির্মলকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি। মেরীনগরে। সেই তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিযেছে। সুরেশের ঠিকানাটা সে জানে না বলল।

—সুরেশকে কেন খুঁজছেন আপনি?

বাসু-মামু জবাব দিতে পারলেন না। ঠিক তখনই সদর দরজাটা হাট করে খুলে গেল। একটি দীর্ঘকান্তি সুবেশ, সুন্দর, প্রাণবন্ত যুবক দ্রুত প্রবেশ করল ঘরে। বললে, সুরেশ! সুরেশের নাম শুনলাম যেন? স্পিক অফ দ্য ডেভিল, অ্যান্ড দ্য ডেভিল জাম্পস ইন!

স্মৃতিটুকু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চকিতে তাকিয়ে দেখল বাসু-মামুর দিকে। তারপর ভাইয়ের দিকে ফিরে বললে, তুই বম্বে যাসনি?

—বম্বে? মানে?

বাসু-মামু হঠাৎ বলে উঠলেন, ভালই হল তুমি এসে পড়েছ, সুরেশ। তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম আমরা।

—বাট হোয়াই?

স্মৃতিটুকু ফর্মাল ইনট্রোডাকশান করিয়ে দিল। আমাকে বাদ দিয়ে। বললে, ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার পি.কে.বাসু। ইনি স্বীকৃত হয়েছেন, আমাদের স্বার্থে ঐ উইলখানি নাকচ করে দেবার ব্যাপারে উনি আমাদের সাহায্য করবেন। পারিশ্রমিক, পাঁচ থেকে পনেরো শতাংশ—আদৌ সাফল্য লাভ করতে পারলে; ব্যর্থ হলে আমরাও ব্যর্থ হব পেমেন্ট করতে!

সুরেশ দারুণ খুশিয়াল হয়ে ওঠে। বলে, গ্র্যান্ড আইডিয়া। তুই ওঁর খোঁজ পেলি কী করে?

—না, আমি ওঁকে ডেকে পাঠাইনি। উনি নিজে থেকেই এসেছেন।

—মোস্ট ইন্টারেস্টিং! কিন্তু আমি যতদূর জানি ব্যারিস্টার পি.কে.বাসু ক্রিমিনালদের বিপক্ষে থাকেন, তাদের পক্ষে তো ওঁকে—

স্মৃতিটুকু মাঝপথেই বলে ওঠে, আমরা ক্রিমিনাল নই।

—কিন্তু প্রযোজনে হতে স্বীকৃত! তাই নয়? তুই হযতো মুখে স্বীকাব করবি না, আমার কিন্তু সব খোলামেলা। বুঝেছেন, বাসু-সাহেব, দু-একবার ছোটখাটো ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু হাত পাকিয়েছি। বড়পিসির একটা চেক নিয়ে একবার ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। আমি শুধু ওঁর লেখা সংখ্যাটায় একটা বাড়তি শূন্য যোগ করেছিলাম—স্রেফ শূন্য! তার আর কী দাম বলুন? কিন্তু বড়পিসি ঠিক ধবে ফেললো। বুড়ির দৃষ্টি ছিল ঈগলের মতো!

—তা ঠিক! —বললেন বাসু-মামু—এক বান্ডিল একশ টাকার নোট থেকে মাত্র পাঁচখানা খোয়া গেলেও তাঁর নজরে পড়ে!

—তার মানে?

—আমি ওঁর শেষ জন্মদিনের আগেব দিনটাব কথা বলছি। হলঘবেব ড্রযাবে, যাতে ফ্লিসিব বলটা বাখা ছিল!

ধীবে ধীরে সোফায বসে পড়ে সুবেশ, বাই জোভ! আপনি তা কেমন কবে জানলেন?

স্মৃতিটুকু বললে, উনি পিসির লেখা একটা চিঠি পেয়েছেন। পিসি ওঁকে জানিযেছিল।

মামু প্রতিবাদ করলেন না। বললেন, শেষ দিকেব ঘটনাগুলো তাবিখ অনুযাযী সাজিয়ে নিতে হবে। শুনেছি ওঁর জন্মদিনে তোমরা ওঁব কাছে গিয়েছিলে, কিন্তু জন্মদিনেব আগেব বাত্রে ছয তাবিখে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাই না?

সুরেশ বলে, হ্যাঁ। রাত সাড়ে দশটায় বড়পিসি সিঁড়ি থেকে গড়িযে পড়ে যায়। ওঁব একটা কুকুর আছে—ও, আপনি তো জানেনই—সেই ফ্লিসির বলে পা দিযে হড়কে পড়ে যায়।

—খুব আঘাত পান তিনি?

—খুব কিছু নয়! দুর্ভাগ্যবশত মাথাটা নিচেব দিকে বেখে পড়েননি তিনি। তাহলে না হয বলা যেত মস্তিষ্কে আঘাত পেযে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিযে ফেলেন। আর তাতেই দ্বিতীয উইলখানা বানিয়ে ফেলেন।

—তা বটে! মাথা নিচেব দিকে রেখে না-পড়ায় তোমবা মর্মাহত?

স্মৃতিটুকু প্রতিবাদ করে—কী যা তা বলছেন!

সুরেশ কিন্তু সহজ ভাবেই নিল ব্যাপারটা। বললে, তুই বুঝতে পারছিস না টুকু, উনি বলতে চাইছেন—সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় উইল বানানো ওঁর পক্ষে সম্ভবপরই হত না! অস্বীকাব করে কী লাভ? তিন-হপ্তা বেঁচে থাকায় আমরা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি!

—তোমরা তারপর কে-কবে কলকাতায় ফিরে গেলে?

—সবাই একই দিনে, শুক্রবার, দশ তারিখ সকালে।

—তারপর কবে তোমরা মেরীনগরে যাও?

—দু'হপ্তা বাদে মানে—পঁচিশে, শনিবাব।

—আর মিস্ পামেলা জনসন মারা গেলেন পয়লা মে? শুক্রবার?

—হ্যাঁ, তাই।

—তারপর, তৃতীয়বার কবে গেলে?

—ওঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শনিবার সকালে, দোসরা মে।

বাসু-মামু এবার টুকুর দিকে ফিরে বললেন, পঁচিশে শনিবার তুমিও সুরেশের সঙ্গে গেছিলে?

—হ্যাঁ।

—সেটা ওঁর দ্বিতীয় উইল করার চারদিন পরে। তখন কি তিনি বলেননি যে, তিনি দ্বিতীয় একটা উইল করেছেন?

আশ্চর্য! দুজনে প্রায় একই সঙ্গে জবাব দিয়ে বসলো। টুকু বললে—'না'। আর সুরেশ বললে. 'বলেছিলেন'।

বাসু-মামু সুরেশেব দিকে ফিরে দ্বিতীয়বার বললেন, বলেছিলেন?

স্মৃতিটুকুও একই সঙ্গে বললে, সুরেশ!

সুরেশ দুজনেব দিকেই তাকিয়ে দেখল। ছোট বোনকে বললে, তোর মনে নেই? আমার যতদূর মনে হচ্ছে তোকে তা আমি বলেছিলাম।

তারপব বাসু-মামুব দিকে ফিরে বললে, বুড়ি আমাকে দ্বিতীয় উইলখানি দেখিয়েও ছিল। ওর ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে বুড়ি উদ্গার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো বসেছিল। বললে, 'আমার বাবা, এবং বোনেরা শান্তি পাবেন না তাঁদের রক্ত জল করা টাকা কেউ যদি রেস খেলে বা ফূর্তি করে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়, অথবা প্রীতমের মতো ফাটকাবাজি করে। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি মিন্টিকে দিয়ে যাব বলে স্থিব কবেচি। মিন্টিটা বোকা, কিন্তু সৎ। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ।' তখন আমি বললুম, 'এসব কথা আমাকে ডেকে কেন বলছ বড়পিসি?' উনি বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর যাতে তোমরা নিরাশ না হও, অথবা আমাব মৃত্যুর পর লাখ-বেলাখ পাবে আশা করে এখনই যাতে ধাবকর্জ না কর, তাই।'

—উনি তোমাকে উইলের কথা মুখে মুখে বললেন, না দেখালেন?

—না, উইলখানা আমাকে দেখালেন।

টুকু আবার বললে, এ-কথা আমাকে জানাসনি কেন?

—আমাব যতদূর মনে পড়ছে, আমি তোকে বলেছিলাম।

বাসু-মামু টুকুকে ছেড়ে সুবেশকেই প্রশ্ন করেন, উইলটা দেখে তুমি বড়পিসিকে কী বললে?

—আমি প্রাণ খুলে হাসলাম। বললাম, 'বড়পিসি, তোমাব টাকা তুমি যাকে খুশি দেবে, এতে আমাদের বলার কী আছে? হয়তো একটা ধাক্কা লাগলো, তা লাগুক—এই তো জীবন।' শুনে বড়পিসি বললে, 'ঠিক বাপের মতো। থরোব্রেড স্পোর্টসম্যান!' তখন আমি বললাম, 'পিসি, উইলে যখন আমাকে বঞ্চিতই করলে, তখন শ-পাঁচেক টাকা আমাকে ধার দাও।' তা পিসি দিয়েছিল, পাঁচশ' নয়। তিনশ'।

—তার মানে তুমি যে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছ, সেটা গোপন করতে পেরেছিলে?

—ইন ফ্যাক্ট আমি কোন ধাক্কা খাইনি আদৌ. আমি ভেবেছিলাম এটা বড়পিসির একটা ফাঁকা হুমকি। ও শুধু আমাদের ভড়কে দিতে চেয়েছিল।

—ফাঁকা হুমকি দেখাতে কেউ ফি দিয়ে অ্যাটর্নিকে বাড়িতে নিয়ে এসে ওভাবে উইল তৈরী করে?

—করে। লোকটা যদি বড়পিসি হয়। আপনি তাকে চিনতেন না বাসু-সাহেব, আমি তাকে হাড়ে-হাড়ে চিনতাম! আমি আজও বলবো, বড়পিসি যদি হঠাৎ না মরে যেত তাহলে ঐ দ্বিতীয় উইলখানা ছিঁড়ে ফেলতো। এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। হতে পারে না।

বাসু জানতে চান, তোমার সঙ্গে যখন মিস্ জনসনের এসব কথা হচ্ছিল তখন মিনতি কোথায়?

—খোদায় মালুম। কেন?

—এমন কি হতে পারে যে, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনেছে।

—পারে। খুবই সম্ভব। কারণ দরজাটা খোলা ছিল, আমরা কেউই ফিসফিস করে কথা বলিনি।

বাসু এবার স্মৃতিটুকুর দিকে ফিরে বললেন, এসব কথা তুমি কিছুই জানতে না? দ্বিতীয় উইল করার কথা?

সে জবাব দেবার আগেই সুরেশ বলে ওঠে, টুকু, মনে পড়ছে না? আমি তোকে বলেছিলাম কিন্তু।

স্মৃতিটুকু ওর চোখে চোখে তাকাল না। বাসু-সাহেবকে বলল, এমন একটা ব্যাপার ও যদি আমাকে বলে থাকে তা কি আমি ভুলে যেতে পারি?

—না। সম্ভবত না। আর একটা কথা, মিনতি মাইতিকে যদি সাক্ষীর মঞ্চে তোলা যায়, তাহলে তাকে দিয়ে কি বলিয়ে নেওয়া যাবে—

তাঁর বাক্যটা শেষ হল না। সুবেশ সোৎসাহে বলে ওঠে, যাবে। আমি আপনাকে চিনি। আপনি অনায়াসে ওকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে পারবেন যে, তার জ্ঞান মতে কাক আর বক একই রঙের পাখি, তবে তাদের গায়ের রঙ টিয়া পাখির মতো লাল নয়!

বাসু হেসে ফেলেন। বলেন, উইলটা একবার দেখা দরকার। মিস্ হালদার, আমাকে একটা ইনট্রোডাকশান লেটার দিতে হবে।

—তাহলে এ ঘরে আসুন। আমার লেটার-হেডটা ওঘরে আছে।

ওরা তিনজনে পাশের ঘরে উঠে গেলেন। আমি গোঁজ হয়ে বসেই রইলুম। সেটা কেউ গ্রাহ্যই করল না। মিনিট-পাঁচেক পরে বাসু-মামু ওঘর থেকে বার হয়ে এলেন। সোজা সদর দরজার দিকে গট-গট করে এগিয়ে গেলেন। সশব্দে দরজাটা খুললেন এবং সশব্দেই বন্ধ করলেন। তারপর ঐ শয়ন কক্ষের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। আমি স্তম্ভিত।

ঠিক তখনই ঘরের ভিতর থেকে প্রায় আর্তকণ্ঠে স্মৃতিটুকুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ য়্যু ফুল।

এই সময়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে পরিচারিকাটি প্রবেশ করল। বাসু-মামু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে—নিঃশব্দেই বেরিয়ে এলেন করিডোরে।

করিডোরে বেরিয়ে এসে আমি বলি, মামু। শেষ পর্যন্ত আমাদের দরজায় আড়ি পর্যন্ত পাততে হবে?

—'আমাদের' বলছো কেন কৌশিক? আমিই কান পেতেছি। তুমি ঘটনাচক্রে শুনতে পেয়েছ মাত্র!

—দিস্ ইজ নট ক্রিকেট!

—নো, ইট ইজ নট! বাট, বডি-লাইন বোলিং ইজ নট ক্রিকেট আইদার!

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

—বলছি—'হত্যা' বস্তুটা 'খেলা' নয়, যে স্পোর্টসম্যানশিপের আইনকানুন সবসময় মনে রাখতে হবে।

—হত্যা! 'হত্যা' হলো কোথায়?

—তুমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছো? 'হত্যা' নয়?

—হত্যার চেষ্টা হয়তো হয়েছিল, মানছি, কিন্তু উনি মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে। জনডিসে।

—আই রিপিট: তুমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছো?

—সবাই তাই বলছে!

—আবার সেই একই কথা ঃ 'সবাই তাই বলছে।'

আমি রুখে উঠি—এক্ষেত্রে শেষ কথা বলার অধিকার তাঁর চিকিৎসকের। ডক্টর পিটার দত্ত আমাদের তাই বলেছেন—পরিণত বয়সে জনডিস-এ ভুগে তিনি মারা গেছেন।

মামু আমাকে নিয়ে লিফটের খাঁচায় ঢুকলেন। স্বয়ংক্রিয় লিফট। তৃতীয় যাত্রী ছিল না, তাই উনি বললেন, হাজারকরা নশো নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানই শেষ কথা বলে, ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু বাকি একটি ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশে কবর থেকে মৃতদেহকে খুঁড়ে বার করে তোলা হয় exhume করা হয়--দেখা যায় ডাক্তার তার বিশ্বাস অনুযায়ী ভুল সার্টিফিকেট দিয়েছিল।

লিফট নিচে এসে থামলো। আমরা বের হয়ে আসি। পোর্টিকোটাও তখন নির্জন। আমি বলি, মামু, এবার আমি আপনাকে ঐ একই প্রশ্ন করবো ঃ আপনি নিজে কি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন? আপনি 'ঘরপোড়া গরু'র ভূমিকাটা অভিনয় করছেন না তো? সারা জীবন 'খুন' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যেখানেই 'সিঁদুরে মেঘ' দেখেন...

কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো, কৌশিক! 'ঘর-পোড়া-গরু'! কিন্তু গোয়ালে দ্বিতীয়বার আগুন লাগার ক্ষীণ সম্ভাবনাও তো থাকে—হাজারকরা একবার?

আমি দৃঢ়ভাবে বলি, এখানে তা হয়নি! কোনও ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না আমি সে বিষয়ে।

—পাচ্ছো না? তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি—এক: স্মৃতিটুকু কেন বললো, সুরেশ বোম্বাই চলে গেছে আগের দিন? দুই: আমি প্রথমাবস্থায় ওর পারিবারিক বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই শুনেই সে কেন নার্ভাস হয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল? তিন: সে কেন স্বীকার করলো না যে, সুরেশ তাকে জানিয়েছিল দ্বিতীয় উইল করার কথা? এবং শেষ প্রশ্ন: নির্জন কক্ষে সে কেন তার দাদাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বসল: য়ু ফুল!

আমি জানতে চাই: আপনি কী অনুমান করছেন?

বাসু-মামু জবাব দিলেন না। আমরা দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসি। আমি এবার ড্রাইভারের সিটে। উনি পাইপ ধরালেন। বললেন, হ্যারিসন রোডে চল, মিস্ মাইতির হোটেলে।

মিনতি মাইতি লক্ষপতি, স্মৃতিটুকুর মতো অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ নয়, কিন্তু সে আছে শিয়ালদহর কাছাকাছি একটি মামুলি ছা-পোষা হোটেলে। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল হোটেলের এক ছোকরা চাকর। কড়া নাড়তে এক মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা দ্বার খুলে দিতে ছোকরাটি বললে, এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বকনা-বাছুরের মতো দুটি চোখ মেলে মহিলাটি আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মামু নমস্কার করে বললে, আমার নাম পি. কে. বাসু।

—ও!

—আপনার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলার আছে, ভিতরে আসবো?

বেশ বোঝা যায়, মিনতি মাইতির মাথায় ওঁর নামটা কোনও ধাক্কা মারেনি। সে বোধহয় ওঁর নামটা জীবনে শোনেনি। বললে, হ্যাঁ, আসুন, আসুন। বসুন।

আমরা ভিতরে গিয়ে বসি। ঘরে একটিই চেয়ার। বাসু তাতে বসলেন। আমাকে বসতে হল খাটের প্রান্তে। মিস্ মাইতি ড্রেসিং টুলে বসে বললেন, আমার কাছে....?

—গত পরশু, আমরা দুজন মেরীনগরে মরকতকুঞ্জটা দেখে এসেছি। অনন্ত স্টোর্সের ভবানন্দবাবু আপনাকে কিছু জানাননি?

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। উনি কাল ফোন করেছিলেন। তা বাড়িটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে?

—ভবানন্দবাবু কি টেলিফোনে আমার নামটা জানিয়েছিলেন?

—নাম? হ্যাঁ, আমি লিখেও রেখেছি। দাঁড়ান দেখি।

উনি এগিয়ে এসে একটি খাতা দেখে বললেন, হ্যাঁ, আপনার নাম কে. পি. ঘোষ। রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার।

—আমি কি সেই নামটাই আপনাকে এখনি বললাম?

ভদ্রমহিলা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, মাপ করবেন, তখন আমি খুবই অন্যমনস্ক ছিলাম। ঠিক খেয়াল করে শুনিনি, কিন্তু আপনি তো কে. পি. ঘোষ, তাই নয়?

—না। আমি বলেছি, আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি নেভাল অফিসার ছিলাম না। আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি, ব্যারিস্টার! এ আমার চ্যালা কৌশিক মিত্র।

এবার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল মিনতির। বললে, আপনিই কি সেই 'কাঁটা-সিরিজে'র পি.কে.বাসু?

—সে কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছি এতক্ষণ।

এরপর মিনিট-তিনেক মিনতি দেবী কী বললেন, কী করলেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। প্রথমেই গড় হয়ে প্রণাম করলেন মামুকে। তারপর আমাকে প্রণাম

করার উদ্যোগ করতে আমি বাধা দিই; উনি সে-কথা শুনলেন না। আমারও এক খাবলা পদধূলি নিয়ে বললেন, সে-কথা শুনছি না কৌশিকদা, সুজাতা বৌদিকেও নিয়ে এলেন না কেন?

বেশ বোঝা গেল, কাঁটা-সিরিজের গল্পগুলি ওঁর প্রিয়, বাসু-সাহেবের 'ফ্যান'। শেষমেশ যখন হোটেলের বয়টাকে ডেকে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে যাবেন তখন বাধা দিলেন বাসু-মামু, শোনো মিনতি, ও-দুটোই কেউ একসঙ্গে পান করে না। হয় চা, নয় ডাব।

হোটেল-বয়টাও হেসে ফেলেছিল। তাঁকেই বললেন মামু, তিনটে ডাবই নিয়ে এসো হে!

ছোকরাটা চলে যেতে মিনতি বললে, আপনি যদি মরকতকুঞ্জটা কেনেন, তাহলে...

—না মিনতি। মরকতকুঞ্জটা কিনবার ইচ্ছে নিয়ে আমি মেরীনগরে যাইনি। আমি পরশু দিন মিস্ জনসনের একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে একটি বিষয়ে তদন্ত করতে বলেছিলেন...

আশ্চর্য! মিনতি মাইতি অবাক হলো না—পরশু চিঠি পাওয়ার কথায়। বরং বললে, সেই পাঁচশো টাকা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে?

—না! সেটা যে সুরেশ নিয়েছিল তা তিনিও জানতেন, তোমরাও বুঝতে পেরেছিলে, নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বলা তো যায় না—নিজের বাড়ির লোক...

—তা তো বটেই। মিস্ জনসন আমাকে লিখেছিলেন, অন্য একটি বিষয়ে তদন্ত করতে। ওঁর সেই অ্যাকসিডেন্টটার বিষয়ে...

—তার মধ্যে তদন্তের কী আছে? সে তো ফ্লিসির সেই হতভাগা 'বল'টায় পা দিয়ে...

—কিন্তু 'ফ্লিসি' তো সে রাত্রে বাড়িতে ছিল না? ছিল?

—না, ছিল না। সারা রাত বাইরে বাইরে কাটিয়ে ভোর রাতে ফিরে এসেছিল। আমিই তাকে দোর খুলে চুপি-চুপি ভিতরে ঢুকিয়ে আনি।

—কেন, 'চুপি-চুপি' কেন?

—মায়ের যাতে ঘুম না ভেঙে যায়। তাছাড়া, ফ্লিসি রাত্রে বাইরে বাইরে কাটালে মা ভীষণ বিরক্ত হতেন। ওঁর ঐ শারীরিক অবস্থায় সেটা ওঁকে জানতে দিইনি।

—আই সি! আচ্ছা, তোমার মনে আছে মিনতি? মৃত্যুর আগে উনি কী একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন? চীনের মাটি...

মিনতি জানতে চাইলো না এ সংবাদ বাসু-মামু কোথা থেকে পেলেন। যেন ধরে নিল, মৃত্যু মুহূর্তে উচ্চারিত কথাটাও মিস্ জনসন আগেভাগেই ওঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। বললে, হ্যাঁ, মনে আছে, উনি বলেছিলেন, 'চীনের মাটিতে খুব দামী ফুল ফোটে'—কিন্তু সে তো বিকারের ঘোরে।

—তোমার কোনও ধারণা আছে, কেন উনি তাঁর উইলটা বদলে ফেলেন?

এই প্রথম মনে হল মিনতি সতর্ক হল। 'উইল' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র। আমতা-আমতা করতে থাকে—উইল? মানে ওঁর উইল?

—এ-কথা তো ঠিক যে, বছর পাঁচেক আগেই তিনি একটি উইল তৈরি করেছিলেন? মৃত্যুর মাত্র দশদিন আগে সেটা উনি কেন বদলে ফেললেন? তোমার কী মনে হয়?

মিনতি একটু ভেবে নিয়ে বললে, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। সত্যিই জানি না। উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন আমি একেবারে অষ্টস্তব্ধ হয়ে যাই! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, উনি সব কিছু আমাকেই দিয়ে গেছেন! আমার এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বপ্ন দেখছি না তো? এ কি হয়? ওঁর তিন-তিনজন নিকট আত্মীয় রয়েছে, তবু উনি কেন সব কিছু আমাকেই দিয়ে গেলেন! প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যেন পরের ধন চুরি করেছি। যা আমার হক্কের ধন নয়, যাতে আমার অধিকার নেই...

—তুমি কি তোমার অগাধ সম্পত্তির কিছু অংশ ওদের তিনজনকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছ এখন?

খণ্ডমুহূর্তের জন্য মনে হল মিনতির ভাবান্তর হল। মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। যেন, সরল, নির্বোধ মেয়েটির ভেতর থেকে একটি বুদ্ধিমান মেয়ে উঁকি মেরে অন্তরালে সরে গেল। ও বললে, অবশ্য এর আর একটা দিকও আছে...প্রথমত,আমি যদি ওঁর দান গ্রহণ না করি, তবে তাঁর শেষ ইচ্ছাটায় বাধা দেওয়া হবে। ম্যাডাম অনেক বিবেচনা করেই এ-কাজটা করেছেন; হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, ওঁর বাবা এবং বোনেরা শান্তি পাবেন না তাঁদেব রক্তজল-করা টাকা কেউ যদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, অথবা প্রীতমের মতো ফাটকাবাজি করে...

—তিনি যে এই কথা ভেবেছিলেন, ঠিক এই ভাষাতেই, তা তুমি কেমন করে জানলে?

এবারে ও যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে জিব কাটলো। আবার শুরু হলো তার আমতা-আমতা: না, মানে আমি কেমন করে জানবো? এ আমার আন্দাজ আর কি! তাছাড়া কেন তিনি তাঁর উইলটা শেষমেশ এভাবে বদলে ফেলবেন?

—তা হতে পারে। সুবেশ রেস খেলে, স্মৃতিটুকু বেহিসাবি খরচে, কিন্তু হেনা..।

ইচ্ছা করেই উনি বোধহয় বাক্যটা অসমাপ্ত রাখলেন। মিনতি সেই অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করলো, না, হেনা মাটির মানুষ। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? সে প্রীতম ঠাকুরের হাতের পুতুল। হেনাও অনেক টাকা পেয়েছিল—সব ঐ প্রীতম উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রীতমকে হেনা ভীষণ ভয় পায়। সে যা বলে ও তাই করে। প্রীতম হুকুম করলে ও বোধহয় মানুষ খুন করতে পারে! অথচ এমনিতে ও খুবই ঠাণ্ডা। ছেলেমেয়ে দুটোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। হেনাকে এভাবে বঞ্চিত করা আমার ভাল লাগেনি। টুকুকে কিছু দেননি, ভালই করেছেন—সুরেশকেও। বিশেষ সুরেশ যেভাবে ওঁকে ভয় দেখাতো...

—ভয় দেখাতো? মানে?

—একবার সে তার বড়পিসিকে বলেছিল ঃ 'মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে বড় বিপজ্জনক, তোমার ভালমন্দ কিছু না হয়ে যায়—'

—তাই নাকি? কবে বললো এ কথা?

—ঐ উনি সিঁড়ি থেকে উল্টে পড়ার আগে।

—তোমার সামনেই?

—না, ঠিক আমার সামনে নয়। তবে ওঁরা কিছু ফিসফিস করে কথা বলছিলেন না। আর আমার ঘরটা তো মায়ের ঘরের কাছাকাছিই।

এরপর বাসু-সাহেব উষা বিশ্বাসের কাছে সংগৃহীত সেই প্ল্যানচেটের প্রসঙ্গ তুললেন। সেটাও করবোরেটেড হলো—এবার অবিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, বিশ্বাসীর চোখে। মিনতির বিশ্বাস—স্বয়ং যোসেফ হালদার এসে ভর করেছিলেন মিস্ জনসনের দেহে। মেয়েকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন।

বাসু জানতে চাইলেন, টুকু আর সুরেশ পঁচিশে এপ্রিল শনিবার মেরীনগরে এসেছিল, নয়?

—পঁচিশে কিনা মনে নেই, তবে শনিবারই। তার আগের শনিবারে হেনা আর প্রীতম এসেছিল ।

—সেটা তাহলে আঠারো তারিখ। আর উনি উইলটা করেন মঙ্গলবার, একুশে?

—হ্যাঁ, একুশে। উনি উইল করার আগের হপ্তায় হেনারা এসেছিল, পরের হপ্তায় টুকু আর সুরেশ। সেদিন প্রীতমও এসেছিলেন, একা—

—তাই নাকি? প্রীতম পঁচিশে মেরীনগরে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাত্রে থাকেননি। মায়ের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলে ফিরে গিয়েছিলেন।

—তখন সুরেশ আর টুকু মরকতকুঞ্জে?

—হ্যাঁ, কিন্তু তারা বোধহয় জানে না যে, হেনার বর এসে দেখা করে তখনই চলে গেছেন।

—আশ্চর্য! দেখা হলো না কেন?

—সবাই যে যার তালে এসেছিল। বুড়িমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে। ওরা একে-অপরকে এড়িয়ে চলতো। বুড়িমা সবই বুঝতেন, চুপচাপ থাকতেন।

—প্রবীরবাবু কেমন লোক?

—প্রবীববাবু! তিনি কে?

—প্রবীর চক্রবর্তী, সেই যিনি উইলটা তৈরি কবে সই করিয়ে নিযে যান?

—ও, উকিলবাবু? লোক ভালই, তবে কী-জানি কেন, আমাকে ভাল চোখে দেখেন না।

বাসু-মামু একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে একটা কথা জানানো দরকাব মিনতি। আমি খবব পেয়েছি, টুকু আর সুরেশ ঐ উইলটা নাকচ করবার চেষ্টা করছে।

রীতিমত ভাবান্তর হলো এবার। গম্ভীর হয়ে বললে, জানি। হেনা বলেছে আমাকে। কিন্তু ওরা কিছুই কবতে পারবে না। আমি ভাল উকিলের পবামর্শ নিযেছি। আপনি একবার দেখবেন উইলটা?

—তোমার কাছেই আছে সেটা?

—না, হোটেলে নেই। উকিলবাবু বারণ কবেছিলেন ওটা নিজেব কাছে বাখতে। আমার ব্যাঙ্ক-ভল্টে আছে। উনিই ব্যবস্থা করে ঐ ভল্টটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন।

—না, থাক। আমি আব দেখে কী বলব? তুমি তোমার উকিলের পরামর্শ মতো চলো।

মিনতি মাইতির হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন কবি, কী বুঝলেন?

—এক নম্বর: মিনতি আড়ি পাতায় ওস্তাদ! দু নম্বর: সে হয অতি নির্বোধ, না হলে অত্যন্ত চালাক এবং সুঅভিনেত্রী। দুটোর কোনটা ঠিক, তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের নেক্সট টার্গেট হেনা ঠাকুবের বাড়ি—ঠিকানা তো জানোই। চলো—

হ্যাঁ, হেনার ঠিকানা সরবরাহ করতে পেরেছে মিনতি। প্রীতমের এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছে ওবা। এখনও সেখানেই আছে। ভবানীপুরে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট যেখানে হরিশ মুখার্জি রোডে এসে পড়েছে সেখানে, শিখদের গুরুদ্বারাব কাছাকাছি একটি ত্রিতল বাড়ি। গৃহস্বামী শিখ, প্রীতমের আত্মীয়। তাঁব এক-দু'খানি ঘর দখল করে হেনা সাময়িক সংসার পেতেছে। মেজানাইন ফ্লোর। একতলায় গৃহস্বামীব মোটর-পার্টস্-এর দোকান। একটি ভৃত্য আমাদের পৌছে দিল মেজানাইন ফ্লোরে। কড়া নাড়তে যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। লোকটি আমাদের দেখিয়ে হিন্দিতে বললে, মাইজি, এঁরা দুজন আপনাকে খুঁজছেন।

—আমাকে? না ঠাকুর-সাহেবকে? —প্রশ্নটা সে করেছিল ঐ ভৃত্যস্থানীয় লোকটিকেই।

বাসু-সাহেব তাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বললেন, তুমিই হেনা ঠাকুর?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আমি...

—না, আমাকে তুমি চেনো না। আমরা আসছি স্মৃতিটুকু হালদারের কাছে থেকে।

—ওঃ! টুকু! হ্যাঁ, বলুন?

—তোমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলার আছে। কোথায় বসে কথাটা বলবো?

—আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

মেজানাইন ঘরটা আকারে মাঝারি। একটা ডবল-বেড খাট পাতা। খান-দুই চেয়ারও ছিল। ওপাশে একটি বছর-চারেকের মেয়ে বসে কী লিখছিল। সে চোখ তুলে আমাদের দেখতে থাকে। হেনা আমাদের বসতে দিল, নিজেও বসলো খাটের এক প্রান্তে: বলুন?

বাসু-মামু বললেন, আমি তোমার সঙ্গে মিস পামেলা জনসনের মৃত্যুর বিষয়ে দু-একটা কথা আলোচনা করতে চাই।

হতে পারে আমার দৃষ্টিভ্রম—হঠাৎ মনে হল, মেয়েটি যেন সাদা হয়ে গেল। কোনক্রমে বললে, হ্যাঁ, বলুন?

—মিস্ জনসন মৃত্যুর আগে হঠাৎ তাঁর উইলটা পরিবর্তন করেছিলেন। তোমাদের বঞ্চিত করে সব কিছু তাঁর সহচরীকে দিয়ে যান। এক্ষেত্রে সুরেশ আর স্মৃতিটুকু একটা মামলা আনতে চায়—উইলটা

পাল্টে ফেলতে। ন্যায্য উত্তরাধিকারীরাই যাতে ওঁর সম্পত্তিটা পায়। তুমি কি ওদের সঙ্গে হাত মেলাবে?

হেনা রুদ্ধশ্বাসে কী-যেন ভাবছিল। বললে, কিন্তু তা কি সম্ভব? আমার স্বামী উকিলের পরামর্শ নিয়েছেন—তাঁরা বলেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করে কিছু লাভ নেই, অহেতুক অর্থব্যয়!

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে; কিন্তু এ সব ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়ে থাকে। আমি উকিল নই, তাই অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখতে পাচ্ছি। মিস্ হালদার লড়তে প্রস্তুত, এ বিষয়ে তোমার কী মত?

হেনা আমতা-আমতা করল, আমি... মানে... এক্ষেত্রে কী করণীয় তা আমি জানি না। উনি জানেন।

—নিশ্চয়ই। ডক্টর ঠাকুরকে না জানিয়ে তুমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারো না; কিন্তু তোমার মনোগত ইচ্ছাটা কী? তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাটা?

হেনা যেন আরও বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে, আমি... ঠিক জানি না। মানে, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা নোংরামি আছে, একটা অর্থলোলুপতা—

—তাই কি?

—নয়? বড়মাসি তাব টাকা যাকে খুশি দিয়ে যেতে পারে, তাতে আমরা আপত্তি করতে পারি না।

—তার মানে মিস্ জনসন তোমাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তুমি ক্ষুব্ধ নও?

—না, তা নয়। ক্ষুব্ধ তো বটেই! বড়মাসি অন্যায়ই করেছে—সে তো শুধু তার নিজের টাকাই দানছত্র করেনি, তার মধ্যে মেজ আর ছোটমাসির টাকাও আছে। তাঁরা নিশ্চয় রাকেশ আর মীনাকে এভাবে পথে বসাতেন না। বড়মাসির এই শেষ পরিবর্তনটা বিস্ময়কর।

—তার মানে কি শেষ সময়ে তিনি সজ্ঞানে সব কিছু করেননি? কারও প্রভাবে পড়ে—

—কিন্তু মুশকিলের কথা এই যে বড়মাসিকে কেউ প্রভাবান্বিত করেছে এটা ভাবাই যায় না।

—সে-কথা সত্যি। শুনেছি তাঁর খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিল। আর মিস্ মিনতি মাইতির পক্ষে ও জাতীয় চক্রান্ত করা...

—না! মিন্টিদি মোটেই সেরকম নয়। তাঁর মনটা সাদা। হয়তো একটু বোকাসোকা; কিন্তু... মানে সেটাও একটা কারণ, যে-জন্য আমি উইল-বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিপক্ষে।

বাসু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তোমার কী মনে হয়? উনি হঠাৎ সবাইকে বঞ্চিত করে গেলেন কেন?

ওর গাল দু'টি একটু রক্তাভ হয়ে উঠল। অস্ফুটে বললে, আমার কোন ধারণাই নেই।

বাসু বললেন, মিসেস ঠাকুর, আমি আগেই বলেছি যে, আমি উকিল নই। কিন্তু তুমি তো জানতে চাইলে না আমার পেশাটা কী?

হেনা জবাব দিল না। ওঁর দিকে ফিরে তাকালো। তার চোখে জিজ্ঞাসা।

—আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি একজন ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার। সাধারণের ধারণা আমি গোয়েন্দাও। কিছুদিন আগে আমি মিস্ জনসনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম—ওঁর মৃত্যুর ঠিক আগেই লেখা। উনি আমাকে একজনের বিষয়ে তদন্ত করতে...

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেনা বললে, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে...?

—সে-কথা বলার অধিকার আমার নেই।

—তাহলে নিশ্চয় প্রীতমের বিষয়ে! কী লিখেছিলেন তিনি? বিশ্বাস করুন, মিস্টার বাসু—এ সবই মিথ্যা! উনি এসব নোংরামির মধ্যে নেই—

—'নোংরামি' মানে?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হেনা বলে চলে, আর আমি জানি, কে বড়মাসির কান ভাঙিয়েছিল। সেজন্যও আমি ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে গররাজি।

—মাম্মি, আমার হাতের লেখা হযে গেছে।

বাচ্চা মেয়েটা উঠে এসে তার খাতাখানা মেলে ধরলো মায়ের সামনে। হেনা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বাঃ! বেশ হয়েছে!

—এখন আমি কী করবো মাম্মি? —সব কথাই সে বলছে হিন্দিতে।

হেনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা এক টাকার নোট বাব করে তার হাতে দিল। হিন্দিতেই বলল, নিচে দরোয়ানজিকে বল, সে ঐ স্টেশনারি দোকোনে নিয়ে যাবে—একা-একা যেও না যেন। ওখান থেকে তোমার পছন্দমতো একখানা পিকচার পোস্ট-কার্ড কিনে নিয়ে এস। যমুনাকে তাহলে তুমি এখান থেকে একটা চিঠি লিখতে পারবে, ও·কে·?

টাকাটা নিয়ে মেয়েটা নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

মামু প্রশ্ন করলেন, তোমার ঐ একটিই মেয়ে?

—না। মীনার একটি ছোট ভাইও আছে—রাকেশ। সে তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—তোমরা যখন মরকতকুঞ্জে গেছিলে তখন ওদেব সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলে?

—না! এবার ওরা এখানে ছিল, প্রীতমের বোনের কাছে। বড়মাসি বাচ্চাদের হৈ-হাঙ্গামা সইতে পারতো না। তবে নাতি-নাতনিদের ভালবাসতো খুবই। মাসির বলতে গেলে ঐ দুটিই তো নাতি-নাতনি—আর কেউ তো নেই।

—তুমি শেষ কবে তাঁকে দেখেছ? আঠারই এপ্রিল?

—তারিখ মনে নেই, তবে সুরেশ আর টুকু যে শনিবারে যায়, তার আগের শনিবারে।

—তার আগেই কি উনি দ্বিতীয় উইলখানা করেছেন?

—না। তার পরের মঙ্গলবারে।

—উনি কি বলেছিলেন যে, নতুন একখানা উইল উনি তৈরি করতে যাচ্ছেন?

—না। কিছুই বলেননি।

—ওঁর ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখেছিলে কি?

হেনা একটু ভেবে নিয়ে বললে, না, আদৌ না। পরিবর্তন হবে কেন?

বাসু একটু উসকে দিলেন, টুকু আর সুরেশের কান-ভাঙানির কথা বলছিলে না তুমি?

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে পড়ে হেনা। বলে, ও হ্যাঁ, বুঝেছি। ওদেব কান-ভাঙানিতে বড়মাসি বেশ কিছুটা বদলে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ওঁর মন বিষিয়ে গেছিল। জানেন, প্রীতম একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করলো—ওঁর হজমের ওষুধ—নিজে গিয়ে ডিস্‌পেনসারি থেকে সার্ভ করিয়ে আনলো, আর বড়মাসি—আপনি বিশ্বাস করবেন না, সেটা মুখেই দিল না! ধন্যবাদ দিয়ে সরিয়ে রাখলো। প্রীতম ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওয়াশ-বেসিনে শিশির ওষুধটা ঢেলে ফেলে দিল। এ শুধু টুকুর শয়তানিতে।

বাসু-মামু একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কিন্তু তা কেমন করে হবে? তোমরা চারজন মেরীনগর থেকে একই সঙ্গে ফিরে এসেছো, তার পরের হপ্তাতে আঠারোই শনিবার তোমরা দুজন গেছিলে। টুকু-সুরেশ তো সেখানে যায় তার পরের হপ্তায় পঁচিশে, তাই নয়?

হেনাকে জবাব দেবার ঝামেলা সইতে হল না। দ্বারপ্রান্তে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে একজন দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী পুরুষেব আবির্ভাব ঘটলো।

নিঃসন্দেহে প্রীতম ঠাকুর আর রাকেশ।
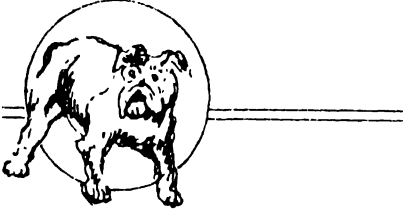
আমি মনে মনে প্রীতম ঠাকুরের চেহারা যেরকম ভেবে রেখেছিলাম ওঁকে দেখতে সেরকম নয়। ওঁর উপাধি দেখছি ঠাকুর—ওঁর আদি নিবাস উত্তর ভারত না রাজস্থান জানি না, কাশ্মীরও হতে পারে—কারণ গায়ের রঙ খুব ফর্সা, একমুখ কুচকুচে কালো দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। মনে হল. ধর্মে উনি খালসা শিখ। অথচ পরিষ্কার বাংলা বলছিলেন। প্রীতমের আবির্ভাবমাত্র হেনার একটা পরিবর্তন হল। যেন একটা পর্দার আড়ালে সরে গেল। সেখান থেকে সে অনাসক্তকণ্ঠে বাসু-মামুর পরিচয় দিল। আমাকে সে পাত্তাই দিল না।

—আহ্। মিস্টার পি. কে. বাসু—বার-অ্যাট-ল! আপনি তো স্বনামখ্যাত। কিন্তু আপনার ভেল্কি তো শুনেছি আদালতের চৌহদ্দিতে, এ গরিবখানায় পদার্পণ করে হঠাৎ আমাদের ধন্য করছেন যে?

বাসু বললেন, আসতে হলো। এক বৃদ্ধা মক্কেলের প্রয়াণে। মিস্ পামেলা জনসন।

—হেনার বড়মাসি? তিনি আপনার মক্কেল ছিলেন? কী ব্যাপার?

বাসু-মামু ধীরে ধীরে বললেন, তাঁর মৃত্যু-বিষয়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করতে...

হেনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তাঁর শেষ উইলটার বিষয়ে, প্রীতম। মিস্টার বাসু আসছেন টুকু আর সুরেশের কাছ থেকে। ওরা আদালতে যেতে চায়।

আবার আমার দৃষ্টিবিভ্রম হল কি না জানি না, কিন্তু প্রসঙ্গটা পামেলার 'মৃত্যু' থেকে সরে গিয়ে তাঁর 'উইলে' পরিবর্তিত হওয়ায়—আমার মনে হল—প্রীতম আশ্বস্ত হল। বললে, আহ্! সেই নিষ্ঠুর উইলখানা! কিন্তু সে-বিষয়ে আমার নাক গলানো বোধ হয় ঠিক হবে না।

বাসু-মামু স্মৃতিটুকু আর সুরেশের সঙ্গে তাঁর আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত সারাংশ দাখিল করলেন। সত্য-মিথ্যায় মেশানো। তির্যক ইঙ্গিত রইলো—উইলটা নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

—অস্বীকার করে লাভ নেই, আমি ইন্টারেস্টেড। তবে তার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। ইতিপূর্বে আমি একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছি।

মামু বললেন, উকিলরা সাবধানী, মামলায় হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে ওঁরা কেস নিতে চান না—এখনি আপনার স্ত্রীকে সে কথা বলছিলাম। তবে আমার পদ্ধতি একটু অন্য জাতের। আমার তো মনে হয়েছে—উইলটা বাতিল করার বেশ কিছুটা সম্ভাবনা আছে। আপনি কী বলেন?

—আমি আগেই বলেছি, এ বিষয়ে নাক-গলানো আমার তরফে অশোভন। ব্যাপারটা হেনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তবে, এ-কথাও বলবো, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু, সেটা মনে হয় অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ?

—এ যুক্তি মিস্ হালদারও দিয়েছিল—সে বলেছে, সাফল্যলাভ করলেই আমাকে 'ফিজ' দেবে। উইল নাকচ করতে না পারলে আমার এক্সপেন্সও মেটাবে না।

—আপনি তা সত্ত্বেও কেসটা নিয়েছেন! তার মানে, আপনি একটা কিছু পথের সম্ভাবনা নিশ্চয় দেখতে পেয়েছেন। শর্তটা সে-জাতের হলে আমাদের আপত্তি নেই, কী বল হেনা? —মিষ্টি হেসে হেনার দিকে চাইলো প্রীতম। হেনাও মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করলো—কিন্তু তা যেন যান্ত্রিক হাসি।

প্রীতম জমিয়ে বসলো। বললো, আমি আইন জানি না, তবে আমার মনে হয়েছে—মিস্ জনসন

উইলটা পালটে ফেলেন স্বেচ্ছায় নয়, ওঁর ঐ সহচরীটির প্ররোচনায়—মিনতি মাইতি বোকা সেজে থাকে, আসলে সে অত্যন্ত ধূর্ত আর শয়তানী বুদ্ধি তার পেটে পেটে।

মামু চট করে ঘুরে হেনাকে প্রশ্ন করেন, তুমি এ বিষয়ে একমত?

হেনা একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। বলে, মিন্টিদি আমাকে খুব ভালবাসে। তাঁকে বুদ্ধিমতী বলে আমার মনে হয়নি। আর শয়তানী...

কথাটা তার শেষ হয় না। প্রীতম মাঝখানেই বলে ওঠে, হ্যাঁ। মিস্ মাইতি তোমাকেই ভালবাসে। আমার প্রতি তার ব্যবহারটা অন্য রকম। শুনুন বাসু-সাহেব, একটা উদাহরণ দিই। বৃদ্ধা একবার সিঁড়ি থেকে উল্টে পড়েন, আমি ওঁর কাছে থেকে যেতে চেয়েছিলাম—মানে ডাক্তার হিসাবে সেবা-শুশ্রূষা করতে। তিনি রাজী হননি—সেটা স্বাভাবিক—ভদ্রমহিলা একা-একা থাকতেই অভ্যস্তা, কিন্তু ঐ মহিলাটি, আই মীন মিস্ মাইতিও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল আমাদের তাড়াতে। কারণ, এ নয় যে তার খাটনি বাড়বে। কারণটা এই যে, অসুস্থ বৃদ্ধাকে সে আগলে রাখতে চাইছিল—কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না।

একই ভঙ্গিতে বাসু-মামু হেনাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি একমত?

এবারও স্ত্রীকে জবাব দেবার সুযোগ দিল না প্রীতম। বলে ওঠে, হেনার মনটা নরম। ও কারও দোষত্রুটি দেখতে পায় না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। আরও একটা উদাহরণ দিই। বুড়ি ভূত-প্রেত আত্মা-ফাত্মা বিশ্বাস করতো না, আর মিস্ মাইতি একজন লোকাল গুনিন্‌কে আমদানি করে ওঁর উপর প্রভাব বিস্তার করছিল—

—'লোকাল গুনিন' মানে? —বাসু-মামু যথারীতি ন্যাকা সাজলেন।

প্রীতম ঐ ঠাকুরমশাই আর সতী-মায়ের গল্প শোনালো। তার বিশ্বাস—শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধাকে এভাবে প্রভাবান্বিত করা খুবই সহজ। সম্ভবত একটি ভেল্‌কির মাধ্যমে বুড়ির মতটা বদলে দেওয়া হয়—হয়তো প্ল্যানচেটে স্বর্গত যোসেফ হালদার এসে তাকে আদেশ করেছিলেন—সমস্ত সম্পত্তি ঐ শয়তানির নামে লিখে দিতে।

একই ভঙ্গিতে মামু হেনাকে প্রশ্ন করেন, তোমারও তাই বিশ্বাস?

এবার প্রীতম আর বাধা দিল না। বরং একটু ধমকের সুরেই স্ত্রীকে বললো, মিনমিন কোরো না, হেনা। তোমার কী মতামত তা স্পষ্ট করে জানাও!

স্বামীর মর্মভেদী দৃষ্টির প্রতি নজর হেনার। সে যেন কুঁকড়ে গেল। মিনমিন করেই বললে, আমি এসবের কী বুঝি? আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলছো, প্রীতম!

প্রীতম খুশি হলো। বললো, আমি চিরকালই ঠিক বলি, হনি।

বিলাতী কায়দায় সর্বসমক্ষে স্ত্রীকে 'হনি' ডাকা শিষ্টাচারসম্মত—প্রীতম কিন্তু—আমার মনে হল—সে কায়দায় অভ্যস্ত নয়। তবে, হেনা যে অবাধ্যতা করছে না, এটা প্রণিধান করে সে হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠেছে।

বাসু প্রসঙ্গান্তরে চলে এলেন। প্রীতমকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিস্ জনসনের মৃত্যুর আগের শনিবারে আপনারা মেরীনগরে গিয়েছিলেন, নয়?

প্রীতম মনে করার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে হেনা স্বাভাবিক হয়েছে অনেকটা। বললে, না। আমরা গেছিলাম তার আগের সপ্তাহে, তখনো উনি দ্বিতীয় উইলটা করেননি।

বাসু-মামু একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন প্রীতমের দিকে। তাকেই বলেন, না। আমি পঁচিশে এপ্রিলের কথা বলছি। সেদিন আপনি কাঁচড়াপাড়া থেকে গোপাল মোদকের রিক্‌সা নিয়ে একাই মরকতকুঞ্জে গিয়েছিলেন। তাই নয়?

হেনা এবার তার স্বামীর দিকে ফিরলো, বললে, তুমি বড়মাসির কাছে গেছিলে? পঁচিশে? যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। স্ত্রীকেই বললে, হ্যাঁ, ফিরে এসে তোমাকে তো বলেছিলাম?

ঘণ্টাখানেক আমি মরকতকুঞ্জে ছিলাম। ফিরে এসে বললাম, মিস্ জনসন ভালই আছেন। মনে নেই?

এবার শুধু বাসু-মামু নয় আমিও একদৃষ্টে হেনার দিকে তাকিয়ে আছি। সে আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছলো। প্রীতম তাগাদা দেয়, মনে পড়ছে না? অদ্ভুত তোমার স্মৃতিশক্তি, বাপু!

যেন এতক্ষণে হেনার মনে পড়লো। বললো, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার কিছুই মনে থাকে না। তাছাড়া দু'মাস হয়ে গেল তো?

বাসু-মামু এবার প্রীতমকে বলেন, তখন ওরা দু'জন ছিল মরকতকুঞ্জে? টুকু আর সুরেশ?

—তা হবে। আমি ওদেব দেখতে পাইনি। মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলাম...

বাসু নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়েই আছেন। প্রীতম একটু নড়েচড়ে বসলো। বললে, অস্বীকার করে লাভ নেই, আমি ওঁর কাছে কিছু টাকা ধার করতে গেছিলাম। ভবি ভুললো না!

বাসু একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করবো ডক্টর ঠাকুর?

প্রীতমের মুখে কি একটা আতঙ্কের ছায়া পড়লো? একটু সামলে নিয়ে বললে, স্বচ্ছন্দে!

—মিস্ স্মৃতিটুকু আর মিস্টার সুরেশ হালদারের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

ডক্টর ঠাকুরের একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো যেন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তোমাব ভাই-বোনদের সম্বন্ধে আমার 'ফ্র্যাঙ্ক ওপিনিয়ন' দিলে তুমি কিছু মনে করবে না তো?

হেনা জবাব দিল না। নিঃশব্দে নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করলো শুধু।

—তাহলে খোলাখুলিই বলি, ওরা দুজনেই একেবারে বখে গেছে। তবু সুরেশকে আমার ভাল লাগে। সে প্রাণবন্ত, স্পোর্টসম্যান, খোলামেলা। স্মৃতিটুকু অন্য জাতের মানুষ। গ্ল্যামারাস, বেহিসাবি, ওভারস্মার্ট—তার নানান পুরুষ বন্ধু! সে বোধহয় প্রয়োজনে কারও পাত্রে অনায়াসে বিষও মিশিয়ে দিতে পারে। সবটা তার নিজের দোষ নয়—হেরিডিটি—ওর রক্তে হয়তো আছে এর প্রভাব। আপনি জানেন কি না জানি না, ওর মায়ের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল—প্রথম স্বামীকে নাকি তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন—

—জানি। শুনেছি, তিনি বেকসুর খালাসও পেয়েছিলেন। আর ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত?

—ডক্টব দত্তগুপ্ত? হ্যাঁ, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ব্রেন। লিভার এক্সট্র্যাক্ট নিয়ে সে একটা থেরাপিউটিক্যাল আবিষ্কার নাকি করে ফেলেছে। সে একদিন মরকতকুঞ্জে ডিনারে এসেছিলো। সেদিনই বললে—

—ব্যাপারটা কী? আই মীন, আবিষ্কারটা কী জাতীয়?

—সিরাম ইনজেকশানের একটা পেটেন্ট নেবে সে। তাব এক্সপেরিমেন্ট নাকি সাকসেসফুল। অন্তত তার মতে। আশ্চর্য! সে যে কেমন করে স্মৃতিটুকুর প্রেমে পড়লো এটা আজও আমার মগজে ঢোকে না। দুজনের চরিত্র একেবারে বিপরীত।

ওপাশ থেকে মীনা বলে উঠলো, মা লাঞ্চে যাবে না? রাকেশের ভূখ্ লেগেছে।

মামু উঠে পড়েন, সো সরি! আপনাদের লাঞ্চে দেরি করিয়ে দিলাম।

হেনা তার স্বামীর দিকে একটা চোরা চাহনি হেনে বাসু-মামুকে বললে, আপনারাও আসুন না। আমরা ঐ সামনের রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করি। রান্নাবান্নার হাঙ্গামায় যাইনি। প্রীতমের বোন আর ভগ্নীপতি ক'দিনের জন্য বেড়াতে গেছে...

বাসু-মামু বললেন, গোপালপুর-অন-সীতে নয় নিশ্চয়?

প্রীতম অবাক হয়ে বললে, আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন? রিয়ালি, আপনি একজন জিনিয়াস! অফ অল দ্য টুরিস্ট স্পটস...

বাসু-মামু তাঁর ভাগ্নের দিকে চোরা চাহনি হানলেন একবার। প্রীতমের টেলিফোন নাম্বারটা লিখে নিলেন। বললেন, প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন। তারপর বিদায় নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে আসি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করি, কাঁচড়াপাড়ার রিকশাওয়ালা গোপাল মোদক—

—ও নামটা আবিষ্কার করলাম। নাহলে হয়তো প্রীতম কবুল করতো না!

নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিচ্ছি. হঠাৎ নজব হলো, মিসেস ঠাকুব বেশ একটু দ্রুতপায়েই এগিয়ে আসছেন আমাদেব দিকে। বাসু-মামু আমাব হাতটা চেপে ধবলেন। নজর হলো হেনা একাই আসছে। প্রীতম বা ছেলেমেয়ে তাব সঙ্গে নেই। সে বারে বারে পিছন দিকে তাকাচ্ছে আব প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিযে আসছে। ততক্ষণে আমরা দুজনেই গাড়ির ভিতর। আমি ড্রাইভারেব সিটে। হেনা এগিযে আসতে মামু কাচটা নামিয়ে দিলেন। হেনা ঝুঁকে পড়ে বললে, মিস্টার বাসু, আপনাকে একটা কথা বলার আছে... অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপনীয...

—বল? —বাসু-মামুও ঝুঁকে পড়েন।

হেনা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কেউ তাকে নজব কবছে কি না। তাবপব আবাব বললে, আপনি... আপনি... মানে, কাউকে বলবেন না তো?

—গোপন কথা কেন বলবো? বল, কী বলতে চাও?

—জানাজানি হলে কিন্তু সর্বনাশ হযে যাবে।

—দেরি কোরো না হেনা। এখনই প্রীতম নেমে আসবে। কথাটা কী?

প্রীতমেব নাম শুনেই মেয়েটি পিছন ফিরলো। তখনই নজব হলো ছেলেমেয়েব হাত ধরে প্রীতম সদব দবজা দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বললে, আপনাবা যাননি দেখছি!

হেনা সহজ গলায বললে, আজ আপনারা এক কাপ কফি পর্যন্ত খাননি। তাহলে কবে আসবেন বলুন?

—ও! নিমন্ত্রণ কবা হচ্ছে?

বাসু বললেন, টেলিফোন কবে জানাবো।

—তাহলে ঐ কথাই রইলো। এখনি যা বলছিলাম। টুকুকে বলবেন, আমরাও আছি তার সঙ্গে। নমস্কার।

আমি স্টার্ট দিলাম গাড়িতে। ঠাকুর দম্পতি সামনের রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলেন ছেলেমেয়েদেব নিয়ে। গাড়ি চালাতে চালাতেই বলি, হেনা কী বলতে এসেছিল বলুন তো? অত্যন্ত জরুবি এবং অত্যন্ত গোপন?

—শোনা হল না! শোনার দরকার ছিল।

—পরে টেলিফোন করলে জানা যাবে নিশ্চয়।

—যদি প্রীতম সে সময় বাড়িতে না থাকে!

বাড়ি ফিরে দেখি সুজাতার চিঠি এসেছে। গোপালপুর-অন-সী থেকে। জানতে চেয়েছে, আর কদিন দেরি হবে আমাদের। আমরা কেন যেতে দেরি করছি।

আহারান্তে বিশ্রাম নেওয়া গেল না। বিশু এসে খবর দিল বড়কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। মুখে পাইপ।

আমাকে দেখেই বলে ওঠেন, অফ অল দ্য টুরিস্ট স্পটস্ লোকে কেন যে 'গোপালপুর-অন-সী'তে দৌড়য় বুঝি না।

এই 'লেগ-পুলিং' আমার ভাল লাগে না। বলি, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? কিছু বলবেন?

—তোমার হাতে যদি সময় থাকে। আর যদি এই মওকায় চিঠির জবাবটা লিখে ফেলতে চাও তা হলে, এখন বরং থাক।

—চিঠির জবাব? কোন চিঠি?

—আজকের ডাকে গোপালপুর থেকে একখানা খাম এসেছে মনে হলো?

বলি, না, গোপালপুর থেকে নয়. ও আমার এক বন্ধুর চিঠি। —উনি যদি ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যেতে পারেন, তাহলে আমিই বা পারবো না কেন?

বলেন, বোসো। কেসটা একটু আলোচনা করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেসটার মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম।

—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কৌশিক। আমি মিস্ জনসনের চিঠি পেয়েছি শুনে এক-একজনের এক-একরকম প্রতিক্রিয়া হল। শান্তি ধরে নিল---সেটা সুরেশের চৌর্যবৃত্তি—উদ্ঘাদটিত হল একটি নতুন অধ্যায়। টুকু বললে, স্বর্গীয় পোস্ট-অফিস থেকে কেউ চিঠি লেখে না—যেন, মৃত ব্যক্তি কোনও ফরিয়াদ আনতে পারে না। কিন্তু আমি যেই বললাম, তিনি মৃত্যুর পূর্বে চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন, অমনি সে নার্ভাস হয়ে সিগারেট ধরালো। আর মিনতি মাইতি এর মধ্যে কোন কিছু বিস্ময়ের দেখতে পেল না। হয় সে অত্যন্ত চতুর—তার বোকাসোকা চরিত্রটা সব সময় বিশ্বাসযোগ্য করে রাখতে সক্ষম, অথবা সে এতই বোকা যে, বুঝতে পারে না—মৃত্যু মুহূর্তে উচ্চারিত কথাটা মিস জনসনের পক্ষে চিঠিতে জানানো সম্ভবপর নয় । আবার ওদিকে কথাটা শোনামাত্র হেনার রিফ্লেক্স অ্যাকশন ঃ 'আমার স্বামীর বিরুদ্ধে?' কেন? মিস পামেলা জনসন ওর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আমাকে তদন্ত করতে বলবেন কেন?

আমি বলি, হেনা একটা কথা জানে, যা আমরা জানি না।

—হ্যাঁ, কিন্তু কী সেটা? মিনতি মাইতির ধারণা, প্রীতম হুকুম করলে হেনা মানুষ খুন করতে পারে। আবার প্রীতমের ধারণা ঃ প্রয়োজনে স্মৃতিটুকু কারও খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সুরেশের বিবেকের বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। সবটা মিলিয়ে মনে হয়—এ ডেনমার্কে কোথাও কিছু একটা পচেছে। গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, উৎসটা বোঝা যাচ্ছে না, তাই নয়?

স্বীকার করতে হলো, আমি একমত মামু।

—তুমি কিন্তু বদলে যাচ্ছ কৌশিক। এ মত গোড়ায় ছিল না তোমার। বল তো, তোমার মতটা ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে বদলে গেল?

একটু ভেবে নিয়ে বলি, না। হঠাৎ বাঁক নেয়নি, ইটস্ আ কন্টিনিউয়াস্ কার্ভ। ধীরে ধীরে আমি আপনার সঙ্গে একমত হয়ে গেছি। বোধ করি স্থির-নিশ্চয় হয়েছি যখন হেনা ছুটে এসে তার 'গোপন কথা' বলতে চেয়েছিল—প্রীতমকে দেখে কথা ঘোরালো। মনে হলো ও একটা দারুণ আতঙ্কের মধ্যে আছে—

—আতঙ্ক! কাকে ওর ভয়? আমাকে?

—প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই যখন আপনি মিস জনসনের 'মৃত্যু'র কথা তুললেন, তখনই ও সাদা হয়ে গেছিল—যেন সেই মৃত্যু-রহস্য সম্বন্ধে সে কিছু একটা কথা জানে। ঠিক পরমুহূর্তেই সে স্বাভাবিক হলো, যখন দেখল—না, 'মৃত্যু' নয়, আপনি তার 'উইলটা'র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছেন। পরে আমার মনে হয়েছে, ওর আতঙ্কের উৎস—ওর স্বামী। প্রীতমকে সে দারুণ ভয় করে। আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি—পঁচিশে এপ্রিল প্রীতম যে মরকতকুঞ্জে গেছিল তা ফিরে এসে তার স্ত্রীকে বলেনি।

—আর সুরেশ? সে কি বলেছিল টুকুকে যে, দ্বিতীয় উইলটা সে স্বচক্ষে দেখেছে?

—হ্যাঁ! এখানে স্মৃতিটুকুই মিথ্যেবাদী! সে জানতো! আর তাতেই সে বলেছিল 'ইউ ফুল'!

—ঐ 'ক্লু'-টার সাহায্য তো তোমার নেওয়াব কথা নয় কৌশিক। আডিপাতা 'ক্রিকেট' নয়।

—'বডিলাইন বোলিং ইজ নট ক্রিকেট আইদাব।'

—হুঁ। মনে হচ্ছে আমরা ঠাঁই বদল করেছি!

উনি নীরবে ধূমপান করতে থাকেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলি, কী ভাবছেন?

—অনেকের কথা। ইন্সপেক্টর রবি বোস, দারুণ স্মার্ট জয়দীপ রায়। ...

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো না, ওরা কারা। জানতে চাই, তার মানে?

—সমস্ত ব্যাপারটা পরপর সাজিয়ে দেখো কৌশিক—

বাধা দিয়ে বলি, একই কথা বারে বারে বলে কী লাভ?

—না, খুব সংক্ষেপে সারবো। প্রথম কথা: বুড়িকে হত্যা করার যে একটা চেষ্টা হয়েছিল—সিঁড়িতে একটি মৃত্যুফাঁদ পেতে—এটা তুমি এখন মেনে নিচ্ছো?

—হ্যাঁ। এ সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ নেই।

—তাহলে তার অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত, একজন হত্যাপ্রয়াসীর অস্তিত্ব। য়্যু কান্ট হ্যাভ অ্যাটেম্পটেড মার্ডার, উইদাউট আ মার্ডারার! সে রাত্রে কেউ ঐ মৃত্যুফাঁদটা পেতেছিল।

—মেনে নিলাম।

—প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে সে কি থেমে গেছিল? ...বাধা দিও না কৌশিক... আমি জানি, ডক্টর পিটার দত্ত বলেছেন—পামেলার মৃত্যু স্বাভাবিক। প্রথম কথা, পতনজনিত দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে কার লাভ হতো?

—মিস্ মাইতি বাদে সকলেরই।

—ঠিক কথা! অথচ ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনাই হয়তো মূল হেতু যার জন্য মিস্ জনসন উইলটা পালটে দিলেন। যাকে বাদ দিতে চাই একমাত্র সেই হল লাভবান।

—তার মানে কাকে সন্দেহ করছেন আপনি?

—সেটা পরের কথা। এখন আমাদের বিচার্য বিষয় 'কার্য-কারণ সম্পর্ক'! পর পর চিন্তা করে দেখো। দুর্ঘটনার পরেই কী ঘটলো?

—মিস্ জনসন শয্যা নিলেন। অতিথিদের সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিতাড়ন করলেন। দশদিন তিনি চিন্তা করলেন। তাঁর অ্যাটর্নিকে আসতে বললেন আর আপনাকে চিঠি লিখলেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দিলেন না। কেন? ভুলে গেলেন? অথচ প্রবীর চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিখানি তো ডাকে দিতে ভোলেননি।

—কী জানি। আমি তার কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না।

—আমার একটা আন্দাজ হচ্ছে। উনি চিঠিপত্র লিখে হয়তো সচরাচর ওঁর সহচরীকে ডাকে দিতে দিতেন। কিন্তু আমার চিঠিখানি তাকে দিতে চাননি। হেতু, উনি মিস্ মাইতিকেও জানাতে চাননি যে, পি. কে. বাসুকে তিনি একটি চিঠি লিখেছেন। বুড়ি ওর চরিত্রটা ঠিক জানতো কি না জানি না—অর্থাৎ সে নির্বোধ না অত্যন্ত চতুর—কিন্তু এ-কথা জানতো যে, সে পি. কে. বাসুর 'ফ্যান', 'কাঁটা সিরিজ'-এর পোকা।

—সম্ভবত আপনার ডিডাকশান ঠিক।

—সম্ভবত। বুড়ি চিঠিখানা তোশকের তলায় রেখে দিয়েছিল, সুযোগমত ছেদিলাল বা তার বৌয়ের হাতে ডাকে পাঠাবে বলে। তারপর ভুলে যায়। যাহোক তারপর কী হলো?

—হেনা আর প্রীতম আঠারই দেখা করে গেল। সম্ভবত তিনি তাদের জানাননি প্রবীরবাবু বা আপনাকে চিঠি লেখার কথা।

—মোস্ট প্রব্যাবলি! তারপর?

—উকিলবাবুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় উইল প্রণয়ন। একুশে এপ্রিল।

—ইয়েস! পরের সপ্তাহে, পঁচিশে এল টুকু আব সুবেশ। কর্ত্রী নিঃসন্দেহে সুরেশকে উইলখানি দেখিয়েছিলেন—

—সে সিদ্ধান্তেব একটিই এভিডেন্স। সুবেশের স্বীকৃতি—

—না! মিন্টির স্টেটমেন্টও! মিন্টি কান পেতে ওঁদের কথোপকথনটা শুনেছিল। না হলে তার পক্ষে কথাগুলো ভার্বাটিম বলা সম্ভবপর হতো না—'ওর বাবা আর বোনেরা শান্তি পাবেন না তাঁদের রক্ত জলকবা টাকা কেউ যদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়', অথবা 'প্রীতমেব মতো ফাটকাবাজি করে—'

—ও ইয়েস! মিস্ জনসন উইলটা সুরেশকে দেখিয়েছিলেন। ঐ আলোচনা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সুরেশেব সঙ্গে টুকুর যে সম্পর্ক তাতে সুবেশ নিশ্চয় তার বোনকে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। অথচ স্মৃতিটুকু সে-কথা কিছুতেই স্বীকাব কবলো না ।

—বাট হোয়াই? কেন?

—সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।

—দ্যাটস্ আ ভাইটাল ক্লু, কৌশিক! কেন টুকু বারে বাবে অস্বীকার কবলো যে, সুরেশ তাকে ও-কথা বলেনি!

স্বীকার করতে হলো, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে মামু!

—ঠিক আছে। তাবপর কী হলো? ঐ পঁচিশে প্রীতম ঠাকুরও এসেছিল। ঘণ্টাখানেক মরকতকুঞ্জে ছিল, অথচ সে ফিরে গিয়ে সেকথা তাব স্ত্রীকে বলেনি। নাকি বলেছিল? হেনা মিথ্যা কথা বলছে?

—না মামু! এখানে ডক্টর ঠাকুরই মিথ্যাবাদী। হেনা জানতো না যে, তার স্বামী পঁচিশে ঘণ্টাখানেকেব জন্য মেরীনগর ঘুরে এসেছে। আমি নিশ্চিত।

—ববং ধবে নেওযা যায খুব সম্ভবত হেনা জানতো না। তারপর কী ঘটলো? শনিবারেই প্রীতম কলকাতা ফিবে গেল। টুকু আর সুরেশ ফিরে গেল সোমবার—সাতাশে। পবদিন বসলো প্ল্যানচেটের আসর।

—পরদিনই ধরে নিচ্ছেন কেন?

—যেহেতু মিস্ উষা বিশ্বাস বলেছিলেন 'মঙ্গলবার'। শনি-মঙ্গলই এসব ব্যাপারের প্রশস্ত বার। সুতরাং পরদিনই মঙ্গলবার। আঠাশ তারিখে মিস্ জনসন প্ল্যানচেটের আসর থেকে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ডাক্তার এলো। পরীক্ষা করে বললো, অ্যাকিউট কেস অব জনডিস! তার তিনদিন পরে মিস্ জনসন মারা গেলেন আর মিস মাইতি হয়ে গেল—সুতৃপ্তির বয়ের ভাষায় 'ছপ্পড়ফোঁড় মালকিন'। এবং সমস্ত বিবরণটা শ্রবণান্তে সুকৌশলীর সিনিয়ার পার্টনার বললেন, স্বাভাবিক মৃত্যু!

আমার আর সহ্য হল না। বলে উঠি, সেই সিনিয়ার পার্টনারের গুরু কোন এভিডেন্স ব্যতিরেকেই সিদ্ধান্তে এলেন, বিষ-প্রয়োগে হত্যা!

মামু রাগ করলেন না। বললেন, না! বিনা এভিডেন্সে নয়, কৌশিক। মিস্ জনসনের মুখ থেকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে কিছু একটা বার হয়েছিল—'লুমিনাস, অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময়, জোনাকির আলো হলুদরঙের হলে যেমন হয়', তাই নয়? একথা মিস্ বিশ্বাস একা বলেননি। মিনতি মাইতি তা করবোরেট করেছে।

—তাতে কী হলো? অ্যাকিউট কেস অব জনডিসে এমন হয় না?

বাসু-সাহেব জবাব দিলেন না।

বলি, খোলাখুলি বলুন তো মামু? আপনি কি সন্দেহটা সূচীমূল করতে পারছেন না আমার মতো?

—না কৌশিক। আমার সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজনই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি!

—ভয় পাচ্ছেন? সে পালিয়ে যেতে পারে বলে?

—না! মরিয়া হয়ে সে দ্বিতীয় আর একটি খুন করে বসতে পারে বলে!

—দ্বিতীয় খুন! কে? কাকে?

সে কথার জবাব না দিয়ে উনি বললেন, রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথা আব আমি ভাবছি না কৌশিক, ভাবছি এই দ্বিতীয় হত্যাটা কী ভাবে ঠেকানো যায়!
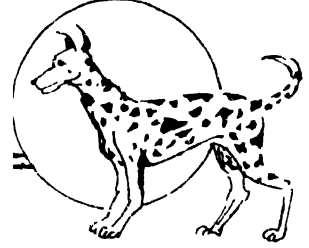
বেলা তিনটের সময় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে অ্যাটর্নি প্রবীর চক্রবর্তীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই ছিল।

কিন্তু মামু বললেন একবাব নিউ আলিপুরের ডেরায় যেতে হবে। তাঁর কিছু কাজ আছে। তাছাড়া দুপুরে বাইরে খাওয়ার কোনও কথা ছিল না। বিশু আমাদের ভাত আগলে বসে থাকবে, নিজেও খাবে না।

অগত্যা এলগিন রোড থেকে ফিরে আসতে হলো নিউ আলিপুরেব বাড়িতে।

সেখানে পৌঁছাতেই শোনা গেল বৈঠকখানায় এক বাবু বসে আছেন বাসু-মামুর প্রতীক্ষায়। বৈঠকখানায় নয়, মামুর চেম্বারে। দুজনে তাই সেখানেই গেলাম প্রথমে।

একটু আশ্চর্য হলাম সুরেশ হালদারকে দেখে। সে নাকি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করছে।

মামু তাঁর চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কী ব্যাপার? সুরেশবাবু যে...

—জানতে এলাম স্যার, কতদূর কী হচ্ছে এদিকে?

—আহারাদি হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, আপনারা বরং খেয়ে-দেয়ে নিন, তারপর কথা হবে।

—না। অনেকক্ষণ বসে আছো, এসো, কথাবার্তা যেটুকু আছে তা আগেই সেরে ফেলি।

—আপনি কিছু ফন্দি-ফিকির বার করতে পারলেন?

—উইলটাই তো এখনো দেখিনি। আজ বিকালে দেখবো। আচ্ছা সুরেশ, তোমরা কি মিনতি মাইতির সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেছো?

—বৃথা চেষ্টা। সে রীতিমতো উকিলের পরামর্শে চলছে। ও আমাদের দুজনকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সোজা আঙুলে ওর কাছ থেকে ঘি বার করা যাবে না—

—তার মানে আঙুল বাঁকাতেই হবে?

—আমার আঙুলগুলো এমনিতেই বাঁকা-বাঁকা স্যার, আপনার মদত পেলে—

—মদত পেলে? কী জাতীয় সমাধানের কথা ভাবছো তুমি?

—কিছুই মাথায় আসছে না স্যার। মিন্টিকে হুমকি দিলে কি কিছু কাজ হবে?

—হুমকি? হুমকিতে কি কাজ হয় সুরেশ? বড়পিসিকে তো দিয়ে দেখেছিলে?

সুরেশ একটু অবাক হয়ে বললে, আপনি তা কেমন করে জানলেন?

—তাহলে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বানানো নয়? সত্যি কথাটা বলবে?

—বলবো। বড়পিসিকে হুমকি দিইনি আমি। সহজ কথাটা সরল করে বলে ফেলেছিলাম শুধু। বলেছিলাম—তোমার শরীর দুর্বল, একা-একা থাকো, উইল করে যা আমাদের দেবে তার থেকে

আগে-ভাগে কিছু দিয়ে দেওয়াই ভালো নাকি? আমাদের চারজনের অবস্থাই সঙ্গীন। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়। শেষে তোমার কিছু ভালমন্দ না হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, এটা একটা সহজ কথা এবং সরল করেই বলা। তা শুনে তিনি কী বললেন?

—বড়পিসি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, শরীর দুর্বল হলেও সে নিজেকে রক্ষা করতে জানে। তারপর আমাকে সোজা দরজা দেখিয়ে দিল।

—বুঝলাম। আচ্ছা তুমি কি জানো যে, ডক্টর ঠাকুর পঁচিশে, শনিবার মরকতকুঞ্জে গিয়েছিল, ঘণ্টাখানেক মাত্র ছিল?

—না! কে বললো?

—ডক্টর ঠাকুর নিজেই।

—বেচারি! সে নিশ্চয় বড়পিসির কাছে দরবার করতে গেছিল। চিঁড়ে ভেজেনি। বলুন স্যার, এরকম মরিয়া হয়ে গেলে মানুষ খুন করার কথা ভাবে না? আমি বড়পিসিকে ফাঁকা হুমকি দেখিয়েছি?

—না! তবে একথাও বলবো, মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে শুধু 'হত্যা'র কথাই ভাবে না। তুমি ভাবো কি না, সে-কথা তুমিই বলতে পারবে।

একগাল হাসলো সুরেশ। বললে, ওভাবে আমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিতে পারবেন না, বাসু-সাহেব। আমি কোনদিন বড়পিসির স্যুপে আরসে—

—স্যুপে?

—স্ট্রিকনিন্-বিষ মেশাইনি। যাক, আপনাদের লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজ চলি।

হাসতে হাসতেই বিদায় নিল সে।

বলি, আপনি কি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন মামু? ও কিন্তু একটুও ভড়কায়নি।

—তাই মনে হল তোমার? ঐ ক্ষণিক বিরতিটুকু সত্ত্বেও?

—ক্ষণিক বিরতি? কখন?

—'বড়পিসির স্যুপে' বলে ও হঠাৎ থেমে গেল না?

—হয়তো একটা তীব্র বিষের নাম ওর মনে আসছিল না।

—হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে সহজ নামটা ওর মনে পড়ল না। কেন?

—সবচেয়ে সহজ নাম? কী? পটাসিয়াম সায়ানাইড?

—সেটা দুর্লভ। আর কোন নাম?

—আর্সেনিক?

—আমার যেন তাই মনে হল। 'আর্সেনিক' বলতে গিয়েই ও থেমে গেছিল, ঘুরিয়ে নিয়ে বাক্যটা শেষ করলো 'স্ট্রিকনিন্' প্রয়োগ করে। যা হোক চলো, খেয়ে নেওয়া যাক। বিশু ইতিমধ্যে বার দুই উঁকি মেরে গেছে।

আহারান্তে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট। চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স বেশ নামকরা সলিসিটার্স ফার্ম। বর্তমানে সিনিয়ার পার্টনার প্রবীর চক্রবর্তী প্রৌঢ় মানুষ। আমাদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে মামুকে বললেন, মিস্ স্মৃতিটুকু হালদার টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে, আপনারা আমার কাছে আসছেন। ওরা ভাইবোনে নাকি আপনাকে নিয়োগ করেছে; কিন্তু কী উদ্দেশ্য নিয়ে এটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি এখনো।

—ধরুন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটা গোপন তদন্ত করে দেখতে।

—মিস্ হালদার এবং সুরেশ ইতিপূর্বেই আমার সঙ্গে আলোচনা করে গেছে। আমি ওদের বলেছি, আইনের দিক থেকে ওদের কিছুই করার নেই। দ্বিতীয় উইলখানি প্রণয়নের বিষয়ে তদন্তের কোন অবকাশ নেই।

—বটেই তো। তা হলেও আপনি যদি আমার কিছু কৌতূহল দূরীভূত করেন তাহলে কৃতার্থ হই। দায়িত্বটা যখন নিয়েছি—

—আয়াম অ্যাট য়োর সার্ভিস।

—আমার খবর, মিস জনসন আপনাকে দ্বিতীয় উইলখানা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সতেরই এপ্রিল, তাই নয়?

ফাইলের কাগজপত্র দেখে নিয়ে উনি বললেন, হ্যাঁ, চিঠির তারিখ সতেরই এপ্রিল।

—উনি আপনাকে একটি নতুন উইল তৈরি করার কথা বলেছিলেন একথা আমি জানি। আপনি সেটা কোথায় বানালেন? মরকতকুঞ্জে গিয়ে?

—না। মিস জনসন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন সব কিছু তৈরি করে, স্ট্যাম্প কাগজে টাইপ করে নিয়ে যেতে, যাতে উনি সই করে দিতে পারেন। 'প্রভিশন্স' খুব সরল ছিল, নির্দেশও স্পষ্ট—মানে ঝি-চাকরদের কাকে কত দিতে হবে, চ্যারিটেবল ফান্ডে কোথায় কত—এবং বাকি সমস্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ঐ ওঁর সহচরীকে। ফলে উইলটা কলকাতাতেই টাইপ করে ফেলতে কোন অসুবিধা হয়নি আমার।

—মাপ করবেন মিস্টার চক্রবর্তী: চিঠির নির্দেশটা পেয়ে আপনি বেশ অবাক হয়ে গেছিলেন, নয়?

—অস্বীকার করবো না তা হয়েছিলাম।

—উনি এর আগে আর একটি উইল করেছিলেন, আপনার মাধ্যমেই, তাই নয়?

—হ্যাঁ, বছর পাঁচেক আগে। ওঁর সব আইনঘটিত কাজ আমার মাধ্যমেই হতো।

—আর সেই উইল মোতাবেক সম্পত্তিটা ওঁর তিন আত্মীয়ের সমান ভাগে পাওয়ার কথা ছিল।

—না, সমান ভাগ নয়। অর্ধাংশ পেতো হেনা ঠাকুর, এক চতুর্থাংশ করে স্মৃতিটুকু আর সুরেশ।

—সেই উইলখানা কী হল?

—সেটা বরাবর আমার কাছেই ছিল। মিস জনসনের নির্দেশ মতো আমি সেখানিও নিয়ে যাই —ঐ একুশে এপ্রিল তারিখে।

—আপনি যদি সেই একুশ তারিখের ঘটনাগুলি একটু বিস্তারিত জানান তাহলে আমার খুব সুবিধা হয়।

—আপত্তি নেই। একুশ তারিখ আর্লি লাঞ্চ সেরে আমি কলকাতা থেকে সরাসরি আমার গাড়িতে যাই। ওখানে পৌঁছাই তিনটে নাগাদ। সঙ্গে ছিল আমার ল-ক্লার্ক আর ড্রাইভার। মিস জনসন নিচের ঘরে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। টেলিফোনে আমি জানিয়েছিলাম—তিনটার সময় পৌঁছাবো।

—ওঁকে কেমন দেখলেন? শারীরিক ও মানসিক?

—শরীর ভালোই ছিল; যদিও একটা লাঠি নিয়ে হাঁটছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁকে কখনো লাঠি ব্যবহার করতে দেখিনি। মানসিকভাবে তিনি কিছু উত্তেজিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভিক্টোরিয়ান স্থিতপ্রজ্ঞতা ছিল বিস্ময়কর—সে উত্তেজনা সহজে নজরে পড়ছিল না।

—মিস মিনতি মাইতিও ছিল সেখানে?

—হ্যাঁ, যখন আমরা পৌঁছাই। তারপরে কর্ত্রীর নির্দেশে সে চলে যায়।

—তারপর?

—উনি জানতে চাইলেন, উইলটা আমি তৈরি করে এনেছি কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলাতে সেটি উনি দেখতে চাইলেন। আদ্যন্ত ধীরে ধীরে সবটা পড়ে যখন সই করতে গেলেন, তখন...

—তখন?

—না। সব কথাই স্বীকার করবো, তখন আমি ওঁকে বলেছিলাম, কাজটা কি ভাল হচ্ছে? আপনি ভেবে চিন্তে দেখেছেন তো এভাবে আপনার পরিবারের সবাইকে বঞ্চিত করাটা ঠিক উচিত হচ্ছে কিনা? জবাবে উনি বললেন, আমি কী করতে যাচ্ছি তা আমি জানি।

—উনি খুব উত্তেজিত ছিলেন, তাই নয়?

—তা ছিলেন; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবার মতো উত্তেজিত ছিলেন না। স্মৃতিটুকু, সুরেশ, হেনাদেব আমি ওদেব ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। তাদেব প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতিও আছে; কিন্তু উকিল হিসাবে আমাকে বলতেই হবে—মিস জনসন যা কবেছেন তা আইনসম্মত। নিজের সম্পত্তি দেখাশোনা করাব ক্ষমতা ও মানসিক স্থৈর্য তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। যে কথা বলছিলাম—উনি কলমটা বাব কবে সই কবতে গিয়েও একবার থামলেন, জানতে চাইলেন—'আমি যা করছি, তা করবার আইনত অধিকার আমাব আছে?' আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। তখন উনি বললেন, 'তাহলে আপনার ল-ক্লার্ক আব ড্রাইভারকে ডাকুন, তাদেব সামনে আমি স্বাক্ষব করবো।' আমি ওদেব ডেকে আনলাম, তাদের সামনে উনি সই দিলেন।

—তাবপর? উইলটা উনি আপনাকে রাখতে দিলেন?

—না, আগেব উইলখানা যদিও ববাবব আমাব কাছে গচ্ছিত ছিল, তবু এখানা উনি নিজেব কাছেই বাখলেন। ওঁব ঘরে যে আলমাবি আছে তার ভিতব।

—আব পুবোনো উইলখানা? যেটা বাতিল হলো? সেটা ছিঁড়ে ফেললেন?

—না। সেখানাও উনি একই আলমাবিতে তুলে রাখলেন।

—এই অদ্ভুত আচবণেব হেতুটা কী, তা আপনি জানতে চাননি?

—চেয়েছিলাম। উনি জবাবে একই কথা বললেন ঃ আমি জানি, আমি কী কবছি!

—আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন! তাই নয়?

—হ্যাঁ। কাবণ আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম ওঁব 'ফ্যামিলি ফিলিংস' খুব গভীব!

—সেই প্রথম উইলখানা কি ওঁব মৃত্যুব পর খুঁজে পাওয়া যায়নি?

—না, গিয়েছিল। এক্সিকিউটাব হিসাবে ওঁব আলমাবির একটি চাবি আমার কাছে বরাববই থাকতো। ওঁব মৃত্যুর পর সকলের সামনে আমি যখন আলমাবি খুলি তখন দুটি উইলই দেখতে পাই—ঠিক যেভাবে উনি গুছিয়ে রেখেছিলেন, সেভাবেই।

—মিস মিনতি মাইতি কি জানতো যে, কর্ত্রী তাকেই সব কিছু দিয়ে দ্বিতীয় একখানি উইল কবেছেন?

—রুদ্ধদ্বাব কক্ষে আমবা কিছু একটা কবছিলাম, এটুকুই সে জানতো। কী করছিলাম, তা জানতো না।

—মিস্টাব চক্রবর্তী, আপনি কি আপনাব মক্কেলকে বলেছিলেন, দ্বিতীয় উইলেব 'প্রভিশন্স' তাঁব সহচরীকে না জানাতে?

উনি হাসলেন। সংক্ষেপে বললেন, বলেছিলাম।

—কেন? এ পবামর্শ কেন দিয়েছিলেন?

ওঁব হাসিটা মিলিয়ে গেল না। বললেন, হেতুটা আপনি জানেন, আপনিও আইনজীবী। এবং জানেন, এসব কথা আলোচনা না করাই ভালো। তাই মূল হেতুটা এড়িয়ে আপনার প্রশ্নেব কৈফিয়ৎ হিসাবে আমি বলবো, যদি আমার মক্কেল তৃতীয়বার উইলটা বদল করেন তখন মিস মাইতি মর্মাহত হবে। এ জন্যই আমাব মক্কেলকে বাবণ করেছিলাম।

—তার মানে আপনি ভেবেছিলেন যে, আপনার মক্কেলের পক্ষে অচিরেই দ্বিতীয় উইলখানা বদল কবার প্রয়োজন হতে পারে?

—ঠিক তাই। আমার মনে হয়েছিল—পরিবারের প্রত্যাশিত ওয়ারিশদের সঙ্গে আমার মক্কেলের কোন কারণে কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকবে। উনি যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন তখন আমাকে ডেকে পাঠাবেন তৃতীয় উইল করবার প্রয়োজনে।

—আপনাব কি একথা মনে হয়নি যে, মিস জনসন সে পদক্ষেপ কববাব বদলে হয়তো প্রথম উইলখানা রেখে দ্বিতীয়খানা শুধু ছিঁড়ে ফেলবেন?

—মিস্টাব বাসু, আপনি আইনজ্ঞ—আপনি জানেন যে, দ্বিতীয় উইল কবা মাত্র তাঁব প্রাথমিক উইলখানি আইনের চোখে বাতিল হয়ে গেছে।

—কিন্তু আপনার মক্কেল আইনজ্ঞ ছিলেন না। এই আইনের খুঁটিনাটি হয়তো তাঁব জানা ছিল না। তাছাড়া দ্বিতীয় উইলখানি পাওয়া না গেলে—স্বাভাবিক ওয়াবিশ হিসাবেই ওরা তিনজন সম্পত্তিটা পেতো। নয় কি?

—দ্যাটস আ ডিবেটেবল পয়েন্ট। কিন্তু ঘটনা তো সেই খাতে বয়নি। দু'খানি উইলই যথাস্থানে বাখা ছিল।

—এমন কি হতে পাবে না যে, মৃত্যুশয্যায় তিনি প্রথম উইলখানি ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন—হয়তো একটা 'ডামি-উইল' ছিঁড়েও ফেলেছিলেন? শেষ সময়ে, মৃত্যুসময়ে কে বা কাবা উপস্থিত ছিলেন তা আপনি জানেন। তাবাই হয়তো ওঁব নির্দেশে দেবাজ খুলে উইল দুটি বাব কবে এনেছিল—

প্রবীব চক্রবর্তী বাধা দিয়ে বললেন, মাপ করবেন মিস্টাব বাসু, এসব কথা কি আপনি আদালতে প্রমাণ কবতে পাববেন?

বাসু নীরব বইলেন। প্রবীরবাবু এবার নিজে থেকেই বলেন, এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে করেন আপনি?

—মাপ করবেন। এই পর্যায়ে আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনাকে শুধু একথাই বলবো যে, ব্যাপাবটাব গভীরে একটা কিছু আমাব নজবে পড়েছে। তাবই তদন্ত কবছি আমি।

—বুঝেছি। কিন্তু আপনার মক্কেলটি কে? মিস হালদাব না সুরেশ?

—ওদেব দু'জনের একজনও নয়?

—তার মানে মিসেস হেনা ঠাকুর?

—আজ্ঞে না, তাও নয়। আমাব মক্কেল : মিস পামেলা জনসন। আপনাকে যেদিন চিঠি লিখে দ্বিতীয় উইলখানি বানাতে বলেন সেইদিনই তিনি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আইনঘটিত কোন কিছু নয়। তিনি আমাকে একটি বিষয়ে তদন্তের ভাব দেন। আমার ক্লায়েন্ট অবশ্য মাবা গেছেন; কিন্তু অসমাপ্ত কাজটা শেষ না কবে আমি তৃপ্ত হতে পাবছি না। আমি আপনার কাছে এসেছিলাম জানতে যে, আপনাব কি মনে হয়নি—উনি অদূব ভবিষ্যতে আবাব একটি উইল বানাতে চাইবেন। আপনি আমার সে কৌতূহল চবিতার্থ করেছেন।

প্রবীববাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমি শুধু আমাব ব্যক্তিগত অনুমানটা আপনাকে জানিয়েছি মাত্র। আমার ধারণাব স্বপক্ষে কোনও এভিডেন্স নেই কিন্তু—

—দ্যাটস্ পার্ফেক্টলি আন্ডারস্টুড, মাই ডিয়াব স্যাব।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বাসু-মামু নিতান্ত খেয়ালবশে কাজ করে চলেন। প্রফেশনাল কারণে নয়। পেশাগত ব্যারিস্টার নেশার বশে গোয়েন্দা হলে যা হয়। যেমন এই কেসটা। মিস পামেলা জনসন

ওর আইনসম্মত মক্কেল নন, ছিলেন না—ওর ফিজটা জানতে চেয়েছিলেন মাত্র, কোনও 'রিটেইনার' দেননি। ভদ্রমহিলা দুর্বোধ্য ভাষায় যে ধাঁধাটা তৈরি করেছিলেন তার পাঠোদ্ধার বাসু-মামু যাই করুন, আমার মনে হয়েছিল তা একটি মাত্র পংক্তিতে সংক্ষেপিত হতে পারে ঃ পাগলা, লা ডুবাস না যেন।

ব্যাস। বাসু-মামু সে-কথা শুনেই নৌকার গলুইয়ে দাপাদাপি জুড়ে দিলেন। যাত্রী-বোঝাই নৌকাটা পাল তুলে দিব্যি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল—ওঁর এই নাচানাচিতে সেটা এখন প্রচণ্ডভাবে দুলতে শুরু করেছে। যাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত—ভরাডুবি না হলেও ওরা বুঝতে পেরেছে তাদের মধ্যে একজনকে উনি ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিতে চাইছেন। ওরা সবাই নিজের নিজের জান বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছে।

এক হিসাবে এই 'সারমেয় গেণ্ডুক' কেসটা অনবদ্য। এতদিন অন্যান্য কেস-এ দেখেছি, অপরাধটার বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—প্রশ্ন থাকতো ঃ কে অপরাধী? এবার তা হয়নি। অপরাধ খুঁজতে বসার আগে ওঁকে খুঁজতে হচ্ছে ঃ অপরাধটা। ওঁর অবস্থা দার্শনিকদের মতো—অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে একটা কালো বেড়ালকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন উনি—অথচ নিজেও জানেন না, ঐ কালো বেড়ালটা এই নীরন্ধ্র অন্ধকার কক্ষে আদৌ আছে কি না!

পরদিন সকালে দেখলাম উনি টেলিফোন করলেন মিনতি মাইতির হোটেলে। কথোপকথনের এক প্রান্তের কথাই কানে এলো। তাতে বোঝা গেল উনি মিন্টি মাইতির সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা করতে চাইছেন, আর সে বলছে যে, আজ বিকালে সে মেরীনগর যাবে। বাসু-সাহেব বললেন, তাহলে তো ভালোই হয়। কথাবার্তা মেরীনগরে বলতে পারলেই ভালো হয়। আমিও যদি সেখানে যাই তাহলে ওবেলা কথা বলা যাবে?

মিনতি জবাবে কী বললো তার আভাস পেলাম বাসু-মামুর প্রত্যুত্তরে: ঠিক আছে। এই ধরো বিকাল চারটে নাগাদ!

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে উনি ঘুরে দাঁড়াতে বলি, তার মানে আমরা আজ ওবেলা আবার মেরীনগর যাচ্ছি?

—হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ ও-বেলায় নয়। এ-বেলাতেই। তৈরি হয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে।

বলি, আমার যেন মনে হলো আপনি বিকেলবেলা মিনতির সঙ্গে সেখানে কথা বলবেন বললেন।

—তাই বলেছি। কিন্তু সে মেরীনগরে পৌছানোর আগেও আমাকে কিছু ইনভেস্টিগেট করতে হবে। নাও, উঠে পড, কুইক!
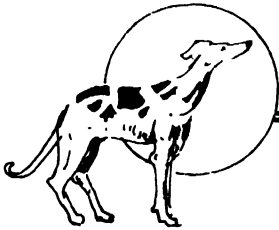
এবার আমাদের দেখে ফ্লিসি চিৎকার চেঁচামেচি একটুও করলো না। বার দুই শুঁকে নিয়েই সে নিশ্চিন্ত হলো। বরং অবাক হলো শান্তি। বললে, মিন্টি আসেনি আপনাদের সঙ্গে?

—না তো। শুনেছি, সে নাকি বিকালে আসবে এখানে।

—হ্যাঁ, তাই তো। আপনারা আসবেন তাও টেলিফোন করে জানিয়েছে। আমি ভেবেছি যে, আপনারা এ বেলাতেই একসঙ্গে এসেছেন।

—না, শান্তি। মিস্ মাইতি বিকালেই আসবে। তখন তার সঙ্গে আমি এসে কিছু আলোচনাও করবো। কিন্তু তার আগেও আমার কয়েকটা কথা জানার দরকার—

শান্তি একটু যেন অবাক হলো। সামলে নিয়ে বললে, যা হোক এসে যখন পড়েছেন, তখন এখানেই
ট খেয়ে নেবেন দুপুরে—

—না! কাঁচড়াপাড়াতে আমাদের একটা লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে। আমার এক মাসিমার বাড়ি।

ওরা বৈঠকখানাতে এসে বসলেন। দুজনেই। শান্তিও একটা মোড়া নিয়ে এসে বসলো।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে বলটা মুখে নিয়ে ফ্লিসি এসে দাঁড়িয়েছে আমার মুখোমুখি। তুবতুব করে
াজটা নাড়ছে। বেচারির বোধহয় অনেকদিন খেলা হয়নি। আমি তাই মামুকে বলি, আপনারা কথা
লুন, আমি ততক্ষণ ফ্লিসিকে একটু খেলাই—

মামু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বার কতক বল ছোঁড়াছুড়ি করে আমার বিবেক-দংশন শুরু হয়ে গেল।
মু কী ভাবছেন? ড্রইং রুমে ফিরে এসে শুনি ওঁরা দুজন মিস্ জনসনের চিকিৎসার বিষয়ে তখনো
থাবার্তা বলছেন। শান্তি দেবী বলছিল, হ্যাঁ, ছোট ছোট সাদা ট্যাবলেট—নাম জানি না। দিনে তিনটে
রে খেতেন। ডক্টর দত্তের প্রেসক্রিপশান মতো। এছাড়া একটা কাপসুলও খেতেন। অর্ধেক সাদা,
র্ধেক হলুদ—মানে বাইরের রঙটা।

—সেটা কার প্রেসক্রিপশানে?

—ঐ ডক্টর দত্তেরই প্রেসক্রিপশান। আর কারও প্রেসক্রিপশানে কোনো ওষুধ উনি কখনো খাননি।
সব বিষয়ে উনি খুব সতর্ক ছিলেন। একবার—

হঠাৎ মাঝপথেই থেমে পড়ে শান্তি। বাসু-মামু বলেন, জানি। ডক্টর ঠাকুর কী একটা ওষুধ নিয়ে
সেছিল, তা উনি খাননি। হেনা বলেছে আমাকে।

শান্তি আর গোপন করার প্রয়োজন দেখলো না। বললে, তবে তো আপনি জানেনই। কিন্তু ম্যাডাম
ভাবে হেনাদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেটা ওয়াশ-বেসিনে ঢেলে ফেলেছিলেন—তা আমার ভালো
াগেনি। হেনাদির বর কিছু বিষ নিয়ে আসেনি—

—বটেই তো! বটেই তো! তা সেসব ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল কি দু-একটা এখনো আছে?

—না! মিনতি সব বাতিল ওষুধ ফেলে দিয়ে ঘরটা সাফা করেছে।

—কোথায় থাকতো ঐ ওষুধগুলো?

—ম্যাডামের ঘরের লাগোয়া বাথরুমের কাবার্ডে।

—শেষদিকে ডক্টর দত্ত একজন নার্সকে বহাল করেছিলেন—তার নাম বোধহয় আশা, নয়?

—হ্যাঁ, আশা পুরকায়স্থ। কেন বলুন তো?

মিথ্যা ভাষণের কী পারদর্শিতা! বাসু-মামু দিব্যি এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসলেন। কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর
এক বৃদ্ধা মাসিমা আছেন—ঐ যাঁর বাড়িতে আজ দুপুরে আমাদের অলীক নিমন্ত্রণ, তিনি নাকি জনডিসে
গছেন। ওঁর মাসতুতো ভাই ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর তার বউ বুঝি কাঁচড়াপাড়াতেই কী-একটা চাকরি
রে। উনি তাই একজন স্থানীয় নার্সকে খুঁজছেন। ডক্টর পিটার দত্তের কাছে আশার কথা শুনে উনি
াবছেন তার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবেন। কাঁচড়াপাড়ায় সে ডে-টাইম নার্স হিসাবে কাজটা নিতে
ারে কিনা।

শান্তি খুব সহানুভূতি নিয়ে সেই বৃদ্ধা মাসিমার কল্পিত রোগের বিবরণ শুনলো। আশার বিষয়ে খুব
শংসাও করলো। সে নাকি 'নমিতা মেডিকেল স্টোর্স'-এর দ্বিতলে থাকে। আশা বিধবা। বাবার সঙ্গে
াকে। দোকানটা ওর বাবাই চালান—ঐ ডিস্পেনসারিটা। আশা ট্রেন্ড্ নার্স। কথার মাঝখানেই ঝন্ঝন্
রে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শান্তি গিয়ে ধরলো।

—হ্যালো? হ্যাঁ, মরকতকুঞ্জ। ...না, আমি শান্তি, মিন্টি এখনো আসেনি। আপনি কে বলছেন?
..ও! মাসিমা! বলুন? ...হ্যাঁ, সাদা রঙের অ্যাম্ব্যাসাডার। ...নম্বর? তা তো জানি না। আচ্ছা
রুন, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে শান্তি আমাদের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, আপানাদের গাড়িটার নাম্বার কি 4437?

বাসু-মামুর চোখ কপালে উঠলো। সোজাসুজি জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেন, মাসিমাটি কে?

—উষা মাসিমা। উনি পোস্ট অফিস থেকে ফোন করছেন। জানতে চাইছেন, একটা সাদা অ্যামবাসাডারে চেপে মিন্টি এসেছে কিনা।

—তা ওঁকে বলে দাও না যে, আসেনি।

—তা তো বললাম। তারপর উনি আপনার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন। আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, 'নামটা মনে পড়ছে না, সে ভদ্রলোক কি এসেছেন? W.B.F. 4437 গাড়িতে চেপে?'

বাসু-মামু বাধ্য হয়ে উঠে গেলেন। শান্তির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বললেন, গুড মর্নিং দিদি। ...হ্যাঁ, আমিই। তা আমি এসেছি কী করে টের পেলেন?

সে সময়ে আমি এক প্রান্তের কথাই শুনতে পেয়েছিলাম, তবে পরে বাসু-মামুর কাছ থেকে পুরো কথোপকথনটাই জেনে নিয়েছিলাম। পাঠক-পাঠিকাকে বঞ্চিত করবো না, এখানেই দু-পক্ষের 'বাৎচিত' ভার্বাটিম লিপিবদ্ধ করে যাই। উষা বিশ্বাস ওঁর গুডমর্নিং শুনেই বলেছিলেন, 'মিস্টার টি. পি. সেন?' আমাদের আগমনবার্তা কী করে টের পেলেন এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'পোস্টাপিসে এসেছিলাম, দেখলাম তোমার গাড়িটা মরকতকুঞ্জের দিকে চলে গেল, তাই ভাবলাম মিন্টিকে নিয়ে তুমি বোধহয় মেরীনগরে এসেছো। তা এখন শুনছি মিন্টি আসেনি। তা যাগ্‌গে, মরুগগে, শোনো ভাই।—তোমার জন্যে একটা দারুণ খবর আমার কাছে লুকানো আছে। কখন আসছো?'

বাসু বলেছিলেন, কী জাতের খবর?

—টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। তুমি হ্যাবল্ড দত্তের নাম শুনেছো?

—না। কে তিনি?

—একটা পরিচয়: তিনি মেরীনগরের একজন আদি বাসিন্দা। দ্বিতীয় পরিচয় ঃ তিনি যোসেফ হালদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তৃতীয় পরিচয় ঃ তিনি পিটার দত্তের বাবা।

—ও বুঝেছি। তা, তাঁর কথা কেন?

—তোমার কাছে কোমাগাতামারুর গপ্পো শুনে পিটার তার পুরনো কাগজপত্র হাতড়ে দেখেছে। ওর বাবার একটি অতি পুরাতন ডায়েরি উদ্ধার করেছে। তাতে যোসেফ হালদারের বিষয়ে নানান গোপন তথ্য লেখা আছে। আমার মনে হয়, তোমার অনুমান ঠিকই—যোসেফ গুরুজিৎ সিংয়ের সহকর্মী ছিল কোমাগাতামারু জাহাজে চেপেই সে মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে আসে।

টেলিফোনে আচমকা এই বিচিত্র বার্তা শুনে বাসু-মামুর কী আন্তরিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তিনি আমাকে জানাননি। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছিল উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মামুর কাছে কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের একটি অনবদ্য আষাঢ়ে গল্প ঃ 'লে লুল্লু!'

বেগম-সাহেবাকে ভয় দেখাতে আমীর-সাহেব বলেছিলেন, এ রকম বে-আদবি করলে লুল্লুকে ধরিয়ে দেবো। 'লুল্লু' আমীর-সাহেবের কোনো পোষা বা পরিচিত ভূতপ্রেত নয়; কথার-কথা হিসাবে তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতায় ঐ অদ্ভুত নামটা পয়দা করেছিলেন। গিন্নি যখন তাতেও ঘাবড়ালেন না, তখন আমীর চিক্কুড় পাড়েন ঃ লে লুল্লু!

ব্যাস্! সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেল!

লেখক ত্রৈলোক্যনাথের উর্বর কল্পনায়, "আশ্চর্যের কথা এই যে, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই মুহূর্তে, আমীরের বাড়ির ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল? সে চমকিয়া উঠিয়া শুনিল—কে তাহাকে কি একটা লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলে, তা ভূতের কথা

ছাড়িয়া দিন। চকিতের মধ্যে, দুর্ভাগ্য রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।"

বাসু-মামু অবশ্য 'লে-লুল্লু' বলেননি। বলেছিলেন: 'লে কোমাগাতামারু!'

টেলিফোনের দিকে যে দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল কোমাগাতামারু-জিন রানী মামিমাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাচ্ছে—আর সেটাই দেখতে পাচ্ছেন উনি, টেলিফোনের মাউথ-পিসে!

বাসু-মামু সামলে নিয়ে বলেছিলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। ডায়েরিটা কোথায়? আপনার কাছে?

—না। পিটারের কাছে। পিটার বাড়িতে আছে। চলে এসো না ওর বাড়ি। আমিও যাই তাহলে। বেশ গল্পগাছা করা যাবে। তোমার সেই সাকবেদটিকেও সঙ্গে এনেছো তো?

মামু স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু তখনই ডক্টর পিটার দত্তের বাড়িতে যেতে পারবেন না, এ-কথাও জানিয়েছিলেন। বললেন, আপনি শান্তিদেবীকে জানালেন যে, আমার নামটা মনে পড়ছে না, অথচ আমার কণ্ঠস্বর শুনেই আমার নামটা উচ্চারণ করলেন। ব্যাপারটা কী?

ঊষা বিশ্বাস সরাসরি জবাব দেননি। তাঁর নিজস্ব ঢঙে প্রতিপ্রশ্ন করে বসেন, তুমি মিস্ মার্পলকে চেনো?

—না। কে তিনি?

—কিছু মনে কোরো না ভাই, ছোটভাই মনে করে বলছি—সাংবাদিকতাকে তোমরা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছো, একটু বই-টই পড়া অভ্যাস করো। মিস্ মার্পল হচ্ছেন অগাথা ক্রিস্টির এক অনবদ্য চরিত্র। তা আমি হচ্ছি তাঁর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মেরীনগরী সংস্করণ। কখন আসছো আমার ডেরায়? ভালো কুকি বানিয়েছি কিন্তু।

বাসু-মামু প্রতিশ্রুতি দিলেন, কলকাতা ফেরার আগে দেখা করে যাবেন। বিকাল তিনটে নাগাদ ফিরে আসবো জানিয়ে আমরা শান্তি দেবীর কাছে বিদায় নিলাম। গেটের কাছে দেখা হয়ে গেল ছেদিলালের সঙ্গে। মস্ত সেলাম করলো সে।

মামু বোধহয় ঐ নীতিতে বিশ্বাসী ঃ 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই?'

ছেদিলালের সঙ্গে জুড়ে দিলেন খেজুরে আলাপ। লোকটা তিন-পুরুষের মালি। গাছের যত্ন নিতে জানে। মামু তাকে এভাবে জেরা শুরু করলেন যে, মনে হচ্ছিল আমরা মেরীনগরে এসেছি ওঁর উদ্ভিদ-বিদ্যার রিসার্চটার ডাটা সংগ্রহে। ছেদিলাল কথা প্রসঙ্গে বললে, ম্যাডাম ছিলেন সত্যিকারের পুষ্পদরদী, বাগিচা-রসিক। নানান ফুলের গাছ লাগাতেন, নানান বীজ, সার, ডাকযোগে আসতো। শীতের মরশুমে ফুলের কেয়ারিগুলো কীভাবে বানানো হবে তা বুঝিয়ে দিতেন ছেদিলালকে। কোথায় ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কোথায় পপি, জিনিয়া, ডায়াস্থাস, ফ্লক্স, মেরিগোল্ড। ছেদিলালকে তিনিই শিখিয়েছিলেন 'বনসাই-শিল্প', অংরেজি কিতাব পড়ে পড়ে। মনে হলো, ছেদিলালই সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছে ম্যাডামের প্রয়াণে। 'জব স্যাটিসফ্যাকশান' নষ্ট হয়ে গেছে তার। শিল্প রসিকের প্রয়াণে শিল্পীর যে হাল হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সত্যিকারের বাগিচা-রসিক সত্যিই দুর্লভ।

যেন ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে খোশগল্প করছেন, মামু বললেন, তুমি এই শায়েরটা শুনেছ?

"হাজারোঁ সাল নার্গিস্/ আপনা বে-নূরী পর রোতী হৈ!

বড়ি মুশ্‌কিলসে হোতী হৈ/ চমন্‌মে দিদাবর পৈদা।।"

ছাপরা-জিলার বাগান-রসিকের বোধগম্য হলো না কাব্যরস। ভাষাটা বড়ই উর্দুঘেঁষা। তাই বাসু-সাহেবকে অন্বয়-ব্যাখ্যা দাখিল করতে হলো। "হাজার বছর ধরে নার্গিস্-ফুল তার অনিন্দ্য সৌন্দর্য পসরা নিয়ে কাঁদছে। ও জানে, বাগিচার দরদী সমঝদার এক অতি সুদুর্লভ বস্তু।"

শাঙ্করভাষ্য শুনেও ও কিছু বুঝলো কিনা তা আমার মালুম হলো না। পাকাচুলে ভরা মাথাটা দুলিয়ে বলল, ও তো সহি বাৎ!

আমি উসখুশ করছি। এই অহৈতুকী খেজুরে আলাপ কতক্ষণ চলবে কে জানে!

ছেদিলাল স্বীকার করলো, বর্তমান মালকিন বাগানের দিকে নজরই দেয় না। সব আগাছায় ভরে যাচ্ছে।

মামু বলেন, তা আগাছা নিড়ানোর দায়িত্ব তো তোমার, মালকিন কী করবে?

—ক্যা কিযা যায় সা'ব? দাওয়াই খতম্ হো গয়া!

—দাওয়াই! কিসের দাওয়াই?

ছেদিলাল জানালো, আগাছা নির্মূল করতে এক জাতের 'উইড-কিলার' ব্যবহার করতে হয়। ম্যাডাম কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতেন। মুশকিল কি বাৎ, ওটা হচ্ছে জহর, বিষ, তাই কিছুতেই একসঙ্গে বেশি আনতেন না। সার আমদানি করতেন বস্তা বস্তা, বীজ প্যাকেট-প্যাকেট—কিন্তু ঐ 'উইড-কিলার' আসতো দু-মাস অন্তর এক ডিব্বা। ওর স্টক ফুরনোর পর বর্তমান মালকিনকে সে জানিয়েছিল—মিনতি মাইতি কিছুতেই রাজি হয়নি—ঐ বিষ কিনতে।

'বিষ'-এর প্রসঙ্গ উঠে পড়া মাত্র মামুর উর্বর মস্তিষ্কে গজিয়ে উঠলো আর একটি আষাঢ়ে গল্পের আগাছা—শান্তিনিকেতনে ওঁর একটি বাগান-ঘেরা বাড়ি আছে। একজন ওড়িয়া মালি সে বাগানের দেখভাল করে। তার নির্দেশমতো নানান-জাতের 'উইড-কিলার' উনি পাঠিয়ে দেখেছেন, কোন কাজ হয়নি। 'উইড-কিলার' মাটিতে মিশিয়ে আগাছা নির্মূল করা যায় না আদৌ। এই নাকি ওঁর অভিজ্ঞতা।

অর্থাৎ সেই একই ট্যাকটিক্স—প্রতিবাদের ইন্ধন জোগানো।

ছেদিলাল দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানায়, না স্যার, আপনি কী-জাতের 'জহর' ব্যবহার করেছেন জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি, মেমসাহেব যা আনতেন তা খুবই কার্যকরী।

—কী 'জহর'? তোমার তো স্টক ফুরিয়েছে, কিন্তু খালি ডিব্বা কি আছে এক-আধটা?

ছেদিলাল জানালো, একটি ডিব্বার সিল খোলেনি সে, সরানো আছে। এই সাতবিঘা বাগানকে আগাছার হাত থেকে বাঁচানো যাবে না এটা ও বুঝে নিয়েছে। তাই একটি কৌটা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে 'সিমেটেরি'র জন্য। সেটা ছোট বাগান, সেখানেই শুয়ে আছেন ওর প্রাক্তন মালকিন এবং তাঁর বিস্তেদারেরা। ছেদিলালের মনে হয়েছে, আগামী বর্ষায় সেই কবরগুলি আগাছায় ভরে গেলে ওর ম্যাডাম-সাহেবা কবরের নিচেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন না—তাই একটি ডিব্বা সে সযত্নে সরিয়ে রেখেছে সিল না খুলে। মামুর আগ্রহে ডিব্বাটা এনে সে দেখালো। বললো, এটা কিনে দেখুন স্যার, নিশ্চিত কাজ দেবে।

বাসু যত্ন নিয়ে কৌটাটিকে পরীক্ষা করলেন। তার গায়ে লেখা লিটারেচার পড়লেন। নির্মাণকারী সাবধানবাণী ছাপিয়েছেন—এটি 'বিষ', আর্সেনিক বিষ আছে এতে। উনি বললেন, না এটা কখনো পরখ করে দেখিনি। তা এ বিষ কতটা খেলে মানুষ মরে যায়?

ছেদিলাল হেসে ফেলে। বলে, আপনিও যে ছোটোসাবের মতো জেরা শুরু করলেন!

—ছোটসাহেব' মানে?

ছেদিলাল হাসতে হাসতেই জানালো দু-তিন মাস আগে ঠিক এক জাতের প্রশ্ন করেছিলেন ছোটোসাব, মানে সুরেশ হালদার ঃ কতটা দাওয়াই খেলে মানুষ গুজর যায়। ছেদিলাল সুরেশকে হাফ-প্যান্ট-পরা যুগ থেকে দেখেছে। প্রাণচঞ্চল যুবকটির প্রতি তার একটা স্নেহমিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। জবাবে সে বলেছিল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ছোটাসাব? তুমি কি কাউকে বিষ খাওয়াবার মতলব ভাঁজছো? তাতে নাকি ওর ছোটাসাব জানিয়েছিল, 'এখন নয়। পরে হয় তো দরকার হবে। ধর আমি ভবিষ্যতে যাকে বিয়ে করবো তাকে যদি পছন্দ না হয়?' ছেদিলাল নাকি তখন তাকে ধমক দেয়, অমন অলুক্ষণে কথা বোলা না ছোটাসাব! যে লছমীজির সাথে তোমার সাদি হবে—এ বাড়ির বহুরাণী—তার সম্বন্ধে অমন কথা রসিকতার ছলেও বলা উচিত নয়।

বাসু হঠাৎ বলেন, কিন্তু এ ডিব্বার সিল তো খোলা?

ছেদিলাল একটু অবাক হলো। কৌটাটি হাতে নিয়ে বললে, আরে হ্যাঁ, তাই তো! তাহলে নিশ্চয় খুলেছিলাম কখনো অন্যমনস্কভাবে। হ্যাঁ, তাই—এই দেখুন, অনেকটা খরচও করে ফেলেছি।

কৌটার ঢাকনি খোলার পর নজর হলো বেশ খানিকটা খরচ হয়ে গেছে।

বাসু বলেন, কবে খুলেছো তা মনে পড়ছে না?

—জী না। হয়তো অন্যমনস্কভাবে—

—তোমার জেনানা খোলেনি তো?

—জী না। ও এসবে হাত দেয় না। আমি বারণ করে দিয়েছি। আমিই নিশ্চয় খুলেছি বোধহয়। এখন মনে নেই।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বলি, এ তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ভ্যাল্যা সাপ বেরিয়ে পড়লো?

বাসু-মামু শুধু বললেন, হুঁ!

—মিস্ জনসনের মৃত্যু বর্ণনার মধ্যে 'আর্সেনিক-পয়েজনিং'-এর কোন সিমটম নজরে পড়েছে আপনার?

মামু বোধহয় অন্য লাইনে চিন্তা করছিলেন। বলেন, কী বললে? না, আর্সেনিক বিষের কোনও লক্ষ্মণ নজরে পড়েনি আমার। আর্সেনিকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, সেকথা কেউ বলেনি। জ্বর হয়, তা অবশ্য জনডিসেও হয়।

—কিন্তু আপনার মনে আছে মামু, সেদিন সুরেশ বলেছিল—'বড়পিসির খাবারে আমি আর্সে... 'স্ট্রিক্‌নিন' বিষ মেশাইনি?

—না, ভুলিনি। অত ভুলো মন আমার নয়। কিন্তু সেই সূত্র ধরে বলা যায় না—সুরেশ ছেদিলালের ঘর থেকে উইড-কিলার চুরি করেছিল।

—কিন্তু ছেদিলাল নিজেই তো বললো, ছোট-সাহেব জানতে চেয়েছিল—কতটা ঐ বিষ খেলে মানুষ মরে যায়—

—ছেদিলালের স্টেটমেন্ট সত্যি হলে সেটা সুরেশের দিকে যায়। কাউকে হত্যা করার মতলবে সুরেশ যদি ঐ উইড-কিলার চুরি করে থাকে, তাহলে এটা কি প্রত্যাশিত যে, সে ঐ আনপড় মালিটাকেই এ প্রশ্ন করবে? কৌটার গায়েই লেখা আছে আর্সেনিকের পার্সেন্টেজ। কত গ্রেন আর্সেনিক ফেটাল-ডোজ সে তথ্যটা বার করা সুরেশের মতো শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কি এতই অসম্ভব?

আবার সব গুলিয়ে গেল আমার। বলি, তাহলে কোন্ বিষে মিস্ জনসনের মৃত্যু হলো?

—বিষের প্রতিক্রিয়াতে যে হয়েছে এ-কথা মনে করার কী যৌক্তিকতা? হয় তো জনডিসে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

—আমার বিশ্বাস হয় না! এ নিশ্চয় হত্যা।

বাসু-মামু হেসে ফেলেন। বলেন, ইয়া-আল্লাহ্! মনে হচ্ছে আমরা ক্রমাগত ঠাঁই বদল করে চলেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মিস্ জনসনের হত্যা রহস্যের কিনারা না করে তুমিই গোপালপুর যেতে চাইবে না, আর আমাকে তোমার পিছু পিছু টো-টো করতে হবে।

ওঁর এই জাতীয় রসিকতা আমার আদৌ ভালো লাগে না। কথা ঘোরাতে বলি, আর ঐ মিস্ বিশ্বাসের ব্যাপারটা? পিটার দত্তের বাবার ডায়েরিতে কোমাগাতামারুর উল্লেখ?

বাসু-মামু বললেন, সেটাও একটা দারুণ রহস্য! আমি যেটা বানিয়ে বানিয়ে বললাম সেটাই কেমন করে সত্যি হয়ে গেল?

এবার ঠ্যাঙটানার সুযোগ আমার। বলি, এমন দুর্লভ কাকতালীয় ঘটনা কি ঘটতে পারে না? ঘরপোড়া গরুর গোয়ালে দ্বিতীয়বার অগ্নিসংযোগ? হাজারে একটা?

বাসু-মামুও প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, বাঁয়ে টার্ন নাও। আমরা এবার নমিতা মেডিকেল স্টোর্সে যাব।

—আপনার মাসিমার জন্যে একজন ডে-টাইম নার্সের সন্ধানে?

—ঠিক তাই।
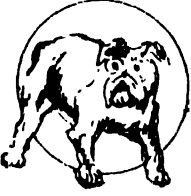
নমিতা মেডিকেল স্টোর্স একটি দ্বিতল বাড়ি। একতলায় ডিসপেনসারি, দ্বিতলে মালিকের ডেরা। শান্তি দেবীর কাছেই খবর পাওয়া গেছে, পুরকায়স্থ বিপত্নীক। তাঁর এক নাবালক পুত্র আর বিধবা কন্যাকে নিয়ে ওখানে থাকেন। দোকানটা বাজারের কাছাকাছি, গির্জার বিপরীতে। কাউন্টারে বসেছিল বারো-চোদ্দ বছরের একটি বালক। তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন বাসু-মামু, তোমার বাবা দোকানে নেই?

—না নেই। কাঁচড়াপাড়া গেছেন। আপনি কি কিছু ওষুধ কিনতে এসেছেন? প্রেসক্রিপশান না পেটেন্ট ওষুধ?

ভবানন্দ দত্ত মশায়ের ছেলের চেয়ে এ অনেক ছোট, কিন্তু দোকানদারিতে মনে হলো অনেক বড়।

মামু বললেন, 'রেডক্সন' আছে? আর 'ভিক্স ভেপোরাব'?

চট-জলদি ঐ দুটি দ্রব্য সে এনে দিল। ছোট একটি ঠোঙায় ভরে দামটা জানালো।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাসু বললেন, তোমার দিদিও কি বাড়ি নেই? আশা?

এবার ও বললে, না দিদি আছে। দোতলায়। ডাকবো? কেন ?

—হ্যাঁ, তাকে ডাকো। দরকার আছে। আমরা দোকানে আছি, তুমি দোতলায় গিয়ে খবর দাও।

ছেলেটি রাজি হলো না। বোধ করি অচেনা লোকের হেপাজতে দোকান ছেড়ে যাবার বিপদ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। তাই একটু পিছনে সরে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখে হাঁকাড় পাড়লো, দিদি, নিচে এসো একবার। তোমাকে দু'জন ভদ্রলোক খুঁজছেন।

একটু পরে নেমে এল মেয়েটি। শ্যামলা রঙ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। বেশ একটু স্থূলাঙ্গী। পরনে সাদামাটা মিলের শাড়ি। ড্রেস করে পরা। অল্প প্রসাধনের আভাস। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলে, বলুন?

—তুমিই আশা পুরকায়স্থ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—না, আমাকে তুমি আগে কখনো দেখনি। আমি কলকাতায় থাকি। ডক্টর পিটার দত্তের কাছে তোমার নাম শুনে দেখা করতে এসেছি। তাছাড়া মিস্ পামেলা জনসনও—শুনেছি, তুমি তাঁর নার্স ছিলে।

মেয়েটি স্বীকার করলো। বললে, তা আমাকে কেন খুঁজছেন?

ইতিমধ্যে একজন খদ্দের দোকানে এসেছে। মামু বললেন, কোথাও বসে আলোচনাটা হতে পাবে?

আশা বললো, তাহলে ওপরে আসুন। দাঁড়ান, ইনি কী চাইছেন আগে দেখি।

আগন্তুক খরিদ্দারকে বিদায় করে আশা আমাদের দ্বিতলে নিয়ে এসে বসালো। মনে হয় দোতলায় দু'খানি শয়নকক্ষ—একটি বাপ-বেটার, একটি আশার। ঘরটা পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। সস্তা আসবাব, ছাপানো শাড়ির পর্দা, দেওয়ালে দু-একটি ফটো ও ক্যালেন্ডার, কিন্তু কেরোসিন কাঠের টেবিলের টেবল্-ক্লথে সুন্দর সূচীশিল্পের নমুনা—মাটির ঘটে স্থলপদ্ম। আশা বললে, এবার বলুন?

মামু তাঁর কাঁচড়াপাড়াবাসী মাসিমার কথা বিস্তারিত জানালেন। তাঁর বয়স, রোগ মেজাজ দেখা গেল প্রয়াত মিস জনসনের অনুরূপ। শোনা গেল, তাঁর বাড়িতে চাকর আছে, ঠিকে ঝিও আছে—কিন্তু বৃদ্ধার পুত্র-পুত্রবধূ দুজনেই চাকরি করেন। তাঁরা নিঃসন্তান। তাই দুপুরে একজন কাউকে বাড়িতে রাখতে পারলে ভালো হয়। চাকর অবশ্য থাকে—কিন্তু বৃদ্ধাকে ধরে ধরে বাথরুমেও নিয়ে যেতে হয়। মামু তাঁর কাহিনীর উপসংহারে বললেন, তোমাকে খোলাখুলিই সব কথা বলবো, আশা। মাসিমা লোক ভালো, কিন্তু ইদানীং তাঁর মেজাজ খুব তিরিক্ষে হয়ে গেছে। এর আগেও আমরা দু-একটি নার্সকে রেখেছি—পাশ করা নার্স নয় তোমার মতো, কিন্তু তারা টিকতে পারেনি। উনি আসলে চান না ওঁর বৌমা চাকরি করে; কিন্তু...

আশা বললে, বুঝেছি। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। এমন কেস আগেও পেয়েছি অনেক।

মিস্ জনসনের কাছে সে দৈনিক কত পেতো সেটা মামু জানতে চাইলেন। এ কথাও বললেন, তার সঙ্গে আশার ক্ষেত্রে রিক্সাভাড়াটাও যোগ করতে হবে।

কথাবার্তা স্থির হলো। আশা জানালো, তার হাতে এখন আর কোনও রোগী নেই। সে কাল বাদে পরশু থেকেই জয়েন করতে পারে। মামু বললেন, আমার মাসতুতো ভাই আর তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি তাহলে। যদি ওরা রাজি হয় তাহলে কাল সকালে আমি বা অন্য কেউ এসে তোমাকে খবর দেবো। কাল যদি কেউ না আসে তাহলে বুঝতে হবে ওরা রাজি হলো না। কেমন?

আশা সম্মত হলো। মামু এবার কথাপ্রসঙ্গে মিস্ জনসনের অসুখের কথা তুললেন। সেই সাদা-সাদা ট্যাবলেটের নাম, ক্যাপসুলের পরিচয় জানা গেল। আশা জানালো, ঔষধ ও পথ্য শেষ সপ্তাহে— অর্থাৎ সে বহাল হওয়ার পরে—সে নিজেই খাইয়েছে। আরও জানালো, বছর দেড়েক আগেও একবার মিস জনসনের বাড়াবাড়ি রকম অসুখ হয়েছিল—ঐ একই অসুখ, জনডিস।

মামু বললেন, শুনেছি সে-কথা। স্মৃতিটুকু বলছিল—

—টুকুকে আপনি চেনেন? সে তো এখানে থাকে না।

—না, কলকাতায় থাকে। তা আমিও তো কলকাতার বাসিন্দা। তুমিও তাকে চেনো দেখছি।

—কেন চিনবো না? ও তো মেরীনগরেরই মেয়ে, না হয় কলকাতাতেই থাকে। স্মৃতিটুকুকে মেরীনগরের সবাই চেনে। দারুণ হ্যান্ডসাম মেয়ে।

মামু বললেন, হ্যান্ডসাম, তবে সুন্দরী নয়। বড় রোগা! একটু কাঠি-কাঠি ঢং।

আশা খুশি হলো। বললে। হ্যাঁ, ও একটু বেশি রোগা। আজকাল মেয়েরা রোগাই থাকতে চায়।

মামু মাথা নেড়ে বললেন, বেচারি একেবারে ভেঙে পড়েছে—ঐ স্মৃতিটুকু—সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার বড়পিসি তাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে যাবে।

আশা বললো, সে-কথা ঠিক। সারা মেরীনগর স্তম্ভিত হয়ে গেছিল বুড়ির উইলের বৃত্তান্ত শুনে। কেন যে উনি শেষ সময়ে সব কিছু মিস্টিকে দিয়ে গেলেন...

—তোমার কী বিশ্বাস? এমনটা কেমন করে ঘটলো? বুড়ি কি শেষ সময়ে তোমাকে কিছু বলেছিল?

—না। সেটা ম্যাডামের স্বভাববিরুদ্ধ—আই মিন, ঘরের কথা পরকে বলা। মন খুললে তিনি হয়তো একমাত্র উষা-মাসিমাকে কিছু বলতেন—তিনিই একমাত্র ওঁর বন্ধুস্থানীয়া। কিন্তু উষা-মাসিমাকেও তিনি নাকি কিছু বলে যাননি।

—'উইল' প্রসঙ্গে শেষদিকে তিনি কি কিছুই বলে যাননি?

—কী জানি! একটা ঘটনায় অবশ্য আমার মনে হয়েছিল উনি উইলের কথাই বলছেন। ওঁর মৃত্যুর ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায়। তবে 'উইল' শব্দটা উনি উচ্চারণ করেননি।

—কী বলেছিলেন তিনি? কাকে?

—মিস মাইতিকে। উনি মিন্টিকে বলছিলেন কী একখানা কাগজ নিয়ে আসতে। আর মিন্টি বলছিল, 'সে কাগজ তো এখানে নেই। আপনি উকিলবাবুকে রাখতে দিলেন, মনে নেই?' আমি তখন ঘরেই ছিলাম। মনে হলো, ম্যাডাম সে-কথার জবাবে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর একটা বমির বেগ এলো। আমি মিন্টিকে সরিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। ঘটনা এটুকুই। ঐ 'কাগজ' আর উকিলবাবুর সূত্র ধরে আমার মনে হয়েছিল—উনি উইলটার কথাই কিছু বলতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সবটাই আমার আন্দাজ।

মামু বলেন, মিনতি মাইতিকে উনি বোধহয় খুব ভালবাসতেন, তাই নয়?

—আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। মিন্টি একটা গবেট। গবেট বলেই পাক্কা তিন বছর সে টিকে থাকতে পেরেছিল। ম্যাডাম তাকে প্রায়ই বকাবকি করতেন, ও গায়ে মাখতো না।

—শেষ সময়ে উনি চীন দেশের মাটিতে ভাল ফুল হয় না—না কি-যেন বলেছিলেন, নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু সে তো ঘোর বিকারে।

নিচে থেকে আশার ছোট ভাই হাঁকাড় দিল ঃ দিদি! প্রেসক্রিপশান।

আমরা তিনজনে নিচে নেমে এলাম। মামুকে ইঙ্গিত করি—'এবার কেটে পড়া যাক?' উনি 'না'-এর ভঙ্গি করলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাইপে টোব্যাকো ভরতে থাকেন। প্রেসক্রিপশান সার্ভ করা শেষ হলে মামু বলেন, ভাল কথা মনে পড়লো। ডক্টর ঠাকুর, মানে হেনার স্বামী মিস্ জনসনকে একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন শুনলাম। ওষুধটা ওঁর খুব কাজে লাগে। তার একটা কপি পেতে পারি?

আশা একটু অবাক হলো। বললে, আমি তো শুনিনি। কে বললো?

—মিস্ জনসনই আমাকে বলেছিলেন। স্থানীয় ডিসপেনসারিতে সার্ভ করিয়ে নিয়ে যায়। এখানে হয়তো আরও ডিসপেনসারি আছে...

—না। মেরীনগরে এই একটিই ডিস্পেনসারি। অবশ্য কাঁচড়াপাড়া থেকে যদি সার্ভ করিয়ে এনে থাকেন তাহলে অন্য কথা।

মামু বললেন, তুমি একটু রেজিস্টারটা দেখে বলবে? তাহলে তার একটা কপি করিয়ে নিয়ে আমার ডাক্তারকে দেখাতাম—মানে মাসিমাকে সেটা খাওয়ানো চলে কিনা। একই অসুখ তো?

—কিন্তু তারিখ না জানলে আমি কেমন করে খুঁজে বার করবো?

—তারিখটা মনে আছে আমার। সম্ভবত আঠারই এপ্রিল, অথবা তারই কাছাকাছি।

আশা রেজিস্টারটা খুলে খুঁজতে থাকে। হ্যাঁ পাওয়া গেল। আঠারই এপ্রিল তারিখে ডক্টর প্রীতম ঠাকুরের প্রেসক্রিপশান মোতাবেক সার্ভ করা হয়েছে—না, কোনও তৈরি করা ওষুধ নয়, ঘুমের ওষুধ: 'কামপোজ'।

কিন্তু 'পেশেন্ট'-এর নামে 'মিস্ পামেলা জনসন' নয়, হেনা ঠাকুর। দৈনিক একটি ট্যাবলেট সেব্য—তিন সপ্তাহ ধরে।

মামু বললেন, না এটা নয়, ...

পরের পাতাতেই পাওয়া গেল প্রীতমের দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশান। মামু সেটা টুকে নিলেন।

নমিতা মেডিকেল স্টোর্স থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, চলো, এবার সুতৃপ্তিতে যাওয়া যাক।

আমি বাধা দিই—কেন মামু? আজ আবার সুতৃপ্তি কেন? কাঁচড়াপাড়ার দিদা যে আমাদের ভাত আগলে বসে আছেন?

—বুঝেছি। তা বেশ, চলো, কাঁচড়াপাড়াতেই কোনও রেস্তোরাঁয় আজ দ্বিপ্রাহরিক আহারটা সারা যাবে।

কিন্তু তাও আমাদের বরাতে নেই। বাধা পড়ল। ডক্টর দত্তের চেম্বারের কাছাকাছি একটি বিপরীতমুখো ফোর্ড গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতে কোনক্রমে ব্রেক কষি। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে মুখোমুখি—যাকে বলে, 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী।'

কিন্তু আমার পোড়া কপাল। ওদিকের গাড়ি থেকে যিনি নেমে এলেন তিনি 'লাবণ্য' নন, ক্ষ্যাপা ঘোষ!

গাড়ি চালানোর দোষ হয়ে থাকলে তা আরোহীর নয়, চালকের। কিন্তু আমাকে তিনি আক্রমণ করলেন না আদৌ। সোজা এসে বাসু-মামুকে চার্জ করলেন, আহ্‌! হিয়ার যু আর! মিস্টার টি. পি. সেন, অ্যালায়াস ব্যারিস্টার পি.কে.বাসু! এবার বলুন মশাই—কেন সেদিন আমার বাড়ি বয়ে এক গঙ্গা মিছে কথা বলে গেলেন—গুরুজিৎ সিং, কোমাগাতামারু, যোসেফ হালদার!

মামু দরজা খুলে নেমে এলেন। বলেন, ইয়েস ডক্টর। একটা কৈফিয়ৎ আমার দেওয়ার আছে। আপনার কাছেই আসছিলুম। চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে বসি। তার আগে গাড়ি দুটো সরিয়ে পথটা ফাঁকা করুন।

ওঁর ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা। মামু বলেন, আমার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো—কেমন করে জানলেন যে, আমি সাংবাদিক নই, ব্যারিস্টার?

—শুধু ব্যারিস্টার নন। গোয়েন্দা!

—বেশ তাই সই। কিন্তু কেমন করে জানলেন?

—আপনি কি ভেবেছেন আপনিই দুনিয়ার একমাত্র গোয়েন্দা? মেরী নগরেও গোয়েন্দা আছে: সে প্রথম থেকেই চিনতে পেরেছে আপনাকে—আমি ঊষার কথা বলছি—ঊষা বিশ্বাস।

আমি সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করি : মিস মার্পল্ অব মেরীনগর!

কথাটা কানে গেল ডক্টর দত্তের। আমার দিকে ফিরে বলেন, কারেক্ট। ঊষা হচ্ছে মেরীনগরের মিস্ মার্পল। দারুণ বুদ্ধি তার। আপনার ছবি দেখেনি, কিন্তু চিনেছে ঠিকই!

—কিন্তু কেমন করে?

—গোয়েন্দা যে! নানান কায়দা-কানুন করে। সেসব কথা তার কাছেই শুনবেন। এখন বলুন তো মশাই—কেন সেদিন এক গঙ্গা মিথ্যা কথা বলে গেলেন?

মামু একটি মাত্র শব্দে কৈফিয়ৎ দাখিল করলেন : অ্যাটেম্পটেড-মার্ডার!

—কী? কী বললেন? 'অ্যাটেম্পটেড-মার্ডার' মানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ: খুনের চক্রান্ত! মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে মিস্ জনসন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন—মনে আছে নিশ্চয়...

—আলবৎ! ওর সেই হতভাগা কুকুরের বলটায় পা-পড়ায়...

—আজ্ঞে না! ওঁর পদস্খলনের হেতু—সিঁড়ির মাথায় কেউ গোপনে আড়াআড়িভাবে একটা কালো রঙের টোন সুতো টান-টান করে বেঁধে দিয়েছিল। 'সারমেয় গেণ্ডুক' সম্পূর্ণ নির্দোষ!

ডক্টর দত্ত নির্বাক তাকিয়ে রইলেন। সিলিং ফ্যানটার দিকে। তাঁর স্ত্রী বর্তমান কি না জানি না। কিন্তু ওঁর সেই হতভম্ব দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল মিসেস দত্তকে কেউ চুলের মুঠি ধরে সিলিং ফ্যানটার সঙ্গে

বেঁধে দিয়েছে। ধর্মপত্নীকে আকাশপথে ঘূর্ণ্যমাণ অবস্থায় দেখছেন উনি! লুল্লু নয়, কোমাগাতামারু নয় — এবাব সারমেয়-গেণ্ডুক!

আত্মস্থ হয়ে অস্ফুটে বললেন, এ-কথা কে বললে আপনাকে?

—আমাকে কে বললো সে-কথা উহ্য থাক, আপনাকে বলছেন, পি. কে. বাসু, গোয়েন্দা— টি. পি. সেন, সাংবাদিক, নন!

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে উনি বললেন, তাহলে পামেলা আমাকে সে-কথা বলেনি কেন?

—তার হেতুটা সহজবোধ্য। বাত দশটার পর মরকতকুঞ্জে যে ক'জন ছিল তারা সবাই ওঁর নিকট-আত্মীয়, পরিবারের লোক! এবং ওঁর ওয়ারিশ!

মিনিটখানেক নীরব থেকে উনি বললেন, তা সত্ত্বেও! আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সে আমাদের দুজনের মধ্যে অন্তত একজনকে বলতো! আমি অথবা উষা। আপনি সম্পূর্ণ বাইবের লোক...

মামু গম্ভীরভাবে বলেন, ডক্টর দত্ত! নিজের দেহে ক্যান্সারের লক্ষণ আশঙ্কা করলে মানুষে নিকট-আত্মীয়েব কাছে তা গোপন করে, অকুণ্ঠভাবে জানায় সম্পূর্ণ বাইরের লোক, ডাক্তারকে। ঠিক তেমনি, নিজের পরিবারের মধ্যে হত্যাকারীর লক্ষণ দেখলে মানুষ তা ডাক্তারের কাছে গোপন করে, জানায় গোয়েন্দাকে!

আবাব বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন ডক্টর দত্ত। তারপর বললেন, পামেলা আমার বাল্যবান্ধবী, আমার ছোট বোনের মতো। আমার দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছে সব কিছু জানতে। কিন্তু না, তা আমি জানতে চাইবো না। শুধু একটা কথা বলুন, কে সেই দড়িটা খাটিয়েছিল তা কি আপনি আন্দাজ করতে পারেননি?

—আমাকে মাপ করবেন ডক্টর দত্ত। আমার মক্কেলের নির্দেশ ছিল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে!

—কিন্তু আপনাব মক্কেল—যদি পামেলাই হয়—সে তো মৃত।

—মৃত্যুর পর আপনি কি জানাতে পারেন আপনার কোন্ রুগী সিফিলিসে ভুগছিল?

—আই সী! না, প্রফেশনাল এথিক্সে তা আমাকে গোপন রাখতে হয়। কিন্তু তদন্তটা তাহলে এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনার মক্কেল তো মৃত।

—একজ্যাক্টলি ডক্টর, একজ্যাক্টলি! ওখানেই আপনার প্রফেশনের সঙ্গে আমার প্রফেশানের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য। আপনার জীবিকার পূর্ণচ্ছেদ রোগীর মৃত্যুতে, আমার জীবিকার প্রারম্ভ—ক্ষেত্রবিশেষে, মক্কেলের মৃত্যুতে। প্রফেশনাল এথিক্সের নির্দেশে তদন্তটা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে—মক্কেল পেমেন্ট করুক না বা করুক। মৃত্যুর পরে ডাক্তারের সঙ্গেও রোগীর যে একটি গোপনতার সম্পর্ক থাকে তা তো এইমাত্র আপনি স্বীকার করলেন!

—বুঝলাম। ওয়েল, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—আমার জিজ্ঞাস্য: প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে কি দ্বিতীয়বার সে-চেষ্টা করেনি সেই অজ্ঞাত আততায়ী?

—মানে, পামেলার মৃত্যু অস্বাভাবিক কিনা? না ব্যারিস্টার-সাহেব। পামেলার মৃত্যু নিতান্ত স্বাভাবিক—দীর্ঘদিন জনডিস রোগে ভুগে।

বাসু-মামু একটু ঝুঁকে এলেন। ছেদিলালের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। মনে হচ্ছিল, সমস্ত কথোপকথনটা যেন ওঁর মস্তিষ্কে কোনও গ্রে-সেলের ক্যাসেটে রেকর্ড-করা আছে!

আদ্যন্ত শুনে বৃদ্ধ বললেন, বুঝেছি, কী বলতে চাইছেন। হ্যাঁ, এমন নজির আছে বটে—পারিবারিক চিকিৎসক 'আর্সেনিক পয়েজনিং' ধরতে পারেনি! ভেবেছে 'অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক এন্টেরাইটিস'। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। দু-একবার বমি করেছিল বটে, কিন্তু পেটে যন্ত্রণা ছিল না। আর্সেনিকের লক্ষণ কিছু

পাইনি। নাঃ! আমি নিশ্চিত—পামেলার মৃত্যু হয়েছিল 'জনডিস'-এ; আরও পরিষ্কার ভাষায় ঃ 'ইয়ালো অ্যাট্রপি অব দ্য লিভার'। আর্সেনিক নয়।

বাসু-মামু তাঁর সেই ম্যাজেশিয়ানি ঢঙে পকেট থেকে বার করলেন এক খণ্ড কাগজ। বললেন, দেখুন তো—এতে আপত্তিকর কিছু আছে?

ডক্টর দত্ত খুঁটিয়ে দেখলেন। বলেন, ডক্টর প্রীতম ঠাকুরের প্রেসক্রিপশন দেখছি। আশ্চর্য! পামেলা তো আমাকে একথা কিছু বলেনি—

—বলেননি সঙ্গত কারণেই। যেহেতু এ ওষুধ তিনি আদৌ খাননি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন তো—এতে আপত্তিকর কিছু আছে?

ডক্টর দত্ত আবার প্রেসক্রিপশনটা খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, না নেই! আমি অবশ্য এই জাতের আসুরিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী নই—বিশেষত বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে, ক্রনিক কেস-এ। কিন্তু আমি হচ্ছি ওল্ড স্কুলের চিকিৎসক; রাতারাতি বাজিমাৎ করা আমার ধাতে নেই। তরুণ চিকিৎসকেরা আশু ফল পাওয়ার আশায় এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন—রোগীর সিসটেমে তা দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নে ক্ষতি করলেও। যা হোক, এতে আপত্তিকর কিছু নেই—অ্যাট লিস্ট আর্সেনিকের নামগন্ধ নেই।

—সেকেন্ডলি, আপনি যদি মনে করেন আপনার কোনও ইনসমনিয়া রোগীকে দৈনিক একটা করে 'কামপোজ' খেতে হবে তিন সপ্তাহ ধরে, তাহলে আপনি কি একুশটি ট্যাবলেটের প্রেসক্রিপশন একসঙ্গে করেন?

দত্ত সাহেব বললেন, এখনি সেই কথাই বলেছি। ঐ জাতীয় আসুরিক চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই। ইনসমনিয়ার ক্রনিক রোগীকে তিন-সপ্তাহ ক্রমাগত একটি করে 'কামপোজ' খাবার পরামর্শ আমি দিই না। এতে দেখা যায়, এরপর দৈনিক দুটো করে খাবার দরকার হয়! তাছাড়া একসঙ্গে দু-পাতা ঘুমের ওষুধ কিনে বাড়িতে রাখাও বিপদজনক। ঘুম-না-আসার যন্ত্রণায় রোগী কখনো কখনো একসঙ্গে বেশি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে—হয়তো ভুল করে—আপনি নিশ্চয় জানেন ওভারডোজ হলে রোগীর ঘুম আদৌ ভাঙে না। তা এই অদ্ভুত প্রশ্নটি করলেন কেন?

—ধরুন জ্ঞানবৃদ্ধিমানসে।

—বুঝেছি। এটাও আপনার প্রফেশনাল সিক্রেসি। যা হোক আরও কোনওভাবে আপনার প্রচেষ্টায় আমি কি সাহায্য করতে পারি? আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করছি, মিস্টার বাসু! পামেলা চিরশান্তির দেশে চলে গেছে। তার মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে মরণের পথে ঠেলে দেবার ঐ জঘন্য চক্রান্ত যদি কেউ করে থাকে—সে ব্যর্থ হোক না হোক—তাহলে তাকে আপনি খুঁজে বার করুন! তার প্রাপ্য শাস্তিটা পাওনা আছে! পামেলা আমার বাল্যবান্ধবীই শুধু নয়, তাকে... ওয়েল, স্বীকারই করি... আমি ভালোবাসতাম!

—থ্যাঙ্কস্ ফর য়োর ক্যানডিড্ কনফেশান ডক্টর! তাহলে আপনাকে আর একটি উপকার করতে হবে। আমার অনুসন্ধান কার্যের একটি অন্তরায়কে সরিয়ে দিতে হবে।

—বলুন?

—আপনাদের ঐ 'মেরীনগরী মিস্ মার্পল'কে রুখতে হবে। গোয়েন্দার পিছনে তিনি ক্রমাগত গোয়েন্দাগিরি করে গেলে আমার পক্ষে কাজটা কঠিনতর হয়ে উঠবে।

—আই সী! হ্যাঁ, উষা মাঝে মাঝে খুব বাড়াবাড়ি শুরু করে। কেন যে সে আপনার পিছনে লেগেছে আমি জানি না—

—তার তিনটি সম্ভাব্য হেতু। এক: বৃদ্ধার হাতে কাজ নেই, তাই খই ভাজতে বসেছেন। একা মানুষ, সময় কাটে না, তাই শৌখিন-গোয়েন্দার ভূমিকাটা গ্রহণ করেছেন। দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছে। দুই: মেরীনগরে তাঁর একটা সুখ্যাতি আছে—বুদ্ধিমতী বলে, ধূর্ত বলে। 'মিস্ মার্পল অব মেরীনগর'

তাঁব মুকুটে একটি নতুন পালক লাগাতে উদগ্রীব হয়েছেন। তিন: এক্ষুণি আপনি যে কথাটা বললেন, সেটা তিনিও বলতে পারতেন আপনার সম্বন্ধে...

—ঠিক বুঝলাম না। তৃতীয় যুক্তিটা কী?

—কিছু মনে কববেন না ডক্টর দত্ত—এ শুধু অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান: মিস্ বিশ্বাস, মিস্ জনসন আর আপনি বাল্যসহচর। আপনি মিস্ পামেলা জনসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়তো তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে, হয়তো তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে। মিস্ উষা বিশ্বাসের অবচেতনে তাই পামেলার প্রতি একটা ঈর্ষা, আপনার প্রতি একটা অভিমান অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে। এ অবশ্য আমাব নিছক অনুমান! তাই হযতো শুধু আপনাকে মোহিত করার জন্যই মিস্ মার্পল্ তাঁর বুদ্ধির দৌড় দেখাচ্ছেন। বাই দ্য ওয়ে—আপনার বাবার কোনও ডায়েরি কি আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

মনে হল, ডক্টর দত্ত অন্যমনস্ক হযে পড়েছেন। কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। মিনিটখানেক আত্মসমাহিত অবস্থায় নিশ্চুপ বসে থেকে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বলেন, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন?

—আমি সেবার চলে যাবার পর আপনি কি আপনার কোনও ডায়েরি...

হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠেন দত্ত-সাহেব। বলেন, ও নো নো! এটাও ঐ মিস্ মার্পল-এর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। আপনি চলে যাবাব পব সে আমাব বাড়িতে হানা দিয়েছিল। আমাকে—কী বলবো—যা নয় তাই বলে গালমন্দ করলো। আমি গবেট, আমার মাথায় গোবর পোরা ইত্যাদি! আমার নাকি প্রথম থেকেই বোঝা উচিত ছিল, আপনি যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে আদৌ আসেননি। আপনি টুকু, সুরেশ বা হেনা নিয়োজিত একজন গোয়েন্দা। এসেছেন, পামেলার মৃত্যু অথবা উইল সম্বন্ধে কোনও রহস্য উদ্‌ঘাটনে। সে নিজেই ঐ টোপটা ফেলতে চেয়েছিল—যাতে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন সেও উপস্থিত থাকবে। আমরা দুজনে গোয়েন্দার মুখোসটা খুলে আপনাকে বেইজ্জত করবো।

মামু বলেন, কিন্তু আমাব পরিচয়টা মিস্ বিশ্বাস কেমন করে পেলেন?

—সহজেই। মিন্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাকে নাকি আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

ঠিক তখনই ডাক্তার-সাহেবের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। উনি বসেছিলেন যে চেয়ারে তার পাশেই টেলিফোন রিসিভারটা। তুলে নিয়ে উনি আত্মপরিচয় দিলেন।

এবারও সে সময় আমরা এক প্রান্তের কথাই শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আলাপচারির পর ডাক্তাব-সাহেব আদ্যন্ত কথোপকথনটা আমাদেব জানিয়েছিলেন। এবারেও পাঠককে বঞ্চিত করবো না। দু-প্রান্তের কথাই পরপর সাজিয়ে দেওয়া যাক।

—হ্যালো? ডক্টর দত্ত বলছি!

—টিক্‌টিকি কি তোমার বাড়িতে?

—কে, উষা? 'টিকটিকি' মানে?

—'ডিটেকটিভ' শব্দটার বাংলা পরিভাষা 'টিকটিকি' তাও জানো না? তোমার বাবার ডায়েরির খোঁজে কি টিকটিকি-সাহেব ওখানে যায়নি?

—হ্যাঁ, এসেছিলেন তো। এই একটু আগে চলে গেলেন।

—ইস্! নাটকীয় দৃশ্যটা আমার দেখা হলো না। তা তুমি ওর নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছো তো?

—ঝামা! মানে? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমার কথা তো পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি বুঝতে পারলে না পিটার। সে আবার আজ নতুন করে কী বুঝবে! ও কী বললো? মিস্টার কোমাগাতামারু?

—শোনো উষা। তুমি পার্টলি কারেক্ট। ভদ্রলোক স্বীকার করেছেন, ওঁর নাম পি. কে. বাসু। ং. পি. সেন নয়। ছদ্মনাম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে—

—হুঁ! কিন্তু কোন ব্যাপার? 'মৃত্যু' না 'উইল'?

—আরে না, না! মিস্টার বাসু আঙ্কল যোসেফের জীবনীটা সত্যই লিখছেন---

—এই যে বললে, 'ব্যাপারটা গোপন রাখতে'?

—তাই তো বলছি। মানে, মিস্টার বাসু চান না যে, কথাটা জানাজানি হয়ে যাক---আই মিন, উনি যোসেফ হালদার আর কোমাগাতামাকুর ওপর একটা রিসার্চ করছেন—

—টিকটিকিটা বুঝি তাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল তোমাকে? তোমার মাথায় নিরেট ষাঁড়ের গোবর। ও এই নতুন টোপটা ফেললো আর তুমি কপাৎ করে গিলে ফেললে? তা আঙ্কল হ্যারল্ডের ডায়েরির কথায় তুমি কী বললে?

—কী আবার বলবো? ডায়েরিটা ওঁর হাতে দিয়ে দিলাম।

—ডায়েরিটা! মানে?

—বাবার ডায়েরিটা—সেই যেটায় আঙ্কল যোসেফ আর কোমাগাতামাকুর কথা আছে!

—মানে!! এবার যে তোমাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হয় পীটার! ফিজিশিয়ান, হিল দাইসেলফ্! সকাল থেকে ক-পেগ টেনেছো?

—ও হো! আমারই ভুল। তোমাকে বলা হয়নি। আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স, উষা। তুমি সেদিন বলার পর আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। কোনটা ঠিক---তোমার কথা না কি সেই সাংবাদিক ভদ্রলোকের কথা। আমি পুরনো কাগজপত্র হাতড়াতে বসলাম। কী অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স দেখো—খুঁজে পেয়ে গেলাম বাবার একটা অতি জীর্ণ ডায়েরি—নাইনটিন ফোর্টিন-এর। তাতে যোসেফ-কাকার বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে, গুরুজিৎ সিং আর কোমাগাতামাকুর কথাও! তুমি কেমন করে এটা আন্দাজ করলে উষা? য়ু আর এ জুয়েল অব আ স্লুথ! আ জিনিয়াস!

এরপর নাকি মিনিটখানেক ও প্রান্ত সম্পূর্ণ নীরব।

—হ্যালো, উষা? হ্যালো? আর য়ু স্টিল দেয়ার?

মিস্ বিশ্বাস কোনোক্রমে বলেন, সত্যি কথা বলছো? পীটার? ডায়েরিটা কোথায়?

—মিস্টার বাসু নিয়ে গেলেন। বললেন, কয়েকটি পৃষ্ঠার ফটো-কপি করে ডায়েরিটা আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। তখন দেখাবো তোমাকে।

আবার কিছুটা নীরবতা। তারপর মিস্ বিশ্বাস শ্রান্তভাবে বলেন, সন্ধ্যাবেলা একবার আমার কাছে এসো দিকিন। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। মাথাটা কেমন যেন... আই মীন রীল করছে!

লুলু এবার মিস বিশ্বাসের চুলের মুঠি খামচে ধরেছে!

মধ্যাহ্ন আহার সেরে আমরা যখন দুজন কাঁচড়াপাড়া থেকে মরকতকুঞ্জে ফিরে এলাম তখনও রোদের তেজ কমেনি। বেলা সাড়ে তিনটে। একটু আগেই নাকি কলকাতা থেকে মিনতি মাইতি এসে পৌঁছেছে। আমাদের দেখে সে যথারীতি পাগলামো শুরু করলো। কীভাবে আমাদের যথোচিতভাবে

আপ্যায়ন করা যায়, তা সে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। প্রথমেই বললো, একটা কথা বাসুমামু। কাল আমার একটা দারুণ ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করতে হবে। বলুন, আমাকে ক্ষমা করেছেন?

—তোমার অপরাধটা কী আগে বলো? তারপর তো ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠবে।

—আজ রাত্রে আপনারা এখানে খেয়ে যাবেন। যাবারই বা দরকার কী? রাতে এখানেই থাকবেন কাল সকালবেলা ফিরে যাবেন। আপনার জন্য সব কিছু কলকাতা থেকেই বাজার করে এনেছি। শান্তি রান্না চড়িয়েও দিয়েছে—কিন্তু আমার এমন ভুলো মন, আপনাকেই বলা হয়নি। আমার উচিত ছিল রানী মামিমাকে আর সুজাতা বৌদিকেও নেমন্তন্ন করা। সবই ভুল হয়ে গেছে আমার।

মামু বললেন, ও! এই কথা! শোন মিনতি। আমরা দুজন তোমার নিমন্ত্রণ নিচ্ছি। রাতে এখানেই খাবো। তবে আজই আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে। উপায় নেই। তাই ডিনারটা যেন একটু আর্লি হয়, ধর সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তোমার রানী মামি আর সুজাতা বৌদি এখন কলকাতায় নেই—তুমি কাল তাদের নিমন্ত্রণ করলেও তাদের আনা যেতো না। কিন্তু আমরা এখনো তোমার দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়েই আছি। আমাদের বসতে বলবে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আসুন। বসুন! কী অন্যায় আমার! দোরগোড়াতেই আটকে রেখেছি!

আমরা বৈঠকখানায় এসে বসি। মামু জানতে চান—শান্তি কোথায়?

সে রান্নাঘরে ব্যস্ত শুনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, তুমি ঐখান বসো। তোমাকে যে কথাটা বলবো বলে এসেছি, তা এবার বলে ফেলি।

মিনতি এমনভাবে বসলো যেন সে শিবরাত্রির ব্রতকথা শুনতে বসেছে।

—তোমাকে সেদিন আমি বলেছিলাম যে, মিস পামেলা জনসনের একটি চিঠি আমি পেয়েছি। তুমি ধরে নিয়েছিলে সেই পাঁচখানা একশ টাকার নোট চুরি যাওয়ার বিষয়ে তিনি আমাকে তদন্ত করতে বলেছিলেন। সেটা ঠিক নয়। উনি আমাকে লিখেছিলেন অন্য একটি বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে—উনি কেমন করে সিঁড়ি দিয়ে উলটে পড়লেন।

—হ্যাঁ, সে-কথাও তো সেদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন। তাতে আমি বলেছিলাম—'তাতে তদন্ত করার কী আছে? সে তো ফ্লিসির সেই বলটাতে পা পড়ায়।'

আমি একটু অবাক হলাম। মিনতির এ জাতীয় স্মৃতিশক্তি আমি আশা করিনি। চকিতে আমার আবার সেই একই কথা মনে হলো—মেয়েটা কী? হাবাগোবা না ধূর্ত?

মামু এটা লক্ষ্য করলেন কি না জানি না। বললেন, না মিনতি! ফ্লিসির বলে পা পড়ায়, তাঁর পদস্খলন হয়নি। হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে—

—কিন্তু আমি যে দেখলাম, বলটা ম্যাডামের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

—কিন্তু কেমন করে এলো? রাত্রে সবাই শুতে যাবার সময় বলটা সিঁড়ির নিচে ছিল, অথবা ড্রয়ারের ভিতর—তাই নয়?

—না, ড্রয়ারে ছিল না। সিঁড়ির নিচেই ছিল। ম্যাডাম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সেটা নজর করেছিলেন। আমাকে বলেও ছিলেন ওটা তুলে রাখতে। আমি ভুলে গেছিলাম।

—তবেই দেখ। বলটা সিঁড়ির নিচে স্থির ছিল, উপরে নয়। বলটা কেমন করে একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল?

—ফ্লিসি-ই নিশ্চয় মুখে করে তুলে এনেছিল।

—তা কি সম্ভব? তোমার যখন দোতলায় উঠে যাচ্ছ তার আগে সদর দরজা বন্ধ হয়েছে। ফ্লিসি তার আগেই বাড়ির বাইরে গেছে। সে ফিরে এসেছিল ভোর রাত্রে। তাই নয়? তুমি চুপি চুপি তাকে দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে এসেছিলে। মনে পড়ছে? তার মানে বলটা ফ্লিসি মুখে করে উপরে নিয়ে যায়নি। যেতে পারে না। ফ্লিসির অ্যালেবাই প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তিটা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লাগলো ওর ব্যাপারটা সমঝে নিতে। যেন

ধাপে ধাপে পিথাগোরাস থিয়োরোমের প্রমাণটা প্রণিধান কবল। তারপব বললে, তাহলে বলটা কেমন করে দোতলায় এলো? তাতে পা পড়েই...

—না মিন্টি! তাতে পা-পড়ায় ম্যাডাম হড়কে যাননি। তাঁর পদস্খলন হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কেউ একজন সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপে আড়াআড়ি একটা কালো রঙের টোন সুতো বেঁধে দিয়েছিল। একদিক বাঁধা ছিল সিঁড়ির বেলিং-এ; অন্যপ্রান্ত একটা পেরেকে। দেওযালের দিকে পেরেকটা কেউ গেঁথে দিয়েছিল। তার মাথাটা ভার্নিশ করা।

এটা পিথাগোরাস থিয়োরেম নয়। দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির অঙ্কই নয়, স্ফেরিকেল ট্রিগনোমেট্রি। ওর বোধগম্য হলো না। শান্তি রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে কিনা পরখ করে নিয়ে আমরা তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলাম। স্কার্টিং-এর গায়ে পেরেকটা দেখিযে উনি বলেন, এই দেখো তাব প্রমাণ! এ পেবেকটা কতদিন আছে ওখানে?

বক্‌না বাছুরেব সেই দৃষ্টিটা ফিরে এল। ওব গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠানামা কবলো। তারপর বললে, আসুন, ঐ ঘরে গিয়ে বসি।

সেটা মিনতিব শয়নকক্ষ। এখন সে এ ঘরে শোয় না। কিন্তু ম্যাডামের জমানায় সে এই ঘরেই শুতো। ঘরে একটি জনকে-খাট, একটি আলনা, আর একটি কাঠের আলমারি, তাব গায়ে প্রমাণ সাইজ আয়না। আমবা কোথায় বসলাম সেটা ও ভ্রূক্ষেপ করল না। নিজে খাটে বসে রীতিমতো হাঁপাতে থাকে। অনেকক্ষণ পবে মনস্থিব করে বলে, আপনি বলতে চাইছেন... মানে কেউ ম্যাডামকে এভাবে...

—হ্যাঁ! সুতোটা যে খাটিয়েছিল সে জানতো—মাঝরাতে মিস জনসন উপর-নীচ করেন! তাঁর বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখেন না। সুতোটা কালো রঙ করা, যাতে চট কবে নজবে না পড়ে। সে লোকটা চেয়েছিল উনি যাতে উলটে পড়েন—মারা যান।

—মারা যান! তার মানে এটা তো খুন!

—মারা গেলে তাই বলা হতো। এখন একে আইনের ভাষায় বলা যায় 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার'—খুনের চক্রান্ত।

—কিন্তু... কিন্তু কে এমন কাজ কববে? সবাই তো ঘরের লোক, বাইবের লোক তো কেউ ছিল না।

—তা ছিল না। তবে সে বাত্রে ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনায যদি ওঁর মৃত্যু হতো, তাহলে তিনি দ্বিতীয় উইল করার সুযোগ পেতেন না। ঐ ঘরেব লোকেরাই তাঁব সম্পত্তিটা পেত—যে লোকটা মৃত্যুফাঁদ পেতেছে সেও সম্পত্তির ভাগ পেতো। নয় কি?

বজ্রাহত হয়ে গেল মিনতি। অন্তত তার মুখভঙ্গি দেখে তাই মনে হলো, যদি না সে অতিদক্ষা অভিনেত্রী হয়।

—এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? এটাই আমাকে তদন্ত করে দেখতে বলেছিলেন মিস জনসন। তিনি জানতেন—ঐ চারজনের মধ্যে একজন ওঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে স্মৃতিটুকু, সুরেশ, হেনা অথবা প্রীতম—ঠিক কে, তা তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওদের মধ্যেই আছে সেই শয়তানটা। আব সেই জন্যেই তিনি উইলটা পালটে ফেলেন। মিনতি জবাব দিলো না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই থাকলো।

—এখন বলো তো আমাকে, ঐ পেরেকটা কবে তোমার প্রথম নজরে পড়ে?

মিনতি এবারও জবাব দিল না। নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করল শুধু।

—যে পেরেকটা পুঁতেছে সে সম্ভবত মাঝরাত্রে কাজ সেরেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে। তুমি কি কোনও রাত্রে কাঠের গায়ে পেরেক ঠোকার আওয়াজ শুনেছিলে?

এবার ও গ্রীবাভঙ্গিও করলো না। মুখটা ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে তার। সে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে।

—অথবা কোনও রাত্রে কি ভার্নিশের গন্ধ পেয়েছিলে? টাটকা ভার্নিশের গন্ধ?

হঠাৎ মনস্থির করলো মিনতি। চট করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমি জানি বাসু-মামু—কে... কে এভাবে মৃত্যুফাঁদটা খাটিয়েছিল!

—তুমি জান? কী জান? কেমন করে জান?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি চিনতে পেরেছিলাম। আমি জানি।

—কী? কী দেখেছিলে নিজের চোখে? বলো, সব কথা খুলে বলো আমাকে।

এবার আর হড়বড় করলো না আদৌ। মোটামুটি গুছিয়েই বক্তব্যটা পেশ করলো :

তারিখটা সে মনে করতে পারলো না। তবে একটু মনে আছে তখন অতিথিরা সবাই মরকতকুঞ্জ এসে গেছেন—আর ঘটনাটা ঘটে ম্যাডামের পদস্খলনের আগে। সে রাত্রে ওর নিজেরও ঘুম আসছিল না। জেগে জেগেই বিছানাতে শুয়ে ছিল। ওর ঘরের দরজাটা খোলাই থাকে—যাতে ম্যাডাম ডাকলে ও শুনতে পায়। মাঝরাত্রে—কত রাত্রি সে জানে না—ও একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায়' ঠকঠক্... ঠকঠক... ঠকঠক্। ও প্রথমটা ভেবেছিল দোতলার কোন ঘরে মশারি টাঙানোর দড়িটা আচমকা খুলে গেছে। কোন ঘরেই খাট-পালঙ্কের সঙ্গে ছত্রি নেই। দেওয়ালে পেরেক খাটানো। মিনতির মনে হলো—কোন ঘরের পেরেক অসাবধানে উপড়ে এসেছে। ঘরের বাসিন্দা সেটা নতুন করে দেওয়ালে পুঁতছে। যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত। তাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না মনে নেই—একটু পরেই—কত পরে তা ও বলতে পারে না—একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল। বাল্যকালে সে নাকি অগ্নিদাহের কবলে পড়ে। তখন ওর বাবা-মা বেঁচে। ওদের খড়ো ঘরে আগুন লেগে যায়। সেই থেকেই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে ওর অবচেতনে একটা 'অবসেশন' আছে। প্রায়ই মাঝরাতে ও পোড়া-পোড়া গন্ধ পেয়ে উঠে বসে। সেদিনও ও উঠে বসলো খাটে। ভালো করে শুঁকে দেখল—না পোড়া-পোড়া গন্ধ নয়—রঙের গন্ধ। রঙও নয়, বছর খানেক আগে ম্যাডাম তাঁর সেগুন কাঠের কিছু ফার্নিচার পালিশ করিয়েছিলেন—সেই গন্ধটাই! মিনতি অবাক হল—মাঝরাতে এমন গন্ধ কোথা থেকে, আসছে? তখনই তার নজর পড়ে আলমারির গায়ে আটকানো প্রমাণ-সাইজ আয়নাটার দিকে। আয়নার ভিতর দিয়ে খোলা দরজার ওপাশে সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা দেখা যায়। একটা বালব সারারাতই জ্বলে। সেই আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেল—

—কী? কী দেখলে তুমি?

—ওকে! সিঁড়ির চাতালে নিচু হয়ে সে কিছু একটা জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছে। ঠিক এখন যেখানে পেরেকটা পোঁতা সেখানেই। আমি কিন্তু অবাক হইনি। আমার মনে হল, ওর হাত থেকে কিছু পড়ে গেছে, তাই কুড়িয়ে নিচ্ছে। হয়তো বাথরুমে গেছিল...

—কাকে দেখলে তুমি?

—দোতলায় একমাত্র ম্যাডামের ঘরে সংলগ্ন বাথরুম আছে। আর কোনও ঘরে তো নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন। ঠিক সে সময়ে আমার মনে পড়েনি যে, কোন ঘর থেকে বাথরুমে যেতে হলে সিঁড়ির দিকে আসার দরকার পড়ে না। কমন বাথরুমটা বারান্দার একেবারে উলটো দিকে...

—বুঝলাম। কিন্তু কাকে দেখলে তুমি? কে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছিল?

—টুকুদিকে।

—স্মৃতিটুকুকে?

—হ্যাঁ।

—মিনতি! তুমি যা বলছ তার গুরুত্ব বুঝতে পারছো? প্রয়োজনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে একথা বলতে হতে পারে।

হঠাৎ কী যেন হল মিনতির। বললে, প্রয়োজনে তাই বলব। ম্যাডাম স্বর্গে গেছেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে এভাবে খুন করতে চেয়ে থাকে তবে তার সাজা হওয়া উচিত।

—ঠিক কথা। কিন্তু ভেবে দেখো, ইলেকট্রিক বালবটা মাত্র কুড়ি ওয়াটের। সিঁড়িতে আবছা আলোই ছিল। তুমি ওকে দেখেছিলে ঘুম-ঘুম চোখে। তুমি আদালতে হলপ নিয়ে শুধু একথাই বলতে পারো যে, একটি নারীমূর্তিকে তুমি দেখতে পেয়েছিলে। সে স্মৃতিটুকু, হেনা বা শান্তি যে কেউ হতে পারে...

—না। শান্তি অমন নাইটি পরে না। তাছাড়া ওর ব্রোচটায় আলো পড়ায় চিকচিক করে উঠেছিল। হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওর কাঁধের ব্রোচে দুটো অক্ষর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমি ঃ T H.! টুকু হালদার। ছি-ছি-ছি! শেষকালে টুকুদি—

—উত্তেজিত হয়ো না মিন্টি। আগে আমাকে ব্যাপারটা সমঝে নিতে দাও। নাও, তুমি সরে এসো দিকিন। আমি ঐ খাটে শোবো। কোন দিকে মাথা করে শুয়েছিলে তুমি? এইদিকে? বেশ আমি শুচ্ছি। তুমি ঐ সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ চলে যাও তো। ঠিক যে ভঙ্গিতে ওকে কিছু কুড়িয়ে নিতে দেখেছিলে সেইভাবে কুড়িয়ে নেবার ভঙ্গি করো। আমি নিজে পরীক্ষাটা করে দেখতে চাই।

মিন্টিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর সে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় কিছু কুড়িয়ে নেবার অভিনয় করে ঘরে ফিরে এলো। বাসুসাহেব দেওয়ালের দিকে মুখ করে আয়নার ভিতর দিয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। তারপর বলেন, চল, এবার সবাই নিচে যাই। কিন্তু তার আগে আর একবার ভেবেচিন্তে বলো দেখি মিন্টি—তুমি সত্যিই স্মৃতিটুকুকে চিনতে পেরেছিলে? অত কম আলোয়?

—পেরেছিলাম। টুকুদিকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি! আমার ভুল হয়নি।
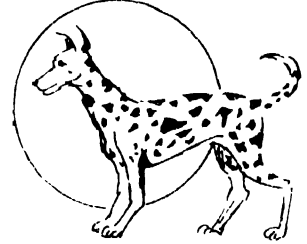
ফেরার পথে মামু একেবারে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। আমার দু-একটি প্রশ্নের জবাবে হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলেন। শুধু একবার উনি মন খুলে দু-চার কথা বললেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনার কি মনে হল—মিনতি মাইতি অত কম আলোয় ঠিকমতো চিনতে পেরেছিল স্মৃতিটুকুকে?' তার জবাবে উনি বললেন, ঐ কথাটাই ভাবছি আমি। শোনামাত্র আমার মনে হয়েছিল কোথায় কী যেন একটা অ্যাপারেন্ট ফ্যালাসি আছে...

—'অ্যাপারেন্ট ফ্যালাসি' মানে?

—আপাত-অসঙ্গতি—যা হবার নয়, তাই।

—একটা উদাহরণ দিন। তাহলে বুঝবো।

—ধরো কেউ যদি বলে, 'এ বছর গুড ফ্রাইডের ছুটিটা রবিবারে পড়ায় একটা ছুটির দিন কমে গেল', কিংবা 'জুলিয়াস সিজারের একটা স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে সালটা ছাপা আছে 55 B.C'.—যেটা হবার নয়। হয় না! তাই! তোমারও এমনটা মনে হয়নি?

—না তো! কোথায় দেখতে পেলেন সেই আপাত-অসঙ্গতি। কী জাতের অসঙ্গতি?

উনি অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠেন, কোথায়, কী জাতের মনে করতে পারলে তো বুঝেই ফেলতাম। মিন্টির ঐ ঘরটায়, মিন্টির ঐ স্টেটমেন্টে—

সমস্ত ঘটনা আব কথোপকথনটা আমি খতিয়ে দেখতে থাকি। অসঙ্গত কিছুই মনে করতে পারলাম না।

নিউ আলিপুরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। রাস্তায় বেশ জ্যাম ছিল। বেল দিতে দরজা খুলে দিল বিশু। কিন্তু তখনো নিস্তার নেই। বললে, এক দাড়িঅলা বাবু এসে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করছেন। কী যেন জরুরি দরকাব। আজ রাতেই কথাটা বলতে হবে। বিশু তাঁকে বসিয়ে রেখেছে বৈঠকখানায়। তাঁর নাম বলেছেন ডক্টর প্রীতম ঠাকুব।

মামু সেদিকে একপা এগিয়ে যেতেই বিশু পথরোধ করে বললে, আরও একটা কথা বাবু। সাঁঝেব বেলা আবও একজন দিদিমণি এসেছিলেন। কিছুতেই তাঁব নামটা জানালেন না। আপনি নেই শুনে চলে গেছেন। বললেন,পরে আসবেন। মনে হলো,তিনি খুবই চনমন করেছিলেন—যেন তাঁকে পুলিস কুকুরে তাড়া করেছে। বারে বাবে ইতি-উতি চাইছিলেন। চোর-চোব ভাবখানা!

বিশুর বযস বছর তের-চৌদ্দ। কিন্তু গোয়েন্দাদের বাড়িতে থাকতে থাকতে দারুণ শেয়ানা হয়ে উঠেছে। মামু জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটির বর্ণনা দে—

নিখুঁত বর্ণনা দিল বিশে: বয়স দিদিমণির কাছাকাছি (অর্থাৎ সুজাতার, আমার স্ত্রীর)। পরনে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। বেশ মোটা-সোটা। বাঁ ভুরুর উপবে একটা কাটা দাগ। রঙ মাজা, ফর্সা নয়, যদিও মুখে কীসব হাবিজাবি মেখে ফর্সা হয়েছেন।

মামু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকাব নোট বাব করে ওব হাতে দিলেন। মুখে শুধু বললেন, একসেলেন্ট। নে—

এক গাল হাসল বিশু। মামু আমার দিকে ফিবে বললেন, দ্বিতীয়বাব ওর গোপন কথাটা শোনাব সুযোগ হলো না, বুঝেছো নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। বাঁ ভুরুর উপর কাটা দাগেই শুধু নয়, মুখে হাবিজাবি মাখা থেকেই বোঝা যায় হেনা ঠাকুর আপনাকে সেই গোপন কথাটা বলতে এসেছিল।

আমরা প্রবেশ করতেই ডক্টর ঠাকুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি।

মামু আসন গ্রহণ করে বললেন, বিলক্ষণ! বলুন কী ব্যাপার? কফি খাবেন?

—না। কাজের কথাটা সেরেই চলে যাব। অনেক রাত হযে গেছে। আমি... মানে... হেনাকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছি!

—হেনাকে নিয়ে? কেন কী হয়েছে?

—আপনার কাছে আজ সে এসেছিল নিশ্চয়?

—না, আজ তো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার বাড়িতে আপনার সামনেই তাকে শেষ দেখেছি। কেন বলুন তো?

এবার উনি একটুও মিথ্যা বলেননি। ট্রুথ, হোলট্রুথ, নাথিং বাট দ্য ট্রুথ!

—ও! আমি ভেবেছিলাম, ও বুঝি আপনাব কাছেই ছুটে এসেছে।

—কেন? বিশেষ করে আমার কাছে আসার কোনও কারণ আছে নাকি?

—না, মানে ওর মানসিক অবস্থায়... ব্যাপারটা কী জানেন বাসু-সাহেব, আজ মাস-দুয়েক ওর একটা দারুণ মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। ও এমনটা ছিল না, হঠাৎ কী-জানি কেন সে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। সব সময় দারুণ ভয়ে ভয়ে থাকে। একটু শব্দ হলে চমকে ওঠে। ও যে মানসিক অসুখটায় ভুগছে তাকে বলে 'পার্সিকিউশন ম্যানিয়া'। ও কল্পনা করছে—কেউ সুপরিকল্পিতভাবে ওকে গোপনে হেনস্তা করছে। বিপদে ফেলতে চাইছে।

মামু যে শব্দটা করলেন তার ধ্বনিরূপ 'স্‌ত্, স্‌ত্'—সহানুভূতির দ্যোতক।

—তাই আমার মনে হয়েছিল ও বুঝি আপনার কাছে ছুটে এসেছে, না এসে থাকলে হয়তো কালই

সে এসে দেখা করবে, আমার বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল কিছু বলবে—আমাকে সে ভয় পাচ্ছে, আমি তার ক্ষতি করতে পারি এইসব আর কি।

—কিন্তু আমার কাছে কেন?

ডক্টর ঠাকুর মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, আপনি একজন স্বনামখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। সাধারণ লোকের ধারণা আপনি গোয়েন্দা। আপনি নিজে থেকে ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন—এটাকে সে ঈশ্বরের একটা আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছে। ওর এই মানসিক অবস্থায় একজন প্রখ্যাত গোয়েন্দার সঙ্গে এরকমভাবে পরিচিত হওয়াটাকে সে তার দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করছে। আমার মনে হয়, আজ যদি না এসে থাকে, কাল নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু হড়বড় করে বলে যাবে। 'পার্সিকিউশান ম্যানিয়া' অসুখে এই রকমটাই হয়। রোগীর সবচেয়ে কাছের মানুষের বিরুদ্ধেই অবচেতনে সবচেয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ জন্মায়।

মামু মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, কী দুঃখের কথা!

—হ্যাঁ, দুঃখের। অত্যন্ত দুঃখের! মিস্টার বাসু, আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি। প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাও আছে আমার। সে ভালবেসে আমাকে বিবাহ করেছে—স্বজাতি নই আমি, তবুও। কিন্তু আমি চিকিৎসক—এ রোগের লক্ষণ জানি, তাই বিচলিত হইনি। আমি জানি, চিকিৎসা করলে এ রোগ সারে। একটাই পথ আছে...

—কী পথ? কী চিকিৎসা?

—শান্ত পরিবেশে ওর মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করা। আমার একজন বিশ্বস্ত সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু আছে। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। ও বিদেশ থেকে মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট করে এসেছে—একটা মেন্টাল হোম খুলে বসেছে। হিমাচল প্রদেশে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসা হয় সেখানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাস তিনেকেই হেনা ভালো হয়ে যাবে।

—আই সি! —এমনভাবে কথাটা বললেন যাতে বোঝা গেল না তাঁর মনের ভাব।

—তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—ও যদি আপনার কাছে আসে তাহলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে আটকে রাখবেন, আর আমাকে খবর দেবেন।

—তার মানে? মিসেস ঠাকুর এখন কোথায়?

—আমি জানি না। সকালবেলাই সে বেরিয়ে গেছে। দুপুরে খেতে আসেনি। জানি না, কোথায় সে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বাচ্চা দুটো?

—আমার বোনের কাছে। ও যদি আপনার কাছে আসে আর আমার বিরুদ্ধে উলটো-পালটা কথা বলে তাতে কান দেবেন না, প্লিজ। সেটা ওর রোগের একটা লক্ষণ!

—বুঝেছি। না, দেবো না।

ডক্টর ঠাকুর বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালেন। মামু ফস করে বললেন, হেনার কি ইনসমনিয়া আছে? রাতে ঘুমায় না?

—না। ঘুমের তো ব্যাঘাত হয় না। তবে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে...

—আপনি কি ওর জন্যে ইদানীং কখনো 'কামপোজ' প্রেসক্রাইব করেছেন?

আমার মনে হল প্রীতম রীতিমতো চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলে, না তো! ঘুমের কোন ওষুধই ও কোনকালে খায় না। ইদানীং আমার দেওয়া কোন ওষুধই খায় না।

—বুঝেছি। আপনাকে বিশ্বাস করে না বলে! ভাবে, আপনি বিষ খাওয়াতে চান!

তৎক্ষণাৎ বদলে গেল ওঁর চেহারা। বলে, মানে! কী বলতে চান আপনি?

—'পার্সিকিউশান ম্যানিয়া'য় সে রকমটাই হবার কথা নয় কি? রোগী মনে করে তার অতি প্রিয়জন তাকে বিষ খাওয়াতে চাইছে!

ডক্টর ঠাকুর শান্ত হলো, ও হ্যাঁ, তাই বটে! আপনি রোগটার বিষয়ে জানেন দেখছি।

—তা জানি। আমার প্রফেশনেও এমন কেস তো মাঝেমধ্যে আসে দু-একটা। কিন্তু আপনাকে আর ধরে রাখবো না। হয়তো বাড়ি ফিরে দেখবেন আপনার জন্যে মিসেস ঠাকুর প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

—থ্যাঙ্কস! গুরুজি তাই করুন!

প্রীতম ঠাকুর আমাদের কাছে বিদায় নিযে বেরিয়ে গেল।

মামু তৎক্ষণাৎ তাঁর মানিব্যাগটা বার করলেন। একটা টুকরো কাগজ দেখে টেলিফোনে ডায়াল করলেন ঃ হ্যালো, হ্যালো... ইয়েস... ডক্টর ঠাকুর অথবা মিসেস ঠাকুর কি আছেন? ...ও আই সি!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, প্রীতমের বোন ফোন ধরেছিল। বললে, মিসেস ঠাকুর রাত আটটার সময় এসেছিল। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে, একটা সুটকেস সমেত ট্যাক্সি করে কোথায় বেরিয়ে গেছে। বোধহয় ডক্টর ঠাকুর এখনো সে-কথা জানে না।

আমি বলি, মামু, প্রীতম কি তার স্ত্রীকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে দিতে চাইছে? দুনিয়া থেকে যখন সরানো যাচ্ছে না, তখন অন্তত পাগলা-গারদে আটকে রাখা?

—শুধু তাই নয়, কৌশিক। হেনা 'পাগল' বলে প্রমাণিত হলে তাকে সাক্ষীর মঞ্চে তোলা যাবে না। তার সেই 'গোপন কথা'—যেটা সে বলবার জন্য বারে বারে আমার কাছে ছুটে আসছে—সেটা হয়ে যাবে 'পাগলের প্রলাপ'!

এদিকটা আমার খেয়াল হয়নি। বলি, কিন্তু প্রীতম জলজ্যান্ত মিথ্যাকথাটা বললো কেন? ঐ 'কামপোজ' প্রেসক্রিপশান ব্যাপারে? সে কিন্তু জানতে চায়নি 'এ-কথা মনে হল কেন আপনার?' অথবা 'কামপোজের কথা উঠছে কোন সূত্রে?' স্পষ্টতই সে আলোচনাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কেন?

মামু গম্ভীরভাবে বললেন, মুশকিল কী জান কৌশিক, আমি স্থিরভাবে সবগুলো 'ক্লু'-কে বিচার করতে পারছি না—আমার সবসময় মনে হচ্ছে, খুনীটা দ্বিতীয় খুনের চেষ্টা করবে—এভিডেন্সগুলো নষ্ট করতে। আমি এখন সেইদিকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সজাগ রেখেছি—কী করে দ্বিতীয় হত্যাটাকে ঠেকানো যায়।

এ আশঙ্কার কথা উনি আগেও বলেছেন। জানতে চাই, খুলে বলুন তো আমাকে—কাকে সন্দেহ করছেন আপনি? কে কাকে খুন করতে চাইছে?

—একটু চিন্তা করলেই তো বুঝবে। তুমি আমার কাছে শিক্ষানবিশ, তোমার অঙ্ক তুমিই কষবে, আমি তোমার হয়ে কষে দিতে পারবো না। এখন তো কেসটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। শুধু মিনতি মাইতির ঐ আপাত-অসঙ্গতিটা—জুলিযাস সিজার কেমন করে তার মুদ্রায় ছাপ মারে '55' বি.সি.? আমরা জানি, জুলিয়াস সিজার জীবিত ছিলেন পঞ্চান্ন বি.সি.-তে, কিন্তু সিজার নিজে তো জানতেন না যে, তাঁর পঞ্চান্ন বছর পরে যীশুখ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করবেন!

পরদিন সকালে সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর অ্যাপার্টমেন্টে যখন 'বেল' দিলাম তখন স্মৃতিটুকু নিজেই দরজা খুলে দিল। মনে হল, সে কোথায় বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সাত সকালেই দারুণ সাজের বাহার। ম্যাজেন্টা রঙের মুর্শিদাবাদী, ম্যাচ করা ব্লাউজ, চোখে ম্যাস্কারা, পায়ে হাই-হিল, হাতে ফুটানির বটুয়া।

মামু বললেন, অসময়ে বিরক্ত করছি মনে হচ্ছে। কোথাও বেরুচ্ছো?

টুকু মিষ্টি করে হাসল। বললে, আপনার 'ডিডাকশান' ভুল হয় না। তবে ঘণ্টাখানেক দেরী করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার একটা বদনাম আমার আছেই; সেটা সওয়া-ঘণ্টা হলে কেউ মূর্ছা যাবে না। আসুন, বসুন।

ড্রইং-রুমে দেখা গেল বসে আছে ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত। স্যুটেড-বুটেড। হয়তো দুজনে মিলে কোথাও যাচ্ছিল। স্মৃতিটুকু তার দিকে ফিরে বললে, ইনট্রোডাকশান বাহুল্য মনে হয়। মেরীনগরে এঁকে দেখেছ। তখন অবশ্য উনি সাংবাদিকতা করতেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহের জীবনী লিখতেন। নির্মল, তুমি বরং চলে যাও! ওদের গিয়ে বলো, আমি আধঘণ্টা পরে আসছি—একটা ট্যাক্সি নিয়ে!

নির্মল সংক্ষেপে বলল, আয়াম সরি, টুকু। এ আলোচনা আমারও শোনা দরকার।

দুজনে দু'জনের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপর টুকু একটু রাগত স্বরেই বললো, বেশ, থাকো। তুমি তো আমার কোন কথাই কখনো শোনো না।

টুকু এবার বাসু-মামুর দিকে ফিরে বলে, বলুন স্যার, এদিকে কদ্দুর কী হলো? উইলটা দেখেছেন শুনেছি। কিছু আশা আছে?

মামু নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন, আশা নেই, একথা বলবো না। তবে এখনই সব কথা বলতে পারছি না। দু'পক্ষই তো সবে 'কাসলিঙ' শেষ করলো! আরও দু-চার চাল খেলাটা এগিয়ে যাক।

স্মৃতিটুকু আন্দাজ করলো নির্মলের সামনে বাসু-মামু রেখে-ঢেকে কথা বলবেন। বললে, তাহলে আজ এ আবির্ভাবের হেতু?

—একটা কথা জানতে এসেছি। একটু ভেবে নিয়ে সঠিক করে বলো তো মিস হালদার—এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তোমরা মেরীনগরে যাবার পরে এবং তোমার বড়পিসির পদস্খলনের আগে, কোনো একদিন রাত্রে—সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর, তুমি কি সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিয়েছিলে?

স্মৃতিটুকু নির্বাক তাকিয়ে রইলো সেকেন্ড দশেক। তারপর বললো, প্রশ্নটা আর একবার করবেন?

মামু দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা পেশ করলেন থেমে-থেমে।

ও অবাক হয়ে বললে, এমন অদ্ভুত প্রশ্নের অর্থ?

—অর্থ যাই হোক। ভেবে নিয়ে বলো তো, এমন ঘটনা ঘটেছিল?

—না! নিশ্চয় নয়। আমি বড়পিসির মতো ইন্‌সমনিয়ায় ভুগছি না। বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু এর কি কোনও গুরুত্ব আছে?

—আছে। একজন বলছে যে, মাঝরাতে সে তোমাকে দেখেছে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিতে।

স্মৃতিটুকু রুখে ওঠে, যে বলছে সে ডাহা মিথ্যুক। আর যদি কুড়িয়ে নিয়েই থাকি, তাতে হলোটা কী? শিবঠাকুরের আপন দেশেও এমন আইন নেই যে মাঝরাতে সিঁড়িতে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিলে তিন মাসের জেল হবে!

মামু গম্ভীর হয়ে বললেন, প্লিজ ডোন্ট বি ফ্রিভলাস মিস্ হালদার। আমি রঙ্গরসিকতা করতে আসিনি তোমার সঙ্গে। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দাও—'গভীর রাত্রে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর মাথায় তুমি নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিয়েছিলে?' জবাবে কী বলবে? 'হ্যাঁ, না, অথবা মনে পড়ছে না।'

—টুকু প্রায় ধমকে ওঠে, না-না-না! না, টু-দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি!

নির্মল নড়ে চড়ে বসলো। বললে, মিস্টার বাসু, আপনি সওয়াল করেছেন, জবাবও পেয়েছেন। এবার কি দয়া করে জানাবেন—কেন এই অদ্ভুত প্রশ্নটা করছেন?

—জানাবো। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, মরকতকুঞ্জে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ কাঠের স্কার্টিঙের গায়ে একটা পেরেক পোঁতা আছে। তার মাথাটা ভার্নিশ করা, যাতে নজরে না পড়ে।

—কেন! ওখানে কেউ পেরেক পুঁততে যাবে কেন? কোনও তুক-তাক?

—না! মিস্ জনসনের বাহাত্তরতম জন্মদিনের পূর্বরাত্রে—সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর কেউ একজন একটা কালো সুতো টান-টান করে বেঁধে দিয়েছিল সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপে—নয় ইঞ্চি উঁচুতে।

—তাই বা কেন?

—যে দড়িটা খাটায় সে জানতো মিস জনসন রাত্রে উপর-নিচ করেন, তিনি চোখে ভালো দেখেন না! জানতো যে, পাঁচ বছর আগে মিস্ জনসন যে উইল করেছেন তার সে অন্যতম ওয়ারিশ।

—মাই গড! কী বলছেন এসব? উনি তো ফ্লিসির সেই হতভাগা বলটায়...

—আয়াম সরি! সে থিওরিটা ভুল। 'সারমেয় গেণ্ডুক' নির্দোষ। ইট ওয়াজ আ ডেলিবারেট অ্যাটেম্পট অন হার লাইফ!

পুরো এক মিনিট ঘর নিস্তব্ধ। শুধু সিলিং ফ্যানটার শব্দ। সবার আগে নির্মল কণ্ঠস্বর ফিরে পায়। বলে, আপনার এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কী যুক্তি!

বাসু-মামু সংক্ষেপে সবকিছু বর্ণনা করলেন—মিস্ জনসনের চিঠি, তাতে গোপনীয়তার বিষয়ে নির্দেশ, ফ্লিসির বলটা কোন যুক্তিতে সিঁড়ির মাথায় থাকতে পারে না। পেরেকের অস্তিত্ব, তার মাথায় ভার্নিশ করা। গন্ধটা দু'মাসেও যায়নি। পকেট থেকে মিস্ জনসনের চিঠিখানা বার করে তিনি ওদের দেখতে দিলেন।

স্মৃতিটুকুর মুখটা সাদা হয়ে গেল। কথা যোগালো না তার মুখে। নির্মলই বললে, কিন্তু আপনি হঠাৎ টুকুকে ঐ প্রশ্নটা করলেন কেন? ঐ সিঁড়িতে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেবার কথা।

মামু এবার অকপটে বললেন, মিস্ মাইতি তোমাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল।

—শি ইজ আ লায়ার! ড্যাম্‌ড লায়ার। আমি সিঁড়িতে পেরেক পুঁতিনি।

—তাহলে নিচু হয়ে কী কুড়িয়ে নিচ্ছিলে? পেরেক পোঁতোনি যখন।

আগুনঝরা চোখে টুকু মামুর দিকে তাকিয়ে বললে, মিস্টার বাসু! ডোন্ট আস্ক মী লীডিং কোয়েশ্চেনস্! আমি সিঁড়ির মাথায় আদৌ নিচু হইনি—কোনোদিন নয়, কোনো রাত্রে নয়।

—কিন্তু মিনতি তোমাকে চিনতে পেরেছিল। তুমি নীল নাইটি পরেছিলে, তোমার কাঁধে একটা ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ব্রোচ ছিল, তাতে T.H. লেখা!

—মাই গড! আপনি বিশ্বাস করলেন? আমি গোপনে মৃত্যুফাঁদ পাততে যাচ্ছি! আর পাছে আমাকে শ্রীমতী মাইতি চিনতে না পারেন তাই নিজের নাম-লেখা ব্রোচ কাঁধে সেঁটেছি।

—তোমার কাছে অমন একটা ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ব্রোচ আছে?

—আছে। দেখতে চান? ঠিক আছে, দেখুন—

দুম দুম করে স্মৃতিটুকু পাশের ঘরে উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এসে সে ব্রোচটা প্রায় ছুঁড়ে দিল বাসু-মামুকে লক্ষ্য করে। উনি সেকেন্ড-স্লিপে কোনোদিন ফিল্ড করেছেন কিনা জানি না। ব্রোচটা ঠিক লুফে নিলেন। মিনতির বর্ণনা মোতাবেক ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ব্রোচ : T.H. লেখা। অস্বীকার করে লাভ নেই, এই মাপের একটি ব্রোচ অত অল্প আলোয় চকচক করে নির্ভুলভাবে সনাক্ত হতে পারে।

মামু সেটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। ফেরত দেবার উপক্রম করতেই টুকু বলে ওঠে, থাক ওটা আপনার কাছে। ওটা আর আমি পরি না। এ জাতীয় ব্রোচ এখন 'ফ্যাশন'-এ দাঁড়িয়ে গেছে।

—'ফ্যাশন'-এ দাঁড়িয়ে গেছে। তার মানে?

—সবাই পরে। আমি 'স্টাইল'-এ বিশ্বাস করি। 'ফ্যাশন'-এ নয়। ওটা যখন কিনেছিলাম তখন সেটা কেউই পরতো না—একমাত্র অনারেবল এক্সেপশান মিস্ উষা বিশ্বাস! তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ রকম একটা ব্রোচ পরেন। তাই এই পুরাতন স্টাইলটা আমি ফিরিয়ে আনি। তারপর আমার দেখাদেখি খেঁদি-পুঁটি-হেনা সবাই ঐ জাতের ব্রোচ কিনেছে।

—হেনাও?

—হ্যাঁ! হেনাও। সে আমার নকল করেই সাজগোজ করে, লক্ষ্য করেননি?

—তা হবে। তা আমি এটা নিয়ে কী করব?

—রেখে দিন। আমার বিরুদ্ধে যদি 'কেস' সাজান তাহলে ওটাই হবে জবর এভিডেন্স। যা হোক, আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে! —টুকু উঠে দাঁড়ায়।

—আছে। মাদমোয়াজেল! 'একজিউমেশান'-এর একটা কথা উঠেছে। সেটার বিষয়ে—

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ে টুকু। বলে, এটা কি আপনার কীর্তি? কিন্তু কবর থেকে মৃতদেহ তুলতে হলে তো নিকটতম আত্মীয়দের অনুমতি লাগে—

—না! স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশে নিকট-আত্মীয়ের আপত্তি সত্ত্বেও কবর থেকে মৃতদেহ তোলা হয়। এমন নজির আছে।

—মাই গড! —টুকুর মুখখানা শাদা হয়ে গেল।

মিনিটখানেক কী ভেবে নিয়ে বললে, কিন্তু কেন? কী হেতুতে?

—কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেছেন, মিস্ পামেলা জনসনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

—কর্তৃপক্ষ, না আপনি নিজে?

মামু নীরব রইলেন। নির্মল বললে, অত উতলা হচ্চো কেন টুকু?

—য়ু শাট আপ। তুমি কী বুঝবে? য়ু আর নট আ রোমান ক্যাথলিক। তারপর মামুর দুটি হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে সে কাতরভাবে বললো, প্লীজ স্যার। এটা যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে! বুড়িটাকে সারা জীবন অনেক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে! আমরা... আমরা সবাই নীচ, স্বার্থপর... কিন্তু মৃত্যুর পর বুড়ির কঙ্কালটাকে টেনে তুলবেন না। তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দিন।

—এটাই তোমার অনুরোধ?

—অনুরোধ নয়, নির্দেশ। মাই ইন্সট্রাকশান্স। তাতে যদি আপনার 'কাসলিঙ' বিধ্বস্ত হয়ে যায় তো যাক! কবরের শান্তিকে কিছুতেই নষ্ট করা চলবে না।

—অল রাইট! তাই যদি তোমার নির্দেশ হয়।

* * *

নিচে নেমে এলে বলি, মামু, আমি ভাবছিলাম—

মামু আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন, ভাবো ভাবো ভাবতে থাকো। বাট প্লীজ ডোন্ট ডিসটার্ব মাই ঔন থট-প্রসেস। আমার চিন্তাধারায় বাধা দিও না। ওও সরে বসো। আমি গাড়িটা চালাবো। তুমি ভাবতে থাকো।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—নিউ আলিপুরে।

পিছনের সিটে বসলাম এবার। মনে হচ্ছে সমাধানে পৌঁছে গেছি। মামুর আশঙ্কাই ঠিক—মিস্ জনসনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর সেটা স্মৃতিটুকু জানে। না হলে কবর থেকে মৃতদেহকে ওঠানোর প্রশ্নে সে অমন শাদা হয়ে যেতো না। কৈফিয়ৎ যেটা দিয়েছে সেটা ধোপে টেকে না। মিস্ হালদার আধুনিকা—পিটার দত্ত, ঊষা বিশ্বাস বা মিস জনসনের মতো সে-আমলের মানুষ নয়। রোমান ক্যাথলিক ও নামেই—হযতো সাতজন্মে চার্চে যায় না! তাহলে মৃতদেহের উৎপাটনে সে কেন এত বিচলিত? কবরের শান্তি! সেটা আর যে কেউ বলুক—মিস টুকু হালদারের মুখে বেমানান। টুকু জানে—বড়পিসিকে কেউ খুন করেছে। সম্ভবত এটাও জানে—'কে' খুনটা করেছে। কে? সুরেশ? তাই কি তার ঠিকানা চাওয়াতে সে মিথ্যে করে বলেছিল সুরেশ বোম্বাই চলে গেছে? নাকি এটা নির্মল দত্তগুপ্তের কীর্তি? ডক্টর পীটার দত্তের পাঠানো ওষুধে কি সে এক পুরিয়া বিষ মিশিয়ে দেবার সুযোগ পায়নি? নির্মলের টাকার প্রচণ্ড দরকার—ওর সেই পেটেন্টটা নেবার ব্যাপারে। ওরা দুজনে মিলে কি এই কাজটা করেছিল? সিঁড়ির মাথায় মৃত্যুফাঁদটা খাটিয়েছিল নিশ্চয় টুকু। তাকে মিনতি স্বচক্ষে দেখেছে। পামেলা সে বাধা অতিক্রম করেছিলেন। তখন নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল

নির্মল—টুকুর যোগসাজসে। আর তাতেই ওদের দৃঢ় আপত্তি মৃতদেহটা কবর থেকে খুঁড়ে বার করে পরীক্ষা করানোতে! কিন্তু আমরা আবার নিউ আলিপুরে ফিরে যাচ্ছি কেন? প্রশ্নটা করাতে মামু বললেন, আজ সকালেই হেনা আবার আসতে পারে। এবার যেন তাকে মিস না করি—

হ্যাঁ! হেনা! হেনা ঠাকুর। কী তার গোপন কথা? স্বামী তাকে পাগল বানাতে চায়? কেন? কোন্ তথ্যটা হেনা জানে, যাতে তার স্বামী তাকে পাগলা-গারদে আটকে ফেলতে চাইছে? হঠাৎই একটা কথা মনে হলো! বলি, মামু! সবাই মিলে কিছু একটা করেনি তো?

—মিটিং করে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যার সিদ্ধান্ত? না, কৌশিক! এক্ষেত্রে তা হয়নি। একটি মাত্র মস্তিষ্ক কাজ করেছে এক্ষেত্রে—এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত। সর্বসম্মতিক্রমে তো নয়ই, এমনকি যৌথ প্রচেষ্টাও নয়।

—টুকু পেরেকটা পুঁততে পারে—কিন্তু বিষ প্রয়োগ—

—শোনো কৌশিক। মিনতি মাইতির গল্পটার তিন-তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক : মিনতি আদ্যন্ত সত্যি কথা বলেছে। দুই : মিনতি কোন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। তিন : সে যা বিশ্বাস করে তাই বলেছে—অর্থাৎ সে মিথ্যা বলেনি, কিন্তু তার ধারণাটাই মিথ্যে।

—আপনি তো স্মৃতিটুকুকে জিজ্ঞাসা করলেন না—মেরীনগরে যাওয়ার সময় সে ঐ ব্রোচটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল কি না?

—কী লাভ হতো? সে হয় সত্যি কথা বলতো, অথবা মিথ্যা! প্রমাণ তো নেই!

নিউ আলিপুরে পৌঁছে শোনা গেলো ইতিমধ্যে কেউ আসেনি।

মামু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে প্রীতমের বাড়িতে ফোন করলেন:

—হ্যালো, ডক্টর ঠাকুর? আমি বাসু বলছি... কোনো খবর পেলেন?... বলেন কী?... কাল রাত আটটায়?... বাচ্চাদের নিয়ে গেছে?... তা তো বটেই... আমি কি কোনও চেষ্টা করে দেখবো?... ও আচ্ছা আচ্ছা! উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক!

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, হেনা কাল রাত্রেই বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে সে তো জানোই। প্রীতম এখনো তার সন্ধান পায়নি। তবে সে আমার সাহায্য চাইছে না। সে নিজেই খুঁজে বার করতে পারবে বলছে। মিসেস ঠাকুরের কাছে টাকাকড়ি সামান্যই আছে—অর্থাৎ বেশিদিন সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

—আপনার কি মনে হয় হেনার সামান্য মস্তিষ্ক বিকৃতি সত্যিই হয়েছে।

—সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। পাগল হয়নি।

—তাহলে এখন আমরা কী করবো?

—খেয়ে নিয়ে কিছু বিশ্রাম। বিকালে মিনতির কাছে যেতে হবে।

—আবার মিনতি? ঐ তিনটে বিকল্প পথের কোনটা ঠিক যাচাই করতে?

—চলো খেয়ে নেওয়া যাক। বিকেল চারটেয় আমরা বের হবো।

বাসু-মামুর সঙ্গে কাজ করতে হলে ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রাখতে হয়। ঠিক চারটের সময় ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি উনি তৈরিই, তবে টেবিলে বসে কী-যেন লিখছেন তখনো।

—কী লিখছেন মামু? চিঠি?

উনি বাঁ-হাতটা তুলে আমাকে গোল করতে বারণ করলেন। চুপচাপ বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে থাকি। আরও মিনিট পনেরো লাগলো ওঁর চিঠিটা শেষ করতে। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বার করে চিঠিখানা ভরলেন। নজর হলো, চিঠিটা বেশ বড়—পাঁচ-ছয় পাতা। তার মানে দ্বিপ্রহরে উনি আদৌ বিশ্রাম নেননি। আশ্চর্য! খামটায় কাগজগুলো ভরে আঠা দিয়ে বন্ধ করলেন, কিন্তু উপরে ঠিকানা লিখলেন না, টিকিটও সাঁটলেন না। পকেটে ভরে ফেলে বললেন, চলো, এবার যাওয়া যাক।

আমি বলি, আপনি কিন্তু চিঠির উপর প্রাপকের নাম লেখেননি!

—আই নো হোয়াট আযাম ডুইং! —হেসে বললেন উনি।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, ও-কথা মিস্ জনসনও বলেছিলেন। তিনি কিন্তু খামের উপর নাম-ঠিকানা লিখেছিলেন, টিকিটও সেঁটেছিলেন। শুধুমাত্র ডাকে দিতে ভুলে যান।

—দ্যাটস্ আ গুড ওয়ান! চলো!

* * *

মিনতি আমাদের পেয়ে যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এবার অবশ্য তার উত্তেজিত হবার যথেষ্ট হেতু আছে। দোরগোড়ায় আমাদের রুখে দেবার। বললে, আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভালো হয়েছে। আপনাকে ফোন করবো কিনা ভাবছিলাম! ইতিমধ্যে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়েছে।

বাসু ওকে সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বলেন, ভীষণ কাণ্ড! কী?

মিনতি দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে ফিরে এলো। ফিসফিস্ করে বললে, ইয়ে হয়েছে... হেনা আমার কাছে পালিয়ে এসেছে!

—হেনা! পালিয়ে এসেছে? কোথায় সে?

শেষ প্রশ্নটাই আসল। সেটাকে এড়িয়ে মিনতি বাকি দুটো প্রশ্নের উপর একটা থিসিস রচনা করতে বসলো; হেনা তার স্বামীকে ভয় পায়... পাওয়ার কথা। কাবুলিওয়ালাকে সবাই ভয় পায়! ও যে কেমন করে অমন একটা দাড়িয়ালা ষণ্ডামার্কাকে বিয়ে করেছিল এটাই আশ্চর্য!... তবে এটা সে ভালোই করেছে... ঐ ডিভোর্স নেবার সিদ্ধান্ত। একথা ঠিক যে, হেনা নিঃস্ব, তার উপার্জন নেই—তা হোক, অমন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দেবে না মিনতি।... হ্যাঁ, লোকটা যদি কাবুলিওয়ালা না হতো, বাঙালি হতো...

বাসু-মামু ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না যে, প্রীতম ঠাকুর কাবুলিওয়ালা নয়, বললেন, হেনা এখন কোথায়?

—এই হোটেলেই। একতলার চার নম্বর ঘরে। আমরা বুদ্ধি করে হোটেলের খাতায় ওর নাম-ধাম সব বদলে দিয়েছি। যাতে সেই কাবুলিওয়ালাটা না খোঁজ পায়।

—ও কি কাল রাতে এসেছে? রাত সাড়ে-আটটা ন'টায়? ছেলেমেয়ে নিয়ে?

—না তো! সে এসেছে আজ সকালে। ছেলেমেয়েদের আনেনি। আজ ওবেলা নিয়ে আসবে। তারা আছে ওর এক বান্ধবীর বাড়ি। ভবানীপুরে, পদ্মপুকুর রোডে।

—তার মানে তুমি হেনাকে সাহায্য করবে বলে স্থির করেছো?

—করবো না? এ তো আমার কর্তব্য! আপনি সেদিন যা বললেন—ম্যাডাম যদি সেজন্যই তাঁর সর্বস্ব আমাকে দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে হেনা বেচারি অহেতুক শাস্তি পাচ্ছে! ফাঁদ পাতলো টুকু, টাকা হাতালো সুরেশ আর দু-দু'টো সন্তানের জননী বঞ্চিত হলো তার ন্যায্য পাওনা থেকে! আর বেচারীর কী কপাল দেখুন—ওর স্বামী এখন ওকে পাগলা-গারদে পাঠাতে চায়।

—তাই নাকি! ও বলছে?

—চলুন! ওর নিজ মুখেই শুনুন।

আমরা একতলায় নেমে আসি। চার নম্বর ঘরের রুদ্ধদ্বারে 'নক' করতে ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। মিনতি ইতিউতি দেখে নিয়ে অনুচ্চস্বরে বললে, হেনা ভয় নেই, দোর খোল, আমি মিন্টিদি—

এবার দরজাটা খুলে গেল। হেনাকে যেন চেনাই যায় না। চুল উসকো-খুসকো! প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় পাগলির মতো দেখতে হয়েছে তাকে। চোখে উদভ্রান্ত না হলেও আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টি। মিনতির পিছনে আমাদের দুজনকে দেখে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো। মিনতি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বললে, ভয় নেই হেনা, বাসু-মামু তোমাকে ধরিয়ে দেবেন না। তিনি আমাদের দলে। পারলে উনিই তোমাকে বাঁচাতে পারেন। উনি উকিল— বিবাহ-বিচ্ছেদের সুলুক-সন্ধান দিতে পারবেন।

মামু একটা চেয়ারে বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। তারপর মিনতির দিকে ফিরে বললেন, তুমি বরং তোমার ঘরে যাও মিনতি। প্রীতম হেনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে তোমার ঘরে খোঁজ নিতে আসতে পারে। হোটেলের বয়টা তোমাকে নিচের চার-নম্বর ঘরে আসতে দেখেছে...

মিনতি স্প্রিং করে লাফ মারে : ঠিক কথা! আমি যাই। আপনারা কথা বলুন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কিন্তু।

মিনতির প্রস্থানের পরে বাসু-মামু দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে ফিরে এসে বসলেন। বললেন, হেনা, তুমি কাল বিকালে আমার কাছে এসেছিলে...

—হ্যাঁ! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য আপনি বাড়ি ছিলেন না। তাই... তাই নিজে নিজেই সিদ্ধান্তটা নিতে হলো...

—কী সিদ্ধান্ত? প্রীতমকে ছেড়ে পালিয়ে আসা?

—হুঁ।

—তুমি সেদিন আমাকে কী-একটা কথা বলতে এসেছিলে—সেই যেদিন আমি তোমাদের বাড়ি প্রথম যাই। তুমি বলবার সুযোগ পাওনি, প্রীতম এসে যাওয়ায়। কথাটা এখন বলো—

হেনা আঙুলে তার আঁচলের খুঁটটা একবার জড়াচ্ছে, একবার খুলছে! সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক এমনটা সচরাচর করে না। সে জবাব দিল না আদৌ।

—কী হলো? বলো? কী? তোমার সেই গোপন কথা?

—না! আমার সাহস হচ্ছে না! আমি... আমি বলতে পারবো না...

—কেন? বললে কী হবে?

—ও যদি জানতে পারে.. তাহলে... তাহলে আমার ভীষণ বিপদ হবে!

—কেউ তা জানতে পারবে না। এখানে তো আর কেউ নেই।

—ও ঠিক টের পেয়ে যাবে! ও যে কী ভীষণ, আপনি জানেন না।

—'ও' মানে? তোমার স্বামী?

—আবার কে?

মামু একটু চুপ করে ওকে দেখতে থাকেন। তারপর বললেন, কাল বিকালে তুমি চলে যাবার পরেই প্রীতম আমার কাছে এসেছিল।

স্পষ্টতই শিউরে উঠলো মেয়েটা। বললে, কী বললে? আমি... আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

—প্রীতম বললে, তুমি খুব মানসিক উত্তেজনার মধ্যে আছো!

—না! আপনি রেখে-ঢেকে বলছেন! ও বলেছে, আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি। ছলে-বলে-কৌশলে ও আমাকে ওর বন্ধুর পাগলা-গারদে আটকে রাখতে চায়। যাতে সেই কথাটা আমি কাউকে বলতে না পারি। বললেও সবাই ভাববে পাগলের প্রলাপ! তাই নয়?

—কোন কথাটা হেনা! কী এমন কথা?

—না! আমার সাহস হচ্ছে না।

—লুক হিয়ার হেনা! কথাটা বলে ফেললে আর তোমার ভয় নেই। তখন আর সেটা গোপন কথা থাকবে না—এখন যদি তুমি আমাকে বলো, তাহলে তাকে আর পাগলের প্রলাপ হবে না। এখনো তো কেউ তোমাকে পাগল প্রমাণিত করেনি।

—আমি কেমন করে জানবো যে, আপনি ওর দলে নন? ও আপনার সঙ্গে দেখা করেছে বললেন—হয়তো ও আপনাকে এমপ্লয় করেছে, ওর স্বার্থে...

বাসু-মামু দৃঢ়স্বরে বললেন, শোন হেনা। এই কেস-এ আমার মক্কেল মৃতা পামেলা জনসন। আর কেউ নন। তাঁর কোনো স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু 'সত্য'র পক্ষে, ন্যায়-ধর্মের পক্ষে'

হেনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, সে তো আপনি বলছেন। প্রমাণ কী? আপনি জানেন না, এই কয় বছর কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমার কেটেছে' না, আমি ওর কাছে ফিরে যাবো না। বাচ্চাদেরও দেবো না! আমি নিঃস্ব, কিন্তু মিন্টিদি আমাকে সাহায্য করবেন' তিনি কথা দিয়েছেন'

মামু বলেন, উত্তেজিত হয়ো না হেনা। খোলাখুলি বলো তো—মিস পামেলা জনসনের মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে হয়নি, তা তুমি জানো। নয়?

হেনা মুখটা তুলতে পারে না। গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করে।

—বিষের ক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঠিক?

এবারও সে নীরব। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—তুমি কি সন্দেহ কর এর পিছনে তোমার স্বামী, প্রীতমের হাত আছে?

হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো মেয়েটা। যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সন্দেহ করবো কেন? আমি তো জানিই!

—কী জানো? কেমন করে জানো? খুলে বলো আমাকে—

আবার নীরবতা।

—ব্যাপারটা কি ঘটে সেই শেষ রবিবারে, যেদিন তোমাকে না জানিয়ে প্রীতম ঘণ্টাখানেকের জন্য মরকতকুঞ্জে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ! সে গোপন করতেও চেয়েছিল তার মৈত্রীনগরে যাবার কথাটা।

—কিন্তু তুমি কেমন করে তা জানতে পারলে?

—সেটা এখনি আপনাকে বলতে পারবো না।

বাসু-মামু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, কিন্তু সেটা যদি আমি তোমাকে এখনি বলে দিই, তুমি কি সেটা স্বীকার করবে, অথবা অস্বীকার?

—আগে বলুন—

—বলছি। তার আগে আমাকে বলো তো—মীনা আর রাকেশকে তুমি যে বান্ধবীর বাসায় রেখে এসেছো সে কি জানে তুমি প্রীতমকে ছেড়ে এসেছো?

—না। সে কিছুই জানে না।

—তাকে কি প্রীতম চেনে? তোমার বান্ধবীকে? তার বাড়ি চেনে?

—হ্যাঁ, তা চেনে। কিন্তু প্রীতম সেটা সন্দেহ করবে না।

—করবে। সে অত্যন্ত ধূর্ত। তাছাড়া কলকাতায় তোমার বান্ধবী খুব কম, তাই নয়? তুমি পাটনায় মানুষ হয়েছো। কলকাতায় তোমার যে পাঁচ-সাতটি বান্ধবী আছে প্রীতম পর্যায়ক্রমে তাদের বাসায় যাবে। তোমার বান্ধবী জানে না যে, তুমি চিরকালের জন্যে প্রীতমকে ত্যাগ করে এসেছো—ফলে প্রীতম যদি মীনা আর রাকেশকে নিয়ে যেতে চায়, তোমার বান্ধবী বাধা দেবে না। প্রীতম যদি ছেলেমেয়েকে আটকে রাখে তখন তোমার পক্ষে আর পালিয়ে বেড়ানো সম্ভবপর হবে না।

—কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমি তো এখনি গিয়ে ওদের নিয়ে আসবো?

—বুঝলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি দেখো প্রীতম বসে আছে?

হেনা শিউরে উঠলো। বিহ্বলের মতো মামুর দিকে তাকিয়ে দেখলো। মামু বললেন, তার চেয়ে এক কাজ করো, একখানা হাত চিঠি লিখে দাও আমার সঙ্গে সে বাচ্চাদের আসতে দেয়। লেখো, তোমার শবীবটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে তাই নিজে যেতে পারছো না।

হেনা যুক্তিব সারবত্তা প্রণিধান করলো। রাজি হলো। একখণ্ড কাগজে সেই মতো চিঠি লিখে দিল বান্ধবীকে। বললো, ওদের নিয়ে এখনই চলে আসুন।

—না। বাচ্চাদের আমাব বাড়ি নিয়ে যাবো। আমার কাছে এক রাত্রি রাখবো। এখানে ওদের নিয়ে আসা ঠিক হবে না। কাল সকালে অন্য কোনও হোটেলে তোমার জন্য ঘর বুক করে বাচ্চাদের নিয়ে আমি সেখানে অপেক্ষা কববো। এই কৌশিক এসে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। বাচ্চারা সেখানেই থাকবে তোমার কাছে।

—কেন? এখানে কী আপত্তি?

—বুঝছো না কেন? তুমি নিজে এখানে ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকতো পারো, বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রীতম জানে, তোমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ নেই। সে স্বতই ভাববে, তুমি মিনতিব দ্বারস্থ হবে। তাই এই হোটেলটায় বারে বারে খোঁজ করবে। তুমি মিন্টির কাছে যাতায়াত কবছো কি না জানতে। যে কোন সময়ে তুমি বাচ্চাদের জন্য ধরা পড়ে যাবে।

এবারও যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করলো হেনা। রাজি হলো।

—তাহলে বাচ্চাদের আমার হেপাজতে রেখে তুমি নিশ্চিন্ত হলে তো?

—কেন হবো না? রাকেশ কিন্তু ঝাল খেতে পারে না। রাত্রে ও দুধ রুটি খায়।

—ও আচ্ছা। এবাব মন দিযে শোনো আমি কি বলছি—

হেনা প্রায় আর্তনাদ কবে ওঠে: না! আমি তো বলেছি, আর কিছু বলতে পারবো না।

—আমি তোমাকে শুনতে বলছি হেনা, কিছু বলতে নয়। শোনো—ধরে নাও আমি জানি—আমি জানি, কী করে মিস্ জনসন মারা যান। মানে যুক্তির খাতিরে তোমাকে এটা ধরে নিতে বলছি। ধরো, তুমি যে কথাটা জানো, তোমার 'গোপন কথা' সেটা আমি জানি। আমি সেটা অনুমান করতে পেরেছি। তা যদি ঘটে থাকে তাহলে পরিস্থিতিটা একটু বদলে যায়। যায় না কি?

হেনা সন্দিগ্ধ চোখে একদৃষ্টে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বিশ্বাস কব হেনা, কথার প্যাঁচে তোমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিচ্ছি না আমি। প্রতিটি কথার উত্তর ভেবেচিন্তে দিও। তোমার 'গোপন-কথা'র বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত না দিয়ে। এবার বলো, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, আমি সব কিছু জানি, তাহলে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হয়ে যায়। তাই না?

হেনা একগুঁয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, আপনি কিছুতেই সেটা অনুমান করতে পারবেন না—এ হয় না। প্রীতম কী ভাবে... না, না, আমি কিছু বলবো না!

মামুর পেশাই হচ্ছে সওয়াল-জবাব কবা। ধৈর্য ধরে একই কথা বললেন আবার, তোমাকে বলতে তো কিছু বলছি না। শুধু স্বীকার করতে বলছি; যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, আমি সব কিছু জানি, তাহলে তোমাকে আবার সব কিছু নতুন করে ভাবতে হবে—যেহেতু পরিস্থিতিটা বদলে যাচ্ছে। নয়?

হেনা এবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হ্যাঁ, তাই।

—গুড। এবার শোনো: আমি পি. কে. বাসু, এ রহস্যের কিনারা সন্দেহাতীতভাবে করেছি! এটাই আমার পেশা। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। আমি সব কিছু জানি—মায় তোমার ঐ 'গোপন-কথা'টা... না, না, কথা বোলো না। শুধু শুনে যাও। তুমি যে কথাটা আমাকে বলতে পারলে না, কখনো কাউকেই বলতে পারবে না—সেটা আমি লিখে এনেছি। এই নাও এটা ধরো—

পকেট থেকে সেই মুখবন্ধ খামটা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, আমরা চলে যাবার

পর ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এটা পড়ো। তারপর পুড়িয়ে ফেলো! যদি মনে করো, আমি যা লিখেছি তা ঠিক নয় তাহলে কাল সকালে আমাকে তা জানিও। না, কাল সকালে নয়। আজ রাত্রেই আমাকে টেলিফোন কোরো। আর যদি মনে করো আমি ঠিকই লিখেছি...

---তাহলে?

--সে কথা কাল হবে। চিঠিটা আগে পড়ে দেখো।

হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মামু বললেন, মানুষের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তা আমরা করেছি। বাকিটা করুণাময় ঈশ্বরের হাতে।

আমি বলি, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

—করি, আই হ্যাভ ইম্পেকেবল্ ফেইথ ইন হিজ ইনযেকজরেবল জাস্টিস!

* * *

বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের প্রতীক্ষায় বসে আছে ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত।

—কী ব্যাপার? ডক্টর দত্তগুপ্ত কী মনে করে?

—আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না স্যার। আমার নিজেরও তাড়া আছে। কাঁচড়াপাড়ায় ফিরতে হবে। দু-একটি কথা জানতে এলাম।

—বলো?

—আপনি আসলে কী চাইছেন, বলুন তো? আপনার ভূমিকাটা কী? কে আপনার মক্কেল?

—কেন? তুমি তো জানোই—মিস্ স্মৃতিটুকু হালদার।

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, এক্সকিউজ মি স্যার, আমি নির্বোধ নই। দুজনেরই সময়ের দাম আছে। কথাবার্তা খোলাখুলি হলেই ভালো হয়। প্রথম কথা, আপনি ছদ্ম পরিচয়ে যখন প্রথম মেরীনগরে যান তখনো আপনি টুকু বা সুরেশকে চিনতেন না। কিন্তু তার আগেই আপনি মিস্ জনসনের চিঠিখানা পেয়েছেন। সেকেন্ডলি, আপনার সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়েছি—প্রতিটি সূত্রই বলছে, আপনার 'ইন্টিগ্রিটি ইম্পেকেব্‌ল্'! অসত্যের সঙ্গে মিথ্যার হাত মেলানো আপনার ধাতে নেই। টুকুকে যেভাবে মিথ্যার লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসভাজন হয়েছেন সেটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। আই রিপীট! আপনি কী চাইছেন?

মামু বললেন, যদি বলি, আমার মক্কেল মিস পামেলা জনসন, তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে না। তাই বলছি: আমার মক্কেল একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন--ট্রুথ' আমি সত্যান্বেষণ করছি।

—কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থটা কী? ঘরের খেয়ে কেন বনের মোষ তাড়াচ্ছেন?

—বলছি। তার আগে বলতো ডক্টর দত্তগুপ্ত—তোমার স্বার্থটা কী? তুমি কেন ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়াতে এই এখন নিউ আলিপুরে ছুটে এসেছো? কাকে বাঁচাতে চাইছো? সুরেশকে না টুকুকে?

নির্মল হাসলো। বললো, আমি ডাক্তার আর আপনি ব্যারিস্টার। বাকযুদ্ধে আপনার সঙ্গে পারবো না। হ্যাঁ, আমাকে বলতে হবে যে, দুটোর একটাও নয়। সুরেশ বা টুকুকে বাঁচাবার জন্যে আমি ছুটে আসিনি। এ শুধু দুরন্ত কৌতূহল। আর সে কথাটা বললেই আপনার যুক্তিটা মেনে নেওয়া হয়—আপনিও ঐ চিঠিখানা পেয়ে দুরন্ত কৌতূহলে মেরীনগরে ছুটে গেছিলেন।

—না, নির্মল, ভুল হলো তোমার। শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক কৌতূহল নয়। মিস্ পামেলা জনসনের চিঠিখানা পড়েই আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলাম তাঁকে—দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমতী, পরমশ্রদ্ধেয়া একটি বৃদ্ধাকে। পারিবারিক কৌলিন্য সম্বন্ধে যাঁর কঠোর দৃষ্টি, কিন্তু যিনি আত্মরক্ষা করতে জানেন। তিনি আমার বুদ্ধির উপর আস্থা রেখেছিলেন--সেই আস্থার মর্যাদাটুকু আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে। আমার মক্কেল—বিলিভ ইট, অর নট: আমার বিবেক।

—অর্থাৎ ঐ 'বুবি-ট্র্যাপটা' যে খাটিয়েছিল তাকে আপনি খুঁজে বার করবেনই?

—না। সেটা আমি জানি। আমি খুঁজে বার করছিলাম—কে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছে।

—এটাই আপনার অনুমান?

—না। আবার ভুল হলো তোমার—অনুমান নয়, স্থির সিদ্ধান্ত। শুধু তাই নয়, আমি এ-কথাও জানি—কে তাঁকে হত্যা করেছে।

—তাও জানেন? তবে তাকে গ্রেপ্তার করছেন না কেন? প্রমাণের অভাবে?

—ঠিক তাই। তবে আশা করছি আগামীকালই প্রমাণটা আমার হাতে আসবে।

নির্মল আবার হাসলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে: আহ্! টুমরো! 'আগামীকাল'! দ্য লাস্ট সিলেব্‌ল্ অফ রেকর্ডেডটাইম। আমার অভিজ্ঞতা বলে, 'আগামীকাল' বস্তুটা মরীচিকার মতো—কেবলই পিছিয়ে যায়।

—তুমি ক্রমাগত ভুল বলে যাচ্ছো। নির্মল! আমার জীবনে 'আগামীকাল' বস্তু টা আরও কয়েক হাজার বেশিবার এসেছে—আই মিন, তোমার চেয়ে। আমি বরাবর দেখেছি, 'আগামীকাল'টা অনিবার্যভাবে আজকের ঠিক পরেই আসে!

নির্মল দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে, আগেই বলেছি, আপনার সঙ্গে আমার মতো লোকের তর্কযুদ্ধ শোভা পায় না। তাহলে পরশুই আসবো—

—এসো। তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।

—থ্যাঙ্কস। গুড নাইট স্যার! আগামী পরশুটাও অনিবার্যভাবে আসবে আগামীকালের পরেই। তখনই জানা যাবে কে আপনার টার্গেট—টুকু, সুরেশ, হেনা অথবা প্রীতম?

—ব্যস! লিস্ট খতম? সন্দেহভাজন আর কেউ নেই?

—আপনার তালিকায় আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু মিনতি মাইতিকে আমি লিস্ট থেকে বাতিল করেছি অনেক আগেই—

—না, মিনতির কথা বলছি না আমি; কিন্তু আর একটি পঞ্চম সন্দেহজনক লোকের নাম তো নেই তোমার তালিকায়?

—পঞ্চম নাম? কী সেটা?

—ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত।

একটু হকচকিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই হেসে ওঠে। বলে, আযাম রিয়ালি সরি স্যার! হ্যাঁ, সে নামটা আমার মনে পড়েনি। দশমস্ত্বমসি! কারেক্ট! তার হবুপত্নীর অর্থলোভে সেও লাভবান হতো বটে! তাছাড়া সে ছিল ডক্টর পীটার দত্তের সাকরেদ। আচ্ছা চলি। অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম আপনার।

—নট অ্যাট অল! নট অ্যাট অল।

নৈশাহারের টেবিলে এসে দেখি একটিমাত্র খাবার প্লেট সাজিয়েছে বিশু। তার দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাতেই সে কৈফিয়ৎ দিল—বড়সাহেব রাতে খাবেন না বললেন।

শুয়ে পড়েছেন?

—আজ্ঞে না। আজ আবার বোতলটা বার করেছেন।

ইদানীং মামু প্রত্যহ সন্ধ্যায় মদ্যপান করেন না। আগে তাঁর দৈনিক বরাদ্দ ছিল এক পেগ বিলাইতি। ইদানীং মাঝে মধ্যে বোতলটা বার করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আজ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কোনও

হেতু হয়েছে। এটাও বুঝতে পারছি, সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে। হেনার সেই 'গোপন কথা'—যেটার কোনও আঁচ আমি করতে পারছি না, সেটা কোনও না কোনও সূত্রে উনি জেনে ফেলেছেন। কিন্তু কেমন করে তা হলো? উনি যা জানেন, যেটুকু জানেন, আমিও তো তাই জানি। আমার চোখের আড়ালে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যা শুধুমাত্র ওঁর জানা। তাহলে? প্রীতম ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে কাজ হাসিল করে এলো? যদি হেনার কথাটা সত্যি হয় অবশ্য। না হলে, কী তার গোপন কথা? আর তাহলে মিনতি কেমন করে স্মৃতিটুকুকে দেখলো সিঁড়ির মাথায়? তাহলে কি ধরে নেবো—দুটো কাজ দুজনের? ফাঁদটা পেতেছিল টুকু, আর বিষটা মিশিয়েছে প্রীতম? কিন্তু তাও তো হবার নয়—মামু আমাকে স্পষ্টই বলেছেন, এটা একই হাতের কাজ। হত্যাকারী এবং হত্যার যে চেষ্টা করেছিল তারা এক এবং অভিন্ন। তাহলে? কে সে?

আহারান্তে গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম বাসু-মামুর শয়নকক্ষে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি একটা সিল্কের গাউন পরে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। পাশের টিপয়ে রাখা আছে 'শিভাস রিগাল'-এর বোতলটা, একটা গ্লাস, বরফের প্লেট! চোখ দুটি বোঁজা। পাইপটা ওঁর ঠোঁট থেকে ঝুলছে। জেগেই আছেন।

মামুর শয়নকক্ষ একতলায়। রানীমামিমা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন না। আমাদের শয়নকক্ষ দ্বিতলে। পা টিপে টিপে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। খাটে শুয়েও ঘুম এলো না। আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। রাতে পৌনে এগারোটার সময় হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। নিচে মামুর ঘরে রাখা আছে সেটা—একটা এক্সটেনশান দ্বিতলের লাউঞ্জেও আছে। নিচে যে ইজিচেয়ারে মামু বসে আছেন সেখান থেকে হাত বাড়ালেই উনি ফোনটার নাগাল পাবেন। তাই ব্যস্ত হইনি। কিন্তু বার পাঁচ-ছয় বাজার পরে মনে হলো, উনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম।

—হ্যালো?

—মিস্টার পি. কে. বাসু, স্যার?—মহিলার কণ্ঠস্বর।

—না, আমি কৌশিক বলছি। আমি কে? মিসেস ঠাকুর?

—হ্যাঁ বাসু-সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

—সম্ভবত। ডেকে দেব?

—না, দরকার নেই। কাল সকালে ওঁকে খবরটা দিলেই চলবে।

—কী খবর? বলুন?

—ওঁকে বলবেন, তিনি চিঠিতে যা লিখেছেন তাই ঠিক।

—বলবো। আর কিছু?

—মীনা আর রাকেশ ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়?

বুঝতে পারি, ও ধরে নিয়েছে ওর বাচ্চা দুটো এ বাড়িতেই আছে। আমরা যে এখনো ওদের নিয়ে আসিনি তা ও জানে না! কিন্তু মামুর শাকরেদি করে করে এটাও অভ্যাস করে ফেলেছি। রাত পৌনে এগারোটায় হেনার বান্ধবীর বাড়িতে বাচ্চা দুটো নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে এটা ট্রুথ, হোলট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ!

বলি, খুব সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা আমার ঘরে শোয়নি। আর কিছু?

—হ্যাঁ। বাসু-সাহেবকে বলবেন কাল সকালেই এখানে চলে আসতে। জরুরি দরকার আছে। বাচ্চা দুটোকে তখন আনার দরকার নেই। বুঝেছেন? তাদের পরে আনলেই চলবে।

—বলবো। আর কিছু?

—না।

—গুড নাইট!

হেনা নিঃশব্দে টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রাখল। 'শুভরাত্রি' না বলেই।

বারান্দায় গিয়ে উঁকি দিলাম। মামুর ঘরে বাতিটা জ্বলছে। বাতি জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নীচে। ওঁর ঘরের সামনে এসে পর্দাটা সরিয়ে দেখতে পেলাম—ঠিক একই ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে বসে আছেন উনি টেলিফোন-রিসিভারটা তখনো তাঁর কানে ধরা আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। যন্ত্রটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখলেন। অর্থাৎ এক্সটেনশান-লাইনে উনি দু'পক্ষের কথাই শুনেছেন। আমার কোনও কিছু বলা নিতান্ত বাহুল্য। তখনই নজর হলো উনি হাত নেড়ে আমাকে স্থানত্যাগ করতে বলছেন। মনে হলো, নেশাটা বেশ জমেছে তাঁর।

দ্বিতলে উঠে আসি। ঘুম আসতে দেরি হলো। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙলো বেলায়। টেলিফোনের শব্দে। প্রথমেই নজরে পড়লো ঘড়ির দিকে। পৌনে আটটা। টেলিফোনটা কতক্ষণ বাজছে কে জানে। উঠে গিয়ে ধরলাম!

—হ্যালো? বাসু-মামু? ও, আপনি কৌশিকদা? শুনুন! আমি যে কী বলবো ভেবেই পাচ্ছি না।

কণ্ঠস্বরেই শুধু নয়, বাচনভঙ্গিতেও বোঝা যায় ও প্রান্তে মিনতি মাইতি। আর কেউ সাত সকালে টেলিফোন করে বলতে পারে না—সে কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

—শুনুন কৌশিকদা। এদিকে একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে কাল রাত্রে।

—কী 'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার'? প্রীতম খোঁজ পেয়ে গেছে?

—না, না, সেসব কিছু নয়! প্রীতম কিছুই জানে না। ওর ফোন নাম্বারটা আমি জানি না। ওকে কি এখন জানানো উচিত? আমাকে এরা নাজেহাল করছে—হেনার মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার জন্য। হেনা তো ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে—এখন এরা 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' করছে। বলছে, আপনিই তো ওর মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। দোষ তো আপনারই। বলুন, দাদা, আমার কী দোষ? আমি ওকে প্রীতমের হাত থেকে বাঁচাতেই তো এই মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার আর কী স্বার্থ থাকতে পারে?

এ ভদ্রমহিলা কি একটা কথাও সহজ করে বলতে পারে না? ধমকে উঠি: কী হয়েছে আগে জানি। হেনা হোটেল ছেড়ে পালিয়ে গেছে?

—না, না, সে তো এখনও ওর ঘরেই শুয়ে আছে! ঘণ্টাখানেক আগে ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে।

—কোন ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে? আসল কথাটা যে এখনো জানি না আমি?

—কালরাতে হেনা ভুলের বশে বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। আজ সকালে বেড-টি নিয়ে যে যায় সে প্রথম টের পায়—ও প্রথমটায় ভেবেছিল...

—হেনা মারা গেছে?

—তাই তো বলছি তখন থেকে। ভুল করে বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে! এখন কী হবে? মীনা আর রাকেশ এতটুকু বয়সে মাতৃহীন হয়ে গেল! অবশ্য আমি ওদের বেশ কিছু টাকাকড়ি দেব—ম্যাডামের তাই ইচ্ছে ছিল—কিন্তু মায়ের অভাব কি পূরণ করা যায়? আপনিই বলুন? তাছাড়া টাকাটা যদি সেই কাবুলিওয়ালা কেড়ে নেয়? আচ্ছা কৌশিকদা... আপনার কি মনে হয়—

আমি ঠক করে যন্ত্রটা রিসিভারে নামিয়ে রাখি। চটিটা পায়ে গলিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসি নিচে। মামুর ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখতে পাই—কাল রাত্রের ভঙ্গিতেই একইভাবে অর্ধশয়ান অবস্থায় বসে আছেন ইজিচেয়ারে। টেলিফোন যন্ত্রটা এখনো তাঁর কানে ধরা। আমাকে দেখতে পেয়েই সেটা নামিয়ে রাখলেন।

উনি নিশ্চয় সারারাত ঐখানে ঐভাবে বসেছিলেন না। কিন্তু নয় ঘণ্টা আগে যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু সেই দৃশ্য, একই ভঙ্গি, একই অবস্থানে। পরিবর্তনের মধ্যে ঘরে এখন বিজলি বাতি নয়, দিনের আলো। পরিবর্তনের মধ্যে বোতলটা শূন্যগর্ভ। উনি এবার আমাকে চলে যেতে বললেন না। বসতে বললেন। ওঁর খাটের প্রান্তে বসে বলি, কী মনে হয়? অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ? সত্যিই ভুল করে?

—না, কৌশিক, ভুল করে নয়।

—আত্মহত্যা হতে পারে না। কাল রাতে পৌনে এগারোটায় হেনা টেলিফোনে আমাকে বলেছিল আজ সকালেই যেন আপনি ওর হোটেলে যান। ওর কী একটা জরুরি কথা বলার আছে। ফলে আত্মহত্যা হতেই পারে না। হয় অ্যাকসিডেন্ট, না হলে প্রীতম কোনও ছল ছুতোয়..

—রাত এগারোটার পর প্রীতম ওর নাগাল পাবে কেমন করে? চল, যাওয়া যাক।

আমরা যখন গিয়ে পৌছলাম তার আগেই প্রীতম সেখানে পৌছেছে। পুলিসের জেরায় মিনতি তার নাম-ঠিকানা জানাতে বাধ্য হয়েছিল। দেহ তখনো অপসারিত হয়নি। পুলিস-ফটোগ্রাফার ছবি নেওয়া সবে শেষ করেছে। মিনতি আমাদের দেখেই হাঁউমাউ করে উঠল। প্রীতম ঠাকুর হয় সত্যই উঁচু দরের অভিনেতা, অথবা সে সত্যিই একবারে ভেঙে পড়েছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—বাজে পোড়া তালগাছ।

দিন দুই পরের কথা।

বাসুমামুর ব্যবস্থাপনায় সকলে সমবেত হয়েছে মেবীনগর মরকতকুঞ্জে।

মিনতি মাইতি প্রথমটা আপত্তি করেছিল—এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করতে। বিশেষ, শান্তি দু'দিনের ছুটি নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ি গেছে। বাসুমামু তাতে দমেননি। বলেছিলেন, আহারের নিমন্ত্রণ তো তুমি করছো না মিনতি। একটি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেত করা হচ্ছে নিতান্ত অন্য উদ্দেশ্যে। হেনার বাচ্চা দুটোর ব্যবস্থা করতে। তুমি চাও তাদের কিছু টাকা দিতে—কিন্তু সে টাকা যেন প্রীতম উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দিতে পারে। তাই নয়? তাছাড়া ওরা সবাই জানতে চায়—কীভাবে হেনা মারা গেল? সেটা অ্যাকসিডেন্ট, আত্মহত্যা না হত্যা? পুলিস তা ধরতে পারছে না, আমি জানি। তাই সবাইকে ডেকে সে-কথা বলতে চাই। আমি ওদের খবর দিচ্ছি। তুমি ব্যবস্থা করো।

ফলে মিনতিকে সেই মতো ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

মরকতকুঞ্জে বৈঠকখানা ঘরে সেদিন সবাই এসেছে। স্মৃতিটুকু, সুরেশ, নির্মল, প্রীতম, ডক্টর পিটার দত্ত এবং গৃহস্বামিনী। প্রত্যাশিত একজন অতিথি শুধু অনুপস্থিত—মিস্ মার্পল অব্ মেবিনগর। ডক্টর দত্ত জানালেন, বুড়ির 'ফ্লু' হয়েছে—গরম-ঠাণ্ডায়। একেবারে শয্যাশায়ী। বুড়ি একা-একা থাকতো—তাকে বাধ্য হয়ে অপসারিত করা হয়েছে পীটার দত্তের বাড়িতে। সাময়িকভাবে। আশা-পুরকায়স্থ তার সেবা-শুশ্রূষা করছে। এতদিনে জানা গেল—ডক্টর পীটার দত্তও অবিবাহিত—কনফার্মড ব্যাচিলার। এক ভাইঝি তাঁর সংসারের দেখভাল করে।

বাসুমামু দর্শকদলের দিকে মুখ করে একটু দূরে বসে আছেন। তাঁর মুখে পাইপ।

এমন দৃশ্যে আমি অভ্যস্ত। অনেক-অনেকবার দেখেছি। একদল সুবেশ তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখেই ভদ্রতার মুখোস আঁটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় জানি, ওদের মধ্যে একটি মানুষের মুখোস টেনে খুলে ফেলবেন মামু। আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে বলবেন, এই সেই নৃশংস হত্যাকারী।

হ্যাঁ। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এই এতগুলি আপাতভদ্র মানুষের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একজন পিশাচ। যে শয়তানটা বৃদ্ধার গমনপথে মাঝরাতে ফাঁদ পাততে দ্বিধা করে না—আর্ত মানুষের

পানীয়ে বিষ মেশাতে সংকোচ বোধ করবে না। হেনার মতো দু-দুটি সন্তানের জননীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে তার বুক কাঁপে না।

বাসু-মামু গলাটা সাফা করে বললেন, আপনারা জানেন, কেন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাকে এ কাজটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বর্গগতা মিস্ পামেলা জনসন—এই মরকতকুঞ্জের প্রাক্তন মালিক। আমার অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য খুঁজে বার করে দেখা—কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো। প্রসঙ্গত অন্যান্য কথাও আসবে। মিস জনসনের মৃত্যু চারটি সম্ভাব্য হেতুর একটি কারণে। এক: তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণই করেছিলেন। দুই: তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান। তিন: তিনি নিজের জীবন নিজেই নিয়েছেন—অর্থাৎ আত্মহত্যা। চতুর্থ সম্ভাবনা তিনি কোনও অজ্ঞাত আততায়ীর চক্রান্তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন!

—মৃত্যুর পরে তাঁর বিষয়ে কোনও 'ইনকোয়েস্ট' হয়নি—অর্থাৎ পুলিসী তদন্ত। কারণ তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক—যিনি রোগিণীকে দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন—ধরে নিয়েছিলেন মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি 'ডেথ-সার্টিফিকেট' দিতে দ্বিধা করেননি।

—মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললে যেটা সম্ভবপর নয়, ক্রিশ্চিয়ান অথবা মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবপর। সন্দেহের বশে মৃতদেহকে কবর থেকে খুঁড়ে বার করা হয়—'এক্সহিউম' করা হয়। নানা কারণে আমি সে পথে যেতে চাইনি—মুখ্য হেতু আমার মক্কেলের সেটা অভিপ্রেত ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস।

নির্মল বাধা দিয়ে বললে, আপনার মক্কেল বলতে?

মামু তার দিকে ফিরে বললেন, মিস্ পামেলা জনসন। আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর তরফেই কথা বলছি। তাঁর অন্তিম বাসনার মর্যাদা দিতে। তাঁর শেষ চিঠিতে দুটি নির্দেশ ছিল পরিষ্কার: 'সারমেয় গেণ্ডুক'-এর রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং এ অনুসন্ধান কার্যের গোপনীয়তা রক্ষা। তাই এখানে কোনও বাইরের লোক নেই। সকলেই তাঁর পরিবারভুক্ত, একজন অচিরেই তা হতে চলেছেন—একজন তাঁর ওয়ারিশ এবং একজন তাঁর আকৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁর লেখা চিঠিখানা প্রথমে পড়ে শোনাই। এটা উনি লিখেছিলেন তাঁর পতনজনিত দুর্ঘটনার দশদিন পরে। শুনুন—

এর পরের মিনিট-দশেকের ভাষণ আমি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারি—তাঁর পত্রপ্রাপ্তি এবং প্রথম অনুসন্ধানে আসার বৃত্তান্ত। কীভাবে ধাপে-ধাপে তিনি সিঁড়ির মাথায় পেরেকটা দেখেন এবং বুঝতে পারেন মিস জনসন কী ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন। তারপরে উনি আবার শুরু করেন, আমি বুঝতে পারি—আপাত আবোল-তাবোল চিঠির ভিতর দিয়ে মিস্ জনসন আমাকে কী বলতে চেয়েছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন—সারমেয় গেণ্ডুকে পা পড়ায় তাঁর পদস্খলন হয়নি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন—মৃত্যুফাঁদ পেতে কেউ ওঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

—কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? মরকতকুঞ্জে সে রাত্রে ছিল নয় জন ব্যক্তি। তার ভিতর তিনজন ছিল রুদ্ধদ্বার সৌধের বাইরে, আউট-হাউসে—ছেদিলাল, তার স্ত্রী এবং ড্রাইভার। শান্তিকে তিনি সন্দেহ করেননি, যদিও উইল মোতাবেক—তাঁর পাঁচবছর আগে করা উইলের কথা বলছি—সে কিছু পেতো। কিন্তু শান্তি এ পরিবারে আছে দশ-পনের বছর। আরও একজনকে তিনি সন্দেহ করেননি—কারণ পতনজনিত মৃত্যু হলে তার কোনও লাভ হতো না। সুতরাং বাকি রইল মাত্র চারজন। ওঁর মৃত্যুতে এই চারজনই লাভবান হতো—তিনজন প্রত্যক্ষভাবে, একজন বিবাহসূত্রে।

—মিস জনসন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়লেন। একথা পুলিসে জানানো যায় না—তাতে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য, কিন্তু যে ওঁর প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিল তাকে ক্ষমাও করতে পারেন না। উনি মনস্থির করলেন। দু-দুটি দৃঢ়পদক্ষেপ করলেন। প্রথম: আমাকে তদন্ত করতে আহ্বান

জানালেন—গোপনীয়তার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয়: উনি ওঁব অ্যাটর্নিকে একটি নতুন উইল প্রণয়ন করে নিয়ে আসতে বললেন।

—আমাব দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তবে আততায়ী যেই হোক, উনি সন্দেহ করেছিলেন একজনকেই। কাবণ তিনি জানতেন তার চারিত্রিক দুর্বলতার কথা। ইতিপূর্বেই সে একবার ওঁর টাকা চুবি করেছে, চেক জাল কবেছে। অপরাধপ্রবণতা হয়তো তার রক্তে—সেটা সত্যমিথ্যা যাই হোক—মিস পামেলা জনসনের মতে সে অপরাধপ্রবণ। ঘটনাচক্রে, দুর্ঘটনার পূর্বে তাব সঙ্গে ওঁর একটি জনান্তিক আলোচনাও হয়েছে। তাতে সেই সন্দেহজনক ব্যক্তি ওঁকে শাসিয়ে রেখেছে—বৃদ্ধা তাঁর টাকা আঁকড়ে বসে থাকলে তাঁব 'ভালমন্দ' কিছু হয়ে যেতে পারে। বাস্তবে অপরাধী যেই হোক না কেন—মিস্ পামেলা জনসন সিদ্ধান্তে এলেন: মৃত্যুফাঁদটা সেই পেতেছিল।

—আব তাই প্রথম সুযোগেই তিনি সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে বলেছিলেন দ্বিতীয় একটি উইল কবাব কথা। পাছে সে মনে করে এটা একটা ফাঁকা হুমকি তাই তাকে উইলটা দেখিযেও দিয়েছিলেন। উনি প্রকারান্তরে সেই সম্ভাব্য হত্যাকাবীকে বুঝিযে দিতে পেরেছিলেন—তাঁর মৃত্যুতে তাব কোন লাভ হবে না।

—বৃদ্ধা ভালভাবেই জানতেন—দ্বিতীয় সম্ভাব্য আততায়ী ঐ ব্যক্তির নিকটজন। আশা করেছিলেন—এ ওকে জানাবে।

—কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বচক্ষে উইলটা দেখেছিল সে তার নিকটতম আত্মীযাকে সেকথা জানায়নি। প্রথম সন্দেহভাজন ব্যক্তি...

এখানে সুরেশ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু। ব্যাপারটা এমনিতেই জটিল—আপনি আব তাকে ক্রমাগত ভাববাচ্যে জটিলতব করে তুলবেন না। সরাসবি 'প্রপার নেম' ব্যবহার কবলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বাসু সকলের দিকে ফিরে বলেন, আমি সৌজন্যবক্ষা করতেই আকাবে-ইঙ্গিতে কথা বলছি। আপনারা যদি অনুমতি দেন...

আবাব সুরেশই বলে ওঠে, ওটুকু নলচেব আড়ালে সৌজন্য আদৌ বক্ষিত হচ্ছে না বাসু-সাহেব। উপস্থিত পঞ্চজন জানেন, কোন হতভাগ্য মিস জনসনেব চেক জাল করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, জানে—এক্সকিউজ মি পীটাব কাকা ফর বিইং ক্যান্ডিড—আপনার অনুমান-মোতাবেক কোন বৃদ্ধ পারিবাবিক চিকিৎসক বুদ্ধুর মতো ভুল ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—

মামু এবাব ডক্টব দত্তের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কী বলেন? আমি খোলাখুলি আলোচনা করবো?

বৃদ্ধ গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, আমি সুরেশের সঙ্গে একমত। সৌজন্যেব নলচের আডালে কিছুই ঢাকা পড়ছে না। আপনি খোলাখুলিই সব কথা বলুন। তবে এই সুযোগে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাখছি—পামেলার মৃতদেহ 'এক্সহিউম' করে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না—আর্সেনিক পয়েজিনিং-এ তার মৃত্যু হয়েছিল। আমি অবশ্য খুবই মর্মাহত হবো কবরের শান্তি বিঘ্নিত হলে—কিন্তু আমি বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আমি তা সহ্য করবো।

—না ডক্টর দত্ত, আমি মিস জনসনের দেহ কবর থেকে তুলবার প্রস্তাব কবিনি, করছি না। দুটি কারণে, প্রথমত আমার মক্কেল—যদি পরলোক থাকে—তাহলে এটা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। দ্বিতীয়ত—মৃতদেহকে নাড়াচাড়া না করেই আমি আততায়ীকে চিহ্নিত করেছি, প্রমাণ পেযেছি। সে কথাই বলবো। যে কথা বলছিলাম: মিস্ জনসন সন্দেহ করেছিলেন, তাঁর ভাইপো সুরেশকে। তাই তাকে দ্বিতীয় উইলখানি দেখতে দেন। আশা করেছিলেন—সে মিস্ হালদারকে সে কথা জানিয়ে দেবে।

—এখানে আমার অনুসন্ধানে দুটি ধারা দেখা দিল। সুরেশ বাবে বারে বলেছিল সে এ-কথা তাব

বোনকে জানায় আর স্মৃতিটুকুও দৃঢ়স্বরে জানায় যে, সুরেশ তাকে বলেনি। স্পষ্টতই একজন মিথ্যা কথা বলেছে। কে বলেছে? আমি সিদ্ধান্তে এলাম—মিথ্যাভাষণ করেছিল সুরেশ। যুক্তি? টুকুর মিথ্যা কথা বলার কোনও যৌক্তিকতা নেই। বরং সে যদি বলতো যে সুরেশ তাকে জানিয়েছিল, তাহলে ওর সুবিধা হতো। তাকে আমি জানিয়েছিলাম যে,আমার মতে মিস্ জনসনের মৃত্যু অস্বাভাবিক—তাঁর দেহ 'এক্সহিউম' করার কথা হচ্ছে। সে নিজে দোষী হলে বরং মিথ্যা করেও বলবে যে, সুরেশ তাকে জানিয়েছিল দ্বিতীয় উইলটার কথা। সেটা টুকুর জানা থাকলে তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। ফলে টুকু মিথ্যা কথা বলেনি। এখন দুটি সম্ভাবনা—সুরেশ মিথ্যা কথা বলেছে নিশ্চয়, কিন্তু কোনটা মিথ্যা? সে দ্বিতীয় উইলটা দেখেছে বোনকে বলেনি অথবা আদৌ দেখেনি, আমাকে মিথ্যা করে বললে যে, দেখেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা বাতিল করতে হলো মিনতির স্টেটমেন্ট থেকে। মিস জনসন যে-ভাষায় কথা বলেছিলেন ঠিক সেই ভাষাতেই মিনতি আমাকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। অর্থাৎ মিনতি কথোপকথনটা স্বকর্ণে শুনেছে। হয় ঘটনাচক্রে অথবা আড়ি পেতে। তার মানে সুরেশ উইলটা দেখেছে, কিন্তু টুকুকে সে কথা জানায়নি।

কেন? একটাই হেতু। 'গিল্ট কনশাস'—অপরাধী মনোভাবাপন্ন। সে বুঝতে পেরেছিল, তার জন্যে বড়পিসি উইলটা পালটে ফেলেছে। ফাঁদটা সে পাতুক না পাতুক তাকে সন্দেহ করেই—নোট সরানো, চেক জাল করা অথবা 'ভালমন্দ' বিষয়ে হুমকি দেওয়ায় বড়পিসি দ্বিতীয় উইল করে সবাইকে বঞ্চিত করেছেন। লজ্জায় সে কথা সে বোনের কাছে স্বীকার করতে পারেনি।

—কিন্তু মৃত্যুফাঁদটা তাহলে কে খাটালো? যে কয়জনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা গেছে তার মধ্যে একমাত্র মিনতি মাইতির কোন লাভ হতো না সে রাত্রে মিস্ জনসনের মৃত্যু হলে; অথচ ঘটনা এমন যে, মৃত্যু না হলেও ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনার ফলে একমাত্র সেই লাভবান হলো। যদি ধরে নিই মিনতিই ফাঁদটা পেতেছিল...

আর সহ্য হল না মিনতির। সে গর্জে ওঠে ঃ থামুন। কী যা তা বলছেন...

—একটু ধৈর্য ধরে শোনো মিনতি, আমি কী বলতে চাই—

—কী শুনবো? বলি, শুনবোটা কী? আপনি ক্রমাগত যা নয় তাই বলে যাবেন...

বাসু ওর কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন, তাহলে তার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে—মিস জনসনের মন তাঁর পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা; সেক্ষেত্রে সে কিছুতেই ঐ তথ্যটা তার ম্যাডামের কাছ থেকে লুকোতে চাইতো না—অর্থাৎ ফ্লিসি সে রাত্রে বাইরে ছিল। খবরটা জানলেই কর্ত্রীর মন তাঁর পরিবারভুক্তদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠতো। আমি একাধিক সূত্র থেকে জেনেছি—মিনতি বরং খবরটা গোপন রাখতেই চেয়েছে। ফলে, মিনতি ঐ ফাঁদটা পাতেনি। মিনতি নির্দোষ।

যুক্তির সারবত্তা ও গ্রহণ করতে পারলো কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু শেষ পংক্তির অর্থগ্রহণ হলো তার। সংক্ষেপে বললে, ধন্যবাদ।

—এইখানে আর একটা 'সাইড-ইস্যু' এসে যাচ্ছে: আর্সেনিক প্রসঙ্গ।

উনি ছেদিলালের সঙ্গে কথোপকথন,তার কৌটার সিল খোলার কথা বিস্তারিত বললেন, এবং সুরেশ যে 'আর্সেনিক' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে হঠাৎ 'স্টিকনিন' বলেছিল তাও।

এবার ভেঙে পড়লো সুরেশ নিজেই। বললে, আমরা... আমরা বোধহয় সবাই কমবেশি পাষণ্ড! অন্যের কথা জানি না—নিজের কথা বলি—ছেদিলালের কৌটোটা দেখে আমার লোভ হয়েছিল। কতটা 'উইড-কিলার' খেলে মানুষের মৃত্যু হয় তাও ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বিশ্বাস করুন... না, আয়াম সরি... এ পর্যন্ত আমার যে চরিত্রচিত্রণ হয়েছে, তাতে 'বিশ্বাস করুন', শব্দটা উচ্চারণ করার অধিকার আমার নেই!

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সুরেশ।

এবার হঠাৎ স্মৃতিটুকু বলে ওঠে, তোর ঐ কথাটা খাঁটি—আমরা বোধহয় সবাই পাষণ্ড। আমার যে

নিবুচরণ হয়েছে, তাতে আমিও নিজেকে বিশ্বাসভাজন বলে দাবি করতে পারি না। কিন্তু মিথ্যা অপরাধ তোর স্কন্ধেও চাপতে দেব না রে সুরেশ'. . হ্যাঁ, ছেদিলালের সিলড-টিন খুলে ঐ 'আর্সেনিক বিষ' আমিই সরিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন... আযামসর্বি' কথাটা আমারও নাগালের বাইরে।

এবার বাসু-মামু বলে ওঠেন, আমি তোমাদের দুজনের কথাই বিশ্বাস করেছি। কারণ—য়ু আর পার্ফেক্টলি রাইট ডক্টর দত্ত—আর্সেনিক বিষে মিস জনসনের মৃত্যু হয়নি।

সুরেশ আর টুকুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। আমার স্পষ্ট মনে হলো, ওরা দুজনেই দুজনকে সন্দেহ করছিল। তাই টুকু বলেছিল—সুরেশ বোম্বাই চলে গেছে। আর তাই সুরেশ ভাবছিল—টুকুকে দ্বিতীয় উইলটার কথা না-বলা চূড়ান্ত মূর্খামি হয়েছে তার।

মামু তাঁর বিশ্লেষণে ফিরে এলেন: এবার মিস্ জনসনের মৃত্যুর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সচরাচর দেখা যায়, প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আততায়ী দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা করে। এখানে বলি, একটি তথ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম একাধিক সূত্র থেকে। মৃত্যুর তিন দিন আগে মিস্ জনসন প্ল্যানচেটে বসেছিলেন। মিনতি বিশ্বাসী—সে একটা স্বর্গীয় আভা দেখতে পায়। কিন্তু মিস্ ঊষা বিশ্বাস অবিশ্বাসী—তিনি অতি ধূর্ত, বিচক্ষণ। তাঁর বর্ণনা মোতাবেক—কোট 'প্রথমত বিবনদুটি স্পষ্টতই ওর মুখ থেকে বার হয়েছে। দ্বিতীয়ত ধূপের ধোঁয়া হয় নীলচে-সাদা রঙের। এ দুটি হলুদ-রঙের। তৃতীয়ত বিবনদুটি লুমিনাস, আই মীন, প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময় ঝলমলে বা চকচকে নয়। স্নিগ্ধ, দ্যুতিমান, প্রভাময়—জোনাকির আলো হলুদরঙের হলে যেমনটা দেখাবে' আনকোট। মিস্ বিশ্বাস স্কুলে বাংলা আর ইতিহাস পড়াতেন; তার বদলে যদি তিনি বিজ্ঞানের ছাত্রী হতেন তাহলে ঐ বিস্তারিত বর্ণনা একটি মাত্র বাক্যে সংক্ষেপিত করতেন ঃ 'মিস্ জনসনের নিশ্বাস ছিল ফসফোরেসেন্ট'।

নির্মল একটু নড়েচড়ে বসলো। মামু তার দিকে ফিরে বলেন, হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছ নির্মল—আর্সেনিক নয়, ফসফরাস। ফসফরাসের টক্সিক এফেক্টকে অনেক সময় মানে হয় 'ইয়েলো অ্যাট্রপি অব দা লিভার'। বিষ হিসাবে ফসফরাস দুর্লভ নয়, একরকম দেশলাই কাঠির মাথাতেই পাওয়া যায়। এক গ্রেনের শতভাগ থেকে ত্রিশভাগ হচ্ছে 'ফেটাল ডোজ'। অর্থাৎ বিষটা যে প্রয়োগ করেছে সে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

—সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে দু'দুজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো অন্য একজনের উপর। বি-এস-সি-তে রসায়নে অনার্স নিয়ে সে দু'দুবার পরীক্ষা দিয়েছে। তার বাবা ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক। আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথম দর্শনেই মনে হল সে আতঙ্কগ্রস্তা। কেন? মিস্ জনসনের 'মৃত্যু' সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছি শুনে সে খণ্ডমুহূর্তের জন্য শিউরে উঠেছিল। যে মুহূর্তে আমি বুঝিয়ে বললাম—না মৃত্যু নয়, তাঁর উইলের প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করতে এসেছি, অমনি তার অন্য মূর্তি। সে ভাব দেখালে—প্রীতমকে সে দারুণ ভয় পায়। ধীরে ধীরে সে আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছিল—যাতে আমি তার স্বামীকে সন্দেহ করি। কেন?

—হেনার চরিত্রটা আমি বিশ্লেষণ করলাম। আমার মনে হল প্রীতমকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে—ভালবেসে নয়। সাজে-পোশাকে সে যাদের আকর্ষণ করতে চেয়েছিল তাদের কাউকে ও ধরে রাখতে পারেনি। মিস্ জনসন বা মিস্ বিশ্বাসের মতো অবিবাহিত জীবন কাটাতে চায় না বলেই সে বাধ্য হয়ে প্রীতমকে বিবাহ করেছিল—এটাই মনে হলো আমার। ক্রমে সে প্রীতমের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে ওঠে। স্মৃতিটুকুর মতো সাজ-পোশাক করতে চায় সে—পার্টিতে যেতে চায়, গ্ল্যামারাস হতে চায়। মজঃফরপুরে সেসব কিছুই নেই। তাছাড়া প্রীতম শেয়ার-মার্কেটে তার স্ত্রীধন নষ্ট করে ফেলায় ওর মনে একেবারে বিষিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে দুটি সন্তান হয়েছে তার। লেডি ম্যাকবেথের যেমন ছিল একটি কন্যাহৃদয়, ওর তেমনই ছিল একটি মাতৃহৃদয়। ও প্রীতমের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বয়ম্ভর হতে চাইলো। কলকাতায় টুকুর মতো অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে সে থাকবে। তার টাকার দরকার। একমাত্র পথ—মিস্ জনসনের আশু মৃত্যু। অনেকেই জানে না—মিস্ জনসনের উইল মোতাবেক হেনা সম্পত্তির

এক-তৃতীয়াংশ পেতো না—পেতো অর্ধেক। এ তথ্যটা সে বোধহয় জানতো। ফসফরাস বিষের লক্ষণ যে জনডিসের অনুরূপ এ তথ্যটাও তার জানা। বিহার থেকে আসার সময়েই সে ঐ 'ফসফরাস' সংগ্রহ করে এনেছিল। কিন্তু মরকতকুঞ্জে পৌছে একটি সহজতর সমাধান ওর নজরে পড়ে, সারমেয় গেণ্ডুক। সিঁড়ির মাথায় মৃত্যুফাঁদটা সেই পেতেছিল—

মিনতি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু আমি সে-রাত্রে স্পষ্ট দেখেছিলাম...

বলছি সে-কথা। তুমি থামো। কথা বোলো না। মিনতি আমাকে জানিয়েছিল যে, দুর্ঘটনার রাত্রে বা তার পূর্বরাত্রে সে স্বচক্ষে দেখেছিল স্মৃতিটুকুকে ঐ পেরেকটা পুঁততে, অথবা নিচু হয়ে কিছু করতে। ব্যাপারটা বিস্তারিত বলি—

এরপর উনি সমস্ত ঘটনাটা জানালেন, মায় টুকুর দৃঢ় অস্বীকার। বললেন, মিনতির ঐ স্টেটমেন্ট শুনেই আমার মনে হয়েছিল—জবানবন্দির ভিতর কিছু আপাত-অসঙ্গতি আছে—যা হবার নয়, তাই বলা হচ্ছে। সেটা যে কী, তা বুঝতে পারিনি। পরে ঘটনাচক্রে একদিন আয়নার সামনে ওই ব্রোচটা ধরায় আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হলো। মিনতি টুকুকে সনাক্ত করেছিল তার নীলরঙের নাইটি দেখে। আর ঐ T.H. নাম লেখা ব্রোচটা দেখে। না হলে অত কম আলোয় ঘুমঘুম চোখে তার পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভব হতো না।

—ঘটনাচক্রে আয়নার সামনে ঐ ব্রোচটা ধরতেই আমার নজর পড়লো প্রতিবিম্বে অক্ষর দুটি উলটে গেছে—T.H নয়, H.T.।

—হেনা টুকুর নকল করতো, পোশাকে-আশাকে। তারও ছিল অনুরূপ নীল নাইটি। সেও টুকুর অনুকরণে কিনেছিল অনুরূপ ব্রোচ—H.T , হেনা ঠাকুর। কিন্তু সাজসজ্জা বিষয়ে তার কোনও রুচি ছিল না। তাই নাইটি পরেও কাঁধে ব্রোচ আটকেছিল—সে ভুল কিছুতেই করতে পারে না নিখুঁত সজ্জা-পারদর্শী স্মৃতিটুকু হালদার। রাতে নাইটির উপর ব্রোচ আটকানো!

—হেনা ফাঁদ পাতলো। তাতে মিস্ জনসনের মৃত্যু হলো না। তিনি যে উইলটা বদলে ফেলেছেন তা হেনাকে জানাননি, কারণ তাঁর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না—হেনা একাজ করতে পারে। এবার হেনা তার মূল পরিকল্পনা রূপায়িত করলো। অতি সহজ পদ্ধতিতে। মিস্ জনসনের বাথরুমে ক্যাপসুলের একটি খুলে 'ফসফরাস' ভরে দিল—ওষুধটা ফেলে দিয়ে। হেনা জানতো। দিন পাঁচ-সাতের মধ্যেই ঐ ক্যাপসুলটা উনি খাবেন। তখন সে অকুস্থল থেকে অনেক দূরে। তাই সে আর মরকতকুঞ্জে একবারও আসেনি।

—হেনা ওখানেই থামেনি। বড়মাসির মৃত্যুর পর সে মর্মাহত হয়ে যায়। দেখে, সে সফল হয়েও ব্যর্থকাম! এখন সে অন্যপথে চলতে শুরু করলো। মিনতি মাইতির হৃদয় জয়। লক্ষ্য করে দেখলাম—একমাত্র প্রায় সমবয়সী সেই মিনতি মাইতিকে ডাকে 'মিন্টিদি' বলে, 'আপনি' বলে কথা বলে—যা বলে না প্রায় সমবয়সী সুরেশ বা টুকু। আর সেজন্যই সে সুরেশ-টুকুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিনতির বিরুদ্ধে উইল-সংক্রান্ত মামলায় যেতে চায়নি। ওর তখন দুটি লক্ষ্য। এক: প্রীতমের কবলমুক্ত হওয়া সন্তানের অধিকার সমেত। দুই: মিনতির সেন্টিমেন্টে আঘাত করে কিছু অংশ ফিরে পাওয়া।

—হেনা এবার পাগলামোর অভিনয় শুরু করলো। তার স্বামী তাকে ভালবাসে, তাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করাতে চায়। এটাই হলো হেনার তুরুপের টেক্কা। সে ধীরে ধীরে আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছিল যে, বিষপ্রয়োগ করেছে প্রীতম নিজেই! তার প্ল্যানটা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। স্বামীর সই জাল করে সে বেশ কিছু 'কামপোজ' ট্যাবলেট কিনে নিজের কাছে রেখেছিল। আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে বুঝলেই সে স্বামীকে ঐ ঘুমের ঔষধটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাইয়ে দিতো। সবাই ধরে নিতো ডক্টর প্রীতম ঠাকুরই হত্যাকারী—পি.কে.বাসুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

প্রীতম একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকে। তারপর সংযত হয়ে বলে, তাই... সেদিন আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কামপোজের কথা?

—হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনকে পৃথক করতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয় হত্যা ঠেকাতে চেয়েছিলাম। প্রীতম রুদ্ধকণ্ঠে বলল, যেদিন ও রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সকালবেলা বেরিয়ে যায় সেদিন তুচ্ছ কারণে আমরা ঝগড়াঝাটি করেছিলাম। ও আমাকে এক গ্লাস সরবৎ খেতে দিয়েছিল, ওর মুখ দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল—ওর পাগলামির কথা জানতাম, তাই ভেবেছিলাম ও কিছু বশীকরণের শিকড়-বাকড় খাওয়াতে চাইছে আমাকে। আমি রাগ করে সরবৎটা ফেলে দিয়েছিলাম।

—এমনটা ঘটতে পারে তা আমি জানতাম। তাই আমি একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে হেনাকে পড়তে দিয়েছিলাম—তাকে জানতে দিয়েছিলাম যে, তার 'গোপনকথা' আমি জানি।

—মাই গড! তাই সে আত্মহত্যা করেছে! তাই পুলিসে বলছিল, মৃত্যুর আগে হেনা কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। কাগজ পোড়া ছাই ছিল ওর ঘরে।

বাসু প্রীতমের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, এটাই সব থেকে ভালো হল নাকি? আমি ওকে আত্মহত্যা করার কথা বলিনি। শুধু জানিয়েছিলাম—মীনা আর রাকেশের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সিদ্ধান্তটা হেনা নিজেই নিয়েছে। এছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এটার দরকার ছিল প্রীতম। নাহলে একের পর এক দুর্ঘটনা-জনিত অপমৃত্যু ঘটত। প্রথমে তুমি। তারপর মিনতি—যখন ওরা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতো।

মিনতি উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাসু-মামু, এবার আমিও আমার কথাটা বলি। সুরেশদা যে কথা বলেছে তা নিয্যস সত্যি—আমরা সবাই কম-বেশি পাষণ্ড। আমি... আমিও কিছু পাপ-কাজ করেছি।

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, জানি, মিনতি। মৃত্যুর ঠিক আগে মিস্ জনসন তোমাকে বলেছিলেন উইলখানা নিয়ে আসতে। আর তুমি মিথ্যে করে বলেছিলে, কাগজখানা উকিলবাবুর কাছে আছে। তাই নয়? তার মানে তুমি ম্যাডামের অগোচরে আলমারি ঘেঁটে দেখেছিলে।

মিনতি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, আমিও ধোওয়া তুলসীপাতাটি নই। আমি লুকিয়ে আলমারি খুলেছিলাম, জানতাম ঐ উইলের কথা—বুঝতে পেরেছিলাম—উনি সেটা ছিঁড়ে ফেলতে চান। আমি জন্মদুখিনী... কিন্তু উইল পড়ে আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি—বিশ্বাস করুন—যে সম্পত্তিটার পরিমাণ এত! আমি ভেবেছিলাম দশ-বিশ হাজার টাকা! তারপর থেকে রাতে আমার ঘুম হয় না। আমার সব সময়ে মনে হয়, আমি তঞ্চকতা করেছি—সবাইকে ঠকিয়ে যা আমার হক্কের ধন নয়...

বাসু বললেন, তুমি কি মীনা আর রাকেশকে কিছু দিতে চাও?

—শুধু ওদেরই নয়। সুরেশদা, টুকুদি এদের কাছেও আমি অপরাধী হয়ে আছি। আপনি মধ্যস্থ হয়ে একটা বিলিব্যবস্থা করে দিন। মীনা আর রাকেশ এই মরকতকুঞ্জেই মানুষ হতে পারে—প্রীতমভাই যদি রাজি হয়। নাহলে, কবরে শুয়েও ম্যাডাম শান্তি পাবেন না।

মামু ডক্টর দত্তের দিকে ফিরে বলেন আপনি আমার মক্কেলকে পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। বলুন, কী ব্যবস্থা নিলে মিস্ পামেলা জনসন খুশি হতেন?

পিটার দত্ত বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—উষাও তাই বলে—পামেলা ঐ দ্বিতীয় উইলটা বানিয়েছিল অন্তিমে ছিঁড়ে ফেলার জন্যই। মিন্টি যখন নিজে থেকে আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছে তখন আপনি মধ্যস্থ হয়ে একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিন। নির্মলের পেটেন্টটা যাতে নেওয়া যায়, সুরেশ আর টুকু যাতে পামেলার ক্ষমাসুন্দর আশীর্বাদ পায়, আর প্রীতমকে আমি একটা সাজেশান দিতে চাইছি: সুদূর মজঃফরপুরে পড়ে থাকার কী দরকার তার? আমি আর কদিন? নির্মলও মেরীনগরে থাকবে না, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। ও যদি মরকতকুঞ্জেই এসে বসবাস করে তাহলে আমার প্র্যাকটিসটা ওর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। অবশ্য তার বয়স কম, সে যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে...

প্রীতম মাঝখানেই বলে ওঠে, মীনা আর রাকেশকে মানুষ করে তোলাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য। দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রশ্নই ওঠে না। বাকি জীবনটা আমি আমার হতভাগিনী স্ত্রীর স্মৃতি নিয়েই

কাটিয়ে দিতে চাই। এখানে সর্বসমক্ষে আমার স্ত্রীকে নগ্ন করা হয়েছে—আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি—বাট য়ু টু ডক্টর্স উড অ্যাপ্রিশিয়েট—সে সত্যিকারের শয়তানী ছিল না। সে একটা অবসেশানে ভুগছিল—ইটস আ মেন্টাল ডিজিজ। হ্যাঁ, সুরেশ ঠিকই বলেছে—আমরা সবাই কমবেশি পাষণ্ড—কিন্তু 'হানি' তা ছিল না—শি ওয়াজ জাস্ট আ পেশেন্ট!

বাসুমামু আজ অনেক অনেক ভেল্কি দেখিয়েছেন—কিন্তু আমার মনে হল, শেষ চমকটা দিল ঐ প্রাণবন্ত পাঞ্জাবী তরুণটি।

'হানি'র প্রতি তার ভালবাসায় একতিলও মালিন্য স্পর্শ করেনি।

ডাক্তার পিটার দত্তের পীড়াপীড়িতে ফেরার পথে তাঁর বাড়িতে একবার যেতে হলো।

মিস বিশ্বাস আজকের এ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি—শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায়, কিন্তু তাঁর উৎসাহ নাকি কারও চেয়ে কম নয়। মামুর অনুরোধে ডক্টর দত্ত এ কয়দিন 'মিস মার্পল অব মেরীনগর'কে কোনক্রমে শান্ত করে রেখেছেন। এখন যদি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমরা ফিরে যাই তাহলে তিনি মর্মাহত হবেন। ডক্টর দত্তের শেষ যুক্তি: রোগীর মানসিক শান্তির জন্যও এটুকু করা দরকার।

মামু বললেন, শ্যিওর! উনি আমার দিদির মতো, চলুন যাই।

আমাদের দেখতে পেয়ে শয্যালীন বৃদ্ধা বললেন, শেষ-মেশ এমন দিনে এলে ভাই যে, আমি বিছানায় শুয়ে। কেক-কুকি কিছুই বানিয়ে রাখতে পারিনি।

ডাক্তার সাহেবের ভাইঝি দাঁড়িয়ে ছিল ওঁর বিছানার পাশে। বললে, তাতে কী? আমি তো আছি! ও বেলা পুর করে রেখেছি, জানতাম ওঁরা আসবেন। এখনি গরম গরম ভেজে আনছি। কফি না চা?

মামু বললেন, কফি। কিন্তু র। দুধ-চিনি বাদ। শুধু আমারটা।

আশা পুরকায়স্থও উপস্থিত ছিল। হাত তুলে নমস্কার করলো। সেও চলে গেল ভিতর দিকে। বোধ করি সাহায্য করতে।

বৃদ্ধা বললেন, পীটার, মিস্টার টি. পি. সেনের জন্য যেটা আনিয়ে রেখেছি সেটা নিয়ে এসো।

পীটার আদেশ তামিল করতে গেলেন। মামু বলেন, আমার জন্য আবার কী আনিয়ে রেখেছেন? প্রেজন্টেশান?

উনি জবাব দেবার আগেই ডক্টর দত্ত ফিরে এলেন। তাঁর হাতে কৃষ্ণনগরী মাটির পুতুল। একজন বলিষ্ঠ গঠন নগ্ন যুবক কব্জিতে থুতনি রেখে কী ভাবছে। বিখ্যাত ভাস্কর্যের মিনিয়েচার-কপি ঃ দ্য থিংকার।

মিস্ বিশ্বাস বলেন, তুমি পেশায় সাংবাদিক, চিন্তাজগতের মানুষ। তাই তোমার জন্য ঘূর্ণী থেকে আনিয়ে রেখেছি। টেবিলে সাজিয়ে রেখো, আমার কথা মনে পড়বে।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে মামু উপহারটা গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধা বলেন, শুনলাম তুমি আংকল্ যোসেফের জীবনীটা লিখবে না বলে স্থির করেছ? সত্যি?

মামু হেসে বলেন, সত্যি। আংকল হ্যারল্ডের ডায়েরিটা পড়ে মনে হল আপনি ঠিকই বলেছেন—কোমাগাতামারু জাহাজের সঙ্গে যোসেফ হালদারের কোন সম্পর্ক ছিল না।

দুজনেই বুঝছেন। তবু কথাবার্তা চলেছে সাবে-সাবে। 'আউল-বাউল'-এর সাঙ্কেতিক ভাষায়। ঊষা বললেন, আঙ্কল যোসেফের মেয়ের দেহটা 'এক্সহিউম' না করেই যে সেটা তুমি বুঝে উঠতে পেরেছ এতেই আনন্দের। সেটা করলে আমরা সবাই মর্মাহত হতাম—আমি,পীটাব আর পামেলা।... শুনলাম হেনা ভুল করে বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিল। বেচারি হেনা! তা প্রীতম কী স্থির করল? মরকতকুঞ্জে এসে থাকবে?

শেষ প্রশ্নটা পীটাব দত্তকে। মনে হলো, এ নিয়ে বুড়োবুড়ি আগেই আলোচনা করেছেন। পীটাব গ্রীবা সঞ্চালনে জানালেন—প্রীতম রাজি হয়েছে।

বৃদ্ধা খুশি হলেন। বাল্যবন্ধুকে বললেন, তাহলে তোমার ছুটির ঘণ্টাও এবার বাজলো?

—তাই তো আশা করছি।

এবার বৃদ্ধা মামুর দিকে ফিরে বললেন, আই কনগ্র্যাচুলেট য়ু। কাজটা হাসিল করেছো অথচ ডার্টি লিনেন সর্বসমক্ষে ঝাড়তে হলো না। কী করে সবার পেটের কথা বার করলে জানতে দারুণ কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু না, আমি জানতে চাইবো না।

মামু আগ বাড়িয়ে বলেন, জাতে সাংবাদিক যে! সকলের সব কথাই আমার মনে থাকে, তার ঠিক ইন্টারপ্রিটেশান করতে পারি।

—নাকি? একটা উদাহরণ দাও?

—যেমন ধরুন, 'ডিটেকটিভ' শব্দটার বাংলা পরিভাষা যে 'টিকটিকি' এই সোজা কথাটা না বুঝতে পারায় একবার এক বৃদ্ধ যে ভাষায় ধমক খেয়েছিলেন তার কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন শ্রোতা করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

রীতিমতো চমকে উঠলেন উনি। আমতা-আমতা করে বলেন, মাই গড! তুমি .. তুমি তা কেমন করে জানলে? সে তো টেলিফোনে কথা---

—ঐ যে বললাম, জাতে সাংবাদিক যে! প্রায় গোয়েন্দার মতো।

—কী? কী ভাষায় ধমক খেয়েছিল সেই বৃদ্ধ?

—কোট 'আমার কথা তো পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি বুঝতে পারলে না ডট ডট ডট! সে আবার আজ নতুন করে কী বুঝবে?' আনকোট।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ঊষা বিশ্বাসের চোখ দুটো। বাক্যটার কী 'ইন্টারপ্রিটেশন' ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোক করেছেন তা আর জানতে চাইলেন না। মামু মিটিমিটি হাসতে থাকেন। ঊষা বলেন, না! তুমি সাংবাদিক নও। য়ু আর এ জুয়েল অব আ স্লুথ! আ জিনিয়াস! এয়ারকুল পয়রো! চেনো তাঁকে? নাম শুনেছো?

মামু সে-কথার জবাব না দিয়ে একটি প্রতিপ্রশ্ন করেন। বলেন, ক্রমাগত আপনিই বা প্রশ্ন করে যাবেন কেন? এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন দেখি, আপনি মেরি রোজ-ব্যুরের নাম শুনেছেন? চেনেন মেয়েটিকে?

মিস্ বিশ্বাস অবাক হলেন। বলেন, মেরি রোজ-ব্যুরে? ফ্রেঞ্চ?

—হ্যাঁ। ফরাসী মহিলা। জন্ম 1844। ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চলের বাসিন্দা।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে ভাবলেন। তারপর বললেন, আর দু-একটা ক্লু।

—অত্যন্ত সুন্দরী। মাথায় সোনা-গলানো চুল। আনপড়। নিজের নাম সই করতে পারতেন না। আপনি আমাকে যে মূর্তিটা দিলেন—'দ্য থিংকার', তার অরিজিন্নাল তাঁর সঙ্কলনে ছিল।

মাথা নেড়ে বললেন, ফেল মারলাম। বলে দাও। কে ঐ মেরী রোজ-ব্যুরে?

—মৃত্যুর মাত্র উনিশ দিন আগে তাঁর পদবীটা বদলে গেছিল। মৃত্যু সময়ে তাঁর নাম; মেরি রোজ-রোদ্যাঁ। অগ্যস্ত্‌ রেনে রোদ্যাঁর সহধর্মিণী। তাঁর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স সত্তর, রোদ্যাঁর

সাতাত্তর। পঞ্চাশ নয়, পাক্কা তিপান্ন বছর ধরে অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ সেই মহিলাটির কী একটা কথ
অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল শয্যালীন বৃদ্ধার। ক্রমে সামলে নিলেন। ডাক্তার দত্তের দিকে ফি
বললেন, ছোকরার মুখের কোনও আড় নেই!

মামু বলেন, ছোকরা! আমার বয়স কত জানেন?

—জানি। সত্তর বছর বয়সে মেরি রোজ যদি ওয়েডিং গাউন পরতে পারেন তাহলে তোমার বয়
চ্যাঙড়াও দিদির হাতে পিটটানি খেতে পারে। বুঝেছো হে ছোকরা?

গরমাগরম কচুরি হাতে আশারা প্রবেশ করায় বোধ করি সেদিন ভাগ্নের সামনে মামুকে দিদির হা
ঠ্যাঙানি খেতে হলো না।